রত্ন-বলয়

(Garnet Bracelet)

আলেকজান্ডার কুপরিন

অনুবাদ : তারাপদ রাহা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
কলিকাতা-১২

॥ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ ॥

আলেকজান্দার কুপারিনের গারনেট ব্রেসলেট থেকে অনুবাদ।

প্রকাশক :
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ছেপেছেন :
ননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ
৯ এ্যান্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শঙ্কর দাশগুপ্ত

দাম : সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

সূচী

কুপরিনের প্রায় সমস্ত রচনার মূল বক্তব্য মাত্র দুটি কথায় প্রকাশ করা যায়ঃ এখনকার দুঃখ কষ্ট এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

ওয়াক্ল ওরোওস্কি (১৮৭১—১৯২৩), সোবিয়েত কূটনীতি বিশারদ, সম্পাদক এবং সাহিত্য সমালোচক।

পৃথিবীর একমাত্র দেবতা—মানুষের জয় হোক। আসুন আমরা তার দেহানন্দের গুণগান করে তার শাশ্বত মনের দিব্যারাধনায় শির নত করি।

—আলেকজান্দার কুপরিন

লেখক পরিচিতি

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নারোভচাটা নামে ক্ষুদ্র এক গ্রাম্য শহরে আলেকজেন্দার আইভানোভিচ্ কুপরিনের জন্ম। বাপ ছিলেন এক নিম্নপদের রাজকর্মচারী। আয় ছিল তাঁর সামান্যই। কুপরিনের বয়স যখন এক বছর তখনই তিনি মারা যান। এর পর কুপরিনের পরিবার মস্কোয় চলে আসেন। কুপরিনের মা কুপরিনকে সাত বৎসর বয়সে এক অনাথ ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হন; এর তিন বৎসর পর কুপরিন এক সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আঠারো বছর বয়সে কুপরিন খবরের কাগজে একটি গল্প লেখেন, গল্পটির নাম হচ্ছে 'শেষ উদ্যোগ'। কুপরিন তখনও সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রেসের জন্য কিছু লিখবার অধিকার ছিল না, তাই তাকে বন্দী করা হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'জেনারেল স্টাফ আকাদমী'তে প্রবেশ করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় সামরিক জীবন ত্যাগ করে তিনি নির্ঝঞ্ঝাট হন।

এর পর কপর্দক শূন্য হয়ে হাজির হন তিনি কীভ শহরে। তিন বৎসর ধরে চলে বেকার, যাযাবর বৃত্তি আর নিদারুণ দারিদ্র্য। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'আমি এক অজানা অচেনা শহরে এসে হাজির হলাম, টাকা নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, পরিচিত লোক পর্যন্ত নেই। সব চেয়ে মুস্কিল কোন কাজ-কর্ম আমার শেখা নেই, জীবন সম্বন্ধে কোন সত্যিকার জ্ঞান নেই'।

এইখানে ছোট গল্প আর কবিতা লিখেছেন তিনি, খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় ছাপা হয়েছে সেগুলি; এ ছাড়া খবরের কাগজের রিপোর্টার, কেরাণী, জমিদারের গোমস্তা ইত্যাদির কাজ করেছেন, আমিন, দারোয়ানের কাজ করেছেন, প্রাদেশিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর নাম করবার মত প্রথম বই 'মোলক' প্রকাশিত হয়।

এক বৎসর পর তাঁর ছোট গল্পের একটি সংকলন বের হয়।

এই সময় তাঁর ম্যাকসিম গর্কীর সঙ্গে দেখা হয়। গর্কী তাঁকে 'জনানিয়া' সমিতির সাহিত্য সংকলনের জন্য লিখতে আমন্ত্রণ জানান। প্রগতিপন্থী বহু রুশ লেখকই এই প্রকাশনীতে তাঁদের বই দিতেন। গর্কীর নামে উৎসর্গীকৃত দ্বন্দ্বযুদ্ধ নামে গল্পটি ছাপা হবার পর কুপরিন তাঁকে লেখেন, আমার এই গল্পে সমস্ত বীরত্ব এবং প্রচণ্ডতার প্রেরণা যুগিয়েছেন আপনি। আপনার কাছে থেকে

আমি কত কি যে শিখেছি, এবং সেজন্য আপনার কাছে কত যে কৃতজ্ঞ আমি, তা যদি আপনি জানতেন!

প্রথম রুশ বিপ্লবের (১৯০৫) পূর্বে লেখক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি, তাঁর মানবপ্রেম, তাঁর শিল্পনীতির উৎকর্ষ প্রগতিপন্থী সমালোচকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করছিল।

কিন্তু ১৯০৫-এর বিপ্লবের পরাভবের পর যে কয়েক বৎসর ধরে তার প্রতিক্রিয়া চলে, তখন কুপ্রিন গোর্কীর কাছ থেকে সরে ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে যোগ দেন। এঁরা সাহিত্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, বলতেন শিল্পের উদ্দেশ্য শিল্প সৃষ্টি, আর কিছু নয়।

অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের প্রতি কুপ্রিনের সহানুভূতি ছিল, কিন্তু এর অর্থটা তার পুরোপুরি বোধগম্য হয়নি। জনগণের এই আন্দোলনের 'নীতিগত' দিকটার প্রতি সন্দেহ জাগায় ভয় পেয়ে যান তিনি, তাই নতুন সোভিয়েত রাশিয়ায় থেকে তাঁর লেখার কাজ চালাতে পারবেন কি না ঠিক বুঝে ওঠেন না তিনি।

১৯২০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত তিনি প্যারীতে কাটান। বিদেশ বাসকালে আত্মজীবনীমূলক 'সামরিক ছাত্র' উপন্যাসের কয়েক অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই তেমন লিখতে পারেননি তিনি। এই সময় তিনি বেশ বুঝতে পারেন, জীবনে তিনি কি ভুলই না করেছেন! দেশে ফিরবার জন্য মন তাঁর আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। তিনি বলেছেন, 'দেশের জন্য মন কাঁদে, ফিরে যেতে প্রবল ইচ্ছা জাগে, এ বেদনা কিছুতেই প্রশমিত হয় না...। রাশিয়া যেতে পারলেই, তবে গিয়ে আমি তার জন্য কিছু করতে পারি।'

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় ফিরে এসে তিনি বললেন, আমার চারিদিকে লোকে এখন রুশীয় ভাষায় কথা বলছে শুনে কত আনন্দ হচ্ছে আমার। আর এর আগের বৎসরগুলিতে...আমার মনে হয়েছে রুশীয় লোকদের কাছে মহা অপরাধ করেছি আমি। ওরা এক চমৎকার কাজ করছে, নতুন জীবন গড়ে তুলছে। সোভিয়েতের লোকজন এবং তাদের সৃজনী প্রচেষ্টা নিয়ে বই লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু অসুস্থতার দরুণ পেরে উঠেননি। ১৯৩৮ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মোলক্*

কারখানা থেকে টানা সুরে সাইরেন বেজে উঠল: নূতন করে আর একটি কর্মদিনের ঘোষণা। সাইরেনের গভীর কর্কশ নাদ যেন পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে উঠে উপরে এসে কোমল হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বর্ষাচ্ছন্ন আগস্টের বিষণ্ণ প্রভাত তাতে আবার কেমন এক বিষাদ আর অমঙ্গলের আভাস এনে দিচ্ছে।

ইনজিনীয়ার ববুরভ এই সময় বসে চা খাচ্ছিল।

সম্প্রতি কয়েকদিন ধরে অনিদ্রা রোগে সে বড় কষ্ট পাচ্ছে। এত কষ্ট এর আগে আর কোনদিন সে পায় নি। মাথাটা ভারী নিয়েই সে শুতে গিয়েছিল এবং প্রায় প্রতি মুহূর্তেই সে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চমকে চমকে উঠছিল, তবুও কোন রকমে ঘুমিয়ে পড়তে তার বেশি দেরী হয় নি। ঘুমের মাঝেও ছটফট করেছে সে। ভোর হবার অনেক আগেই তার ঘুম ভেঙে গেছে। শরীরে জুৎ নেই, মেজাজ তিরিক্ষে। দেহ ও মন দুই-ই বড় শ্রান্ত থাকে আজকাল। এ নিশ্চয়ই তারই ফল। তা ছাড়া—এর সঙ্গে মরফিয়া ইন্‌জেকশান নেবার পুরানো অভ্যাসটিও আছে। এ অভ্যাসটা ছাড়াতে অবশ্য সে আজকাল প্রাণপণ চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে।

জানালার ধারে বসে সে একটু একটু করে চা খাচ্ছিল,—কিন্তু তা-ও ভাল লাগছে না তার, কেমন যেন বিস্বাদ। বৃষ্টির ধারা জানালার কাঁচের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে গড়িয়ে পড়ে নিচে জমে-থাকা খানাখন্দের জল চঞ্চল তরঙ্গায়িত করে তুলছে।

জানালা দিয়ে তার চোখে পড়ছে এক আড়ে-দিঘে-সমান চৌকো পুকুর, চারিদিকে তার খসখসে নেড়া বেঁটে-গুঁড়িওয়ালা গাছের সারি, পাতার রঙ তাদের ধোঁয়াটে সবুজ। দমকা হাওয়ায় যখন জলের উপরকার তরঙ্গ ছুটে যাচ্ছে—উইলোর পাতাগুলি হয়ে উঠছে তখন একটু রুপালী। আউরে যাওয়া ঘাসের ডগাগুলি বৃষ্টির ঘায়ে মাটিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। পাশের গ্রাম,—

* মোলক—বলিভুক দেবতা। প্রাচীন ফিনিশীয়দের এই দেবতার কাছে শিশু বলি দেওয়া হত।

চক্রবালে মিশে যাওয়া করাতের-মত-খাঁজ-কাটা কালো বনের রেখা, আর হলদে কালোর ছোঁয়া লাগা মাঠ—সব কিছুই কুয়াসাচ্ছন্নের মত অস্পষ্ট আর ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে।

সকাল সাতটার সময় ববরভ মাথায় ঢাকনা তোলা অয়েলস্কিনের এক বর্ষাতি গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অন্যান্য ভীতু লোকের মতই ববরভের সকাল বেলাটা বড় খারাপ লাগে। সেদিনও শরীরটা কেমন দুর্বল বোধ হতে লাগল তার। চোখদুটোয় কেমন একটু ব্যথাঃ যেন জোর করে কেউ চেপে ধরেছে তার চোখ। মুখটাও কেমন বিস্বাদ। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছে সে—সম্প্রতি তার মনে যে দ্বন্দ্বের ভাব দেখা দিয়েছে—তা থেকে। তার যে সব সহকর্মীরা আদিম যুগের খোশমেজাজ নিয়ে জীবনটাকে ব্যবহারিক দিক দিয়ে দেখতে পেরেছে তারা হয়ত তার মনের এই গোপন বেদনার কথা শুনে হাসবে, অন্তত তারা কেউ বুঝতে পারবে না তার কথা। তার কারখানার কাজে বিতৃষ্ণা যেন একটা আতঙ্কের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা ছাড়া এটা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

তার যা মন, অভ্যাস এবং রুচি তাতে লেখাপড়ার কোন কাজ, অধ্যাপনা বা খামারের কাজে জীবন উৎসর্গ করাই তার সব চেয়ে ভাল ছিল। ইনজিনীয়ারিং কোনদিনই তার ভাল লাগে না। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ই সে কলেজ ছেড়ে দিতে চেয়েছিল,—কিন্তু মায়ের পীড়াপীড়িতে তা আর পেরে ওঠে নি।

তার নারীসুলভ কোমল প্রকৃতি বাস্তবের কঠিন সংঘাতে বড় বেশি কষ্ট পায়। এ কষ্টের রকমটা ভাবতে গেলে তার মনে হয়—জ্যান্ত অবস্থায় তার যেন গায়ের চামড়া তুলে নেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় যে সব তুচ্ছ ব্যাপার অপরের চোখেই পড়ে না—তা-ই তার মনে গভীর স্থায়ী বিরক্তির সৃষ্টি করে।

সাধারণ সাদাসিধে নিরহঙ্কার চেহারার লোক ববরভ। একটু বেঁটে, একটু রোগাটে, কিন্তু দেখে মনে হয় ভয়াবেগে কঠিন কাজও সে করে ফেলতে পারে। তার মুখের চেহারার মাঝে দেখবার মত ছিল তার সাদা উঁচু কপালটা। বিভিন্ন আকারের চোখের বিস্ফারিত মণিদুটো ছিল তার এত বড় যে তার জন্যে তার ধূসর চোখ দুটো দেখাত কালো। নাকের ঠিক উপরে অসমান ঘন ভ্রূ দুটো এসে মিশে তার চোখের দৃষ্টিকে করে তুলেছিল অচঞ্চল কঠোর,—অনেকটা যেন তপস্বীদের মত। পাতলা ঠোঁট দুটি যেন ভীতু ভীতু, কিন্তু নিষ্ঠুর নয়, একটু যেন সামঞ্জস্যহীনঃ মুখের দক্ষিণ কোণটা বাম কোণের চেয়ে একটু উঁচু। তার লালচে দাঁড়িগোঁফ বড় পাতলা আর ছোট,—বলতে গেলে একটা ছেলে-মানুষেরই মত। মুখটা তার এমন সাদামাঠা হলেও হাসবার সময় তাতে এক অপূর্ব শ্রী ফুটে উঠত। এই সময় খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত তার দুটি

চোখ. দৃষ্টিতে নামত মধুর কোমল ছায়া,—ফলে তার সারা মুখখানিই হয়ে উঠত মনোরম।

ঘর থেকে বেরিয়ে আধ মাইলের মত পথ হেঁটে ববরভ এসে হাজির হল একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর। নিচে কারখানার বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় বিশ বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে যেন হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। আসলে—এটা একটা লাল ইটে তৈরী শহর,—শুধু নামে নয়,—কাজে। কালো-ঝুল-মাখা লম্বা চিমনি-গুলো যেন তার মাঝে খোঁচা খোঁচা শুয়োরের কুঁচির মত খাড়া হয়ে আছে। গন্ধক আর গলিত লোহার ভাপ উঠছে তাদের গা থেকে। কারখানার বিরামহীন উৎকট শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। সবার উপর টেক্কা দিচ্ছে এখানকার চারটি ভীমকায় ধাতু-গলানো চুল্লী। তাদের পাশেই রয়েছে গরম বাতাস চলা-চলের জন্য আটটা উষ্ণ বায়ু-প্রবাহক কক্ষ, আর গোল গম্বুজ মাথায় আটটা বিরাটকার লৌহপ্রাসাদ। ধাতু-গলানো চুল্লীর আশে পাশে রয়েছে আর আর সব ঘরঃ কয়েকটা মেরামতখানা, একটা ঢালাইখানা,—একটা ধোলাইখানা,— রেল এঞ্জিন রাখবার একটা চালা, একটা রেল গড়ানোর কারখানা, একটা খোলা উনুন এবং অনেকগুলো গলিত ধাতু ঘুটবার কল।

কারখানার এলাকাটা তিন তিনটে বিপুলায়তন স্বাভাবিক চাতালে নিচে নেমে গেছে। ছোট ছোট রেল এঞ্জিন চারিদিকে ঘর্ঘর রবে ছুটে চলেছে। নিচের চাতালে এসে একবার দেখা দিয়ে কড়া শিটি বাজিয়ে তারা অতি দ্রুত উপরে ছুটে চলেছে, সুড়ঙ্গের মাঝে কয়েক সেকেন্ড অদৃশ্য থেকে শ্বেতবাষ্প গায়ে মেখে আবার বেরিয়ে আসছে, তারপর ঝনঝন করে সেতু পার হয়ে ধাতু গলানো চুল্লীতে খনিজ ধাতু বা কয়লার চাংড়া ফেলতে পাথরের ঠেকার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে।

আরও দূরে স্বাভাবিক চাতালগুলি ছাড়িয়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ধাতুগলানো চুল্লীর ওখানে যে হুলুস্থূল কান্ড চলেছে তার দিকে নজর পড়লে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। ওখানটা দেখলে মনে হয় ভেতরের এক প্রবল ধাক্কায় নানা রঙের নানা আকারের পাথরের আর ইটের টুক্রো, বালুর পাহাড় আর চ্যাপটা পাথরের ঢিবি, লোহার পাত আর কাঠের স্তূপ ছিটকে এসে পড়েছে। বিনা কারণে প্রকৃতির কি খেয়ালে যেন ওরা এক সঙ্গে এসে জড়ো হয়েছে। ভাঙা উইয়ের ঢিবিতে যেমন উই চলা ফেরা করে ঠিক তেমনি করে শত শত গাড়ি আর হাজার হাজার মানুষ ওখানে দ্রুত চলাফেরা করছে। সাদা ঝাঁঝালো চুণের গুড়ো ওর উপরে যেন কুয়াশার সৃষ্টি করছে।

আরও দূরে চক্রবাল রেখার কাছাকাছি রয়েছে লম্বা এক মালগাড়ি। ওখানে মজুরেরা সব মাল খালাস করবার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। মালগাড়ির কামরা থেকে কাঠের পাটাতন বেয়ে অবিরাম ইট গড়িয়ে পড়ছে, ঝনঝন করে লোহার

পাত পড়ছে, পাতলা বোর্ডগুলি কাঁপতে কাঁপতে যেন উড়ে বেরিয়ে আসছে। খালি গাড়ি গুলি সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সারি বেঁধে উঁচু বোঝাই আরও গাড়ি এসে হাজির হচ্ছে। হাজার রকমের শব্দ এক সঙ্গে মিলে দ্রুত-সঞ্চারী এক মহারবের সৃষ্টি করছেঃ এর মাঝে রয়েছে পাথর কাটা মিস্ত্রীর বাটালির ঘা, পেরেক-লাগানো মিস্ত্রীর বয়লারে পেরেক ঠোকার ঝনঝনে আওয়াজ, বাষ্পহাতুড়ীর ভীষণ আওয়াজ, বাষ্পনলের প্রবল হিস্‌হিসানি এবং শিটি, আর মাঝে মাঝে পাতালের কোন প্রদেশ-থেকে-ওঠা মাটি-কাঁপানো চাপা বিস্ফোরণের শব্দ।

এ সব দেখলে বিস্ময়-আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। মানুষের শ্রম-শক্তি এখানে পূর্ণোদ্যমে একটা বিরাট জটিল নির্ভুল যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে।

পৃথিবীর নানা দিক থেকে ইনজিনীয়ার, পাথর কাটা মিস্ত্রী, কারিগর, ছুতোর মিস্ত্রী, ফিটার মিস্ত্রী, লৌহবর্ম্ম-নির্মাণকারী মিস্ত্রী, কাঠ জোড়ার মিস্ত্রী, কামার ইত্যাদি হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানে,—জীবন-সংগ্রামের কঠোর নীতির আজ্ঞাবহ হয়ে শিল্পোন্নতির মাত্র একটি ধাপ এগিয়ে দিতে তাদের শক্তি, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল—সব কিছু দান করতে চায় তারা।

এই দিন ববরভের মন বড্ড বেশি খারাপ লাগছিল। বৎসরের মাঝে তিন চার বার তার এক অদ্ভুত মন-মরা ভাব আসে, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ ওঠে তিরিক্ষে হয়ে। সাধারণত এ ভাবটা আসে তার শরতের মেঘলা সকালে অথবা শীতের সন্ধ্যায় যখন বরফ গলতে সুরু করে। এই সময় সব কিছু দেখায় যেন নিস্তেজ দীপ্তিহীন, মানুষের মুখগুলি যেন বিবর্ণ, রুগ্ন, কদাকার, তাদের কণ্ঠস্বর আসে যেন কোন সুদূর লোক থেকে,—সে স্বরে আনন্দ আনে না, আনে শুধু বিরক্তি।

সেদিন রেল কারখানার ওখানে চক্কর দিয়ে আসবার সময় শ্রমিকদের কয়লার গুঁড়ো মাখা, আগুনের আঁচ লাগা বিবর্ণ মুখ দেখে মেজাজটা তার বড্ড বেশি তিরিক্ষে হয়ে উঠল। জ্বলন্ত লোহার আঁচ লেগে মজুরদের দেহ ঝলসে যাচ্ছে, চওড়া দরজা দিয়ে আসছে শরতের হাড়-কাঁপানি বাতাস,—এই অবস্থায় তাদের কাজ করতে দেখে ববরভের মনে হচ্ছিল তাদের শারীরিক কষ্টের সে নিজেও যেন কিছু অংশ গ্রহণ করছে। তার সাজগোজের এমন পারিপাট্য, সুন্দর জামা কাপড় এবং বাৎসরিক তিন হাজার রুবল মাইনের জন্য তার লজ্জা বোধ হতে লাগল।

২

একটা জোড় লাগানো চুল্লীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ববরভ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। চুল্লীটা তার বিরাট ধ্বক্‌ধ্বকে মুখগহ্বরে—জ্বলন্ত চুল্লী থেকে সদ্য নিষ্ক্রান্ত শত শত পাউন্ড ওজনের উত্তপ্ত লৌহখণ্ডকে টেনে নেবার জন্য প্রতি মুহূর্তে মুখ ব্যাদান করছিল। মিনিট পনের পরে,—ডজন খানেক মেশিনের মাঝ দিয়ে ভীম-গর্জনে চলে কারখানার শেষপ্রান্তে ঐ সব লোহা লম্বা চক্‌চকে রেল হয়ে বেরিয়ে আসছিল।

এমন সময় কে যেন ববরভের কাঁধটা স্পর্শ করলে। ববরভ বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে তার সহকর্মী সেজ্‌হেভস্‌কী।

ববরভ এই লোকটাকে একেবারেই দু'চোখে দেখতে পারে না। লোকটা সব সময়ই এমন একটু নুয়ে থাকে যে দেখে মনে হয় যেন কাউকে সে নমস্কার করছে, কিম্বা চুপি চুপি সরে পড়বার মতলব। একটা চাপা হাসি তার মুখে লেগেই আছে, আর তার ঠাণ্ডা ভিজে ভিজে হাত দুটি গরম করতে সে অবিরত তা রগড়াচ্ছে। কারখানার যে-কোন গুজব অপর কারো কানে যাবার আগে কি করে সে জেনে ফেলে, আর ঐ গুজবে যাদের সব চেয়ে বেশি মুষড়ে পড়বার কথা তাদের কানেই কথাটা তুলে ধরে সে বিশেষ আনন্দ পায়। যখন কাউকে কিছু বলতে যায় তখন মনে মনে একটু ভয়ের ভাব নিয়েই বেশ আড়ম্বর করে সব সময় তার দেহের দুই পাশ, কাঁধ, হাত আর জামার বোতামে হাত লাগাতে থাকে।

এইবার সেজহেভস্‌কী ববরভের হাত চেপে ধরে কেমন একটু চাপা হাসি হেসে বললে,—তারপর, বন্ধু, অনেকদিন তোমার দেখা পাই নে যে বড়,—খুব পড়াশুনা হচ্ছে বুঝি?

ববরভ তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম অনিচ্ছা সত্ত্বেই বললে,—সুপ্রভাত। ...শরীরটা আমার ভাল নেই।

জিনেঙ্কোদের বাড়িতে তুমি না যাওয়ায় ওঁরা সবাই দুঃখ করছিলেন।—তুমি যাও না কেন ওখানে?

কথাটার মাঝে কি যেন একটা গূঢ় ইঙ্গিত আছে সেজহেভস্‌কীর!

আর সেদিন কারখানার ডিরেক্টার এসেছিলেন ও বাড়িতে। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কথায় কথায় ধাতু-গলানো চুল্লীর কথা উঠল, তিনি তোমার খুব প্রশংসা করলেন।

ববরভ কৃত্রিম বিনয়ে একটু নত হয়ে বললে, খুশী হ'লাম শুনে।

ঠাট্টা নয়, ভাই, সত্যিই বলছি 'বোর্ড' তোমাকে খুব সুদক্ষ ইনজিনীয়ার বলে মনে করেন, এবং তাঁদের ধারণা ইচ্ছা করলে তুমি অনেক কিছু করবার শক্তি রাখ।

ডিরেক্টারের মতে তোমার মত পাকা লোক ঘরে থাকতে কারখানা পরিকল্পনার কাজে ফরাসীদের ডাকবার কোন মানে হয় না। কেবল...

শুনেই ববরভের মনে হ'ল এইবার ইতরোমি সুরু হবে।

সেজহেভসকী পূর্বপ্রসঙ্গ ধরে বললে, তিনি বললেন, কেবল এইটে বড় দুঃখের কথা যে তুমি লোকজনের কাছ থেকে সরে সরে থাক,—যেন কোন গুপ্ত দলের লোক। তোমায় নিয়ে যে কি করা যায়, বা কিভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলা যায়,—লোকে তা এক রকম বুঝতেই পারে না।...হাঁ, ভাল কথা,—আমি তোমার কাছে এ, ও, তা বলছি, অথচ দেখ সব চেয়ে বড় খবরটাই বলা হয়নি এখনও ঃ ডিরেক্টার চান কাল বারোটার ট্রেন স্টেশনে আসবার সময় সবাই স্টেশনে হাজির থাকে।

আবার কেউ আসছেন বুঝি? জিজ্ঞাসা করলে ববরভ। ঠিক ধরেছ।...আচ্ছা বল ত কে?

এইবার সেজহেভস্কীর মুখে ধূর্ততা আর বিজয়ের ভাব ফুটে উঠল,—যেন বেশ খুশি মনেই নিজের দুই হাত রগড়াতে লাগল ঃ এইবার সে একটা খবরের মত খবর দিতে পারবে।

ববরভ তার কথার জবাবে বললে, কি করে বলব, তা ছাড়া ভাল আন্দাজ করবার ক্ষমতাও আমার নেই।

আমার অনুরোধ—একবার চেষ্টা করে দেখ,—অন্তত—এলোমেলো যার নাম মনে আসে বলে ফেল।

উত্তরে ববরভ কিছুই বললে না, একটা বাষ্পচালিত ক্রেন কাজ করছিল, সে তারই দিকে নজর দিয়েছে—এমন ভাব দেখাতে লাগলে। সেজ্‌হেভস্‌কী তা লক্ষ্য করে আরও তড়বড় সুরু করলে ঃ

তুমি কিছুতেই বলতে পারলে না ত?...আচ্ছা, আর তোমার ঔৎসুক্য বাড়িয়ে কষ্ট দেব না,—আসছেন এবার খার্শনিন, একেবারে সশরীরে।

ওর নাম উচ্চারণ করবার ভঙ্গীর মাঝে যে অকপট দাস-মনোভাবের ভাবটি ফুটে উঠল তাতে বিরক্তি বোধ করল ববরভ।

এতে এমন গুরুত্ব দেবার কি আছে—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলে সে।

সে কি কথা?—ডিরেক্টারদের বোর্ডে তিনি নিজের যা খুশি তাই করেন,—এবং প্রত্যেকে তাঁর কথা দৈববাণীর মত মন দিয়ে শোনে। এবার বোর্ড তাঁর উপর কারখানা তাড়াতাড়ি গড়ে তুলবার ভার দিয়েছে—মানে—তিনি নিজের উপরই এই ভার অর্পণ করেছেন। তিনি এখানে এসে পেঁৗছলে কি কান্ডটা বেঁধে যায় এবার দেখ না। গত বৎসর তিনি একবার এই কারখানা তদারক করতে এসে-ছিলেন—তুমি আসার আগেই হবে,—তাই না?—চারজন ইনজিনীয়ার, আর

ম্যানেজারের চাকরি হল খতম।...তোমার গলানো চুল্লী শেষ করে ঘরে নেওয়া হবে কবে ?*

ওটা শেষ হয়ে গেছে বললেই হয়।

বেশ ভাল কথা। তা হলে খাশনিন এখানে এলে আমরা ও নিয়ে এবং ওর ভিত্তিস্থাপন করা নিয়ে ঘটা করে কিছু করতে পারি।...খাশনিনকে দেখেছ কোনদিন তুমি ?

না, দেখিনি কোনদিন,—তবে ওঁর নাম শুনেছি বটে!

ওঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বলতে গেলে অমন আর একটি লোক আর কোথায়ও দেখতে পাবে না তুমি। সারা পিটার্সবার্গের লোক ওঁকে চেনে। প্রথমেই ধরো—লোকটি এত মোটা যে ওঁর ভুঁড়ির উপর উনি ওঁর দুই হাত আড়াআড়ি এনে জোড় দিতে পারেন না। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? —বিশ্বাস কর—সত্যি বলছি আমি। ওঁর গাড়িটা পর্যন্ত এক বিশেষ ধরনে তৈরি—ডান দিকের সবটুকু অংশ তার কবজার উপর বসানো, খোলা যায়। ভদ্রলোক লম্বায় যেন এক গির্জের চূড়া,—মাথায় লাল চুল, কথা বলতে গেলে গলা থেকে এক গুম গুম আওয়াজ বেরোয়। আর লোকটা কি চালাক,—বাপ রে! যতগুলি যৌথ কারবার আছে সবগুলির বোর্ডে উনি আছেন—বৎসরে সাতটা মিটিং-এ হাজির দিয়েই উনি দুই লক্ষ রুবল আয় করেন। সাধারণ সভায় কিছু পাশ করিয়ে নিতে ওঁর জুড়ি নেই। রীতিমত সন্দেহের উদ্রেক করবার মত বাৎসরিক হিসাবও উনি এমনভাবে সবার সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন যে শেয়ারের মালিকেরা জলজ্যান্ত মিথ্যেকে মনে করবে সত্যি,—এবং বোর্ডকে ধন্যবাদ দিতে এগিয়ে আসবে। সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে যে তিনি নিজেই ঠিক জানেন না তিনি কি সম্বন্ধে কথা বলছেন, আর লোককে অজস্র আশ্বাস দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে চান। কাল যখন তুমি তাঁর বক্তৃতা শুনবে তখন সম্ভবত তোমার এই কথাটি মনে হবে যে সারাজীবন তিনি এক গলানোচুল্লী নিয়ে তড়বড় করা ছাড়া অন্য কোন কাজ করেন নি, অথচ ঐ জিনিসটা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আমার সংস্কৃত-জ্ঞানেরই মত।

ববরভ ওর কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে—'ট্রা-লা-লা-লা' বলে ইচ্ছা করে বেসুরা গান গেয়ে উঠল।

সেজহেভসকী বলে চলল,—একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি তোমায়। পিটার্সবার্গে লোকজন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে উনি কি করে তাদের দেখা দেন জানো?

* ধাতু গলানো তাপ হচ্ছে ৩০০০ ফার-এর মত,—ধাতুগলানো চুল্লী সক্রিয় করবার আগে তাতে এই তাপ সৃষ্টি করা দরকার। কখনও কখনও এ তাপ কয়েক মাস ধরে থাকে।

—গ্রন্থকার।

—গোসলখানায় জলের উপর ও'র লাল মাথাটা বের করে উনি বসে থাকেন, আর কোন প্রিভী কাউনসিলার বা অমনিধারা আর কেউ অতি অবনত মস্তকে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে থাকেন। তা ছাড়া লোকটা ভয়ঙ্কর পেটুক, খাবার বেছে নিতেও ওস্তাদ। বড় বড় রেস্তোরাঁয় খার্শাননের কেক্‌ বলে ও'র নামে বিশেষ ধরনের এক খাবারেরই চলন হয়ে গেছে। আর মেয়েদের ব্যাপার?—আঃ—এই তিন বছর আগে এমন একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল—

ববরভ এইবার চলতে সুরু করেছে দেখে সেজহেভসকী তার জামার বোতাম টেনে ধরে একরকম মিনতি করে তার কানে কানে বললে, যেও না। বড় মজার ব্যাপার, সংক্ষেপেই বলছি আমি। ব্যাপারটা হচ্ছে—প্রায় তিন বছর আগে—শরৎকালে—একটি গরিব ছেলে—মানে যুবক পিটার্সবার্গে এসে হাজির হ'ল। ছেলেটি কেরানী বা ঐ ধরনের কি একটা কাজ করে,—নামও এখন ঠিক মনে পড়ছে না আমার। একটা গোলমেলে উত্তরাধিকার লাভ করবার চেষ্টায় ঘুরছিল ছেলেটা। প্রত্যেক দিন সকালের দিকে নানা অফিসে ঘোরাফিরা করে গ্রীষ্মোদ্যানের একটা বেঞ্চিতে বসে মিনিট পনেরর মত সে বিশ্রাম করত। আচ্ছা,—তারপর?—এমনি করে তার তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন কেটে গেল,—এর প্রতিদিনই সে দেখত ভীষণ মোটা লালচুলো এক ভদ্রলোক বাগানে পায়চারি করছেন। ক্রমে তাদের মাঝে কথাবার্তা হ'ল। এই লালমাথা ভদ্রলোক হচ্ছেন খার্শানন। খার্শানন ছেলেটির সব ব্যাপার শুনে বিশেষ সহানুভূতি দেখালেন, কিন্তু নিজের নাম বললেন না। আচ্ছা, তারপর—তারপর একদিন লালমাথা ভদ্রলোক ছেলেটিকে বললেন,—তুমি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী আছ,—বিয়ের পরই কিন্তু তোমার ছেড়ে আসতে হবে তাকে,—এবং আর দেখাশুনা হবে না? ছেলেটির এই সময় বড়ই কষ্টে দিন কাটছিল। তাই কথাটা শুনেই সে বললে, হাঁ, আমি রাজী,—তবে আমার রাজী হওয়াটা নির্ভর করছে আমি কত পাব তার উপর—তা ছাড়া টাকাটা আমায় আগাম দিতে হবে।

বুঝতেই পারছ—ছেলেটি অমনি কাঁচা ছেলে নয়। আচ্ছা, তারপর। তারপর ওদের লেনদেনের ব্যাপার সব ঠিক হয়ে গেল। এর এক হপ্তা পরে লালমাথা ছেলেটিকে একটা 'ড্রেস্‌কোট' পরিয়ে খুব সকালে পাড়াগাঁয়ের এক গির্জেয় নিয়ে হাজির করলে। লোকের ভিড় নেই সেখানে,—কনে হাজির,—কনের মাথায় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অবগুণ্ঠন টেনে দেওয়া হয়েছে, তবুও সেই অবগুণ্ঠনের মাঝ দিয়েই বোঝা যায়—কনে সুন্দরী এবং তরুণী।

অনুষ্ঠান সুরু হয়ে গেল। ছেলেটি লক্ষ্য করল মেয়েটিকে যেন কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সে তখন মেয়েটির কানে চুপিচুপি বললে,—আমার মনে হচ্ছে তোমাকে বোধ হয় তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে এখানে? মেয়েটি উত্তর দিলে,—

তোমারও বোধ হয় ঐ একই অবস্থা। এমনি করে তাদের সব কিছু জানা হয়ে গেল। বোঝা গেল মেয়েটির মা-ই মেয়েটিকে এই বিয়েতে বাধ্য করেছে। অবশ্য —বুঝতেই পারছ—মেয়েটিকে সরাসরি খাশনিনের হাতে তুলে দিতেও তার বিবেকে বেধেছে। আচ্ছা, তারপর?—ছেলেটি আর মেয়েটি কিছুক্ষণ এমনি করে কথা বলার পর ছেলেটি মেয়েটিকে বললে,—এস দু'জনে মিলে একটা কাজ করা যাক—একটা চালাকি! আমরা দু'জনেই তরুণ,—ভবিষ্যতে ভাগ্যে আমাদের কিছু সুখ থাকলেও থাকতে পারে,—সুতরাং খাশনিনের নাকের ডগা দিয়ে আমরা সরে পড়ি।

মেয়েটিও ছিল দৃঢ়চেতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতি,—তাই ছেলেটির কথায় সে-ও বলে উঠল,—বেশ, তাই করা যা'ক।

বিয়ে শেষ হয়ে গেলে সবাই একে একে গির্জে থেকে বেরিয়ে পড়ল,—খাশনিন তখন আহ্লাদে একেবারে ডগমগ। ছেলেটি তার টাকা খাশনিনের কাছে থেকে আগেই আদায় করে নিয়েছিল,—আর সে-টাকাও বড় কম নয়,—কারণ এ সব ব্যাপারে খাশনিন টাকা খরচে কার্পণ্য করতেন না। খাশনিন এবার নব-দম্পতির কাছে এগিয়ে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভাব নিয়ে তাদের অভিনন্দন জানালেন। তারাও তাঁর অভিনন্দনের জবাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানালে, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে গাড়িতে উঠে বসলে।

একি, একি,—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

কেন, স্টেশনে যাচ্ছি আমরা, সেখান থেকে আমরা আমাদের মধুচন্দ্রিমায় বেরুব।...এই গাড়োয়ান, গাড়ি চালাও—।

খাশনিন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর একবার—, একি, তুমি চললে যে, আন্দ্রেই ইলিয়িচ্?

ববরভকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে টুপির কিনারা নামাতে এবং ওভারকোটের বোতাম আঁটতে দেখে সেজহেভ্সকীর বক্বকানি থেমে গেল। ববরভ তার কথার জবাবে নীরস কণ্ঠে বললে,—দুঃখিত,—সময় নেই আমার। আর যে গল্প তুমি শোনালে,—আমার মনে হচ্ছে এর আগেই কোথায় যেন এটা শুনেছি বা পড়েছি। নমস্কার।

ববরভের কঠোর হাবভাব দেখে সেজহেভসকী ভড়কে গেল,—এইবার ববরভ তার দিকে পিছন ফিরে দ্রুত কারখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কারখানা থেকে এসে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ববরভ বারান্দায় এসে দাঁড়ালে। গাড়োয়ান মিত্রোফানকে ঘোড়ায় জিন দিতে বলা হয়েছিল, সে তাই পাটকেলী রঙের দন অঞ্চলী টাট্টু ফেয়ারওয়ের পিঠে কষে বিলেতী জিন আঁটছিল। ঘোড়াটা এইবার পেট ফুলাবে, ঘনঘন ঘাড় ফিরিয়ে মিত্রোফানের জামার আস্তিনে কামড় লাগাবে,—আর মিত্রোফান রেগেমেগে গম্ভীর চালে ওকে ধমকাতে থাকবে, থাম, হতভাগা, থাম,—চুপ রহো।—সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে,—দেখ, একবার হতভাগার কাণ্ড দেখ!

ফেয়ারওয়ে—উচ্চতার দিক দিয়ে মাঝারি ধরনের, বুকে কিন্তু ভীষণ জোর, ধড়টা লম্বা কিন্তু পিছনটা একটু সরু আর নিচু। ওর খুর মজবুত,—গুল্‌ফ সুন্দর বলিষ্ঠ লোমশ পায়ের উপর ভর দিয়ে সহজ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল ও, বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। অশ্বরূপ-দক্ষ বিশেষজ্ঞেরা হয়ত এর এই ঈষৎ ধনুকের মত বাঁকানো দেহ আর হাড়গিলের মত হাড় বেরকরা লম্বা গলাটা তেমন পছন্দ করবেন না,—কিন্তু ববরভের মতে দন অঞ্চলের ঘোড়ার এইখানেই বিশেষত্ব,—এইখানেই সৌন্দর্য। ড্যাশুণ্ডের সৌন্দর্য যেমন তার বাঁকা পায়ে, আর সেটারের যেমন লম্বা কানে,—দন-অশ্বের সৌন্দর্য তেমনি এই বিশিষ্ট অবয়বে। যাই হ'ক কারখানার আর কোন ঘোড়া ত ফেয়ারওয়েকে দৌড়ে হারাতে পারে না!

রাশিয়ার অন্যান্য ভাল গাড়োয়ানের মতই মিত্রোফান ঘোড়াকে কোনরকম আস্কারা দেয় না,—এদের প্রতি ব্যবহার তার অতি কঠোর। মরাখেকো, খুনী, আসামী, বেজন্মা ইত্যাদি গাল তার মুখে লেগেই আছে,—তবুও মনে মনে ফেয়ারওয়েকে যে সে খুবই ভালবাসে তার পরিচয় পাওয়া যায় একে খাবার দেওয়া আর ডলাই মলাই করবার সময়। ববরভের ব্যবহারের জন্য কারখানা থেকে 'সোয়ালো' আর 'সেলার' নামে আর যে দুটি ঘোড়া দেওয়া হয়েছে তাদের চেয়ে এ দুটি জিনিসই সে মিত্রোফানের কাছ থেকে বেশিমাত্রায় পায়।

ববরভ জিজ্ঞাসা করলে,—ওকে জল খাইয়েছ,—মিত্রোফান?

মিত্রোফান তখনই কোন উত্তর দিলে না। ভাল সইসের লক্ষণই হচ্ছে কথাবার্তায় সংযম এবং গাম্ভীর্য রক্ষা করা।

একটু পরে সে বললে—হাঁ, আন্দ্রেই ইলিয়িচ্ জল দিয়েছি ওকে।—তার পর ঘোড়াটাকে বললে,—এই শয়তান আবার খিটখিটে? খিটখিটানি ঘুচাচ্ছি তোর দাঁড়া!...ওর জিনের জন্য উশখুশ করছে, সার্,—তর সইছে না আর।

ববরভ ফেয়ারওয়ের কাছে এগিয়ে এসে লাগামটা বাঁ হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন যে ব্যাপার ঘটে তাই ঘটল। ববরভকে এগিয়ে আসতে দেখেই

ঘোড়াটা তার দিকে ক্রুদ্ধ বক্র দৃষ্টিতে চাইছিল, এইবার পিঠ বাঁকা করে পিছনের পা দিয়ে মাটি ছিটকে মুখে শব্দ করে আপত্তি জানাতে সুরু করলে। রেকাবে পা দেবার জন্য ববরভ এক পায়ে লাফাতে লাফাতে তার কাছে আসছিল।

রেকাব পা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল,—মিত্রোফান,—এবার লাগাম ছেড়ে দাও, পর মুহূর্তে সে জিনের উপর গিয়ে বসলে।

সোওয়ারের পায়ের গুঁতোয় এবার ফেয়ারওয়ের সব ছটফটানি থেমে গেল,—মাথা নেড়ে নাক দিয়ে শব্দ করে কয়েকবার সে নিজের গতি ভঙ্গী পালটে নিলে. —তার পর গেট থেকেই লম্বা ধাপে দুলকী চালে চলতে লাগল।

ঘোড়ার দ্রুত বেগ,—কানে তালা লাগানো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া,—শরতের ঈষৎ ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ ববরভের স্নায়ুগুলিকে যেন পুনরুজ্জীবিত করে তুলল। তা ছাড়া প্রতিবারই জিনেঙ্কোদের ওখানে রওয়ানা হবার সময় তার মনটা কি এক সুখের আশায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

জিনোঙ্কো-পরিবারে লোক হচ্ছে সাত জন,—বাপ, মা, আর পাঁচটি মেয়ে। বাপ কারখানার গুদাম ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। দৈত্যের মত দীর্ঘাকৃতি এই লোকটা কুঁড়ে এবং দেখতে ভালমানুষের মত হলেও আসলে রীতিমত স্বার্থান্বেষী এবং কুটিল। সত্য কথা বলার অছিলায় যে সব লোক তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সোজাসুজি তোয়াজ করে,—বেহায়ার মত সহকর্মীদের নামে লাগায়,—আর অধস্তন কর্মচারীদের উপর দিয়েই খুশিমত অত্যাচার করে—তিনি তাদেরই একজন। সামান্য একটু ছুতো পেলেই তিনি তর্ক করবেন, কোন আপত্তি কানে না তুলে রাসভের মত শুধু চীৎকার করতে থাকবেন এই তাঁর স্বভাব। এ ছাড়া আরও আছে।—ভাল খাবারের দিকে তাঁর বড় ঝোঁক,—আর ঝোঁক উক্রেইনের কোরাস গানের দিকে,—অথচ এই গান গাইবার সময় বেসুরো ছাড়া ঠিক মত সুরে তিনি কখনও গাইতে পারেন না। নিজের স্ত্রীকে সমীহ করে চলবার কোন কারণ নেই, —কারণ দেখতে তিনি যেমনি ছোট, তেমনি রোগা, রয়ে সয়ে কথা বলেন,—খুদে খুদে ধূসর চোখ দুটি এত কাছাকাছি বসানো যে তার কোন মানে হয় না,—তবু তার কাছে ইনি যেন একটি পোষা বেড়াল।

মেয়েদের নাম হচ্ছে মাকা, বেতা, শুরা, নিনা এবং কাস্যা।

বাড়িতে এক এক মেয়ের এক এক পরিচয়।

মাকার মুখখানা পাশ থেকে দেখতে মাছের মত,—কিন্তু বাড়িতে বলা হয় তার স্বভাবটি নাকি দেবদূতের মত নির্মল। বিকেলে বাইরে বেড়াতে বেড়াতে অথবা সন্ধ্যার কোন পার্টিতে সে যখন তার বোনদের দর্শনীয় করে তুলবার জন্য নিজের অস্তিত্বটুকুও মুছে ফেলতে চায় তখন তার বাপ মা নিজেদের মাঝে বলা-বলি করেন,—দেখেছ,—আমাদের মাকা যেন বিনয়ের অবতার।

বাড়ির লোকের মতে বেতা হচ্ছে সব চেয়ে বুদ্ধিমতী। সে পাঁশনে পরে। নারীকল্যাণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিখতে গিয়েছিল সে। পুরনো গাড়ি টানা ঘোড়ার মত মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে এমন করে চলে সে যে দেখে মনে হয় জলের মাঝে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলছে। বাড়িতে নতুন কেউ দেখা করতে এলেই হয় তাকে জোর করে বোঝাতে চেষ্টা করবে সে—যে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভাল,—সাধুও বটে,—অথবা হাসতে হাসতে বলবে,—আপনি ত বেশ চালাক মনে হচ্ছে,—আমি কেমন লোক বলুন ত? অনেক বাড়ির আসরেই আলোচনা চলে লারমনতভ বড় বা পুশ্‌কিন বড়, অথবা প্রকৃতি কি মানুষের দয়া-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করছে? এই রকম কোন প্রসঙ্গ সুরু হলেই দেখা যায় বেতাকে রণহস্তীর মত সবার আগে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

সেজো মেয়ে শুরা অবিবাহিত তরুণের সঙ্গে পালা করে তাস খেলে যায়।—যখনই সে দেখে তার খেলার সাথীর বিয়ে হতে যাচ্ছে তখনই সে তার মনের দুঃখ বিরক্তি চেপে আবার নূতন সঙ্গী বেছে নেয়। খেলার সময় ছোটখাটো ঠাট্টা তামাসা দুষ্টামি সবই চলে,—শুরা তার সঙ্গীর হাতের উপর তাসের ঠোক্কর মেরে ছোট লোক বলে গালাগালিও দিয়ে থাকে।

বাড়ির সবচেয়ে আদরের দুলালী হচ্ছে নিনা। বেশি আদরে একটু বখে গেছে এই যা,—কিন্তু বড় প্রিয়দর্শন। তার অন্যান্য বোনদের মেদবহুল দেহ আর লাবণ্যহীন কদাকার মুখের মাঝে সে যেন এক বিরাট ব্যতিক্রম। নিনার ছোট্ট কোমল দেহটা দেখলে মনে হয় এখনই তা ভেঙ্গে পড়বে,—হাত দুটি প্রায় বড় ঘরের মেয়ের মত,—মুখখানা বেশি ফর্সা না হলেও বড় সুন্দর—তাতে রয়েছে আবার মনোরম কয়েকটি তিল, ছোট্ট কানদুটির রঙ গোলাপী,—মাথায় ঈষৎ কুঞ্চিত ঘন কেশদাম। এমন চেহারা সে কোত্থেকে যে পেল,—মাদাম জিনেঙ্কোই তা ভাল বলতে পারবেন। নিনা বাপ মায়ের অনেক আশা ভরসা,—তাই তাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পায়ও সে সব কিছুতে,—ভাল ভাল মিঠাই,—অন্যান্য বোনেদের চেয়ে ভাল জামা কাপড়, সব কিছুই পায় সে বাপ মায়ের কাছ থেকে,—কথা বলে একটু ঠেকারি ঠেকারি,—শুনতে ভালই লাগে,—বাপ মা কিছুই বলেন না।

সবার ছোট কাস্যা—সবে চৌদ্দ ছাড়িয়েছে,—কিন্তু এর মাঝেই সে তার মায়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, দিদিদের হার মানিয়েছে নিজের স্পর্ধিত উঠতি যৌবন লক্ষণ দিয়ে। কারখানার তরুণ ছেলেরা অনেকদিন থেকেই তার দিকে নজর দিতে সুরু করেছে,—কারখানা শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বলে মেয়ে-দের সঙ্গে মিশবার সুযোগও নেই তাদের। এই ছেলেগুলি যখন কাস্যার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে,—কাস্যাও অকালপক্ক মেয়ের অকপট ঔদ্ধত্য দিয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকে,—দৃষ্টি নত করে না।

জিনেঙ্কো-বাড়ির সব মেয়েদের পরিচয়ই মিলের সকল লোকের জানা,—একবার ওদের একজন রসিকতা করে বলেছিল,—কেউ যদি জিনেঙ্কো-বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে চায়,—তবে তার উচিত হবে ও বাড়ির পাঁচটি মেয়েকেই এক সঙ্গে বিয়ে করা,—নইলে কাউকে না। ইনজিনীয়ার এবং যে সব ছাত্র হাতে-কলমে কাজ শিখতে এখানে আসত—তাদের কাছে এ বাড়িটা ছিল যেন একটা হোটেল,—সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এখানে তাদের ভিড় লেগেই থাকত। পান ভোজন চলত রীতিমত,—ভোজনের চেয়ে পান আরও বেশি,—কিন্তু অপূর্ব কৌশলে বিবাহবন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখত সবাই।

জিনেঙ্কো-বাড়িতে ববরভের তেমন সমাদর ছিল না। মাদাম জিনেঙ্কো সব কিছু বিচার করতেন সাবেক পুরোনো প্রাদেশিক ঔচিত্য নিয়ে,—তার সংকীর্ণ বিচার-বুদ্ধিতে ববরভের আচরণ মোটেই ভাল লাগত না। খোশ মেজাজে ববরভ যখন ব্যঙ্গাত্মক তামাসা করত তখন সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত,—আবার ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে অনেকদিন সন্ধ্যায় যখন সে শেষ পর্যন্ত মুখ বন্ধ করে বসে থাকত তখন তাকে কোন গোপন সমিতির সভ্য, অহঙ্কারী এবং মৌন ব্যঙ্গরসিক বলে সন্দেহ করা হ'ত,—তা ছাড়া সে কোন পত্রিকায় গল্প লিখবে বলে চরিত্র সংগ্রহ করছে এ সন্দেহও করা হ'ত।

খাবার টেবিলে ববরভের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হত না,—মাঝে মাঝে মাদাম জিনেঙ্কো তার উদ্দেশ্যে কাঁধ ঝাকুনি দিতেন,—এই সব দেখে ববরভও বুঝতে পারত এদের বিরূপ মনোভাবের কথা,—যদিও সেটা স্পষ্ট প্রকাশ পেত না। ববরভ তবুও এ বাড়িতে যেত। সে নিনাকে ভালবাসে কি না বলতে পারে না,—কিন্তু ঘটনাচক্রে তিন চার দিন ওবাড়িতে না যাওয়ার পর নিনার কথা ভাবতে গেলেই কেমন এক মধুর বেদনা বোধ করে সে,—মনটা উতলা হয়ে ওঠে। মনশ্চক্ষে ভেসে আসে নিনার সুঠাম তনু দেহ,—ঘন, পক্ষ্মাশ্রিত স্মিতোজ্জ্বল অবসন্ন দুটি চোখ, একটু আটা আটা পপলার গাছের নব মঞ্জরীর গন্ধের মত নিনার দেহবাসও যেন নাকে আসতে থাকে তার,—ববরভ কেন যে ঐ গাছের কুঁড়ির গন্ধের সঙ্গে নিনার দেহবাসের তুলনা দেয়—বুঝতে পারে না।

জিনেঙ্কো-বাড়ির হৈচৈয়ের মাঝে পরপর তিন সন্ধ্যা কাটাতে গেলেই তাক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে ববরভের মন, ভাল লাগে না তাদের সাহচর্য,—প্রতিদিন একই ধরনের ঘটনায় একই ধরনের কথা,—সবার মুখে একই ধরনের কৃত্রিম অভিব্যক্তি। বাড়ির পাঁচটি মেয়ে এবং তাদের প্রণয় প্রার্থীদের (এ নামটা অবশ্য বাড়ির লোক-দেরই দেওয়া) মাঝে একই ধরনের কৌতুক ক্রীড়া প্রায়ই চলে। খেলাটা হচ্ছে—দুই দলে যেন ঝগড়া। প্রণয় প্রার্থীদের একজন তার আপন প্রিয় মেয়েটির কোন কিছু রহস্যছলে চুরি করে বলে সে এটা কিছুতেই দেবে না,—মেয়েদের মুখে

অমনি কৃত্রিম ক্রোধ বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে,—নিজেদের মধ্যে কানাকানি চলে,—তারপর উৎকট বিশ্রী হাসি হেসে তারা তরুণটিকে বলে,—ছোট লোক। এ খেলা প্রতিদিনের। শুধু তাই নয়,—প্রতিদিনের যত কথা যত অঙ্গভঙ্গী সবই পূর্ব-দিনের মত,—একটু অদল বদল নেই। তাই ববরভ জিনেঙ্কোদের বাড়ি থেকে যখন ফিরে আসে তখন তার মাথা ধরা নিয়ে ফিরতে হয়,—ওদের অমার্জিত অশোভন ব্যবহারে স্নায়ুগুলি হয় শ্রান্ত অবসন্ন।

এই জন্য নিনাকে পাবার—নিনার উত্তপ্ত কর-স্পর্শের রোমাঞ্চকর অনুভূতি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই ওবাড়ির কৃত্রিম একঘেয়ে জীবন যাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণায় ববরভের মন ভরে যায়। ববরভের এটা বেশ জানা যে নিনাকে বিয়ে করলে সে তার কৃত্রিম হাবভাব দিয়ে, আধ্যাত্মিক শূন্যতা দিয়ে তাদের দাম্পত্য জীবনকে একেবারে দুর্বিষহ করে তুলবে—এ কথাও জানা যে তারা দু'জন যেন দু জগতের লোক। তবুও মাঝে মাঝে এমন মুহূর্ত এসেছে যে ববরভ তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বসে আর কি। যাই হ'ক সে নিজের মন ঠিক করতে পারে নি বলে এ পর্যন্ত চুপ করেই আছে।

ঘোড়ায় চড়ে শেপেতোভকার দিকে যেতে যেতে তার মনে হচ্ছিল, ওরা ওকে কি ভাবে দেখলে কি ভাবে কি কথা বলবে তা তার জানা,—এমন কি ও সব বল-বার সময় ওদের চোখে মুখে কি ভাব ফুটে উঠবে তারও স্পষ্ট ছবি যেন স্পষ্ট ভেসে উঠছিল তার চোখে। ওবাড়ির মেয়েরা সব সময়ই 'সুন্দর তরুণ'দের অপেক্ষায় থাকে,—তাই বারান্দা থেকে ওকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখেই প্রথমে মেয়েদের মাঝে কে আসছে তা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি চলবে। সে যখন কাছে গিয়ে হাজির হবে তখন যে সঠিক অনুমান করেছিল সে লাফিয়ে উঠে, হাত তালি দিয়ে জিভ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ করে জোর গলায় বলে উঠবে,—কেমন, ঠিক বলেছি না আমি,—দেখলে ত! এরপরে সে আনা আফানাসেভ্‌নার কাছে ছুটে গিয়ে বলবে,—মা, ববরভ আসছে,—আমিই প্রথম ধরেছি। মাকে দেখা যাবে —আস্তে আস্তে চায়ের কাপ শুকোচ্ছেন। তিনি তখন নিনাকে,—ঠিক নিনাকেই ডেকে বলবেন,—জানিস, নিনা, ববরভ আসছে।—যেন কত নতুন আর মজার কথা বলছেন। তারপরে তারা সবাই যেন ববরভকে আসতে দেখে তাজ্জব বনে গেছে, —এইভাবে চেঁচিয়ে উঠবে।

লাগামের টানে টানে মধুর নাসিকাধ্বনি তুলে কদমে চলেছে ফেয়ারওয়ে। সামনেই শেপেতোভকা এলাকা। লিলাক এবং বাবলা গাছের ঘন সবুজ পাতায় জন্য এর লাল ছাদ আর সাদা দেওয়ালগুলি তেমন চোখে পড়ছে না। নিচের—সবুজ তটভূমি থেকে দূরে—ছোট্ট একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। গাঢ় হলদে রঙের ব্লাউজটা ওর ঈষৎ ময়লা রঙের সঙ্গে বড় সুন্দর মানিয়েছে,—দূর থেকে দেখেই ববরভ বুঝলে এ নিনা। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে সিধে হয়ে বসলে, পা'টা রেকাবের ভিতর জোরে চাপলে।

আবার তোমার সেই রত্নটির পিঠে চেপেছ,—ঐ দৈত্যটাকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না—একটা বখে যাওয়া মেয়ের দুষ্টামি ভরা সুরে বলে উঠল নিনা। ববরভ ঘোড়াটাকে বড় বেশি ভালবাসে বলে অনেক দিন থেকেই নিনা ববরভকে ওর নাম করে ক্ষেপায়। জিনেঙ্কো বাড়িতে অবশ্য কিছু না কিছু নিয়ে একজন না একজনকে ক্ষেপানোই রীতি।

কারখানার সহিস ছুটে এসেছিল,—ববরভ তার হাতে ঘোড়ার লাগামটা দিয়ে তার স্বেদ ক্লিন্ন বলিষ্ঠ কাঁধে দু চারটে আদরের চাপড় দিয়ে নিনার সঙ্গে তাদের ড্রয়িংরুমের দিকে চলল। আনা আফানোসেভ্না সেখানে একা বসে সামোভার তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন,—ববরভকে দেখে তিনি পরম বিস্ময়ের ভান করে মধুর কণ্ঠে বললেন,—এই যে আন্দ্রেই ইলিয়িচ্,—এসেছ তুমি?

ববরভ তাকে অভিবাদন করলে—তিনি তার ওষ্ঠ পুটে হাত দিয়ে নাকি সুরে আদর করে বললেন—কি খাবে বল,—চা, দুধ, আপেল?

আনা আফানাসেভ্না মাপ করুন আমায়,—কিছুরই দরকার নেই।

মেঁর্সি উই, উ মেঁর্সি নং?

জিনেঙ্কো-বাড়িতে এই রকম ফরাসী কথার টুকরো প্রায়ই শোনা যায়। না, ববরভ কিছুই খাবে না।

মাদাম জিনেঙ্কো তখন প্রসন্ন চিত্তে বললেন, তা হ'লে বারান্দায় যেতে পার তুমি,—ওখানে ছেলে মেয়েরা 'ফরফিট' না কি সব খেলছে।

ববরভ যখন বারান্দায় গিয়ে হাজির হ'ল তখন চারজন তরুণীই একসঙ্গে তাদের মায়ের মত ঠিক একই সুরে একটু নাকি ঠাটে চীৎকার করে উঠল,—আরে, আরে,—আন্দ্রেই ইলিয়িচ্ যে,—কতদিন তোমায় দেখি না।...কি খাবে বল? চা, আপেল, দুধ?...কিছুই না?—তা কি হয়? কিছু একটা খাবে তুমি নিশ্চয়? ...আচ্ছা,—বসো, আমাদের খেলা দেখ।

ওরা খেলছিল—"ভানুমতীর হাজার কড়ি",—"মতামত"—এ ছাড়া আর একটা খেলা—আধুকী (আধ আধ-ভাষিণী) কাস্যা যার নাম দিয়েছে "চাকা খেলা"। বাইরে থেকে এসেছে তিনটি ছাত্র,—একটি পা সামনে এগিয়ে—ফ্রক কোটের পকেটে এক হাত ঢুকিয়ে বুক ফুলিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে দাড়িয়েছে তারা। আর এসেছে মিলার নামে এক টেকনিশিয়ান—প্রিয় দর্শন চেহারা, গান ও গায় অতি সুন্দর,—কিন্তু মাথায় গোবর পোরা,—তাকে ভুলবার উপায় নেই। এ ছাড়া আছেন আর একজন ভদ্রলোক.—ছাই-রঙের জামা তাঁর গায়ে,—বড্ড কম কথা বলেন,—কেউ তাঁর দিকে তেমন নজর দিচ্ছে না।

খেলাটা তেমন জমছিল না। পুরুষেরা খেলার নিয়মে বাধ্য হয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে তাদের হারের টাকা দিচ্ছিল,—কিন্তু মেয়েরা এ সবের ধার ধারছিল না,—তারা শুধু এ ওর কানে কি সব বলাবলি করছিল আর ভীষণ হাসছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। পাশের গ্রামের ঘরগুলির পিছন থেকে মস্তবড় লাল চাঁদ উপরে উঠে এল। খাবার ঘর থেকে আনা আফানাসেভ্না উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, —মিলারকে আমাদের একটু গান শোনাতে বল।

একটু পরেই মেয়েদের কণ্ঠস্বরে বাড়ির কক্ষগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল,—তারা তাদের মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল,—বেশ কাটল সময়টা,—খুব হেসেছি আমরা।

নিনা এবং ববরভ বারান্দায়ই রয়ে গেছে। নিনা একটা রেলিং-এর উপর বসে বাঁ হাতে একটা থাম জড়িয়ে ধরেছে,—বসার ভঙ্গীটি নিনার অজ্ঞাতেই হয়ে গেছে বড় সুন্দর। ববরভ তার পায়ের কাছে একটা বেঞ্চে বসেছে। ওখান থেকে একটু উপরের দিকে চাইতেই নজর পড়ল তার নিনার সুন্দর কণ্ঠ আর চিবুকের দিকে।

নিনা আর চুপ করে থাকতে না পেরে এক রকম আদেশের সুরেই বলে উঠল, —এইবার একটা ভাল কিছু বল, আন্দ্রেই ইলিয়িচ্।

তোমায় কি যে বলব খুঁজে পাই নে আমি,—উত্তর দিলে ববরভঃ তা ছাড়া ফরমাইশ মত কথা বলা আরও কঠিন। ভাবছি এবার বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর কথোপকথনের কোন বই পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখব।

ছিঃ,—কথা বলে একেবারে সুখ নেই তোমার সঙ্গে,—কেমন টেনে টেনে গোঙিয়ে বললে নিনা,—তোমার মেজাজ কি কখনও ভাল থাকতে নেই?

চুপ থাকাকে তুমিই বা এত ভয় কর কেন, বলত? কথাবার্তা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন এক অস্বস্তি বোধ করতে থাক তুমি। নীরবে কথা বলা কি এতই মন্দ?

ববরভকে উত্যক্ত করবার জন্য নিনা মিহি গলায় বললে,—বেশ, আজ রাতে আমরা তা হ'লে চুপ করে থাকি।

হাঁ, তাই ভাল। দেখ,—আকাশ আজ কেমন পরিষ্কার, তাতে কত বড় লাল চাঁদ! চারিদিক কেমন নিস্তব্ধ! আর কি চাই আমরা!

নিনা অমনি সুর করে আবৃত্তি করে উঠল,—বন্ধ্যা মূর্খ আকাশে এই বন্ধ্যা মূর্খ চাঁদ।...বিয়ের প্রস্তাব,—শুনেছ জিনা ম্যাকোবা এখন প্রোতোপপভের বাগদত্তা? মোট কথা জিনার সঙ্গে তার বিয়ে হতে যাচ্ছে! প্রোতোপপভকে বুঝতেই পারি না আমি—বলে নিনা একটা কাঁধ ঝাঁকি দিলঃ জিনা ওকে তিন বার প্রত্যাখ্যান করেছে, ও কিছুতেই ছাড়বে না,—চতুর্থবার প্রস্তাব করলে ও। যাই হ'ক,—দোষ প্রোতোপপভেরই,—জিনা হয়ত তাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে,—কিন্তু ভালবাসতে তাকে কিছুতেই পারবে না।

এই কথা শুনবামাত্র ববরভের মেজাজটা আবার বিগড়ে গেল। জিনেঙ্কো-বাড়ির এই সব বাজে ছোট্ট শহরে প্রচলিত একঘেয়ে কথাগুলি শুনলেই ববরভের মাথা রীতিমত গরম হয়ে ওঠে।—সে তাকে ভালবাসে কিন্তু শ্রদ্ধা করে না,—অথবা সে তাকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু ভালবাসে না,—এ ছাড়া আর কথা নেই। নর-নারীর জীবনের জটিল সম্বন্ধ প্রকাশ করতে এদের আর কোন ভাষা নেই। এমনি ধারা কোন লোকের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার জন্যও আছে মাত্র এদের দুটি মাত্র কথা,—কালো চুল আর লাল চুল।

নিজের ক্রোধের আগুনে কিছুটা ইন্ধন যোগানোর জন্যই সে প্রশ্ন করলে,—আচ্ছা,—কি রকম লোকটা এই প্রোতোপপভ,—বলত?

প্রোতোপপভ?—নিনা একটুখানি কি ভেবে নিয়ে বললে,—লোকটা একটু ঢেঙা—মাথায় বাদামী চুল।

এই সব?

আর কি শুনতে চাও,—বলো?—হাঁ, লোকটা আবগারি বিভাগে কাজ করে।

এই সব হয়ে গেল বোধ হয়? আচ্ছা,—নিনা গ্রিগোরেভনা,—কোন লোকের পরিচয় দিতে হলে, তার চুল বাদামী, আর সে আবগারী বিভাগের লোক—এ ছাড়া আর অন্য কিছু মনে আসে না তোমাদের,—না? ভেবে দেখ—জীবনে আমরা কত রকমের চিত্তাকর্ষক, গুণী, জ্ঞানী, চতুর লোকের সাক্ষাৎ পাই—এদের পরিচয় কি শুধু এদের বাদামী চুল, আর আবগারী বিভাগ? চাষীর ছেলে-মেয়েরা জীবনকে কেমন দেখতে শেখে—কেমন সুষ্ঠু তাদের বিচার। আর তুমি সাবধানী অভিমানী মেয়ে হয়েও—ড্রয়িং-রুমের কয়েকটা বাসি পচা বুলি আওড়ানো ছাড়া আর কোন দিকে নজর যায় না তোমার? আমি জানি—কথাবার্তা বলবার সময় কেউ যদি প্রসঙ্গক্রমে চাঁদের কথা তোলে,—তুমি অমনি বলে উঠবে এই বন্ধ্যা মূর্খ চাঁদের মত—। জানি—কথা প্রসঙ্গে যদি কোন অস্বাভাবিক

ঘটনার কথা তুলি আমি, তুমি অমনি টিপ্পনী কেটে বসবে—কাহিনীটা নূতন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করা শক্ত। সব সময় দেখছি—তোমার ঐ এক কথা। দোহাই তোমার, বিশ্বাস কর, মৌলিক শোনাবার মত কিছু...

নিনা অমনি ফোঁস করে উঠল,—আমার উপর কোন লেকচার দিতে হবে না তোমার।

চুপ করে গেল ববরভ—মুখের ভিতর কি রকম এক তিক্ত স্বাদ অনুভব করলে সে। পুরো পাঁচ মিনিট দুইজনেই চুপ করে বসে রইল, কেউ কোন কথা বললে না, নড়লে না পর্যন্ত। হঠাৎ ড্রয়িং রুম থেকে মধুর সঙ্গীতধ্বনি ভেসে এল—দু জনেই শুনতে পেল মিলার গান ধরেছে, স্বরটা ঈষৎ বিকৃত হলেও বেশ দরদ আছে তাতে। সে গাইছে—

অভিমানের দৃপ্ত পদক্ষেপে
নৃত্য যেথায় চলে মত্ত রবে,
তোমায় আমি দেখেছিলাম গো,
জেনেছিলাম তোমার গোপন ব্যথা শ্রীমুখে নীরবে।

ববরভের মনের উষ্মা অমনি কেটে গেল, নিনাকে উত্যক্ত করেছে বলে তার দুঃখ হতে লাগল। এমন একটা সরল অনভিজ্ঞ মেয়ের কাছ থেকে মৌলিক কি-ই বা আমি আশা করতে পারি? ভাবলে সেঃ সে ত একটা ছোট্ট পাখীর মতই বটে, যা মনে আসে, কিছু না ভেবে চিন্তে তাই নিয়েই কিচিরমিচির করতে থাকে, স্ত্রী স্বাধীনতা, নিৎশে, অবক্ষয়বাদী ইত্যাদি বড় বড় গালভরা কথার চেয়ে এর এই কিচিরমিচিরই ঢের ভাল কি না কে বলবে?

ভাবাবেগে সে বলে উঠল—নিনা গ্রিগোরেভনা,—আমার উপর রাগ করো না, —বাক্‌সংযম রাখতে না পেরে যা তা বলে ফেলেছি তোমায়, মনে কিছু করো না।

নিনা কোন উত্তর না দিয়ে,—চাঁদ উঠছিল সেই দিকে তাকিয়ে বসে রইল। অন্ধকারেই দেখা গেল নিনার হাতটা ঝুলে পড়েছে, ববরভ পরম আদরে সেটা নিজের হাতে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলার মত করে ডাকলে, নিনা গ্রিগোরেভনা, লক্ষ্মীটি—

নিনা হঠাৎ তার দিকে ফিরে বসল, কম্পিত করে হঠাৎ ববরভের হাতে একটু চাপ দিল। কথা বললে সে এবার, কণ্ঠে ক্ষমার সুর, মৃদু তিরস্কার করে সে বললে, কি বদ মেজাজ তোমার, তুমি সব সময়ই আমায় আঘাত দিয়ে কথা কও, জান, আমি তোমার উপর রাগ করতে পারি না, তবুও—।

ববরভের হাতটা এবার কেঁপে উঠল, সেটা হঠাৎ সরিয়ে দিয়ে নিনা তার কাছ থেকে উঠে এক দৌড়ে—প্রথমে বারান্দায়, তারপর সেখান থেকে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

মিলার তখন সুরে আবেগ আর বেদনা ঢেলে গাইছে—

অজানা স্বপনে চিত্ত ঘুরিয়া ফেরে,—
ভালবাস কি না আমার মহিমা রাশি
জানি না, জানি গো আমি—শুধু ভালবাসি।

শুনে ববরভও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কম্পিত বক্ষটা হাত দিয়ে চেপে নিজের মনে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, জানি আমি শুধু ভালবাসি।

সে অভিভূত হয়ে ভাবলে—পাশেই রয়েছে যখন আমার সহজ গভীর সুখের উৎস তখন অজানা দিব্য সুখের নিষ্ফল সন্ধানে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলি কেন আমি? যে নারী বা বধূ এত কোমল, এত শান্ত, অনুগত, সেবাতৎপর, তার কাছ থেকে আর কি আশা করবার আছে? আমরা স্নায়ু-দুর্বল লোকেরা জীবনের প্রাপ্য আনন্দকে সহজে গ্রহণ করতে পারি না, প্রত্যেক অনুভূতিকে উদ্দেশ্যকে নিজেদের অদম্য বাসনার বিষে জর্জরিত করে তুলি, সে নিজেদেরই হ'ক বা অপরেরই হ'ক। এই প্রশান্ত রাত্রি, যে মেয়েটিকে ভালবাসি তার সান্নিধ্য, তার মিষ্টিমধুর অকপট হাসি, ক্ষণিক ক্রোধের পরই আদরের স্পর্শ,—হায় ভগবান—এ ছাড়া জীবনে আর কি কাম্য থাকতে পারে?

এরপর ববরভ যখন ড্রয়িংরুমে ঢুকল তখন তাকে এত প্রফুল্ল দেখাতে লাগল, যেন সে কত কি জয় করে এসেছে। নিনার চোখে চোখ পড়তেই সে দেখতে পেল সেও তার প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তার চিন্তায় সায় দিচ্ছে। ববরভ বেশ খুশি হয়ে নিজের মনে শান্তভাবে আওড়াতে লাগল,—হ্যাঁ এই হবে আমার স্ত্রী।

খাশনিনের কথা হচ্ছিল ওখানে। আনা আফানাসেভ্না কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের ঝঙ্কার তুলে বলছিলেন পরের দিন তিনিও তার মেয়েদের নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছেন।

ভাসিলি তেরেন্তিভিচ্ হয়ত আমাদের এখানেও একবার পায়ের ধূলি দিতে পারেন—বললেন তিনি,—আমার এক দূর সম্পর্কের বোনের স্বামীর ভাইঝি হচ্ছে লিজা বেলোকোনস্কায়া,—সে মাসখানেক আগে ওঁর এখানে আসবার কথা লিখেছে আমায়।

জিনেঙ্কো অতি বিনীতভাবে বললেন,—যার ভাইয়ের সঙ্গে প্রিন্সেস মুখো-ভেতস্কায়ার বিয়ে হয়েছে এ কি সেই বেলোকোনস্কায়া?

আনা আফানাসেভনা মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। স্ত্রেমাওকোভদের তো তুমি চেনো,—তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এ—দিদিমার দিক দিয়ে। সে লিখেছে—ভাসিলি তেরেন্তিভিচের সঙ্গে একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল তার,—মিল দেখতে যদি কোন দিন আসা হয় তাঁর, তা হলে আমাদের বাড়িতেও যাতে তিনি পায়ের ধূলি দেন তার জন্য অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে সে।

জিনেঙ্কো একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমরা তাঁর যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করতে পারব কি?

তোমার কথা শুনে হাসি পায়। যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা। তবে এ কথাও ঠিক—বার্ষিক আয় যার তিন লক্ষ রুবল—তার মনে রাখবার মত আদর যত্ন করবার সাধ্য আমাদের নেই।

জিনেঙ্কো যেন আর্তনাদ করে উঠলেন,—বাপ রে,—তিন লক্ষ রুবল,—ভাবতে গেলে গাটা শিউরে ওঠে।

নিনার কণ্ঠেও এর প্রতিধ্বনি উঠলঃ তিন লক্ষ রুবল!

আর আর মেয়েরাও মোহগ্রস্তের মত এক সঙ্গে বলে উঠলঃ তিন লক্ষ রুবল!

আনা আফানাসেভনা বললেন,—হাঁ, তাই,—আর এর সবই ব্যয় করে ফেলেন তিনি, একেবারে শেষ কোপেক পর্যন্ত। তারপর মেয়েদের অনুচ্চারিত এক প্রশ্নের উত্তর দিতেই তিনি বললেন, তিনি বিবাহিত, কিন্তু লোকে বলে বিয়েটা তার সার্থক হয় নি। ওর স্ত্রীর না আছে কোন ব্যক্তিত্ব, না আছে লোকের চোখে বড় হবার মত কোন গুণ। যাই বল—স্ত্রীর উচিত স্বামীর কাজকর্মকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে তোলা।

নিনার মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল,—তিন লক্ষ!—যেন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে সেঃ এ টাকায় কত কি যে করা যায়!

আনা আফানাসেভনা নিনার মাথার ঘন চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, এমন একটা স্বামী পেলে মন্দ হয় না,—কি বলিস?

অপর একটা লোকের তিন লক্ষ রুবল আয়ের কথা ও বাড়ির সবাইকে যেন যাদু করে ফেলেছে। চলতে লাগল লক্ষপতিদের জীবন যাপনের নানা গল্প; রূপকথায় শোনা ভোজের মত তাদের বাড়ির ভোজ, অপরূপ সুন্দর সব ঘোড়া, তাদের বাড়ির নৃত্যোৎসব আরও দশ রকমের অশ্রুতপূর্ব বিলাসের ব্যয় শুনে বিস্ময়ানন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সবার চোখমুখ।

দেখে শুনে ববরভের বুকটা একেবারে দমে গেল,—একটা ব্যথা বোধ করতে লাগল সে বুকে। আস্তে আস্তে নিজের টুপিটা নিয়ে চুপে চুপে বেরিয়ে এল সে বারান্দায়। তার বেরিয়ে যাওয়াটা কারো নজরেই পড়ল না।

বাড়ির দিকে জোর কদমে ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতেও মনে পড়তে লাগল তার—প্রলাপের মত নিনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সেই দুটি কথা,—তিন লক্ষ! হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার সেদিন সকালেই সেজহেভস্কী যে গল্পটা শোনাবার জন্য জিদ করছিল,—সেই গল্পটার কথা।

রাগে দাঁত কড়মড় করে ফেয়ারওয়ের পিঠে চাবুক লাগিয়ে আপন মনেই সে বলে উঠল,—এই মেয়েটিও নিজেকে—বিক্রী করতে পারে!

নিজের আস্তানার কাছাকাছি এসে ববরভ দেখলে তার ঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ঘর্মাক্ত ঘোড়ার লাগাম টানতে টানতে সে ভাবলে,—আমি বাইরে থাকবার সময় ডাক্তার এসে গেছে নিশ্চয়,—খুব সম্ভব আমার সোফায় হেলান দিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে সে। এই ডাক্তার গোল্ডবার্গই হচ্ছে একমাত্র লোক যাকে বরদাস্ত করতে পারে ববরভ,—কিছুমাত্র উত্তেজনা জাগে না মনে।

ববরভের সত্যিই বড় ভাল লাগে এই হাসি-খুশি শান্ত ইহুদী যুবকটিকে, তার কারণ—সব কিছুতেই এর বুদ্ধি খেলে, তর্ক করতে পারে দুরূহ বিষয় নিয়ে, তা ছাড়া মনে এর তারুণ্যের সজীবতা। ববরভ যে বিষয় নিয়েই আলাপ সুরু করুক না কেন, সমানে সে তা নিয়ে তর্ক করে যাবে,—একটুও ভাঁটা পড়বে না তার উৎসাহে। এ পর্যন্ত কেবল তর্কাতর্কিই তারা করে এসেছে, এবং সে তর্ক কিছুতেই যেন আর শেষ হতে চায় না,—তবু একজনের সঙ্গে দেখা না হলে আর একজনের চলে না, এবং দেখা হয়ও প্রায় রোজই।

ডাক্তার একরকম শুয়েই ছিল সোফার উপর,—পা দুটি তুলে দিয়েছে সে ওটার পিছনে। কাছে না হলে সে দেখতে পায় না—তাই চোখের একেবারে কাছে নিয়ে সে একখানা বই পড়ছে। একবার নজর পড়তেই ববরভ দেখলে বইখানা হচ্ছে মেভিয়াসের লেখা "হ্যান্ড বুক অব্ মেটালার্জি",—দেখে একটু হাসলে। তার ভাল করেই জানা—যে কোন বই হলেই ডাক্তার সমান মনোযোগের সঙ্গে তা পড়ে যেতে পারে,—এবং সুরু করবে সে ঠিক এর মাঝখান থেকে।

ববরভকে দেখেই বইখানা ছুড়ে দিয়ে চশমার উপর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলে উঠল,—তুমি বাইরে থাকতেই আমি একবার চা খেয়ে নিয়েছি। যাক, আমার প্রভু আন্দ্রি ইলিয়িচ্ আছেন কেমন? এ-রে, কি তিরিক্ষে দেখাচ্ছে তোমাকে! কি ব্যাপার কি? আবার কোন সুখকর বেদনার কারসাজি?

ববরভ ক্লান্ত কণ্ঠে বললে,—ডাক্তার, জীবনটা বড় ক্লান্তিকর।

কেন বন্ধু?

জানি না,—তবে এই মনে হয়। যাক তোমার হাসপাতালের খবর কি বল?

হাসপাতাল ঠিক আছে। আজই এক চমৎকার অস্ত্রোপচার করতে হ'ল আমাকে। সত্যিই হাসিও পায় আবার দুঃখও লাগে। এক তরুণ মাসালস্ক পাথর মিস্ত্রী এসেছিল আমার কাছে আজ সকালে। এই মাসালস্ক যুবকেরা সবাই জোয়ান, একজনও বাদ নেই। এই যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, কি চাই তোমার? ও বললে, দেখুন ডাক্তার সাহেব, আমাদের দলের সবার জন্য রুটি কাটছিলাম আমি, হঠাৎ আমার আঙুলে ছুরির একটা আঁচড় লেগে রক্ত

বেরুতে লাগল,—কিছুতেই তা বন্ধ হচ্ছে না। আমি তার আঙুলটা পরীক্ষা করে দেখলাম, সামান্য আঁচড়ই, ভাবনার কিছু নেই, তবে একটু পুঁজ পড়তে সুরু করেছে। আমি আমার সহকারীকে দিয়ে ওখানটা ব্যান্ডেজ করে দিলাম,—কিন্তু রোগী নড়ে না। 'আর কি চাই তোমার, হাত ত তোমার ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে, তুমি এখন যেতে পার'।

ও বললে, সে কথা ঠিক,—ধন্যবাদ আপনাকে; কিন্তু দেখুন সার,—আমার মাথাটা একটু কেটে গেছে,—ভেবেছিলাম ওর জন্যও কিছু ওষুধ দেবেন আপনি।

কি হয়েছে তোমার মাথায়, ওখানে ত একটা মোজা লাগিয়েছ দেখছি?

আনন্দে লাফিয়ে উঠে ও হাসতে লাগলঃ ঠিকই ধরেছেন। সেদিন—'সেভিয়ার্স ডে'-তে—মানে তিনদিন আগে আমরা একটু ফুর্তি করেছিলাম, মানে এক বালতি ভদকা খেয়েছিলাম, তারপর নিজেদের মধ্যে একটু ইয়ে—মানে ঝগড়া মারামারি সুরু করেছিলাম। আর জানেন ত—এ সব ব্যাপারে শেষে কি হয়। এক জনের বাটালির ঘায়ে মাথাটা আমার কেটে গেল,—এক রকম সেরেই গিয়েছিল,—বিশেষ কিছু নয়,—মানে প্রথমে খারাপ কিছু বুঝি নি,—ব্যথা লাগে নি, —কিন্তু এখন দেখছি মাথাটা জখম হয়েছে।

আমি ওর মাথাটা পরীক্ষা করে দেখে রীতিমত ভড়কে গেলাম। দেখলাম ওর মাথাটা একেবারে ফেঁড়ে গেছে,—ভিতরে পাঁচ কোপেকের আকারের একটা ছেঁদা,—তা ছাড়া ভাঙা হাড়ের টুকরো এদিকে ওদিকে আটকে আছে। এখন হাসপাতালে সে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে। আশ্চর্য লোক এরা,—ছেলে বুড়ো সবাই। আমি এ কথা জোর করে বলতে পারি জগতে একমাত্র রাশিয়ার মুজিকরাই এ রকমটি বরদাস্ত করতে পারে, অন্য কেউ হলে অকুস্থানেই অক্কা পেত।...আর কি সরল রসিকতা দেখ,—বলে কি না,—আর জানেনই ত,—এ সব ব্যাপারে শেষে কি হয়?—ভগবান!

ববরভ তার উঁচু বুটের উপর শপাং শপাং করে চাবুক আছড়াতে আছড়াতে আর অন্যমনস্ক ভাবে ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে ঘরের মাঝে পায়চারি করছিল। জিনেঙ্কোবাড়িতে যে তিক্ততা তার মনে পাষাণ হয়ে বসেছে তা সে মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

ডাক্তার এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে—ববরভের কথা বলতে ইচ্ছা নেই দেখে সহানুভূতির সঙ্গে বললে,—দেখ আন্দ্রি ইলিয়িচ,—আমি বলছি কি তুমি একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর। আজ রাত্রে দু এক চামচ ব্রমাইড্ খাও তুমি। এখন তোমার যা মনের অবস্থা তাতে এ জিনিস তোমার উপকার খুব করবে, অন্তত ক্ষতি ত করবেই না।

ওরা দুই জনে একই ঘরে শুয়ে পড়ল,—ববরভ শুলো তার বিছানায় আর ডাক্তার শুলো সোফায়। কারো চোখেই ঘুম নেই। গোল্ডবার্গ অনেকক্ষণ কান

পেতে থেকে যখন দেখলে ববরভ এ পাশ ও পাশ করছে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে তখন সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে,—বন্ধু, কি হয়েছে তোমার?—কিসে তুমি কষ্ট পাচ্ছ? তোমার মনের সব কিছু আমায় খুলে বল না? তাতে ভাল হবে তোমার। বাইরের লোক যেমন বৃথা কৌতূহল নিবৃত্তি করবার জন্য প্রশ্ন করে,—আমি ত তা নই!

ডাক্তারের এই সরল আন্তরিকতার কথাগুলিতে ববরভের মনটা একটু নরম হ'ল। ডাক্তার ও তার মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে অনেক দিন,—কিন্তু একটি মাত্র কথা দিয়েও কেউ কোনদিন অপরকে এ কথা জানায় নি। দুই জনই অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ,—তাই কোন রকমে প্রীতির কথা প্রকাশ করতেও বেধেছে দুই জনের। আজ এই রাত্রির অন্ধকারে ববরভের প্রতি অনুকম্পায় ডাক্তারের মুখই প্রথম খুলে গেল।

ববরভ নরম গলায় বললে,—ওসিপ ওসিপোভিচ্, সব কিছু যেন আমার বুকে চেপে বসে,—বিরক্তি লাগে সব কিছুতে। প্রথমেই ধরো আমি মিলে কাজ করছি, প্রচুর টাকা পাচ্ছি, অথচ এ কাজটাকেই আমি ঘৃণা করি। বিরক্তি লাগে এতে। কোন পাপ অভিসন্ধি আমার মনে নেই, তাই আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কি করছ তুমি? তোমার কাজের দ্বারা লাভ হচ্ছে কার? সব বুঝতে পারছি আমি, সব কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার চোখেঃ আমার পরিশ্রমের ফলে শ' খানেক ফরাসী পরশ্রমজীবী এবং ডজন খানেক রুশীয় হাঙ্গর লক্ষ লক্ষ টাকা পকেট জাত করবে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশ যে কাজের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করলাম তার এ ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য বা অর্থ হয় না।

অন্ধকারেই ববরভের দিকে পাশ ফিরে ডাক্তার বললে,—এ কি হাসির কথা বলছ তুমি, আন্দ্রি ইলিয়িচ। আরামে থাকতে হলে অনেক টাকার দরকার যে! বন্ধু, জগৎটা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে উদর-নীতির দ্বারা চালিত হচ্ছে। এর ব্যতিক্রম হয়ওনি হবেও না। এখন কথা হচ্ছে,—তুমি এই টাকাকে কিছুমাত্র পাত্তা দাও না, কারণ তুমি এ সবের অনেক উপরে। কাগজের ভাল ভাল প্রবন্ধে যে অগ্রগতির-রথের উল্লেখ থাকে,—তার চাকাকে তুমি ঠেলে দিচ্ছ,—এতে বীরত্ব আছে—এ বীরত্বের জন্য আত্মতৃপ্তি জাগে না তোমার মনে? যা'ক গে,—জাহাজ কোম্পানীর শেয়ারে অনেক টাকা লাভ হয় সত্যি,—কিন্তু তাতে করে ফুলটনকে মানব জাতির সুহৃদ ভাবতে বাধা কি?

ববরভ বিরক্তির মুখভঙ্গী করে বলল,—ডাক্তার,—তুমি আজ জিনেঙ্কোদের বাড়িতে যাও নি ত!—কিন্তু তোমার মুখে আজ তাদেরই জীবন দর্শনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ভালই,—যুক্তি খুঁজতে আজ আর আমার মাথা ঘামাতে হবে না,—তোমার প্রিয় মতবাদ দিয়েই তোমাকে ঘায়েল করতে পারব আমি।

মতবাদ?—কি মতবাদ?—কই আমি ত কোন মতবাদের কথা মনে করতে পারছি না। সত্যিই বলছি মনে পড়ছে না কিছু,—হয়ত ভুলে গেছি।

তাই না কি?—এই সোফায় বসে কে তবে চীৎকার করছিল এত,—মুখে ফেনা বেরিয়ে গিয়েছিল?—বলছিলে আমরা ইনজিনীয়ার আর আবিষ্কারকেরা সমাজের হৃদস্পন্দনকে জ্বরাক্রান্তের মত দ্রুত করে তুলছি?—মানুষের জীবনকে অক্সিজেনের পাত্রে আবদ্ধ জন্তুর সঙ্গে কে তুলনা করেছিল? আমার বেশ মনে আছে—স্নায়ুরোগগ্রস্ত, উন্মাদ, অতিশ্রান্ত, আত্মহত্যাকারী ইত্যাদি করে কত হাজার হাজার লোককে এই মানব সুহৃদদের কাছেই বলি দিয়েছ? তুমিই বলেছ টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ঘণ্টায় আশী মাইল-গতির ট্রেন দূরত্বকে কত হ্রাস করেছে,—দূরত্বের একরকম অবসান করে দিয়েছে বললেই হয়। তুমিই বলেছ—সময় এখন এত মূল্যবান হয়ে উঠেছে যে দিনের মাত্রা দ্বিগুণ করে তুলতে শীগগিরই লোকে রাতকে দিন করে তুলবে। যে সব সংবাদ আদান প্রদান করতে মাসের পর মাস লেগে যেত, এখন তা পাঁচ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। এই নারকীয় গতিতেও যেন কুলিয়ে উঠছে না আমাদের। শীগগিরই হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও তারের সাহায্যে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাব। অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যখন গ্রাম থেকে কোন শহরে যাবার আয়োজন করতেন তখন তাঁরা গির্জেয় গিয়ে উপাসনা করে আসতেন এবং যাবার জন্য এত সময় হাতে রাখতেন যে সে সময়ে এখন মেরু অভিযান সেরে আসা যায়। উদ্দাম গতিতে সামনে ছুটে চলেছি আমরা,—দৈত্যের মত সব যন্ত্রের ঝনঝনানি, ঘড়ঘড়ানিতে সম্বিৎ হারিয়ে গতির বেগে চোখে সরষের ফুল দেখে, উত্তেজিত স্নায়ু, বিকৃত রুচি এবং হাজার রকমের নতুন রোগ নিয়ে ছুটে চলেছি। মনে পড়ে ডাক্তার,—কল্যাণকর অগ্রগতির সমর্থক তুমি,—তুমিই এই সব কথা বলেছিলে?

ডাক্তার এতক্ষণ এ সবের প্রতিবাদ করবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করছিল,—এই-বার ববরভ একটু চুপ করায় সুবিধা পেয়ে গেল।

সে একটু থতমত খেয়ে বললে,—হাঁ, বন্ধু,—আমি বলেছি এ সব কথা। দরকার হলে আবার বলব। কিন্তু কথা হচ্ছে যে জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে নিজেদের জীবন। তা না হলে বাঁচব কি করে আমরা? সব পেশাতেই ছোটখাটো এমন অনেক বিষয় আছে,—যাতে কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই ধরো আমাদের ডাক্তারের কথাই ধরো। তুমি কি মনে কর আমাদের ব্যবসাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই,—মুস্কিল নেই? কিন্তু সত্যি বলতে কি, একমাত্র অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কিছুর উপরই আমাদের বিশ্বাস নেই। নতুন নতুন প্রতিকার, আর পদ্ধতির কথা নিয়ে মাথা ঘামাই আমরা,—অথচ ভুলে যাই হাজার লোকের মাঝে দুই জন লোকের রক্ত, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, বংশের প্রভাব এবং আরও কত কি এক নয়। বন্য জন্তু এবং হাতুড়েদের চিকিৎসার মালমসলা

থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা কোকেন, য়্যাট্রোপিন, ফেনাসেটিন ইত্যাদি দিয়ে আমাদের ওষুধের দোকান ভর্তি করেছি,—কিন্তু ভুলে গেছি যে রোগীকে এক গ্লাস বিশুদ্ধ জল দিয়ে যদি পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলা হয় এটা জোরাল ওষুধ,—তা হলে সে রোগমুক্ত হয়ে উঠবে। শতকরা নব্বইটা রোগীর বেলায়ই চিকিৎসা ব্যাপারে সাহায্য করে আমাদের বৃত্তিদ্বারা অর্জিত আত্মপ্রত্যয়। বিশ্বাস কর আর না কর একবার একজন গুণী, জ্ঞানী এবং সাধু চিকিৎসক আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন—আমরা ডাক্তারেরা রোগীকে যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করি তার চেয়ে শিকারীদের রুগ্ন কুকুর চিকিৎসা ঢের বেশি বিবেকানুমোদিত। তাদের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে গন্ধকের খই,—এতে ক্ষতি তো কিছু করেই না—কখনও কখনও বরং উপকার করে। চমৎকার ব্যাপার, নয় কি? আমরাও অবশ্য যতটুকু পারি তাই করি। এ ছাড়া আর পথও নেই,—আপোষ করেই চলতে হবে জীবনে। অনেক সময় তুমি সবজান্তা ধন্বন্তরী এই ভাব দেখিয়েই রোগীর যন্ত্রণার অনেক উপশম করতে পার। ভগবানকে ধন্যবাদ যে এটা সম্ভব।

ববরভ বিষণ্ণভাবে বললে,—আপোষের কথা বলছ তুমি, কিন্তু আজই এক মাসালস্ক পাথর মিস্ত্রীর মাথা থেকে হাড়ের টুকরো বের করেছ তুমি,—করনি?

কিন্তু, বন্ধু,—একজনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে পেরেছি আমি তাতে তোমার কাজের থেকে তফাৎ হল কোথায়? ভেবে দেখ তুমিও কত জনের অন্ন-সমস্যার সমাধান করছ, কত জনকে কাজ দিচ্ছ। ইলোভাইস্কি তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, 'জার বরিস লোকচিত্ত জয় করবার জন্য দুর্ভিক্ষের বৎসরেই সাধারণের পানভোজন ও বিশ্রামের জন্য বাড়ি তৈরি সুরু করলেন অথবা এই ধরনেরই একটা কিছু। তুমিও চেষ্টা কর যাতে জনসাধারণের একটা পরম কল্যাণ—

ডাক্তারের শেষ কথাগুলি যেন ববরভের মনে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিলে, সে তার খালি পা এক পাশে বের করে দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসল,—তার-পর এক রকম পাগলের মত চীৎকার করে বলে উঠল,—কল্যাণ?—কল্যাণের কথা বলছ তুমি আমার কাছে?—বেশ, কল্যাণ, অকল্যাণের কথা উঠলই যখন তখন তার একটা মোটামুটি হিসাব শোনাচ্ছি তোমায়। এর পর বক্তৃতামঞ্চ থেকে লোকে যেমন তীক্ষ্ণ, শাণিত সুমিত লয়ে কথা বলে তেমনি করে সে বলতে সুরু করলে,—এটা বহুদিনের জানা কথা যে খনি, ধাতু শিল্পাগার বা বড় বড় কারখানার কাজে মানুষের আয়ু সিকি কমে যায়,—দুর্ঘটনা বা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কথা না হয় না-ই বললাম। তুমি ডাক্তার মানুষ,—সুতরাং আমার চেয়ে ভালই জান ওখান-কার মজুরেরা দূষিত ব্যাধি আর পানদোষে কত কষ্ট পায়, ওখানকার জঘন্য ব্যারাক আর মাটির ঘরে থেকে ওরা কি কষ্ট পায়। প্রতিবাদ করবার আগেই আরও শোন ডাক্তার, একবার ভেবে দেখার চেষ্টা কর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ

ছাড়িয়েছে এমন কটা মজুরকে তুমি কারখানায় দেখতে পেয়েছ? আমি একটিও দেখিনি। এর অর্থ হচ্ছে মজুরেরা তাদের নিয়োগকারীকে বৎসরে তিন মাস, মাসে এক হপ্তা, সংক্ষেপে প্রতিদিন ছ' ঘণ্টা করে তাদের জীবনের আয়ু দান করছে। আমাদের যে ছয়টা ধাতু গলানো চুল্লী আছে,—তাতে কাজ করে রোজ ত্রিশ হাজারের মত লোক, তোমার জার বরিস,—আমার মনে হয়,—এ কল্পনাও করতে পারেন নি। এই ত্রিশ হাজার লোক প্রতিদিন তাদের জীবনের মোট একশো আশি হাজার অর্থাৎ সাড়ে তিন হাজার দিন অগ্নিদেবকে আহুতি দিচ্ছে, সাড়ে তিন হাজার দিনে ক' বৎসর হয় একবার হিসাব করে দেখ।

একটুখানি ভেবেই ডাক্তার বলে উঠল, প্রায় কুড়ি বৎসর।

ববরভ জোর গলায় বলে উঠল,—কুড়ি বৎসর!...দু'দিনের কাজেই এক একটি মানুষ শেষ। মরুক গে,—বাইবেলের আসিরিয়ান বা মোয়াবাইটদের কথা মনে আছে তোমার,—যারা দেবতার কাছে মানুষ বলি দিত? মানুষ বলির আমি যে সংখ্যা দিলাম তা শুনলে ওদের সেই পেতলের তৈরি দেবতা মোলক আর ড্রাগনের মুখ লজ্জা আর অপমানে রাঙা হয়ে উঠত নিশ্চয়।

তর্ক করতে করতে আচম্বিতে অনেকের মনে যেমন নতুন তত্ত্বের উদয় হয়, —ববরভের মনে অদ্ভুত এই সংখ্যার হিসাবও ঠিক তেমনি করে এসে গেছে। কিন্তু এই ভীষণ সংখ্যার কথাটা ভাবতে গিয়ে গোল্ডবার্গ ও সে দুজনেই রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার ববরভের কথা শুনে বলে উঠল,—থাম হে,—তুমি যে আমায় একেবারে ভড়কে দিলে! সংখ্যার হিসাবে তোমার ভুলও ত হতে পারে!

ববরভ আরও উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—আর একটা সংখ্যার হিসাব শোনাচ্ছি তোমায়, এতে একেবারে নিখুঁত ভাবে জানতে পারবে তোমার ঐ অগ্রগতির রথের প্রতি পদক্ষেপে মানে ঐ তুচ্ছ ঝাড়াই কল, বীজ ছাড়ানো কল, বা রেল তৈরির কল তৈরি করতে গিয়ে মানুষের জীবনের কি মূল্য দেওয়া হচ্ছে। চমৎকার জিনিস তোমার সভ্যতা।—এর ফল হচ্ছে সংখ্যা, স্টীল মেশিন হচ্ছে ইউনিট,—আর মানুষের জীবনের মূল্য শূন্য।

ববরভের উত্তেজনায় হতভম্ব হয়ে ডাক্তার বললে,—কিন্তু বন্ধু, তুমি কি বলতে চাও, আমাদের তা হলে সেই আদিম যুগেই ফিরে যাওয়া ভাল? শুধু মন্দ দিকটাই দেখবে কেন তুমি? তোমার হিসাব সত্য হলেও দেখতে পাচ্ছি আমাদের কারখানা স্কুল করে দিয়েছে,—গির্জে হাসপাতাল করে দিয়েছে,—মজুরদের জন্য অল্প সুদে ঋণ-দান-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে।

ববরভ এবার বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে সুরু করলে ঃ

তোমার ঐ স্কুল আর হাসপাতালের কোন মানে হয় না। কুকুরকে ঠাণ্ডা

করতে যেমন সুপসিক্ত রুটি ফেলে দেওয়া হয়—এগুলি তেমনি তোমাদের মত যাঁরা মানুষের কল্যাণ নিয়ে মাথা ঘামান তাঁদের শান্ত করবার—জনগণের সহানুভূতি লাভ করবার অপকৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। 'ফিনিশ'—কাকে বলে জানো?

ফিনিশ?—ঘোড়ার সঙ্গে, ঘোড়-দৌড়ের সম্বন্ধ আছে না কি তোমার এ 'ফিনিশের'?

হ্যাঁ আছে। বিজয় নির্দেশ স্তম্ভে পৌঁছবার আগে সাতশ' ফুটের মত জায়গায় ঘোড়াকে ভীষণ জোরে ছোটাতে হয়,—একে বলে 'ফিনিশ'। ঘোড়া এখানে তার চরম বেগে প্রাণপণে ছোটে,—এবং এই বেগ সৃষ্টি করাতে ঘোড়াকে এমন করে চাবুক লাগানো হয় যে তার গা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। এই জায়গাটা পার হয়ে গিয়ে ঘোড়া মরলেও তাতে কারো কিছু এসে যায় না। আমাদেরও ঠিক ঐ দশা। ঘোড়াকে চরম বেগে দৌড় করানোর পর যখন সে পিঠ পা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে—তখন তাকে দিয়ে আর কোন দরকার থাকে না। ফিনিশের পর যে ঘোড়ার ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ হয়ে গেছে তার জন্য স্কুল হাসপাতালের ব্যবস্থা—অতি সুব্যবস্থা বটে! ধাতু গলানো বা রোলিং-এর কাজ দেখেছ কখনও তুমি? দেখে থাক ত নিশ্চয়ই বুঝেছ এ কাজে চাই অসীম সাহস, লোহার পেশী আর সার্কাস সর্দারের নৈপুণ্য। এ কাজ যারা করে দিনের মাঝে কয়েকবার তারা মরণের মুখ থেকে রক্ষা পায় নেহাৎ আত্মসংযমের বলে। আর জানো এই ধরনের কাজের জন্য কত মজুরী পায় তারা?

গোল্ডবার্গ বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল, কিন্তু যতদিন মিল আছে,—ততদিন তাদের কাজ আছে এটাও বড় কম কথা নয়।

ববরভ জানলার তাকে বসে সমান জোরে বললে,—ছেলে মানুষের মত কথা বলো না, ডাক্তার। মজুরকে আজকাল অন্য কিছুর চাইতে বেশি নির্ভর করতে হয় ব্যবসার বাজার, চাহিদা,—স্টকের কাজকর্ম,—এবং আরও দশরকম ষড়যন্ত্রের উপর। প্রত্যেক বড় কারবার ঠিকমত চালু হবার আগে তিন চারবার হাত বদল করে। আমাদের এ কোম্পানী হ'ল কি করে জানো?—প্রথমে সামান্য কয়েকজন ব্যবসায়ীর টাকা একত্র করে কারবারটা ফাঁদা হয় একটু ছোট রকমে। কিন্তু ইনজিনীয়ার ডিরেক্টর আর কনট্রাক্টরের দল এদের টাকা কি করে যে ধীরে ধীরে উড়িয়ে দিলে মালিকরা তার হদিসই পেলে না। বড় বড় সব ঘর তোলা হয়েছিল,—কোনই কাজে লাগল না সেগুলি,—সেগুলিকে ভেঙ্গে চুরে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর সমস্ত কারবারটা যখন রুবল প্রতি দশ কোপেক দরে বিক্রী হয়ে গেল তখন বোঝা গেল এই বদমাইসের দল অপরের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এই সব নোংরামি করেছে,—অপর একটা বিত্তশালী বড় কোম্পানীর টাকা খেয়ে এই সব করেছে। এখন কারবারটা বেশ জাঁকের সঙ্গেই চলেছে,—কিন্তু আমি

বেশ ভালভাবেই জানি,—এর প্রথম বিপর্যয়ে আটশো শ্রমিক তাদের দু'মাসের বেতন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই তোমার চাকরির নিরাপত্তা! আবার শেয়ারের দাম পড়লেই মজুরির দাম কমে যায়। শেয়ারের দাম কি করে ওঠে নামে তা বোধ হয় জানো। ব্যাপারটার জন্য একবার পিটার্সবার্গ যেতে হবে তোমায়, গিয়ে কোন দালালকে চুপি চুপি বলতে হবে যে তিন লক্ষ রুবলের মত শেয়ার বিক্রী করতে চাও তুমি। বলতে হবে কথাটা যেন আর কারো কানে না যায়,—এবং এই গোপন রাখার জন্য টাকা দেওয়া হবে তাকে। তারপর আরও দু' একজন দালালের কানে কানে এই একই কথা বলতে হবে তোমাকে,—সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের দাম বেশ কিছু রুবল পড়ে যাবে। কথাটা গোপন রাখার মাত্রার উপর নির্ভর করবে শেয়ারের দাম কমার দ্রুততা ও নিশ্চয়তা। নিরাপদ কর্ম-সংস্থানই বটে!

ভীষণ জোরে এক ধাক্কা দিয়ে ববরভ জানালাটা খুলে দিলে,—বাইরে থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। কারখানার দিকে আঙুল দিয়ে ববরভ উচ্চ-কণ্ঠে বলে উঠল,—দেখ ডাক্তার,—একবার তাকিয়ে দেখ।

গোল্ডবার্গ কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বাইরের দিকে তাকাল। দূরে বিস্তৃত এলাকা রাশি রাশি জ্বলন্ত পাথরে-চুনের আলোকে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে,—ওদের তলদেশ থেকে মাঝে মাঝে গন্ধকের নীলাভ হরিৎ আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ওগুলি হচ্ছে চুনের ভাঁটি।* কারখানার উপরে রক্তের মত লাল আগুনের ঢেউ খেলে যাচ্ছে,—তারই আলোতে দেখা যাচ্ছে—বিরাট আকার চিমনিগুলির শীর্ণ শীর্ষদেশ,—ওদের তলদেশ মৃত্তিকোত্থিত ধূসর বাষ্পরাশিতে আচ্ছন্ন। বিশালকায় চিমনিগুলি অবিরাম যে ঘন ধূম উদ্গীরণ করছে—তা আবার পূবের দিকে প্রবাহিত বাষ্পের সঙ্গে মিশে লালচে রঙের পেঁজা তুলোর বলের মত দেখাচ্ছে। জ্বলন্ত গ্যাসের হলকাগুলি দীর্ঘ শীর্ণ ধূম্র-নিষ্কাশক নলের উপর কেঁপে কেঁপে যেন নেচে চলেছে,—ওগুলি দেখাচ্ছে যেন এক একটা বিরাট টর্চ। কারখানার ধূম্রমেঘের উপর গ্যাসের শিখাগুলির যে ছায়া পড়ছে তাতে যেন কোন ভাবী অমঙ্গলের বার্তা বহন করে আনছে। থেকে থেকে সঙ্কেত হাতুড়ীর খনখনে আওয়াজের পরই গলানো চুল্লীর ঘণ্টা বেজে উঠছে,—এবং সঙ্গে সঙ্গে চুল্লীর গর্ত থেকে মল-শীর্ষ অগ্নিশিখার ঘূর্ণী দূরাগত বজ্রনাদের মত শব্দ তরঙ্গ তুলে মহাবেগে উপরে উঠে যাচ্ছে। তারপর সমগ্র কারখানাটা একবার কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, শ্রেণীবদ্ধ কালো গোল তাপপ্রবাহক স্টোভগুলি দেখে মনে হচ্ছে যেন রূপ-

* ইংরেজিতে বলা হয় একে lime kiln. মানুষের মত উঁচু পাথুরে চুনের স্তূপে আগুন দেওয়া হয় কয়লা বা কাঠ দিয়ে। হপ্তাখানেক ধরে এমনি জ্বাল দেওয়ার পর ঐ সব চুনো-পাথর বাখারি চুনে পরিণত হয়।

—গ্রন্থকার।

কথা শোনা কতকগুলি লোহার কেল্লা। সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে সারি সারি সাজানো রয়েছে কয়লার উনুন। কখন কখন তাদের এক একটা জ্বলে উঠছে,—দেখাচ্ছে যেন একটা জ্বলন্ত চোখ। জ্বলন্ত লৌহের জ্বালার সঙ্গে এসে মিশছে বৈদ্যুতিক আলোর নীলাভ তাপহীন দীপ্তি। অবিরাম কানে আসছে লোহার খনখন ঝনঝন আওয়াজ।

মিলের আলোগুলির দীপ্তি ছিটকে ববরভের মুখে এসে পড়ায় মুখখানা দেখাচ্ছে কেমন তাম্রাভ ভয়ঙ্কর,—চোখ দুটি রক্তবর্ণ,—মাথার অবিন্যস্ত চুল কিছুটা কপালের উপর ঝেপে পড়েছে। কণ্ঠস্বর তীব্র—ক্রোধোদ্ধত।

জানলার ভিতর দিয়ে তার শীর্ণ বাহু প্রসারিত করে দিয়ে সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল,—ঐ,—ঐ সে মোলক,—উষ্ণ নরশোণিত পিপাসু মোলক!—এ উন্নতি,—যান্ত্রিক শ্রম,—আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতিই বটে!...ভগবানের দোহাই,—ভেবে দেখ একবার কুড়িটি বৎসরের কথা,—একদিনে মানুষের জীবনের কুড়ি বৎসর!...সত্যিই বলছি,—ভাবতে গেলে মাঝে মাঝে আমি খুনে হয়ে যাই।

ডাক্তারের গা-টা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। ভগবান,—লোকটা পাগল হয়ে গেছে, ভাবলে সে। ববরভকে সে এবার একটু ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করতে লাগলঃ

এস, এস, ভাই—আন্দ্রি ইলিয়িচ্,—বাজে জিনিস নিয়ে অত মাথা খারাপ করতে নেই। বাইরে ঠাণ্ডা,—অথচ জানালা খুলে দিয়েছ তুমি। যাও,—একটু ব্রোমাইড খেয়ে শুয়ে পড় এবার।

লোকটা সত্যিই পাগল!—ভাবতে গিয়ে ডাক্তারের মনে ববরভের জন্য অনু-কম্পা বোধ হতে লাগল,—ভয়ও করল কিছুটা।

উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ববরভ তাই ডাক্তারের কথায় আর তেমন কিছু আপত্তি করলে না। কিন্তু বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে সে হিস্টিরিয়া রোগ-গ্রস্তের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করলে। ডাক্তার তার পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে ছোট্ট ছেলেকে যেমন করে মাথা চাপড়ানো হয় তেমনি করে তার মাথা চাপড়াতে লাগল এবং মনে যে সব কথা আসে তাই বলে তাকে ঠাণ্ডা কর-বার চেষ্টা করতে লাগল।

পরের দিন ইভানকোভো স্টেশনে বিপুল সমারোহে খার্শাননকে অভ্যর্থনা করা হল। এগারোটার মধ্যেই মিলের যাবতীয় উচ্চ কর্মচারী সেখানে গিয়ে হাজির। ম্যানেজার ভালোরিয়ানোভিচ্ শেলকোভনিকোভ গ্লাসের পর গ্লাস সেলজার খেয়ে যাচ্ছেন, এবং ঘন ঘন ঘড়ি বের করছেন, কিন্তু ডায়ালের দিকে না তাকিয়ে যন্ত্রচালিতের মত আবার তা পকেটে রেখে দিচ্ছেন। তিনি যে বেশ একটু অন্যমনস্ক ও অস্থির-চিত্ত হয়ে পড়েছেন, তা আর বুঝতে ভুল হয় না। কিন্তু তার সুন্দর সম্ভ্রান্ত মার্জিত আত্মপ্রত্যয়শীল মুখমণ্ডলের কোন পরিবর্তন নেই। তিনি যে কেবল নামেই নির্মাণ পরিকল্পনার ম্যানেজার এ কথা অবশ্য খুব কম লোকেই জানে। আসল ম্যানেজার হচ্ছেন বেলজিয়ান ইনজিনীয়ার আন্দ্রিয়াস,—পোলান্ড আর সুইডেনের মিশ্রিত রক্ত রয়েছে এর ধমনীতে। মিলে যে এ'র কি কাজ একমাত্র ওয়াকিবহাল গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কেউ তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারে না। দুই ম্যানেজারের অফিস ঘরের মাঝে একটা দরজা আছে,—শেলকোভনিকোভ কাগজের কোণে আন্দ্রিয়াসের টিক্ না দেখে কখনও কোন জরুরী ব্যাপারে নিজের মতামত জানাতে সাহস পান না। কোন জরুরী ব্যাপারে যখন আন্দ্রিয়াসের মত নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না তখন তিনি মুখে চিন্তাক্লিষ্টের ভাব দেখিয়ে প্রার্থীজনকে বলেন,—দুঃখিত, একটুও সময় করতে পারলাম না আপনার জন্য,—বড্ড ব্যস্ত। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার প্রয়োজনটা মিঃ আন্দ্রিয়াসকে জানিয়ে রাখুন,—তিনি 'স্পেশাল নোটে' ব্যাপারটা আমায় জানিয়ে দেবেন।

আন্দ্রিয়াস বোর্ডের কাজ করে দিয়েছেন অসংখ্য। সাবেক কোম্পানীকে ধ্বংস করবার জোচ্চুরি মতলব ইনিই দেন, এবং কাজ হাসিল করবার সময় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ় হস্তে গোপনে ইনিই সব কিছু করেন। তাঁর দেওয়া পরিকল্পনাগুলি সবই অসম্ভব সরল এবং সঙ্গতিপূর্ণ, খনি সংক্রান্ত ব্যাপারে এ'র কথাই শেষ কথা। ইউরোপের বহু ভাষায় ইনি কথা বলতে পারেন, এবং নিজের বিষয় ছাড়া অন্য দশটা বিষয়েও বিশেষ ওয়াকিবহাল। ইঞ্জিনীয়ারদের ভিতর এ গুণটা বড় সচরাচর দেখা যায় না।

স্টেশনে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মাঝে আন্দ্রিয়াসও আছেন। ক্ষয়রোগীর মত শুকনো শরীর, মুখখানা ঠিক বুড়ো বাঁদরের মত, কিন্তু অন্য দশজনের মত স্বাভাবিক স্থৈর্য হারাননি তিনি তাঁর। সবার শেষে এসেছেন তিনি, এসে তাঁর চওড়া থলির মত ঢিলে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছেন, মুখে রয়েছে তাঁর সেই শাশ্বত সিগার। তাঁর ঈষৎ ধূসর চোখ দুটি বিজ্ঞানী মনের শক্তি ও দুঃসাহসিকের প্রবল ইচ্ছাশক্তির স্বাক্ষর বহন করে। এই

চোখের ক্লান্ত ফুলো ফুলো পাতার নীচু দিয়ে তিনি ঔদাস্যভরে তাকাচ্ছেন সবার দিকে, যেমন তাঁর অভ্যাস।

জিনেঙেকা বাড়ির সবাই-ও এসেছেন স্টেশনে। এতে অবশ্য আশ্চর্য হয়নি কেউ। বহুদিন থেকেই লোকে ঐ বাড়ির লোকজনকে মিল-জীবনের অঙ্গ বলে মনে করে। স্টেশনের ঠান্ডা আঁধারে হলঘরটা ও-বাড়ির তরুণী মেয়েরা তাদের কৃত্রিম আনন্দ ও হাসির লহরে সরগরম করে তুলেছে। তরুণ ইঞ্জিনীয়ারেরা খার্শনিনের প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে এদেরই চারিপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আত্ম-রক্ষার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে এরা হরদম এদিকে ওদিকে ছেলেমানুষের মত পুরানো মিষ্টি বুলি ছড়াচ্ছে। আর সদ্য-ফুটে-বেরোন বাচ্চাদের ভিতর মা-মুরগী যেমন চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়ায় ছোটখাটো আনা আফানাসেভনা তার মেয়েদের কাছে ঠিক তেমনি করে ঘোরাফেরা করছেন।

আগের রাত্রের ভীষণ উত্তেজনার পর ববরভ বড় ক্লান্ত, এক রকম অসুস্থ বললেই হয়. তাই সে হলের এক কোণে একা একা বসে কেবল ধূমপান করে যাচ্ছিল। জিনেঙেকা-বাড়ির মেয়েরা যখন ভিতরে এসে গোলটেবিলের চারিপাশে বসে উচ্চকণ্ঠে কলরব সুরু করলে তখন তার মনে দু' রকমের অস্পষ্ট অনুভূতি জাগতে লাগল। এর একটা হচ্ছে লজ্জা, জিনেঙেকা-বাড়ির মেয়েরা এখানে এসে যে অবিবেচনার কাজ করেছে তারই জন্য একটা নিদারুণ লজ্জা, আর একটা হচ্ছে আনন্দ, নিনাকে দেখে। জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে আসার ফলে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি উত্তেজনায় ঝলমল করছে, ওদিনকার পোশাকটাও বড় সুন্দর মানিয়েছে তার, ববরভ কল্পনানেত্রে যে নিনাকে দেখে এ যেন তার চেয়েও সুন্দর। ববরভের কাছে এ ব্যাপার অবশ্য নূতন নয়। তার ক্লান্ত ক্লিষ্ট মনে হঠাৎ যেন এক অদম্য বাসনা জেগে উঠল, কোমল সুরভিত প্রেম, নারী হস্তের স্নিগ্ধ স্পর্শ যা দিয়ে তারা সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেয়—তারই জন্য বাসনা।

নিনার কাছে এগিয়ে যাবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল সে, কিন্তু তখন সে দুটি মাইনিং-এর ছাত্রের সঙ্গে গল্পে মশগুল—কে নিনাকে হাসাতে পারে তাই নিয়ে যেন পাল্লা চলেছে ওদের দুটির মাঝে। নিনা হাসছেও, অন্য দিনের চেয়ে ঢের বেশি হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে, ওদের চিত্তজয়ের চেষ্টায় নারীসুলভ হাবভাব দেখাতেও তার কার্পণ্য নেই, হাসবার সময় তার ছোট ছোট সাদা দাঁতগুলি ঝক ঝক করে উঠছে। এ সব সত্ত্বেও ববরভের চোখের দিকে তার দু তিন বার দৃষ্টি পড়ল এবং ববরভের মনে হল নিনা তার ভুরু তুলে চোখের ইসারায়ই জিজ্ঞাসা করছে, কি খবর? কোন রোষের চিহ্ন নেই তাতে।

হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল প্ল্যাটফর্মে ঃ ট্রেন আগের স্টেশন ছাড়ল তারই ঘোষণা। ইনজিনীয়ারদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল ববরভের মুখে, হলঘরের কোণে বসেই সে দেখতে লাগল কুড়িটি কাপুরুষের মন একই চিন্তাভারে

আক্রান্ত। ঘণ্টা শুনে সবার মুখই গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠল, সবাই একবার করে তাদের ফ্রক কোটের বোতাম, নেকটাই এবং টুপির ওপর হাত বুলিয়ে ঠিক করে নিলে দৃষ্টি নিবন্ধ রইল ঘণ্টার দিকে। হলে আর রইল না কেউ।

ববরভও প্লাটফর্মে বেরিয়ে এল। যে সব পুরুষ এতক্ষণ জিনেঙ্কোর মেয়েদের কাছে ছিল তারা সব বেরিয়ে যাওয়ায় মেয়েরা এবার অসহায়ের মত দরজার কাছে আনা আফানাসেভনাকে ঘিরে দাঁড়াল। ববরভ একদৃষ্টে নিনার দিকে তাকিয়ে ছিল. নিনা এবার তার দিকে ফিরে তাকাল, তারপর ববরভ একান্তে তাকে কিছু বলতে চায় বুঝে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেল।

সুপ্রভাত। তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে যে আজ, শরীরটা ভাল নেই বুঝি? নিনা ববরভের হাতটা সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে জোরে চেপে, ব্যগ্র স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেঃ কাল রাত্রে অত সকাল সকাল তুমি চলে গেলে কেন, কাউকে কিছু না বলে? রাগ করেছিলে?

ববরভ মৃদু হেসে বললে, হাঁ—না,—দুই-ই। না, কারণ রাগ করবার আমার কোন অধিকার নেই, আছে কি?

আমার মতে রাগ করবার কারোই অধিকার নেই, বিশেষ করে তার যদি জানা থাকে যে তার মতের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। যাক এবার 'হ্যাঁ' কেন বল।

হঠাৎ কোত্থেকে যেন খানিকটা সাহস পেয়ে গেল ববরভ, নিনার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, বলছি...দেখ নিনা গ্রিগোরেভনা, কাল রাত্রে তুমি আর আমি যখন বারান্দায় বসে, মনে আছে তোমার? তখন, মানে সেই সময়টা যেন কতকগুলি দিব্য মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল আমার জীবনে, সে তোমারই জন্যে। আর বুঝেছিলাম তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে জগতের মাঝে সব চেয়ে বেশি সুখী করে তুলতে পার... হাঁ, ভয় সঙ্কোচই বা আমার কিসের? তুমি ত জানই, মানে তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ, বহুদিন থেকেই তুমি জানো যে আমি—

কথাটা শেষ আর করতে পারলে না ববরভ। সাহসটা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল।

—যে তুমি কি? কি বলতে চাইছিলে তুমি? নিনা বাইরে ঔদাসীন্যের ভান করে জিজ্ঞাসা করলে, চোখ দুটি কিন্তু তার নত হয়ে গিয়েছিল, এবং গলার স্বর ঠিক রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও তা কাঁপছিল।

নিজেরা না ভালবাসলেও অন্যের কাছ থেকে ভালবাসার কথা শুনতে বড় ভাল লাগে মেয়েদের, রোমাঞ্চ জাগে মনে। নিনা আশা করেছিল ববরভ তাকে ভালবাসার কথাই বলবে। গাল দুটি তার একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

ববরভ আমতা আমতা করে উত্তর দিলে, এখন নয়, আমি অন্য সময় বলব তোমায়, এখন নয়, মাপ করো। স্বরে মিনতি ঝরে পড়তে লাগল তার।

বেশ তাই হবে, কিন্তু রাগ করেছিলে কেন তুমি?

কারণ ঐ দিব্য মুহূর্তগুলির পর ডাইনিং রুমে গেলাম আমি—কি বলব—মানে একটা দিব্য স্নিগ্ধ কোমল মন নিয়ে গিয়ে—

খাশনিনের আয়ের কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে শুনে হঠাৎ একটা আঘাত লাগল মনে—এই ত! নিতান্ত সংকীর্ণমনা নারীর মুখ দিয়েও অনেক সময় সহজে সত্যদর্শীর মত কথা বেরিয়ে যায়। নিনা এর পর ববরভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার বললে,—ঠিক বলেছি ত? ববরভের সর্বাঙ্গে স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে সে বলতে লাগল, সত্যি করে বলবে, বন্ধুর কাছে কিন্তু কোন কিছু লুকাতে পারবে না তুমি।

তিন চার মাস আগে দল বেঁধে নৌকায় করে বেড়াবার সময় গ্রীষ্মের উষ্ণ রাত্রির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এক দুর্বল মুহূর্তে নিনা ববরভকে বলে বসেছিল—চিরদিন সে তার বন্ধু হয়ে থাকতে চায়। ববরভ সাদরে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, এবং একটি পুরো হপ্তা ধরে ওরা পরস্পরকে বন্ধু বলেই সম্ভাষণ করত। এবং নিনা যখনই অর্থপূর্ণ উদাস দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে ববরভকে বন্ধু বলে ডাকত, এই ছোট্ট কথাটা তার অন্তর স্পর্শ করত। সেই পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে ববরভের বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, সে উত্তর দিলেঃ

বেশ, বন্ধু, সব কথা আমি সত্যি করেই বলব, যদিও বলাটা আমার পক্ষে তেমন সহজ নয়।...তোমাকে দেখলেই যে অনুভূতি জাগে আমার মনে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই জন্য এ বেদনাকর। তোমার সঙ্গে কথা বলবার সময় এমন কতকগুলি মুহূর্ত আসে যখন তুমি একটিমাত্র কথা, ভঙ্গী অথবা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে যে কি সুখী করে তোলো—কি বলে তা প্রকাশ করব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। তুমি তা লক্ষ্য করেছ কি কোন দিন?

ঈষদান্দোলিত চক্ষু দুটি নত করে নিনা অতি অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, হাঁ।

এবং তারপরই দেখি তুমি এই অঞ্চলের সামান্য একটা শহরে প্রচলিত কতকগুলি বাঁধা বুলি আউড়ে যাচ্ছ সাধারণ একটা তরুণী মেয়ের মত, ভাবভঙ্গী সবই কৃত্রিম। আমি অকপটে সব বলে যাচ্ছি বলে রাগ করো না তুমি আমার উপর। এতে আমি ভীষণ কষ্ট পাই, নইলে বলতাম না এ সব কথা।

এ-ও লক্ষ্য করেছি আমি।

এই দেখ আমার অনুভূতির সঙ্গে কেমন মিলে যাচ্ছে। আমি জানি, বেশ ভালভাবেই জানি মনটা তোমার কোমল এবং দরদী। তাই যদি হয় তা হলে এখন তোমায় যেমন করে পাচ্ছি তেমন করে তোমায় অন্য সময় পাই না কেন?

নিনা ববরভের দিকে ফিরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার হাতে হাত দিতেই যেন হাত বাড়াল। প্লাটফর্মের যে দিকটায় লোক ছিল না সেই দিকটায়ই তারা পায়চারি করতে লাগল। নিনা ঈষৎ তিরস্কারের সুরে তাকে বলতে লাগল, আন্দ্রি ইলিয়িচ্, তুমি কোনদিনই আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করলে না, তুমি সব সময়ই ভীতু ভীতু আর অধীর। আমার মাঝে যে সামান্য গুণ আছে—তা তুমি

বড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে বল, আর সত্যিই আমি যা তা তুমি কিছুতে ক্ষমা করতে পার না, অথচ যে পরিবেশে আমি মানুষ, যে পরিবেশে আমি চলাফেরা করি তাতে এ ছাড়া অন্য কিছু আমি হতে পারি না। অন্য কিছু হতে গেলে সেটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠত, বাড়িতে সেটা বেসুরো লাগত। বড়ই দুর্বল আমি, আন্দ্রি ইল্লিয়িচ্, এবং সত্যি বলতে কি, এতই নগণ্য তুচ্ছ যে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়ে স্বাধীন সত্তা লাভ করবার মত ক্ষমতা আমার নেই। আর সবাই যেখানে যায়, আমিও সেখানে যাই, আর সবাই যেমন করে সব কিছু দেখে শোনে বিচার করে আমিও ঠিক তাই করি। আমি যে সাধারণ সে কথা যে আমি জানি না—তা ভেব না তুমি, শুধু তোমার কাছে থাকবার সময় এ কথাটা যেমন বুঝি অন্য দশজনের সঙ্গে থাকবার সময় তা তেমন বুঝি না। তোমার সামনে থাকবার সময় নিজেকে যেন খাপ খাওয়াতে পারি না কিছুতে, তার কারণ...। নিনা একটু থেমে গিয়ে বললে, তার কারণ তুমি একেবারে আলাদা, অন্য জগতের লোক, জীবনে তোমার মত আর কাউকে দেখি নি আমি।

নিনার মনে হচ্ছিল সে আজ অকপটে তার মনের দ্বার খুলে দিয়েছে। শরৎ-বায়ুর প্রাণ-সজীবতা, স্টেশনের কলরব, নিজের সৌন্দর্যাভিমান, এবং তার উপর ববরভের নিবদ্ধ-দৃষ্টি-জনিত আনন্দ সব কিছু মিলে বিপুল প্রেরণা দিচ্ছিল তার মনে, এবং হিস্টিরিয়ার ছোঁয়াচ-লাগা অন্যান্য মেয়েদের মত মিষ্টি করে অনেক মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছিল সে অনর্গল, নিজেও বুঝছিল না—এগুলি মিথ্যে। অপরের নৈতিক সমর্থন অভিলাষিণী তরুণীর ভূমিকায় নিজেকে নিজেই তারিফ করে ববরভকে অনেক মিষ্টি কথা বলতে চেষ্টা করলে সে। সে বললে—

আমি জানি তুমি মনে কর,—হাবভাব দেখিয়ে আমি পুরুষের মন কাড়ার চেষ্টা করি। অস্বীকার করো না,—ওরূপ ভাববার কারণও ঘটেছে তোমার, জানি। যেমন ধরো মিলারের সঙ্গে আমি অনেক সময় গল্প করি, তার তামাসার কথা শুনে হাসি। কিন্তু ঐ সুন্দর চক্‌চকে চেহারার ছেলেটিকে আমি কত ঘৃণা করি তা তুমি জান না। তারপর ধরো—ঐ দুটি ছাত্র। সুদর্শন কোন পুরুষকেই আমার ভাল লাগে না,—তার কারণ আর কিছু না হক, তাদের রূপের গর্ব। শুনতে হয়ত একটু কেমন লাগতে পারে—কিন্তু বিশ্বাস কর আমার কথা,—সাদামাঠা চেহারার পুরুষদেরই আমার বেশি পছন্দ।

শেষের কথাটি নিনা অতি মোলায়েম করে মিষ্টি সুরে বললেও, শোনবার সঙ্গে সঙ্গে ববরভের বুক থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। হায়, মেয়েদের কাছ থেকে এই নিষ্ঠুর সান্ত্বনার কথা তাকে আরও অনেকবার শুনতে হয়েছেঃ রূপহীন অনুরাগী পুরুষকে এ কথা শুনাতে তারা কখনও কার্পণ্য করে না।

ববরভ একটু ব্যঙ্গের সুরেই নিনাকে প্রশ্ন করলে, তা হ'লে তোমার কাছে কোনদিন বিশেষ আবেদন করবার আশা রাখতে পারি?—কথাটা শুনালে কিন্তু স্পষ্ট তিক্ত আত্ম-বিদ্রূপ।

নিনা তখনই তার ভুলটা শুধরে নিতে বললে,—বাপরে, কি লোক তুমি, তোমার সঙ্গে কথা বলা দায়, ছি, ছি, নিজের প্রশংসা শুনবার জন্য এত কাঙ্গালিপনা কেন তোমার।

কথার ভোল পাল্টাতে গিয়ে কেমন একটু বিব্রত বোধ করলে সে, তাই তখনই প্রসঙ্গটা পালটাতে সে একরকম আবদারের সুরে হুকুম করে বসলে,—সে সময় বলতে গিয়ে যে কথা বললে না,—তা শুনতে চাই আমি,—এক্ষুনি বলতে হবে তোমায়।

ববরভের সমস্ত উদ্দীপনা ততক্ষণ স্তিমিত হয়ে পড়েছে,—আমতা আমতা করে সে উত্তর দিলে, কই, কিছু মনে পড়ছে না আমার।

আচ্ছা, আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমায়। প্রথমে গত রাত্রের কথা দিয়ে তুমি সুরু করলে। দিব্য আশ্চর্য মুহূর্তের কথা কিছুটা বলে তুমি বললে বহুদিন আগে থেকেই আমি লক্ষ্য করে থাকব,—কিন্তু কি লক্ষ্য করে থাকব আমি? কথাটা ত শেষ কর নি। যা বলতে চাইছিলে তুমি তা খুলে বল,—বলতে হবে,—এখনই,—বুঝলে?

নিনা তাকিয়ে রইল ববরভের মুখের দিকে। কেমন এক অদ্ভুত দুষ্টু হাসিতে ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—ওর মাঝেই রয়েছে বুঝি ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতি,—রয়েছে কিছু কোমলতা। ববরভের জীবনের আর একটা মুহূর্ত মধুর হয়ে উঠল,—দমটা যেন তার আটকে এল, তার হারিয়ে যাওয়া সাহসটা আবার যেন সে ফিরে পেল। দুই হাতে নিজের বুকটা আঁকড়ে ধরে সে ভাবতে লাগল,—তা হলে ও জানে,—এখন আমার নিজের মুখে শুনতে চাইছে।

চলতে চলতে ওরা প্লাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল। আর কোন জনাপ্রণী নেই সেখানে। দুজনেই উত্তেজিত। নিনা ববরভের মুখে তার কথার উত্তর শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে,—যে খেলা সুরু করেছে সে তার তীব্র নেশা যেন তাকে মাতাল করে তুলেছে,—আর ববরভ নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য কথা খুঁজে পাচ্ছে না,— ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার বুক থেকে। এই সময় ট্রেনের একটা জোর শিটি শোনা গেল,—এবং তার পরই তুমুল সোরগোল পড়ে গেল স্টেশনে।

নিনা ববরভের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে,—কই, আমার কথার উত্তর দিলে না তুমি?—ব্যাপারটা আমার কাছে বড় জরুরী,—তুমি যতটা মনে কর,—তার চেয়ে অনেক বেশি, বুঝলে?

একটা বাঁকের আড়াল থেকে কালো ধোঁয়ায় ঘেরা একখানা এক্‌স্‌প্রেস ট্রেন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল। কয়েক মিনিট লৌহবর্ত্মের উপর খটাখট শব্দ তুলবার পর ধীরে ধীরে এর গতি মন্থর হয়ে এল,—শেষে এ প্লাটফর্মে এসে থামল। গাড়িটার সর্বশেষপ্রান্তে বিশিষ্ট যাত্রীর জন্য যুক্ত একটি দীর্ঘ বিশিষ্ট কামরা। কামরাটায় সবে নীল রঙ করা হয়েছে। জনতা ছুটল এই কামরাটার দিকে।

ট্রেনের কনডাক্‌টরেরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কামরার দরজা খুলতে ছুটল,—একটা ভাঁজ-করা মই তখনই খুলে খাটিয়ে দেওয়া হল। দৌড় আর উত্তেজনায় মুখ রাঙা করে স্টেশন মাস্টার তাঁর লোকজনকে কামরাটা গাড়ি থেকে খুলে ফেলতে বললেন,—মুখে তার ভীত চকিত দৃষ্টি।

খার্শানিন রেলওয়ের একজন বড় শেয়ার হোল্ডার এবং এর যে কোন লাইনে ভ্রমণ করবার সময় রেলের যে কোন বড় কর্মচারীর চেয়ে এঁকে বেশি জাঁকের সঙ্গে চলবার সুযোগ দেওয়া হয়।

বিশিষ্ট কামরাটায় মাত্র চারজন লোক প্রবেশ করলেন। শেলকোভনিকভ, আন্দ্রিয়াস্‌ এবং আর দুইজন বড় বেলজিয়ান ইনজিনীয়ার। বিপুলায়তন দুটি পা ফাঁক করে খার্শানিন একটা ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন,—তার বিরাট ভুঁড়িটা সামনে এগিয়ে এসেছে। গোল ফেল্ট হ্যাটের নিচে তার মাথার লালচে চুলগুলি চক চক করছে, দাড়িটা থিয়েটারের এ্যাক্‌টারদের মত কামানো,—গালের মাংস ঢিলে থলথলে,—থুঁতনিটায় তিনটে ভাঁজ,—বড় বড় দাগে ভরতি মুখখানা যেন বিরক্তিতে ভরা, তন্দ্রায় কাতর, ঘৃণায় ঠোঁট দুটি তীব্র কুটিল বক্র হয়ে উঠেছে।

ইনজিনীয়ারদের সম্ভাষণ জানাতে অতি কষ্টে তিনি একটু উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একে একে সসম্মানে তাদের সম্ভাষণ করবার সুযোগ দিতে তার বিপুল মেদবহুল হস্ত প্রসারিত করে গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠে বললেন,—সুপ্রভাত,—মিলের কাজকর্ম চলছে কেমন?

শেলকোভনিকোভ জটিল ভাষায় আফিসের সব খবর দিতে সুরু করলেন। তিনি বললেন,—কারখানার কাজকর্ম সব ঠিক মতই চলেছে। ধাতুগলানো চুল্লীতে প্রথম বায়ু-প্রবাহন এবং নতুন ঘরবাড়ির ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে সবাই ভাসিলি তেরেন্তিভিচের আগমন প্রতীক্ষায় আছেন। সুবিধা মত বেতনের হারে মজুর মিস্ত্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিদিন রাশি রাশি অর্ডার আসছে দেখে কার্যনির্বাহক সমিতি নতুন বাড়ি তৈরির কাজ তাড়াতাড়ি সুরু করতে বাধ্য হচ্ছে।

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে, তাঁর কামরার চারিদিকে যারা সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাদের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে শুনতে লাগলেন সব কিছু। তাঁর মুখে রয়েছে শুধু বিরক্তি আর ক্লান্তির ছায়া। হঠাৎ তিনি ম্যানেজারকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, দেখুন,—ও মেয়েটা কে বলুন ত?

শেলকোভনিকোভ জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

খার্শানিন অধীর আগ্রহে বলে উঠলেন,—ঐ যে মাথার টুপিতে যার হলদে পালক!

ওঃ,—ঐ মেয়েটা?—ম্যানেজার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে খার্শানিনের কানে কানে অপরের দুর্বোধ্য ফরাসী ভাষায় বললেন,—ও হচ্ছে আমাদের গুদাম ঘরের ম্যানেজারের মেয়ে। ম্যানেজারের নাম হচ্ছে জিনেঙ্কো।

খাশনিন গম্ভীরভাবে তার ভারী মাথাটা একবার দুলালেন। শেলকোভ-নিকোভ আবার তাঁর রিপোর্ট বলা সুরু করলেন,—কিন্তু তাঁর উপরওয়ালা জানালার বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আবার তাকে বাধা দিয়ে চিন্তান্বিতের ন্যায় বলে উঠলেন,—জিনেঙ্কো,—কোন জিনেঙ্কো বলুন ত,—নামটা কোথায় যেন আমি শুনেছি মনে হচ্ছে।

শেলকোভনিকোভ যথেষ্ট বিনয় দেখিয়ে ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন,—আমাদের গুদাম ঘরের ভার ওর উপর।

খাশনিন বললেন,—হাঁ, হাঁ—মনে পড়েছে,—পিটার্সবার্গে ওঁরা—ওঁর কথা বলছিলেন বটে!—আচ্ছা, আপনি যা বলছিলেন, বলে যান।

নিনা মেয়েদের অভ্রান্ত সহজাত বুদ্ধি বলেই বুঝতে পেরেছিল খাশনিন তখন তার দিকে চেয়ে তার কথাই জিজ্ঞাসা করছিলেন। ওখান থেকে সরে গেল সে,—কিন্তু খাশনিন তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছেনঃ পুরুষের চিত্তজয়ের আনন্দে নিনার মুখখানা তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে,—মুখের তিলগুলি দেখাচ্ছে অপরূপ।

রিপোর্ট বলা শেষ হয়ে গেলে—খাশনিন উঠে তাঁর কাঁচঘরে গেলেন,—এই কক্ষটি তাঁর বিশিষ্ট কামরার শেষের দিকে,—বেশ প্রশস্ত।

ববরভের মনে হচ্ছিল—এই মুহূর্তটা একটা ভাল ক্যামেরায় ছবি তুলে শাশ্বত করে রাখবার মত। বিশেষ কি এক কারণ বশতঃ খাশনিন কিছুক্ষণ কাঁচের দেওয়ালের ওপাশেই রইলেন,—বিশিষ্ট কামরার দরজার ওখানে যে সব লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল ওঁর বিরাট বিপুল দেহ,—পা দুটো একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি,—চোখ মুখ ক্রোধোদ্ধত, সব কিছু মিলিয়ে যেন জবরজং করে তৈরি এক জাপানী পুতুল। এই মহাপুরুষের অনড়-অবস্থা দেখে যারা সব ওঁকে দেখতে এসেছিল তারা ভড়কে গেছে। দাসমনো-ভাব নিয়ে বললেও ভুল হবে—এক রকম ভয়ে ভয়েই খাশনিনের মুখের দিকে চাইতে গিয়ে ওদের ঠোঁটের উপরে কৃত্রিম হাসির রেখাগুলি যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। যে সব কনডাক্টরেরা ছুটে এসেছিল দরজার দু'পাশে তারা সৈনিকদের মত নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ নিনার দিকে নজর পড়তে ববরভ একটা গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলে তার মুখেও ফুটে উঠেছে অন্য দশজনার মত কষ্ট হাসির রেখা,—আর ভীমকান্তি দেবতামূর্তির দিকে চেয়ে থাকবার সময় বর্বর-দেব মুখে যে ভয়ের ভাব দেখা যায় সেই রকম ভয়ের চিহ্ন।

ববরভ ভাবতে লাগল,—এ কি শুধু বার্ষিক তিন লক্ষ রুবল আয়ের কথা শুনে পরম বিস্ময় আর নিঃস্বার্থ ভক্তি!—তাই যদি হয় তা হলে এতগুলি লোক—যে লোক তাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না—তার সামনে কুকুরের মত নত হয়ে এমন লেজ নাড়ছে কেন? কে জানে—হয়ত মনোবিজ্ঞানের কোন দুর্জ্ঞেয় অবোধ্য দাস্যভাবই এদের মনে ক্রিয়া করছে এখন?

কিছুক্ষণ উপরে দাঁড়িয়ে থেকে খার্শনিন এবার নিচে নামবার জন্য সিঁড়িতে পা দিলেন,—তাঁর ভুঁড়িটা আগে আগে আসতে লাগল,—ট্রেণের ক্রু-দের কাঁধে ভর দিয়ে নামতে লাগলেন তিনি।

সমবেত জনগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তাঁর যাবার পথ করে দিল,—তাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে তার মোটা নিচের ঠোঁটটা বাড়িয়ে অবজ্ঞাভরে মাথাটা একটু নাড়লেন তিনি, তার পর নাকী সুরে বললেন,—আপনাদের এখন কাল পর্যন্ত ছুটি।

স্টেশন থেকে বেরুবার আগেই তিনি হাত ইশারায় ম্যানেজারকে ডেকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন সার্জি ভালেরিয়ানোভিচ্,—আপনি ওঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

শেলকোভনিকোভ গদগদ স্বরে বললে,—কার কথা বলছেন,—জিনেঙ্কো ?

হঠাৎ রেগে গর্জে উঠলেন খার্শনিন,—ধুত্তেরি..., সে ছাড়া আবার কে ?

ম্যানেজার তখনই ছুটে যাচ্ছিলেন,—খার্শনিন তার আস্তিন ধরে টেনে বললেন, —না,—এখানে নয়,—মিলে।

৭

কারখানার নতুন বাড়ির ভিত্তিস্থাপন এবং নতুন ধাতুগলানো চুল্লীতে প্রথম ফুৎকার খার্শনিনের আসার চারদিন পর হবার কথা। দুটি অনুষ্ঠানই রীতিমত জাঁকজমক করে করা হবে ঠিক হল, কাছাকাছি ক্রুটোগোরি, ভোরোনিনো লোভে প্রভৃতি যে সব শহরে লোহা এবং ইস্পাতের কারখানা আছে—সেখানে সেখানে ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হ'ল।

খার্শনিনের পর ডিরেকটর-বোর্ডের দু'জন মেম্বার, চারজন বেলজিয়ান ইনজিনীয়ার এবং কয়েকজন বড় শেয়ার হোলডার এলেন পিটার্সবার্গ থেকে। কারখানার উঁচুদরের কর্মচারী মহলে গুজব যে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে ভোজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বোর্ড তাতে নাকি দু'হাজার রুবল খরচ করবে সাব্যস্ত করেছে,—কিন্তু এ পর্যন্ত তার কোন নমুনা দেখা যাচ্ছে না,—খাদ্য পানীয় ইত্যাদি কিনবার ব্যয়ভার কনট্রাকটরেরাই বহন করছে।

ভাগ্যক্রমে অনুষ্ঠানের দিনটা বড় ভাল পাওয়া গেল, বড় সুন্দর আবহাওয়া, —শরতের প্রথম দিকে মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন এক একটা দিন পাওয়া যায়,— আকাশের বর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন গাঢ় গভীর নীল,—আর সেদিনকার ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাসটা যেন ক্লান্তিহর কোন দামী কড়া মদ।

নতুন ফুৎকার-যন্ত্র এবং অংগার মুক্তকরণ যন্ত্র স্থাপনের জন্য যে সব চৌকোনা গর্ত খোঁড়া হচ্ছে তার চারিধারে অশ্বক্ষুরের আকারে শ্রমিকেরা সব খুব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এই জীবন্ত দেয়ালের মাঝখানে গর্তের ধারে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা সাদামাঠা কোরা টেবিল। তার উপরে রয়েছে একখানা বাইবেল,—একটা ক্রুশ, পূতবারি রাখবার একটা বাটি,—এবং ঐ জল ছিটানোর একটা যন্ত্র। ওর একটু দূরে রয়েছেন পুরোহিত,—গায়ে তাঁর সোনার ক্রুশ আঁকা সবুজ চাদর। পুরোহিতের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পনেরজন শ্রমিক—ওরা সব ইচ্ছা করেই স্তব গাইবার ভার নিয়েছে। অশ্বক্ষুরের খোলা দিকটায় রয়েছেন নানা শ্রেণীর প্রায় শ-আড়াই লোক,—এর মাঝে ইনজিনীয়ার আছেন,—কনট্রাকটর আছেন, সিনিয়র ফোরম্যান আছেন, আছেন কেরানী। পাশের উঁচু জায়গাটায় মাথায় কালো কাপড় টেনে ক্যামেরা হাতে এক ফটোগ্রাফার,—বড় ব্যস্ত তিনি।

মিনিট দশেক পর চমৎকার ধূসর অশ্ব বাহিত এক 'ট্রইকা'য় চড়ে খাশনিন ওখানে এসে হাজির হলেন। গাড়িতে তিনি একাই ছিলেন,—কারণ তাতে ঠেসে ঠুসেও অন্য কারো বসবার স্থান ছিল না। তাঁর আসবার পর আরও পাঁচ ছয়খানা গাড়ি এল। খাশনিনকে দেখেই শ্রমিকেরা বুঝতে পেরেছিল এই তাদের উপরওয়ালা, তাই সবাই একসঙ্গে টুপি খুলে তাঁকে অভিবাদন করলে। খাশনিন সদর্প পদক্ষেপে তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাথা দুলিয়ে পুরোহিতকে নমস্কার জানালেন।

চারিদিকের গভীর নিস্তব্ধতা ভংগ করে পুরোহিত তাঁর স্বভাব সিদ্ধ কর্কশ নাকী সুরে অতি ধীরে ধীরে বলে উঠলেন,—জয়তু, চিরং জয়তু প্রভু।

স্তবকারী 'কয়ার' অমনি তখনই একসঙ্গে বলে উঠল, আমেন!

প্রায় তিন হাজারের মত যে শ্রমিকের দল ছিল ওখানে তারা খাশনিনকে অভিবাদন জানাবার সময় যেমন একসঙ্গে টুপি খুলেছিল ঠিক তেমনি একসঙ্গে ক্রুশের মত করে দুই হাত আড়াআড়ি রাখল নিজেদের বুকের উপর,—মাথা নত করল, আবার তুলল,—মাথার ঝাঁকিতে চুলগুলিও তাদের একসঙ্গে পিছনে পড়ল। ববরভ এদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল, চোখের পাতা পড়ছিল না তার। এদের সামনের দুই সারিতে ছিল সব ধীর শান্ত পাথর-মিস্ত্রীর দল, সবাই এরা সাদা—'এপ্রন' পরা, মাথার চুল সবারই এদের পাতলা, দাড়ি লাল। এদের পিছনে দাঁড়িয়েছে যারা ধাতুগলাই আর হাপরে কাজ করে, ফরাসী আর ব্রিটিশ শ্রমিকের অনুকরণে এরা সবাই চওড়া কালো ব্লাউজ পরেছে, লোহার গুড়ো মুখে লেগে থাকায় এদের মুখগুলি দেখাচ্ছে কেমন ভয়ংকর, এ গুড়ো মুখ থেকে পুরোপুরি কিছুতেই তোলা যায় না। এদেরই মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে কতকগুলি বিদেশী বক্রনাসা ওভারসিয়ারের মুখ। গলাই শ্রমিক আর হাপর মিস্ত্রীদের থেকে অনেক দূরে পিছনে দাঁড়িয়ে যে সব শ্রমিক—তারা সব চুনের ভাঁটিতে

কাজ করে। এদের মুখ দেখলেই অবশ্য তা বুঝা যায়, কারণ এদের মুখে লেগে রয়েছে ঘন চুনের ধুলো,—চুনের ঝাঁজে এদের চোখগুলি যেমনি ফুলো তেমনি লাল।

'কয়ার'—যখনই একসঙ্গে জোরগলায় গেয়ে উঠছে,—হে দেবি, তোমার সেবকদের বিপদ থেকে ত্রাণ কর, তখনই এই তিন হাজার লোক একই মৃদু শব্দ তুলে একসঙ্গে বুকের উপর দুই হাতে ক্রুশ আঁকছে, গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত করছে। ববরভের মনে হচ্ছিল এই বিরাট ধূসর জনতার সমবেত সাধারণ প্রার্থনার ভিতর আদিম মানব মনের কি এক শক্তি যেন কাজ করে,— ব্যাপারটা শিশুসুলভ হলেও অন্তরস্পর্শী। কাল ভোরেই আবার এরা এদের কঠিন বারো ঘণ্টার কাজ সুরু করবে,—কে জানে এদের কার ভাগ্যে জীবন-বলি নির্দিষ্ট হয়েই আছে!—হয়ত কোন পাহাড়ের মত উঁচু জায়গা থেকে পতন, না হয় গলিত ধাতুতে দগ্ধ, না হয় ভাঙ্গা ইট পাথরের স্তূপে সমাধি। 'কয়ার' যখন দেবী মেরীর কাছে তাঁর সেবকদের বিপদের হাত থেকে মুক্তির প্রার্থনা গাইছে—তখন এরা নত মস্তকে মাথার চুল নাড়তে নাড়তে ভাগ্যের এই অমোঘ বিধানের কথা ভাবছে কি না—কে জানে? আর এই শিশুর মত সরল নির্ভীক হৃদয় বীরেরা—প্রতিদিন যারা স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা মাটির ঘর থেকে এসে ধৈর্য ও সাহসের পরীক্ষা দেয়—তারা এক কুমারী মেরী ছাড়া আর কারই বা শরণ নিতে চাইবে?

ঠিক এই অথবা এ ধরনেরই সব চিন্তা আসছিল ববরভের মনে,—তার চিন্তার ধরনই হচ্ছে বড় বড় কবি দার্শনিকের মত। এবং তা ছাড়া সে যদিও অনেক দিন হল প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছে তবু দূর থেকে পুরোহিতের কর্কশ কণ্ঠের পর 'কয়ার'-এর সম্মিলিত কণ্ঠস্বর যখনই তার কানে আসছিল তখনই তার শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে কি এক দিব্য শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল। এই যে সব সরলপ্রাণ শ্রমিক—ঈশ্বর জানেন কোন দূর দূরান্তে এদের ঘর বাড়ি, সেখান থেকে এই কঠিন বিপজ্জনক কাজের জন্য এদের ছিনিয়ে আনা হয়েছে, এদের অকপট প্রার্থনার মাঝে কি যেন আছে হয়ত কোন শক্তি, আত্মসমর্পণ অথবা ত্যাগ।

উপাসনা শেষ হয়ে গেল। খার্শানিন হেলাফেলা করে একটা স্বর্ণমুদ্রা গর্তের মাঝে ফেলে দিলেন,—কিন্তু তাঁর হাতে যে ছোট্ট কোদালিটি দেওয়া হল তা আর তিনি মাটিতে লাগাতে পারলেন না,—তাঁর করণীয়টুকু শেলকোভনিকোভই করে দিলেন। তারপর তাঁরা সদলবলে চললেন ধাতুগলানো চুল্লীর দিকে। এর বাড়িগুলি সবই পাথরের ভিত্তির উপর তৈরি,—দেখায় যেন এক একটা কালো কালো দুর্গ।

নতুন তৈরি পঞ্চম চুল্লীটায়—ওদের বিভাগীয় ভাষায় বলতে—ফুঁ চলেছে পুরোদমে। মাটির প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি উপরে চুল্লির এক ছেঁদা দিয়ে টগবগে গলিত ধাতুমলপ্রবাহ তীরের মত ছুটে বেরিয়ে আসছে, আর তা থেকে গন্ধকের নীল শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তরল প্রবাহটা একটা নালা দিয়ে নিচে নেমে

চুল্লীর গায়ে লাগানো বড় বড় হাতার মাঝে এসে পড়ছে, এবং ওখানেই জমে শক্ত হয়ে খণ্ড খণ্ড ঘন সবুজ রঙের যবের চিনির মত দেখাচ্ছে। শ্রমিকেরা চুল্লীর উপর থেকে এতে ক্রমাগত খাদ-মিশানো ধাতু আর কয়লা ঢালছে। ওগুলি আবার ট্রলি দিয়ে মিনিটে মিনিটে উপরে তোলা হচ্ছে।

পুরোহিত চুল্লীটার চারিদিকে পবিত্র জল ছিটিয়ে ভীতত্রস্ত পদে ওখান থেকে সরে গেলেন, চলনভঙ্গী তাঁর ঠিক বুড়ো মানুষের মত। যে পেশল-দেহ ময়লা-মুখ বুড়োটা চুল্লীর পরিচালনা ভার নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে তার হাত দুটো বুকের উপর আড়াআড়ি রেখে নিজের হাতের তালুতে খানিকটা থুথু ফেললে। তার চারজন সহকারীও তাকে দেখে ঠিক তাই করলে। তারপর তারা ইস্পাতের লম্বা একটা বক্রপ্রান্ত দণ্ড নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আগু-পিছু দুলিয়ে ঝপ করে ফেলে দিলে চুল্লীর একেবারে নিচে,—সেখানকার চিনেমাটির ছিপিতে লেগে সেটা ঝনঝন করে উঠল। যারা তাকিয়ে ছিল এদিকে তারা কি হবে কি জানি ভেবে ভয়ে আঁৎকে উঠল, কেউ কেউ আবার দু'চার পা পেছিয়ে গেল। ফোরম্যান পাঁচজন দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বার ঘা লাগানোর পর হঠাৎ আঘাত-লাগানো জায়গা থেকে চোখ-ঝলসানো সাদা রঙের গলিত ধাতু-প্রবাহ ছিটকে বেরুতে লাগল। ফোরম্যান বক্রশীর্ষ লৌহদণ্ড ঘুরিয়ে ছেঁদাটা একটু বড় করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বালু-প্রণালী-পথে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে লাগল ঢালা-লোহার স্রোত,—রঙ তার যেন আগুনে গৈরিক। চড় চড় শব্দে ছেঁদা থেকে ছিটকে বেরুতে লাগল বড় বড় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত সব আগুনের ফুলকি,—এসে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল তারা। আপাত দৃষ্টিতে তপ্ত ধাতু-প্রবাহ অতি ধীরে ধীরে বইতে থাকলেও তা থেকে এত তাপ বেরুচ্ছিল যে অনভ্যস্ত দর্শকের দল হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেবলই পিছু হটতে লাগলেন।

ধাতুগলানো চুল্লী থেকে ইনজিনীয়ারেরা এবার ফুৎকার বিভাগে যাবার উদ্যোগ করলেন। শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে যাঁরা দর্শক হয়ে আসবেন তাঁরা যাতে কর্ম-তৎপর কারখানার সম্পূর্ণ রূপটা দেখতে পান খার্শনিন আগে থেকেই তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এমন নিখুঁত গণনা করে রেখেছিলেন যে ভদ্রলোকেরা কারখানায় এই সব নতুন কাজকর্ম পরিকল্পনা দেখে শুনে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়বেন, এবং যে সাধারণ সভা থেকে তাঁদের এখানে পাঠানো হয়েছে সেখানে গিয়ে খুব ভাল রিপোর্ট দেবেন। ব্যবসায়ী লোকের মন খার্শনিনের বেশ ভাল ভাবেই জানা, সুতরাং—তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সাধারণ সভা এতদিন নতুন করে আর 'স্টক' ছাড়তে না দিলেও—এর পর তা তিনি ছাড়তে পারবেন, এবং তাতে ব্যক্তিগত-ভাবে লাভ হবে তাঁর বিস্তর।

আর শেয়ার হোল্ডারেরা এ সব দেখে শুনে এত বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে তাঁদের মাথা ঝিম ঝিম করছে, হাঁটু কাঁপছে। ফুৎকার আগারে এসে উত্তেজনায় তাঁরা বিবর্ণ হয়ে গেলেনঃ পনের ফুট উঁচু লম্বমান চারটে পিস্টনের সাহায্যে

নলের ভিতর যখন বাতাস পুরে দেওয়া হল তখন তার ভিতর দিয়ে তা ভীম-গর্জনে এত বেগে বইতে লাগল যে বাড়ির দেয়ালগুলি থর থর করে কাঁপতে লাগল। এই লোহার পাইপগুলির বেড় হচ্ছে দশ ফুটের মত, বাতাস এর ভিতর দিয়ে উত্তাপ দানকারী কক্ষে এসে পড়ছে, জ্বলন্ত গ্যাস আবার সেখানে তাকে হাজার ডিগ্রি উত্তাপ দান করছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে সে ধাতু-গলানো চুল্লীতে, তার ভয়ঙ্কর তাপে গলছে সেখানে খানিক বিমিশ্র ধাতু আর কয়লা। এই ফুৎকার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইনজিনীয়ার দর্শকদের সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একের পর এক শেয়ার হোল্ডারের কানে মুখ রেখে প্রাণপণ চীৎকার করে তিনি যা কিছু বলছিলেন যন্ত্রের ভীমনাদে তা সবই ডুবে যাচ্ছিল, দর্শকদের মনে হচ্ছিল তিনি শুধু নিজেকে পীড়িত করে নীরবে ওষ্ঠ সঞ্চালন করে যাচ্ছেন।

এর পর শেলকোভনিকভ দর্শকদের ধাতু মন্থন চুল্লীতে নিয়ে এলেন। এই মন্থনের কাজ যে বাড়িটায় হচ্ছে সেটা এত লম্বা যে তার সুদূর প্রান্তভাগ দেখায় যেন একটা ক্ষুদ্র বিবর। এই বাড়িটার একটা দেয়ালের গায়ে লাগানো রয়েছে একটা পাথরের পাটাতন তার উপর রয়েছে আটটা ধাতু-মন্থন চুল্লী,—দেখতে সেগুলি চক্রহীন রেলওয়ে ওয়াগনের মত। এই চুল্লীগুলিতে গলিত লোহার সংগে বিমিশ্র ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয়, গলিত ইস্পাতের স্রোত পাইপের ভিতর দিয়ে উঁচু উঁচু ছাঁচে গিয়ে পড়ে। ছাঁচগুলির আবার তলা নেই, উপরে আছে হ্যান্ডেল। এই ছাঁচের ভিতর দিয়ে গলিত ইস্পাত গিয়ে জমে,—ওজন হয় তাদের প্রায় পোনে এক টনের মত। বাড়িটার অপর দিকেতে প্লাটফর্মে বসানো আছে কতকগুলি রেল, সেই রেলের উপর দিয়ে হিস্‌হিস, ফোঁস ফোঁস—ঝন ঝন শব্দে চলেছে বাষ্পীয় ক্রেন, শুঁড় উঠিয়ে নামিয়ে অনুগত কর্মনিপুণ জন্তুর মত তারা কাজ করে চলেছে। এক একটা ক্রেন এক একটা ছাঁচের হ্যান্ডেল ধরে উপরে তুলছে অমনি তার মাঝ থেকে চোখ-ঝলসানো লাল ইস্পাত-পিন্ড বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সে-পিন্ডটা মাটিতে পড়বার আগেই একজন শ্রমিক অদ্ভুত ক্ষিপ্র তৎপরতায় হাতের কবজীর মত মোটা চেন ছুঁড়ে সেটাকে জড়িয়ে ফেলছে। তখনই আবার আর একটা ক্রেন এসে ঐ চেনটাকে আঁকড়ে ধরে লৌহপিন্ডটা অন্য ক্রেনে যুক্ত প্লাট-ফর্মের উপর অন্য পিন্ডের পাশে সাজিয়ে দিচ্ছে। তৃতীয় ক্রেনটা আবার ঐ সমস্ত নিয়ে বাড়ির শেষ প্রান্তে নিয়ে জড় করছে। হুকের বদলে চিমটার মত যন্ত্রে সজ্জিত চতুর্থ একটা ক্রেন আবার ঐ পিন্ডগুলি ট্রাক থেকে তুলে মেঝের নিচে তৈরি গ্যাস-চুল্লীতে চালান করে দিচ্ছে। সর্বশেষে পঞ্চম ক্রেনটি আবার উত্তাপে সাদা দগদগে লৌহ পিন্ডগুলিকে চুল্লী থেকে তুলে একে একে এক লৌহদন্ডের চারিদিকে তীব্রবেগে ঘূর্ণায়মান তীক্ষ্নদন্ত চক্রাকার করাতের নিচে দিচ্ছে, এবং পাঁচ সেকেন্ডের মাঝে সেই প্রকান্ড ইস্পাতখন্ড দুই ভাগে এত সহজে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে যে দেখে মনে হয় কেউ যেন মাখন কাটছে। কর্তিত ইস্পাত পিন্ড দুটি তখন আসছে আবার পঁচিশ হাজার পাউন্ড ভারী এক বাষ্প হাতুড়ীর চাপ

খেতে, সেখানে এত সহজে ওগুলি পাতলা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে, যে মনে হয় ওগুলি ইস্পাত নয়, মোম। শ্রমিকেরা তখনই ঐগুলি খপ করে একটা ট্রলীতে পুরে সেটা অতি দ্রুত বেগে ঠেলে দিচ্ছে। লাল দগদগে লোহা থেকে এমন একটা উত্তাপের ঝলক আসছে যে ও পথে লোকের চলাফেরা দায়।

শেলকোভনিকভ তাঁর দর্শকদের এবার রেল তৈরির কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। মেঝের নিচে রোলার ঘুরছে,—তাদের উপরের দিকটা শুধু দেখা যাচ্ছে, এই রোলারগুলির উপর পর পর সাজানো কতকগুলি মেশিনের মাঝ দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে দগদগে লাল একটি ধাতু-পিণ্ড। পরস্পর বিপরীত মুখে ঘুরছে দুটি ইস্পাতের চোঙ, তাদের মাঝে পড়ে পিষ্ট হয়ে তাদেরই করে ফেলছে বিচ্ছিন্ন, এদের টানাটানিতে নিচের রোলারগুলি কাঁপছে। দূরে আর একটা মেশিন রয়েছে, তাদের চোঙের মাঝে জায়গা বড় কম। লোহ দণ্ডটা এক একটা মেশিনের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে আর সরু আর লম্বা হচ্ছে। রেল মিলের এখানে কয়েকবার উপর নিচে করবার পর শেষে ঐ লৌহপিণ্ড সত্তর ফুট লম্বা এক দগ-দগে লাল রেলে পরিণত হচ্ছে। পনেরটা মেশিনের জটিল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করছে শুধু একটিমাত্র লোক, লোকটি দাঁড়িয়ে আছে স্টীম এঞ্জিনের উপর জাহাজের সেতুর মত একটা প্লাটফর্মে। এখান থেকে একটা হ্যান্ডেল ঘুরাবে অমনি চোঙ আর রোলারগুলি একদিকে ঘুরতে সুরু করবে, হ্যান্ডেলটা পিছন দিকে ঠেলে দিলে আবার ওরা অন্য দিকে ঘুরতে সুরু করবে। রেল যতটা লম্বা করা প্রয়োজন ততটা লম্বা হয়ে গেলে একটা গোলাকার করাত কর্ণবধিরকারী শব্দে ওকে ত্রিখণ্ডিত করে ফেলবে, ঐ সময় অসংখ্য সোনালি ফুলকি উপরে ছিটকাতে থাকবে।

এইবার দর্শকের দল চললেন কুন্দনাগারের দিকে, এইখানে অধিকাংশ ওয়াগন আর রেলগাড়ির চাকাগুলি ফিনিশ করা হয়। ছাদের যতটা দৈর্ঘ্য—ওর নিচে ততটা লম্বা একটা মোটা মজবুত ইস্পাতের রডে আটকানো চামড়ার গতি সঞ্চালক বেল্ট নানা আকার প্রকারের দুই তিন শ মেশিনকে চালিত করছে। চারিদিকে এত বেল্ট আড়াআড়ি চলে গিয়েছে যে সবগুলি মিলিয়ে দেখলে মনে হয় অসংখ্য গিঁট দেওয়া একটা জাল যেন থর থর করে কাঁপছে। কোন কোন মেশিনের চাকা-গুলি সেকেন্ডে কুড়িবার করে ঘুরছে, আবার এমন মেশিনও আছে যার চাকা এত ধীরে ধীরে ঘুরছে যে দেখলে বোঝাই যায় না ওরা চলছে। ইস্পাত লোহা আর পিতলের আঁচড়ানো বর্জিত অংশ ঘরের মেঝের পাক-খাওয়া লম্বা দড়ির মত পড়ে রয়েছে। তুরপুণের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ঘরে কান পাতা যায় না। দর্শকদের একটা নাট তৈরির মেশিনও দেখানো হল। ইস্পাতের মস্ত বড় একটা হাঁ যেন দৃঢ় দ্রংষ্ট্র-ক্ষেপে চিবিয়ে খাচ্ছে। দুইজন শ্রমিক দগদগে লাল দীর্ঘ লৌহদণ্ড এর মুখের ভিতরে দিচ্ছে—আর এই যন্ত্রমুখ থেকে টুকরো টুকরো লোহা নাটের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

শেলকোভনিকোভ দর্শকদের কাছে বিশেষ করে শেয়ার হোল্ডারদের কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কুন্দনাগার ছেড়ে আসবার পর তিনি সবাইকে ন-শো-অশ্বশক্তি সম্পন্ন কমপাউন্ডটা একবার দেখবার আমন্ত্রণ জানালেন, এটা মিলের একটা গৌরবস্থল। পিটার্সবার্গ থেকে যাঁরা এসেছেন—তাঁরা এ পর্যন্ত যা যা দেখেছেন তাতেই যথেষ্ট অভিভূত আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, নতুন কিছু দেখা তাদের মনে তুষ্টির পরিবর্তে ক্লান্তিই আনবে বেশি। রেল-মিলের তাপে তাদের মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, কাপড় জামা হাত সব কালিঝুলে নোংরা, সুতরাং ম্যানেজারের আমন্ত্রণটা তাঁদের নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হল, গ্রহণ করলেন কারণ না করলে যাঁরা তাঁদের এখানে পাঠিয়েছেন তাঁদের অমর্যাদা করা হয়।

ম্যানেজার যে কমপাউন্ডের কথা বললেন, সেটা আর একটা আলাদা বিল্ডিং-এ। বাড়িটা বড় সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বড় বড় ঝকঝকে জানলা, মেঝেটাও নক্সা করা। মস্ত বড় মেশিন চলেছে এখানে কিন্তু তাতে একটুখানি শব্দ নেই। কাঠের খাঁজে ভরা চোঙের মাঝে ত্রিশ ফুটের মত লম্বা দুটো পিস্টন দ্রুতবেগে উঠানামা করছে, একটুও শব্দ হচ্ছে না তাতে। কুড়ি ফুট বেড়ের একটা চাকা এক ডজন দড়ি মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে দ্রুত গতিতে ঘুরে চলেছে। এর গতিবেগ যন্ত্রকক্ষ থেকে আগত শুষ্ক তপ্ত বায়ুপ্রবাহকে যেন ছন্দদান করছে। ফুৎকার যন্ত্র, রোলমিল এবং কুন্দনাগারের যাবতীয় যন্ত্রের শক্তির উৎস হচ্ছে—এখানকার এই মেশিন।

কমপাউন্ডটা দেখা শেষ হলে শেয়ার হোল্ডারেরা ভাবলেন এইবার তাঁদের কাজ শেষ হল, কিন্তু শেলকোভনিকোভ তাঁদের মনস্তুষ্টির অভিলাষে আবার এক নতুন প্রস্তাব করে বসলেন। তিনি তাঁদের সম্বোধন করে বললেন, এবার আপনাদের আমি মিলের হৃদযন্ত্র,—এর প্রাণকেন্দ্রটা দেখাতে চাই।

তিনি তাঁদের এক রকম জোর করেই টেনে নিয়ে চললেন 'স্টীম বয়েলার হাউসে', কিন্তু এতক্ষণ তাঁরা যা দেখেছেন তার পরে মিলের হৃদযন্ত্র এই পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা দশ ফুট উঁচু বারোটা চোঙের মত বয়লার আর তাঁদের তেমন আকৃষ্ট করতে পারল না। তাঁদের আকর্ষণ তখন ডিনার টেবিলের দিকে, সুতরাং তাঁরা ব্যাখ্যাকারীর কাছে আর কোন প্রশ্ন করলেন না, তিনি যা বলে যেতে লাগলেন অন্যমনস্কভাবে মাথা দুলিয়ে তাতে শুধু সায় দিতে লাগলেন। শেলকোভ-নিকোভের বলা শেষ হলে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাঁর সঙ্গে পরমানন্দে করমর্দন করলেন।

সবাই ওখান থেকে সরে পড়লেন, বয়লারের কাছে দাঁড়িয়ে রইল শুধু ববরভ। আধো-অন্ধকার স্টোনপিটের মাঝে যেখানে সব চুল্লীগুলি জ্বলছে তার কিনারায় দাঁড়িয়ে যে ছয়জন শ্রমিক তাদের দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত করে কঠিন শ্রমে নিযুক্ত, তাদের দিকে বহুক্ষণ ধরে চেয়ে রইল সে। এদের কাজ হচ্ছে একটুও না

থেমে দিনরাত চুল্লীতে কয়লা দেওয়া। মাঝে মাঝে লোহার গোল দরজাগুলি ঝনাৎ করে খুলে যাচ্ছে আর ববরভ দেখছে চোখঝলসানো আগুনের শ্বেত শিখা গর্জে উঠে দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে শ্রমিকদের অগ্নিতাপে জীর্ণ কয়লার গুঁড়োয় মলিন চর্ম অর্ধনগ্ন দেহ নুয়ে নুয়ে পড়ছে, পিঠের পেশী আর শিরদাঁড়া বেরিয়ে পড়েছে। শীর্ণ শির বের করা হাতে মাঝে মাঝে এক এক বেলচা কয়লা তারা দ্রুতবেগে জ্বলন্ত গর্তে ঠেলে দিচ্ছে। দুইজন শ্রমিক উপরে দাঁড়িয়ে বয়লার কক্ষের চারিদিকে কয়লার যে বিরাট কালো স্তূপ আছে তা থেকে অবিরত বেলচা দিয়ে নতুন কয়লা নামিয়ে দিচ্ছে। দেখে দেখে ববরভের মনে হতে লাগল—এই অবিরত কয়লা ঠেলার কাজ এমনি অমানুষিক যে দেখলে মনটা দমে যায়। মনে হয় যেন কোন এক অতিপ্রাকৃত শক্তি চিরদিনের মত তাদের এই মুখব্যাদনকারী উদরের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে, এই ঔদরিক রাক্ষসের অদম্য ক্ষুধা মিটানোর জন্য অবিরাম খাদ্য জুগিয়ে যেতে হবে তাদের, নইলে ভয়ঙ্কর প্রাণদণ্ড।

ববরভের পিছন থেকে হঠাৎ কে প্রফুল্ল-কৌতুক-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল,—তোমার মোলককে খাইয়ে মোটা করছে ওরা তাই দেখছ?

ববরভ চমকে উঠে পিটের ভিতর পড়ে যাচ্ছিল আর কি! নিজের চিন্তার সঙ্গে ডাক্তারের এই রসিকতার অদ্ভুত মিল দেখে সে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলে নেওয়ার অনেক পর পর্যন্তও সে দুইজনের ভাবনার এই অদ্ভুত মিলের কথা ভেবে অবাক না হয়ে পারছিল না। সে নিজে যা পড়ছে বা ভাবছে অপর কেউ যদি হঠাৎ সেই কথার অবতারণা করে বসে তা হলে যেমন তার ভাল লাগে তেমনি এই রহস্যময় মিল দেখে সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

ডাক্তার তার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, বন্ধু? আমি মাপ চাইছি।

হাঁ, ভয় একটু পেয়েছিলাম বই কি, এত চুপে চুপে এসেছ তুমি, যে আচমকা ঐ রকম কথা শুনে আমি একেবারে আঁৎকে উঠেছি।

আন্দ্রি ইলিয়িচ,—বড় দুর্বল স্নায়ু তোমার—ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর তুমি। এ ভাল কথা নয়। আমার কথা শোন,—কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাও। এখানে বসে বসে মন খারাপ করছ কেন? ছ' মাস বেশ হেসে-খেলে সহজ জীবন যাপন করে এস,—ভাল ভাল মদ খাও, ঘোড়ায় চড়ো, একটু-আধটু প্রেম করবার চেষ্টা কর।

ডাক্তার হাঁটতে হাঁটতে চুল্লীগহ্বরের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে নিচের দিকে তাকালঃ বাপ রে, কি নারকীয় দৃশ্য! এই ক্ষুদে ক্ষুদে স্যামোভারগুলির এক একটার কত ওজন হবে, পনের টনের কাছাকাছি বোধ হয়,—না?

একটু বেশি, পঁচিশ টনের উপরে।

ধরো ওর একটা যদি ইয়ে—মানে দুম্-পটাশ হয় তা হলে বেশ মজা হয়,—না ?

তা হয় বই কি, ডাক্তার,—এই সব বাড়িগুলি হয় ত একসংগেই ভূমিসাৎ হয়।

গোল্ডবার্গ মাথা নেড়ে কি মনে করে শিস দিতে সুরু করলে, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—কি হলে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে ?

ঘটতে পারে অনেক কারণে, কিন্তু প্রায় কচিৎ এমন ঘটে ঃ বয়লারে—ধর জল খুব কমে গেছে, এক রকম নেই বললেই হয়,—ওর গা যেমনি গরম হতে হতে একেবারে লাল হয়ে উঠবে, এমনি সময় যদি ওতে জল ঢেলে দেওয়া হয়, তা হলে তক্ষুনি এত বেশি বাষ্প তৈরি হয়ে যাবে ওখানে যে বয়লারের গা তার চাপ বরদাস্ত করতে পারবে না,—বয়লার যাবে ফেটে।

তা হলে ইচ্ছা করলে এ করতে পার তুমি ?

যে কোন সময়ে। করে দেখতে চাও তুমি ? পরিমাপ যন্ত্রে যখন দেখতে পাবে জল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে,—তখন ঐ ছোট্ট গোল লিভারটা একটু ঘুরিয়ে দিও, বাস্ আর কিছু দেখতে হবে না।

ববরভ কথা বলছিল কৌতুক করে বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ছিল অদ্ভুত ব্যগ্রতা, চোখের দৃষ্টি কঠোর, বিষণ্ণ।

ডাক্তার নিজের মনে মনেই বললে,—চুলোয় যাক,......ববরভ লোকটি কিন্তু বড়ই ভাল একটু পাগলাটে,—এই যা !

পিটের কাছ থেকে দু' এক পা সরে এসে সে ববরভকে বললে, আন্দ্রি ইলিয়িচ্, তুমি ডিনারে যাও নি কেন ? গেলে দেখতে লেবরেটারিকে ওরা কেমন শীতের উদ্যানে পরিণত করেছিল,—আর কত প্রশস্ত সে উদ্যান ! দেখে তাক্ লেগে যেত তোমার।

গোল্লায় যাক সব,—ঐ সব ইনজিনীয়ারদের ডিনার আমি বরদাস্ত করতে পারি নে,—বলতে গিয়ে কেমন এক বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল ববরভের মুখে ঃ যত সব আত্মশ্লাঘা, চেঁচামেচি, পরস্পর তোষামোদ, আর মাতলামি,—টোস্ট করতে গিয়ে নিজের গায়ে, পাশের লোকের গায়ে মদ ঢেলে ফেলা। গা ঘিন ঘিন করে !

ডাক্তার হেসে উঠল ঃ ঠিক বলেছ ভাই, আমি শুধু আরম্ভটা দেখে এসেছি। খাশনিন চমৎকার বলছিল। ও আরম্ভ করলে,—ভদ্রমহোদয়গণ, ইনজিনীয়ারদের কাজ যেমনি উঁচুদরের তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। রেলওয়ে, ব্লাস্ট ফারনেস্, খনি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দেশের সুদূরতম অঞ্চলে শিক্ষার বীজ, সভ্যতার ফুল, —আরও কিসের ফল যে বহন করে নিয়ে যান—বলেছিল, তা ভুলে গেছি। এমন পাক্কা জোচ্চোর আর দেখি নি। এর পর সে বললে,—তাই বলছি, আসুন বন্ধুগণ, আমরা এক সঙ্গে মিলে আমাদের এই কল্যাণকর্মের পবিত্র পতাকা ঊর্ধ্বে উত্তোলন করি। শুনে সবার সে কি বিপুল হর্ষধ্বনি !

ডাক্তার আর ববরভ কয়েক পা এক সঙ্গে চললে, তারপর ডাক্তারের মুখখানা

হঠাৎ আঁধার হয়ে এল। ক্রুদ্ধভাবে সে বলে উঠল,—কল্যাণ-কর্মই বটে! শ্রমিকদের ব্যারাকগুলি তৈরি হয়েছে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে, অসুখ-বিসুখের অন্ত নেই, ছেলেপিলে মরছে সব মাছি পোকার মত। এই হচ্ছে শিক্ষার বীজ! এদিকে ইভানকোভাতে টাইফয়েড সুরু হয়ে গেছে—কল্যাণ করছে বলে খুব চমক লাগাতে এসেছেন এঁরা!

কিন্তু ডাক্তার, তুমি বলছ, টাইফয়েড সুরু হয়ে গেছে?—ওদের ব্যারাকগুলিতে যেমনভাবে লোক ঠাসা তাতে ত ভীষণ মুস্কিলের কথা!

ডাক্তার দম নেবার জন্য একটু থামলে, তারপর অতি তিক্তকণ্ঠে বললে,—কি বলছ তুমি? কালই দুটো রোগী আনা হল হাসপাতালে,—তার একটা আজ সকালে মারা গেল, আর একটা এতক্ষণও যদি না মরে থাকে, রাত্রে নির্ঘাত মরবে। আর আমাদের কি আছে? না আছে ওষুধ, না আছে শয্যা, না আছে সুনিপুণ নার্স। ডাক্তার অদৃশ্যে কার বিরুদ্ধে মুষ্টি আস্ফালন করে রাগতভাবে বলে উঠল,—আচ্ছা দাঁড়াও, এর মজা টের পাবেন বাছাধনেরা।

৮

পরনিন্দা পরচর্চার রসনা নৃত্যচঞ্চল হয়ে উঠেছে। খাশনিন এখানে আসবার আগেই কারখানার ব্যাপার নিয়ে এত সব কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে যে এখন জিনেঙ্কো-বাড়ির সঙ্গে খাশনিনের এত মেলামেশাতে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কারো সন্দেহ রইল না। মেয়েরা ও সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে তাদের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে, পুরুষরা যখন বলে তখন তারা সোজাসুজিই বলে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। নিশ্চয় করে কেউই কিছু জানে না। মুখরোচক একটা কেলেঙ্কারীর কথা শুনতে সবাই ব্যগ্র।

গুজব যা ছড়িয়েছে তা যে একেবারে ভিত্তিহীন তা-ও নয়। জিনেঙ্কো-বাড়িতে একবার যাবার পর খাশনিন প্রতি সন্ধ্যাই ও-বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কাটাতে সুরু করেছেন। প্রতিদিন সকাল এগারটার কাছাকাছি ধূসর অশ্ববাহিত তাঁর সুন্দর 'ট্রইকা' শেপেতোভকায় গিয়ে হাজির হ'ত, এবং তা থেকে তাঁর গাড়োয়ান নেমে প্রতিদিনই বলত, আমার মনিব এ-বাড়ির ছোট বড় সকল মেয়েদেরই তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই প্রাতরাশে অন্য কোন লোকের নিমন্ত্রণ থাকত না। একজন ফরাসী পাচক খাশনিনের রান্না করত, এখানে ওখানে, বিদেশে—যেখানেই যখন যান,—এই পাচকটিকে খাশনিন সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।

এই সব নবপরিচিতাদের সঙ্গে খাশনিনের ব্যবহারও ছিল অদ্ভুত। অবিবাহিত কাকারা তাদের ভাইঝিদের সঙ্গে যেমন ভদ্রতার বালাই না রেখেই কথা বলেন, ফষ্টিনষ্টি করেন—তিনি এই পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই সেই রকম সুরু করে দিয়েছিলেন। তিন দিনের মাঝেই তিনি এদের বাড়ির ডাক-নাম ধরে ডাকতে সুরু করে দিয়েছিলেন,—শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আবার নিজের দেওয়া আদরের নামও যুক্ত থাকত। যেমন—বাড়ির ছোট মেয়ে কাস্যার ফুলো ফুলো টোল-খাওয়া গালটা টেনে দিয়ে তিনি ডাকতেন,—এই খুকী, এই বাচ্চু। মেয়েটি তাতে এত লজ্জা পেত যে তার চোখে জল বেরিয়ে আসত, কিন্তু একটুও প্রতিবাদ করত না সে।

আনা আফানাসেভনা খাশনিনকে কৃত্রিম তিরস্কার করে বলতেন তিনি তাঁর মেয়েদের আদর দিয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলবেন। আর সত্যিই—ওদের সামান্য সামাজিক একটা ইচ্ছার কথা খাশনিনের কানে গেলেই তিনি তা পূরণ করে বসতেন। মাকার মুখ দিয়ে কখন কি করে বেরিয়ে গিয়েছিল তার বাই-সাইকেল চড়া শিখতে ইচ্ছা করে, অমনি পরের দিন খারকোভ থেকে চমৎকার এক সাইকেল এসে হাজির, আর তার দাম তিন শ রুবলের কম নয়। বেতার সঙ্গে সামান্য কি একটা বিষয় নিয়ে বাজী রেখে দশ পাউন্ড মিঠাই হেরেছেন খাশনিন। আর একটা বাজীতে হেরে কাস্যাকে কিনে দিয়েছেন তিনি চারটি মণিখচিত একটি ব্রোচ,—কাস্যা নামটা বানান করতে যে চারটে অক্ষর লাগে, ঐ রত্নগুলি নামের আদ্যাক্ষরও তাই। একদিন তিনি শুনতে পেলেন নিনা ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে। তার দু' দিন পরেই নিনার জন্য খুব ভাল জাতের এক ইংলিশ ঘোড়া আনালেন তিনি, ঘোড়াটি মেয়ে ঘোড়া এবং মেয়েদের চড়বার উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়া। এই দেবতুল্য লোকটির দরাজ মনের পরিচয় পেয়ে মেয়েরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলঃ কোন একটা খেয়াল তাদের মনে জাগলেই ইনি কি করে তা টের পেয়ে যান, এবং তখনই তা পূরণ করেন। এতটা বদান্যতা ভাল নয়—এই রকম একটা কথা আনা আফানাসেভনার মনে আসছিলও একটু—কিন্তু খাশনিনের কাছে সে কথাটা ঠিক মত করে পাড়বার শক্তি, সাহস কিছুই ছিল না তার। যখনই তিনি—দাসী যেমন কখনও কখনও তার প্রিয় প্রভুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে তিরস্কার করে—তেমনি করে খাশনিনকে একটু বকতেন তখনই খাশনিন হাত নেড়ে তার রুক্ষ দৃঢ় কণ্ঠে 'ঠিক আছে ভদ্রে, এ সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আপনি'—বলে কথাটা উড়িয়ে দিতেন।

এ সব সত্ত্বেও ও'র কোন মেয়ের প্রতি পক্ষপাত দেখাতেন না তিনি কোনদিন, সবাইকেই সমান খুশি করতে চেষ্টা করতেন, ঠাট্টা তামাসাও করতেন সকলকে নিয়ে। যে সব তরুণের দল ও বাড়িতে এসে আড্ডা দিত, তারা সব একে একে সরে পড়েছিল, সেজহেভস্কী কিন্তু প্রতিদিন এসে হানা দিতে লাগল, আগে আসত সে হপ্তায় বড় জোর দু-তিন বার। কেউ যে তাকে আসতে বলত, তা-ও

নয় আসত সে নিজে ইচ্ছা করেই কোনও এক রহস্যময় শক্তির আমন্ত্রণে, আর একদিন করে এসে ক্রমে সে এ-বাড়ির এক অপরিহার্য অঙ্গ উঠল।

জিনেঙ্কো বাড়িতে তার যাওয়া আসা সুরু হবার আগে সামান্য একটা ব্যাপারও ঘটে। প্রায় মাস পাঁচেক আগে সে তার সহকারী বন্ধুদের মাঝে প্রচার করে—সে স্বপ্ন দেখেছে যে সে বহু লক্ষপতি হয়েছে, এবং বলে এ স্বপ্ন তার সফলও হবে নিশ্চয় বয়স যখন তার চল্লিশ হবে।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে?

সেজহেভস্কী তার ভিজে হাত দুটি অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘষতে ঘষতে খিলখিল করে হেসে উত্তর দিয়েছিল,—সব রাস্তাই শেষ হয় বন্ধু, রোমে গিয়ে।

সে তার সহজাত বুদ্ধি বলেই বুঝতে পেরেছিল শেপেতোভকায় যে ব্যাপার ঘনিয়ে আসছে এতেই তার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজের অনেক সুবিধা করে দেবে। যেমন করেই হোক সে নিজেকে তার সর্বশক্তিমান উপরওয়ালার কোন কাজে লাগিয়ে দিতে পারবে। সুতরাং যা থাকে কপালে ভেবে অনুগত দাসের মত চাপা হাসি হেসে সে খার্শানিনের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ভয়ঙ্কর 'মাস্টিফের' কাছে ছোট্ট কোন কুকুরের বাচ্চাকে যেমন কখনও কখনও লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যেতে দেখা যায়—তার খার্শানিনের কাছে যাওয়া অনেকটা সেই রকম,—তার মুখে এবং কণ্ঠে এমন একটা ভাব ছিল যে দেখলেই বোঝা যায় যে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র যে কোন কাজ সে করতে প্রস্তুত তা যতই নোংরা হোক।

খার্শানিন তার এ ভাব দেখে কিছু বলেন নি। ফ্যাকটরীর ডিরেক্টর ম্যানে-জারকে তিনি এক কথায় বিদেয় করে দেন,—কারণ পর্যন্ত দেখান না,—কিন্তু সেজহেভস্কীর উপস্থিতি তিনি মুখ বুজেই সহ্য করে গেলেন। একটা গুরুতর কাজের সম্ভাবনা দেখা গেছে নিশ্চয়, ভাবী লক্ষপতি তারই আশায় প্রহর গণছে।

গুজবটা লোক মুখে মুখে শেষে ববরভের কাণে এসেও পৌঁছল। কথাটা শুনে আশ্চর্য হ'ল না সে একটুও,—জিনেঙ্কো-পরিবার সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই তার যে ধারণা হয়ে আছে তা যেমনি নির্ভুল তেমনি দৃঢ়মূল। ভাবনা হচ্ছিল শুধু তার নিনাকে নিয়ে,—এই নোংরা ব্যাপারের মাঝে তাকেও জড়িয়ে ফেলবে লোকে। স্টেশনে সেই কথাবার্তার পর মেয়েটি বড্ড বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে ববরভের কাছে। কেবল তার কাছেই মেয়েটি তার সমগ্র হৃদয়টা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে,—সে হৃদয় দুর্বল চঞ্চল হলেও কত সুন্দর। আর সবাই দেখে শুধু তার বাইরের দিকটা,—তার পোষাক পরিচ্ছদ,—ভেবেছে ববরভ। ঈর্ষা জিনিসটা ববরভের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত,—ঈর্ষায় আনে শুধু সন্দেহ অবিশ্বাস, আনে ক্ষুব্ধ অভিমান, সংকীর্ণতা আর রূঢ়তা। ববরভের মনে এ সব কিছুরই বালাই নেই,—তার কোমল মধুর সরল মন সব কিছু বিশ্বাস করে।

নারীর অকপট গভীর ভালবাসার মাধুর্য উপভোগ করবার সৌভাগ্য তার কোনদিন হয় নি। সঙ্কোচ দ্বিধায় জীবনের কাছ থেকে প্রাপ্য আনন্দটুকুও

নিতে পারে নি সে এতদিন। তাই তার চিত্ত এই নবাগত প্রবল অনুভূতির দিকে সানন্দে ছুটে চলেছে।

স্টেশনে নিনার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সে কথাগুলি যেন এ কয়দিন তার মনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। কথাগুলি সে বার বার পুঙ্খানুপুঙ্খ করে মনে মনে আউড়েছে, এবং প্রতিবারই নিনার কথার মাঝে নতুন গভীর অর্থ আবিষ্কার করেছে। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তার মনে হত মস্ত বড় একটা আনন্দের কি যেন এসে গেছে তার জীবনে,—কি যেন এক পরম স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস এনে দিচ্ছে।

জিনেঙ্কো বাড়িতে যাবার জন্য মনটা তার ভীষণ ছটফট করত, তার সুখের ব্যাপারটা সে আরও ভাল করে বুঝে নিতে চায়, আরও নিশ্চিত হতে চায়, নিনার সেই কণে-ভীরু ক্ষণে-অকপট নির্ভীক—অর্ধ স্বীকারোক্তি আবার শুনতে চায় সে নিনার মুখে। কিন্তু খার্শনিনের জন্যই সে ওখানে যেতে পারছিল না,—সে তার মনকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিল যে কত দিনই থাকবেন খার্শনিন,—কোনমতেই তিনি দিন পনেরোর বেশি থাকতে পারেন না।

সৌভাগ্য ক্রমে খার্শনিন যাবার আগেই একদিন নিনার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। দিনটা ছিল রবিবার, ধাতুগলানো চুল্লীটা চালু করবার তিনদিন পর। ববরভ তার ফেয়ারওয়ের পিঠে চড়ে মিল থেকে স্টেশনে যাবার মজবুত চওড়া পথটা ধরে চলেছিল। বেলা তখন প্রায় দুটো;—দিনটা বড় ভাল,—নির্মেঘ আকাশ,—শীতল আবহাওয়া। কান দুটো খাড়া করে কেশবহুল লেজটা নাড়তে নাড়তে মন্থর গতিতে চলেছিল ফেয়ারওয়ে। একটা গুদাম ঘরের কাছে বাঁক ঘুরতে ববরভ দেখলে অশ্বারোহণের পোশাক পরে মস্ত বড় একটা পাটকেলি রঙের ঘোড়ায় চড়ে উৎরাই পথে নেমে আসছেন একজন মহিলা,—আর একজন পুরুষ ছোট্ট সাদা একটা কিরগিজ অঞ্চলের ঘোড়ায় চড়ে তার পিছনে। ববরভ প্রায় তখনই চিনতে পারলে এ নিনা। নিনার পরনে একটা গাঢ় সবুজ রঙের লম্বা ঢিলে স্কার্ট,—হাতে হলদে দস্তানা; মাথায় চকচকে একটা টপ্‌হ্যাট। বেশ আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গীতে বসেছে সে জিনের উপর,—বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। তনু-দেহ ইংলিশ ঘোটকীটা তার সরু পা উঁচু তুলে তুলে নিনাকে নিয়ে কদমে চলেছে,—যেন একটা স্প্রিং,—ঘাড়টা ওর যেন শক্ত ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। নিনার সহচর সেজহেভস্কী অনেক পিছু পড়ে রয়েছে,—কনুই নেড়ে, গা ঝাঁকি দিয়ে, লাফিয়ে সে দোল খাওয়া রেকাবটা তার জুতোর সামনেটা দিয়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

ববরভকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে নিনা তার ঘোড়া দ্রুত ধাপে ছুটাল। তারপর ববরভের পাশে এসেই হঠাৎ লাগামটা টেনে ধরল,—ঘোড়া চলতে বাধা পেয়ে নাসিকা বিস্ফারিত করে কট কট করে মুখের লোহা কামড়ে তার আপত্তি জানাতে লাগল,—মুখ থেকে ফেনা ঝরতে লাগল তার। ঘোড়া ছুটিয়ে আসায় নিনার

মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল,—চুলগুলি হ্যাটের নীচে থেকে ছিটকে বর্তুলাকারে কপালের উপর ঝুলে পড়েছিল।

ফেয়ারওয়েকে কোনরকমে সামলে নিয়ে নিনার আঙুলের ডগা ধরতে জিনের উপরেই নত হয়ে ববরভ জিজ্ঞাসা করলে,—এত সুন্দর ঘোড়া কোত্থেকে যোগাড় করলে তুমি?

সত্যিই খুব সুন্দর,—না?—এটা খ্যশনিনের উপহার।

নিনার এই অসতর্ক উত্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে রূঢ় স্বরে ববরভ বললে,—আমি হলে এমন উপহার প্রত্যাখ্যান করতাম।

শুনে লাল হয়ে উঠল নিনার মুখ, বললে,—কেন, কারণ কি?

কারণ খ্যশনিন তোমার কে বটে, কোন আত্মীয়, না ভাবী বর?

বাপরে,—অন্য লোকের বেলায় তোমার কি খুঁতখুঁতে মন,—নিনা একটু রাগের সঙ্গেই বলে উঠল।

কিন্তু ববরভের চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন দেখে সে সুর একটু নরম করে বললে, জানই ত এ উপহার দেওয়া তাঁর পক্ষে কত সহজ,—কত ধনী তিনি!

সেজহেভস্কী এবার কাছে এসে গেছে তাদের,—মাত্র কয়েক পা দূরে। হঠাৎ নিনা সামনে নত হয়ে চাবুকের আগা দিয়ে ববরভের হাতটা ছুঁয়ে রুদ্ধশ্বাসে অনুতপ্ত ছোট্ট মেয়ের মত বললে,—রাগ করো না,—লক্ষ্মীটি,—আমি ওর ঘোড়া ফিরিয়ে দেব। কি খুঁতখুঁতে লোক তুমি,—বাপরে!...আমার কাছে তোমার মতের মূল্য কি বুঝলে ত?

আনন্দে ববরভের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—হাতদুটি নিনার দিকে না বাড়িয়ে দিয়ে সে পারলে না। মুখে কোন কথা বললে না সে,—শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। সেজহেভস্কী এবার কাছে এসে গেছে,—ঘোড়ার উপর হেলাফেলায় বসবার চেষ্টা করতে করতে মাথাটা একটু নীচু করলে সে।

আমাদের বনভোজনের কথা শুনেছ নিশ্চয়?—দূর থেকেই সে বলে উঠল।

ববরভ উত্তর দিলে, কই আর শুনলাম।

আমি বলছি—মানে ভাসিলি তেরেন্তিভিচ্ যে বনভোজনেরব ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন তার কথা। বেশেনয়া বলকায় যাচ্ছি আমরা

শুনি নি।

এবার নিনা বললে,—সব সত্যি,—এস না, আন্দ্রি ইলিয়িচ? সামনের বুধবার,—পাঁচটার সময়। আমরা সব স্টেশন থেকে রওনা হব।

এ কি চাঁদা তুলে বনভোজন?

তাই বোধ হয়,—ঠিক বলতে পারছি না আমি।

নিনা সেজহেভস্কীর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল।

সেজহেভস্কী বললে,—ঠিকই বলেছ তুমি—চাঁদা তুলে। ভাসিলি তেরেন্তিভিচ্ আমাকে কিছু কিছু ব্যবস্থা করতে বলেছেন। এ একটা এলাহি কাণ্ড হবে,—

বলছি আমি। এমনটি আর কোনদিন কেউ দেখে নি। কিন্তু ব্যাপারটা গোপনই রাখা হয়েছে এ পর্যন্ত। সবাইকে শেষে তাক লাগিয়ে দেওয়া হবে।

নিনা আর থাকতে না পেরে হাসতে হাসতে বললে, বলতে গেলে আমিই এর মূলে। সেদিন আমি বলছিলাম কোন একটা বনজঙ্গলে আউটিং-এ গেলে বেশ হয়,—ভাসিলি তেরেন্তিভিচ্ তা শুনেই—

ববরভ অমনি হঠাৎ বলে উঠল,—আমি যাচ্ছি না।

হাঁ,—তুমি যাচ্ছ।—বলতে গিয়ে নিনার চোখ দুটি চক্‌চক্ করে উঠল,—এখন সব ঘোড়া ছোটাও,—উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল সে,—সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘোড়াকে সে ধাপে ছুটালেঃ আমি তোমায় কি বলতে চাইছি আন্দ্রি ইলিয়িচ্,—শোন।

সেজহেভস্কী পিছে পড়ে রইল,—নিনা আর ববরভের ঘোড়া পাশাপাশি চলতে লাগল। নিনা ববরভের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল,—ববরভের মুখে ক্রোধের রেখা,—চোখে ভ্রূকুটি।

নিনা অতি কোমল কণ্ঠে বললে,—এ বনভোজনের ব্যবস্থা আমি তোমার জন্যই করতে চেয়েছি বন্ধু,—নিষ্ঠুর সন্দিগ্ধ মনা তুমি তা বুঝতে পার না কেন? স্টেশনে তুমি যে কথা বলতে গিয়ে শেষ করলে না সে কথা জানতে চাই আমি। বনভোজনে গেলে প্রাণখুলে কথা বলতে আমাদের কোন বাধা থাকবে না।

এক মুহূর্তে ববরভের মনটা একেবারে পালটে গেল,—দুই চোখ তার জলে ভরে এল,—আবেগ ভরা কণ্ঠে সে বলে উঠল,—ও নিনা,—তোমায় আমি কত যে ভালবাসি!

কিন্তু নিনা তার এই আবেগ ভরা কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না, হঠাৎ সে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে তার গতি হাঁটার মত শ্লথ করে নিয়ে বললে, তা হ'লে তুমি আসছ,—আসছ ত?

নিশ্চয়।

দেখ যেন ভুলো না।...এখন আমার সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে,—বিদায়। বাড়ি যেতে হবে আমার।

নিনার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ববরভ যখন তার হাত ধরল,—তখন বিলম্বিত দৃঢ় মুষ্টিতে সে তার প্রত্যুত্তর দিল,—দস্তানার ভিতর দিয়েই নিনার আন্তরিকতার স্পর্শ পেল ববরভ। তার কালো চোখ দুটিতে ভালবাসা যেন উপচে পড়তে লাগল।

৯

পরের বুধবার বেলা চারটেয় বনভোজন যাত্রীতে স্টেশন ভরে উঠল। সবাই খুশি,—সবারই মনে স্বস্তি। খাশনিন যে তাঁর এবারকার পরিদর্শন এমন ভাবে শেষ করবেন এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

কেউ ধমকানি খেল না,—বজ্রনিক্ষেপ হ'ল না কারো উপর,—কাউকে চলে যেতে বললেন না,—বরং শোনা গেল কেরানীদের শীগগিরই কিছু বেতনবৃদ্ধি হবে। তা ছাড়া বনভোজনটাও বড় আনন্দের ব্যাপারই হতে যাচ্ছে। যে বেশেনায়া বলকাতে বনভোজন হতে যাচ্ছে, সে জায়গাটা ঘোড়ায় যেতে দশমাইলেরও কম,—পথের দু' পাশের দৃশ্য একেবারে ছবির মতন। হপ্তাখানেক আগে থেকে আবহাওয়াটাও বড় ভাল যাচ্ছে,—মেঘমুক্ত আকাশ, চারিদিক রবিকরোজ্জ্বল,—একেবারে সোনায় সোহাগা।

আমন্ত্রিত যাত্রী চলেছেন প্রায় নব্বই জনের মত,—তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে পরমোৎসাহে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছেন, হাসছেন। কথা বলবার সময় রুশীয় ভাষার মাঝেই শোনা যাচ্ছে কত ফরাসী, জার্মান, পোলিশ কথা। তিনজন বেলজিয়ান তাঁদের ক্যামেরা এনেছেন মনের মত কিছু দেখলেই তাঁরা স্নাপ্ শট্ নেবেন। বনভোজনটা পুরোপুরি কেমন হবে তা জানবার জন্য সবাই উৎসুক,—অথচ জানবার উপায় নেই,—ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। রহস্যময় মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গীতে সেজহেভস্কী চমকপ্রদ অনেক কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে কিন্তু ভাঙছে না কোন কথাই।

প্রথম চমক লাগাল একটা স্পেশাল ট্রেন। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটায় দশ চাকার একখানা নতুন আমেরিকান্ এঞ্জিন শেড্ থেকে বেরিয়ে এল। মহিলারা সব বিস্ময়ানন্দে চীৎকার করে উঠলঃ এর বিরাট দেহটা পশমী কাপড় আর টাটকা ফুলে সাজানো হয়েছে। ওক গাছের সবুজ পাতার মালার মাঝে মাঝে দেওয়া হয়েছে রাশিরাশি য়্যাস্টর, ডালিয়া, স্টক আর কারনেশান,—সেই মালা দিয়ে জড়ানো হয়েছে এঞ্জিনের ইস্পাত নির্মিত দেহ,—সেই মালাই বর্তুলাকারে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে চিমনীর গায়ে,—সেখান থেকে ঝুলে পড়েছে হুইসেলটার কাছে, —সেখান থেকে আবার উঠে ক্যাবটার গায়ে গিয়ে একটা পুষ্প মঞ্জরী শোভিত দেয়ালের সৃষ্টি করেছে। সবুজ মালা আর ফুলের মাঝ দিয়ে এঞ্জিনের যে ইস্পাত আর পিত্তল নির্মিত অংশ দেখা যাচ্ছে অস্তোন্মুখ শারদ সূর্যের সোনালি কিরণে তা ঝকমক করছে। প্লাটফর্মে ছ'খানা ফার্স্ট ক্লাস বগী লাগানো হয়েছে,—এই বগীগুলিতে করেই বনভোজন যাত্রীদের দ্বি-শততম মাইল স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে—বেশেনয়া বলকা সেখান থেকে মাত্র দু'শো গজের মত।

সেজহেভস্কী দ্রুতপদে প্রতি দলের কাছে গিয়ে বার বার বলতে লাগল,—

মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ,—ভাসিলি তেরেন্তিভিচ্ আমাকে আপনাদের জানাতে বলেছেন যে এ বনভোজনের সমগ্র ব্যয় তিনি বহন করছেন।

অনেক লোক এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল,—আরও অনেক কিছু ব্যাখ্যা করে বলতে হ'ল তাঁর: ভাসিলি তেরেন্তি ভিচোর এখানে যে সম্বার্ধনা করা হয়েছে, তাতে বড় খুশি হয়েছেন তিনি—তার প্রতিদানে কিছু করতে পারাতেই তাঁর আনন্দ। ব্যয় ভার তাই তিনিই বহন করছেন।

প্রভুর বদান্যতার কথা বলতে পরিচারকেরা যে ধরণের গর্ববোধ করে সেই ধরণের গর্বে অনুপ্রাণিত হয়ে সেজহেভস্কী বলে উঠল,—তিন হাজার পাঁচ শো নব্বুই রুবল ব্যয় করতে যাচ্ছি আমরা এ বনভোজনে।

অমনি পিছন থেকে বিদ্রূপের স্বরে কে বলে উঠল,—ব্যয়ভার খাশনিন আর আপনি আধাআধি বহন করছেন না কি? এই বিষোদ্গার কার মুখ থেকে দেখবার জন্য সেজহেভস্কী তখনই ঘুরে দাঁড়াল। দেখলে এ আন্দ্রিয়াস্। আন্দ্রিয়াসের মুখ অন্য সময়ের মত তখনও প্রশান্ত গম্ভীর,—ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেজহেভস্কীর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

সেজহেভস্কী মুখচোখ রাঙা করে বললে,—বুঝতে পারলাম না,—কি বললেন আপনি?

কিছু আপনিই বলেছেন, আমি না। . আপনি বললেন,—আমরা তিন হাজার খরচ করছি,—আমি ধরে নিয়েছি খাশনিন আর আপনি। ব্যাপার যদি তাই হয় তা হলে আমার কর্তব্য হবে আপনাকে জানানো যে এ অনুগ্রহ খাশনিনের কাছ থেকে নেওয়া সম্ভব হলেও মিস্টার সেজহেভস্কীর কাছ থেকে নেওয়া আমার সম্ভব হবে না।

সেজহেভস্কী আমতা আমতা করে বললে,—না, না,—ভুল বুঝেছেন আপনি। ভাসিলি তেরেন্তিভিচ্ই সব কিছু করছেন। আমি শুধু তাঁর কর্মনির্বাহক,—এজেন্ট বা ঐ ধরণের কিছু বলতে পারেন,—শুষ্ক হাসি হেসে বললে সে।

জিনোঙ্কো বাড়ির সবাই এলেন খাশনিন আর শেলকোভনিকোভের সঙ্গে,—ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু খাশনিন গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা করুণ প্রহসনের ব্যাপার ঘটে গেল যা কেউ কোনদিন ভাবতে পারে নি। ঐ দিন বনভোজনে যাওয়া হচ্ছে শুনে সকাল থেকেই শ্রমিকদের স্ত্রী, বোন, মায়েরা সব স্টেশনে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, কেউ কেউ তাদের ছোট ছেলেমেয়েও এনেছে সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের কেউ বা স্টেশনের সিঁড়িতে,—কেউ বা মাটিতে, কেউ বা দেয়ালের ছায়ায় বসে আছে,—তাদের রোদে পোড়া ছন্নছাড়া মুখে অটল ধৈর্যের রেখা। সংখ্যা তাদের দুই শতেরও কিছু উপরে। স্টেশনের কর্মচারীরা তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল তারা কি চায়,—উত্তরে তারা বলেছে মোটা লালমাথা উপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে চায় তারা। পাহারাওয়ালা তাদের ওখান থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতেও তারা এত

চেঁচামেচি সুরু করেছে যে বাধ্য হয়ে তাকে সরে পড়তে হয়েছে সেখান থেকে।

যতবার যত গাড়ি এসেছে সব দেখেই তারা হৈ হৈ করে ছুটে গেছে,—কিন্তু যখন দেখেছে ওর মাঝে তাদের মোটা লালমাথা উপরওয়ালা নেই তখনই আবার ফিরে এসে স্থির হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসেছে।

মোক্ষম করে গাড়ির বাকসোটা ধরে,—গাড়িটা কাঁপিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে খাশনিন গাড়ির পা-দানীতে যেই পা দিয়েছেন অমনি স্ত্রীলোকগুলি চারিদিক থেকে তাঁকে ঘিরে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। ওদের চেঁচামিচিতে অল্পবয়সী তেজস্বী ঘোড়াগুলি আঁৎকে উঠে লাফালাফি সুরু করলে,—আচ্ছা করে লাগাম টেনে গাড়োয়ান কোনরকমে তাদের সামলে রাখলে। খাশনিন ব্যাপারটা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিলেন নাঃ স্ত্রীলোকগুলি তাদের বাচ্ছাদের কোলে নিয়ে সবাই একসঙ্গে চীৎকার করছিল,—তাদের তামাটে গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল।

খাশনিন যখন দেখলেন এই জীবন্ত চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার কোনই পথ নেই তখন তিনি ওদের গলা ছাপিয়ে বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠলেন,—এটা একটা বাজার পেয়েছ না কি তোমরা?...তোমাদের কোন কথাই কাণে আসছে না আমার,—তোমাদের একজন এসে বলো,—কি বলতে চাও তোমরা।

তখন তাদের প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল তারই এগিয়ে এসে বলা উচিত,—সুতরাং সোরগোল আরও বেড়ে উঠল,—এবং গণ্ড বেয়ে আরও বেশি জল গড়াতে লাগল।

কর্তা,—আমাদের বাঁচান,—আমরা আর সহ্য করতে পারছি নে—এ। আমাদের একেবারে কাহিল করে ফেললে,—শীতে আমরা একেবারে মারা পড়লাম,—আমাদের ছেলেপিলে,—আমরা সবাই গেলাম।

খাশনিন আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—কি চাও তোমরা,—কিসে মারা পড়লে?...সবাই এক সঙ্গে চিল্লিও না। তার পর তিনি একটি দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন,—তুমি,—তুমি এগিয়ে এসে বল,—আর সবাই চুপ করে থাক। যে স্ত্রীলোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন খাশনিন—মুখে একটু ক্লান্তির ছোপ থাকলেও তার চেহারাটা বড় সুন্দর।

মেয়েদের অনেকেই চীৎকার থামাল বটে,—কিন্তু তাদের ফোঁপানি আর কান্না থামল না,—কাঁদতে কাঁদতে তারা তাদের নোংরা স্কার্টের প্রান্ত দিয়ে তাদের চোখ আর নাক মুছতে লাগল।

তখনও প্রায় কুড়িজন এক সঙ্গে কথা বলছে। তারা বলছে—

শীতে আমরা একেবারে মারা গেলাম, কর্তা,—আমাদের জন্য কিছু করুন। এ আর সওয়া যায় না। শীতকালে আমাদের ব্যারাকে পুরে দেওয়া হয়,—কিন্তু সেখানে মানুষ থাকে কি করে? এগুলি ব্যারাকই বলা হয় বটে,—কিন্তু তৈরী এ সব কাঠের টুকরো দিয়ে। এই এখনও রাত্রিতে সেখানে এমন ঠাণ্ডা যে দাঁত

খট্‌খট্‌ করিয়ে ছাড়ে। সেখানে শীত কালে আমরা কি করে থাকব বলুন ত? অন্তত আমাদের বাচ্চাদের মুখ চেয়ে দয়া করুন,...অন্তত কতকগুলি স্টোভ তৈরী করিয়ে দিন আমাদের। রান্না করবার জায়গা নেই আমাদের, আমরা ঘরের বাইরে রান্না করি। পুরুষেরা সব সারাদিন ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে কাজ করে,—বাড়িতে ফিরে এলে তাদের ভিজে জামা-কাপড় শুকানোর উপায় থাকে না।

খাশনিন ফাঁদে পড়ে গেলেন। বাইরে বেরুবার জন্য যে দিকেই ফেরেন তিনি, সেই দিকেই স্ত্রীলোকেরা সব,—কেউ বা তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে কেউ বা ষাষ্টাঙ্গে ভূমি স্পর্শ করে তাঁর বহির্গমন পথ রোধ করে দিয়েছে। তিনি জোর করে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করলে ওরা সব তাঁর পা জড়িয়ে ধরছে,—কেউ বা ধূসর লম্বা কোটের প্রান্তদেশ আঁকড়ে ধরছে। আর কোন উপায় না পেয়ে তিনি শেষে শেলকোভনিকোভকে ইসারায় ডাকলেন। শেলকোভনিকোভ কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জনতা সরিয়ে যখন তাঁর কাছে এসে পেঁাছলেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে ফরাসীতে বললেন,—এ সবের মানে কি,—বলুন ত?

শেলকোভনিকোভ হকচকিয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বললেন,—

বোর্ডকে কয়েকবার জানিয়েছি আমি এ সব,—কুলি মজুরের একটু টান ছিল, গ্রীষ্মকাল,—মজুরেরা অনেকেই ফসল কাটতে ব্যস্ত—মজুরির হারও বড্ড বেড়ে গিয়েছিল,—বোর্ড তখন অনুমতি দিলেন না, সুতরাং আমার আর কোন উপায় ছিল না।

খাশনিন রুষ্ট স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন,—মজুরদের জন্য নতুন করে ব্যারাক তৈরী কবে সুরু করছেন আপনি?

ঠিক বলতে পারি না। কোন রকমে চালিয়ে নিতে হবে ওদের। প্রথমে আমরা কেরানীদের কোয়ার্টার্স তৈরী করতে যাচ্ছি,—শীগগিরই করব।

আর এদিকে চলতে থাক এইসব বিদ্রোহ!—ক্ষুব্ধ রুষ্ট স্বরে বলে উঠলেন খাশনিন, তার পর স্ত্রীলোকদের দিকে ফিরে বললেন,—শোন তোমরা,—কালই তোমাদের স্টোভ তৈরী সুরু হবে,—আর তোমাদের ঘরের ছাদ নতুন তক্তা দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হবে,—বুঝলে?

ওরা উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, কর্তা,—বুঝেছি আমরা আপনার কথা,—অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। চমৎকার হল,—কর্তা নিজে যখন হুকুম দিয়েছেন তখন আর আমাদের কিছু সন্দেহ করবার নেই।...ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।...কর্তা,—আর একটা কথা,—কারখানার আশেপাশে যে সব কাঠের টুকরো পড়ে থাকে ওগুলি কুড়িয়ে নেবার অনুমতি দেন আমাদের।

বেশ, ওগুলিও নিতে পার তোমরা।

সব জায়গায়ই পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে থাকে, আমরা ওসব নিতে গেলে তারা সব চাবুক উঁচিয়ে তাড়া করে আমাদের।

কুচ্ পরোয়া নেই, তোমরা এসে ওগুলি নিয়ে যেও, কেউ কিছু বলবে না তোমাদের,—খার্শানিন আবার তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন তারপর তাদের উৎসাহিত করতে বললেন, আর এখন চটপট গিয়ে তোমাদের স্যুপ্ তৈরী কর,—জলদি। এর পর তিনি অতি নিম্ন কণ্ঠে শেলকোভনিকোভকে বললেন,—কালই দুগাড়ি ইট পাঠিয়ে দিও ওদের ব্যারাকের সামনে,—তাতেই ওরা অনেক দিন চুপ করে থাকবে,—ঐগুলির দিকে চাইবে আর ওদের মন খুশিতে ভরে উঠবে।

এবার স্ত্রীলোকেরা সব হৃষ্ঠ চিত্তে ওখান থেকে এদিক ওদিক সরে পড়তে লাগল। খার্শানিন তাদের যা বললেন তা অপর সকলকে শুনিয়ে দিতে বলেছিলেন,—তারা তাই নিজেদের মাঝে বলাবলি করতে লাগল,—আর জানিস,—আর ঐ স্টোভ যদি আমাদের না তৈরী করে দেওয়া হয়, তা হলে ইর্নাজিনীয়ারদেরই ডাকব আমাদের গা গরম করে দিতে।

আর একজন তখনই চট করে বলে উঠল,—হাঁ,—ডাকবই ত! আর আমাদের ঐ উপরওয়ালা কর্তা এসেই আমাদের গা গরম করুক না,—দেখছিস না লোকটা কেমন মোটা আর ফূর্তিবাজ! স্টোভের চেয়ে ওকে পেলেই আমাদের গা বেশ ভাল গরম হবে।

ব্যাপারটা এমন সহজে মিটে যেতে দেখে সবার মনই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। খার্শানিন প্রথম দিকে ম্যানেজারের দিকে ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে চাইলেও মেয়েদের মুখে গা গরমের কথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন,—তার পর পুনর্মিলনের চিহ্ন স্বরূপ শেলকোভনিকোভের কনুই ধরে স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তিনি বলতে লাগলেন—আসল কথা কি জানেন, এদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয়, তা জানা থাকা চাই। যে কোন কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন এদেরঃ য়্যালুমিনিয়ামের ঘর,—দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ,—প্রত্যেকদিন সকালে এক চিলতে মাংস, যা খুশি আপনার,—শুধু মনে রাখতে হবে আপনার,—বলতে হবে এমন করে যাতে ওরা আশ্বাস পায় এবং বিশ্বাস করে। আমি শপথ করে বলতে পারি,—উন্মত্ত বিপুল জনমণ্ডলীর বিদ্রোহাভিযানকে আমি আধ ঘন্টার মাঝে শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থামিয়ে দিতে পারি।

খার্শানিন এবার ট্রেনে উঠে বসলেন। মেয়েদের যে বিদ্রোহ তিনি এইমাত্র দমন করে এলেন তার সকল কথা একে একে মনে পড়তে লাগল আর তিনি প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। মিনিট তিনেক পরে ট্রেন ছেড়ে দিল। গাড়োয়ানদের সোজা বেশেনায়া বলকায় গাড়ি নিয়ে যেতে বলা হল,—কারণ ফিরবার সময় মশাল জ্বালিয়ে ঐ সব গাড়িতে করেই দলের লোক সব ফিরবেন।

নিনার ব্যবহারে ববরভ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। নিনা কখন স্টেশনে পেঁাছবে তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল সে,—আগের দিন রাত্রি থেকেই সে অধীর হয়ে উঠেছে। আগেকার কোন সন্দেহই তার আর নেই,—

তার কেবলই মনে হচ্ছিল সুখের দিন তার এসে গেছে। পৃথিবী তার কাছে এত সুন্দর আর কোনদিন লাগেনি,—ওর মানুষগুলিকে এত সদয়ও মনে হয়নি কোনদিন,—জীবনও হয়ে ওঠেনি কখনও এত সহজ আনন্দময়। নিনার সঙ্গে যখন তার দেখা হবে সেই সময়কার একটা ছবি বিনা চেষ্টাতেই মনের মাঝে ভেসে আসছিল তারঃ তখন কি সব কোমল স্নিগ্ধ ভাল-ভাল ভালবাসার কথা বলবে সে তাই ভাবছিল,—আর হাসি পাচ্ছিল তার। ভালবাসার কথাই বা খোঁজা কেন, —যখন দরকার হবে,—সময় মত ও সব ত আপনিই এসে যাবে,—ভেবে রাখা কথার চেয়ে তা কত বেশি সুন্দর কত বেশি আন্তরিক।

একখানা পত্রিকায় সে একটা কবিতা পড়েছিল, সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ল তার। কবি এতে তার প্রিয়াকে বলেছেন,—তারা পরস্পরের কাছে শপথ করে কোন কিছু বলবেন না, কারণ প্রতিজ্ঞা করতে যাওয়া মানে তাদের একনিষ্ঠ গভীর প্রেমকে অপমান করা।

ববরভ দেখলে জিনেঙ্কো বাড়ির দু'খানা গাড়ি খার্শনিনের ট্রইকার ঠিক পরেই এল। নিনা প্রথম গাড়িতেই ছিল। তার পরনে হালকা হলুদ রঙের একটা জামা,—জামায় তৃতীয়ার চাঁদের মত নীচু গলায় ঐ রঙেরই চওড়া লেস্, মাথায় প্রশস্ত কিনারওয়ালা একটা সাদা ইটালিয়ান হ্যাট, তার উপর আবার কতক-গুলি টি-রোজের স্তবক। নিনা যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু ফ্যাকাশে,—একটু বেশি গম্ভীর। নিনা দূর থেকেই ববরভকে দেখতে পেয়েছিল, ববরভ ভেবেছিল সে ওখান থেকেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইবে,—কিন্তু সে সব কিছুই সে করলে না। শুধু তাই নয় ববরভের মনে হল সে ইচ্ছা করেই তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে। নিনাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করবে বলে সে ছুটে গেল কিন্তু নিনা তাকে এ সুযোগ দিতে চায় না বলেই বুঝি তাড়া-তাড়ি অন্যদিক থেকে নেমে পড়ল। কি যেন একটা অমঙ্গলের আভাস যেন আসতে চাইছিল ববরভের মনে কিন্তু সে তখনই তা দূর করতে নিজেই মনকে প্রবোধ দিতে লাগলঃ বেচারা নিনার নিজের প্রেমের সিদ্ধান্তে লজ্জা এসে গেছে তার মনে। ওর ভয় হচ্ছে ওর চোখ দেখেই লোকে এখন ওর মনের কথা বুঝে ফেলবে। প্রেমের অকপট আনন্দ চেপে রাখা দায়।

ববরভের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিনা নিজেই সেদিন স্টেশনে যেমনটি করেছিল ঠিক তেমনি করে নিজেদের গোপন কথা বলতে সুযোগ খুঁজে নেবে। কিন্তু তার বাইরের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল মহিলাদের সঙ্গে খার্শনিনের এখন যে কথাবার্তা হচ্ছিল তাতেই সে এখন ব্যস্ত, ববরভের দিকে একবার ফিরেও তাকা-চ্ছিল না সে, অপরের অলক্ষ্যেও না। হঠাৎ ভয়ে উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠল ববরভ,—বুক ঢিবঢিব করতে লাগল। জিনেঙ্কো বাড়ির সবাই এক সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর মহিলারা সবাই যেন তাদের এড়িয়ে চলেছে,—চারি-দিকে হৈচৈ, কেউ কারো দিকে মন দিতেও পারছে না। ববরভ ঠিক করলে এই

সুযোগে সে জিনেঙ্কো-বাড়ির দলের ওখানে গিয়ে অন্তত চোখের ইঙ্গিতেও নিনাকে জিজ্ঞাসা করবে সে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না কেন?

ববরভ তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে আনা আফানাসেভনাকে নমস্কার করে তাঁর হস্ত চুম্বন করে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল তিনি কোন কিছু জেনেছেন কি না। হাঁ,—নিশ্চয় জেনেছেন—। মহিলার যে পাতলা বাঁকা ভ্রূকুটি ববরভ এতদিন কপট চরিত্রের পরিচায়ক বলে মনে করে এসেছে তাকে দেখে তা এখন কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছে,—ওষ্ঠে উদ্ধত অবজ্ঞা ববরভের মনে হল নিনা তার মাকে সব কথা খুলে বলেছে,—এবং তিনি তাকে তিরস্কার করেছেন।

ববরভ এবার নিনার কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু নিনা একবার তার দিকে ফিরেও তাকাল না। ববরভ যখন প্রবল আগ্রহে তার হাতটা ধরল তখন তার কম্পিত হাতের মাঝে ওর হাতটা অসাড় নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। ববরভের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে মাথাটাও নোয়ালে না সে,—সে তার মুখখানা তখন বেতার দিকে ফিরিয়ে তার সঙ্গে কি সব বাজে কথা বলতে লাগল। কাপুরুষ বা দোষী লোকেরা যেমন সোজাসুজি কথা বলতে ভয় পায়—নিনার এই ব্যবহারের মাঝেও যেন ঐ রকম কিছু একটা দেখতে পেল ববরভ। হাঁটুটা ভেঙে আসতে লাগল। তার মুখের ভিতরটা যেন ধরে আসছে। কি করবে ভেবে পেলে না সে। নিনা যদি তার মার কাছে তার মনের কথা খুলে বলেও থাকে, তবে সে ত মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ কৌশল—চোখের দ্রুত ইশারায়ও একবার বলতে পারত, হাঁ, ঠিকই ধরেছ তুমি, আমাদের সব কথাই তিনি জানেন,—কিন্তু আমি সে-ই আছি তোমার, সে-ই আছি, ভেবো না তুমি। কিন্তু এ সব কিছু না করে সে মুখ ফিরিয়েই রইল। কুচ্ পরোয়া নেই,—বনভোজনের ওখানে গিয়ে ওর মুখ থেকেই আমি আদায় করব কথা। যেমন করেই হোক আদায় আমি করবই।—ববরভ ভাবলে বটে এই সব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর অঘটনের আভাস এসেও ওর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে।

১০

দ্বিশততম মাইল স্টেশনে বনভোজন যাত্রীরা সব নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে, —তারপর চৌকিদারের বাড়ির পাশ দিয়ে যে সরু পথটা নেমে গেছে সেই পথে দীর্ঘ সারিবদ্ধ হয়ে রঙবেরঙের পোশাকের জোলুস দেখিয়ে বেশেনায়া বলকার দিকে রওয়ানা হলেন। শারদ অরণ্যের তীব্র সজীবতা দূর থেকে তাদের চোখে এসে লাগছিল। রাস্তা ক্রমেই খাড়া হয়ে উঠছিল,—ফেলে আসা পথ হেজেল আর

হনিসাক্‌ল ঝোপের ঘন আস্তরণের নীচে হারিয়ে যাচ্ছিল। পীত কুঞ্চিত শুকনো পাতা পথের নীচে পড়ে কেমন এক খসখস আওয়াজ হচ্ছিল। সামনের একটা ঝোপের ফাঁক দিকে সূর্যাস্তের লাল আভা চোখে এসে পড়ছিল।

ঝোপ জঙ্গল শেষ হয়ে গেলেই হঠাৎ নজরে পড়ল সামনেই একটা জায়গা পরিষ্কার এবং সমান করে তাতে মিহি বালু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিষ্কার জায়গাটার একদিকে করা হয়েছে একটা অষ্টভুজ পটমণ্ডপ, সাজানো হয়েছে তা রঙিন পশমী কাপড় আর সবুজ পাতা দিয়ে; আর এক দিকে ব্যাণ্ডের জন্য কাপড় ঢাকা একটা প্লাটফর্ম। ঝোপের ভিতর থেকে দুটি দুটি করে লোক একসঙ্গে বেরিয়ে আসছিল,—প্রথম দুটি আত্মপ্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডে সুন্দর মার্চের বাজনা বেজে উঠল। বাজনার মধুর আওয়াজ বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে গাছে গাছে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল,—সে ধ্বনি আবার দূরের আর একটা ব্যাণ্ডের ধ্বনির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। শেষোক্ত ব্যাণ্ড কখনও প্রথমটির আগে কখনও পরে বাজতে লাগল। মণ্ডপে অশ্বক্ষুরের আকারে শ্বেত বস্ত্রাবৃত টেবিল সাজানো ছিল, পরিবেষক ভৃত্যেরা তার চারিদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

ব্যাণ্ড থামবার সঙ্গে সঙ্গে বনভোজনকারীরা তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। এ হর্ষের কারণও ছিল তাদেরঃ মাত্র পক্ষকাল আগে আজকার এই পরিষ্কার জায়গাটা ছিল ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা একটা পাহাড়ের পার্শ্বদেশ মাত্র।

ব্যাণ্ডে এবার 'ওয়াল্টস্‌' নাচের বাজনা বেজে উঠল।

সেজহেভস্কী নিনার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ববরভ দেখলে সে এবার তার অনুমতি না নিয়েই তাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে এক ঘুরপাক দিয়ে নাচের আসরে নেমে পড়ল।

সেজহেভস্কী তাকে ছেড়ে দিবার পর একজন মাইনিং-এর ছাত্র তার কাছে ছুটে গেল, তারপর আর একজন। ববরভ ভাল নাচতে পারত না,—নাচ পছন্দও কবত না সে। তবুও তার মনে হল নিনাকে একবার একটা "কোয়াড্রিল্‌" নাচতে সে ডাকে। সে ভাবলে এই সুযোগে সে নিনার আজকার এ ব্যবহারের মানে কি বুঝে নিতে পারবে। নিনা দুটো নাচ নাচার পর যখন বসে পাখা দিয়ে বাতাস খেতে লাগল, তখন সে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে,—

নিনা গ্রিগোরেভনা,—আশা করি আমার জন্য একটা কোয়াড্রিল রিজার্ভ রেখেছ তুমি?

নিনা তার দিকে একবার না তাকিয়েই বললে,—ইস্‌, আমি অনেক আগেই ত অন্যান্য লোকের সঙ্গে আর আর নাচের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি!

ববরভ কি বলবে বুঝতে না পেরে বললে,—তাই না কি, এর মাঝেই?

নিশ্চয়!

অধীর ভাবে ব্যঙ্গের সঙ্গে নিজের কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে নিলে নিনা, তার

পর বললে, এত দেরী করলে কেন তুমি? ট্রেনে থাকবার সময়ই আমার সব নাচ বিলি হয়ে গেছে।

ববরভ বিষণ্ণ সুরে বললে,—তা হলে আমার কথা তুমি একেবারে ভুলেই গেছলে?

ববরভের কণ্ঠস্বরে নিনা একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। কি বলবে বুঝতে না পেরে সে তার পাখাখানা একবার বন্ধ করলে, একবার খুললে, কিন্তু মুখ তুলে চাইলে না একবারও।

তারপর বললে, তোমারই দোষ, তুমি আগে বল নি কেন আমায়?

আমি এই বনভোজনে এসেছি শুধু তোমায় দেখব বলে, নিনা গ্রিগোরেভনা,—তোমার সব কিছুই তবে একটা তামাসা?

নিনা কোন উত্তর দিলে না। উত্তর দেবার কোন কিছু খুঁজে না পেয়ে শুধু পাখা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। হঠাৎ একজন তরুণ ইনজিনীয়ার তার কাছে ছুটে আসায় সে যেন রক্ষা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে তার সাদা দস্তানা পরা সরু হাতটা ইনজিনীয়ারের কাঁধে রাখলে সে, তারপর সেখান থেকে চলতে শুরু করলে, ববরভের দিকে একবার ফিরেও তাকালে না। ববরভ দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। একবারের নাচ শেষ করে নিনা আঙিনার অপর দিকে বসলে। ববরভের মনে হল এটা সে ইচ্ছা করেই করলেঃ ববরভকে সে এখনও এড়িয়ে চলতে চায়,—সে ভয়েই হোক, আর লজ্জায়ই হোক।

সেই সাবেক পুরানো মনমরা বিষণ্ণতা যেন আবার নতুন করে পেয়ে বসল ববরভের মনকে। তার চারদিকে যারা বসে আছে তাদের মুখগুলি যেন কৃপা-যোগ্য ইতরের মুখ,—ভাঁড়ের মত হাস্যোদ্দীপক। সঙ্গীতের ঝঙ্কার যেন মাথার মধ্যে কি এক যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে লাগল। এ সব সত্ত্বেও আশা ছাড়ল না তার মন, নানা অনুমানের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলঃ আমি ওকে ফুল পাঠাইনি বলে হয় ত রাগ করেছে নিনা। অথবা এও হতে পারে আমার মত এক জবড়জং ভালুকের সঙ্গে নাচতে চায় না সে। দোষ করেনি কিছু সে। এই সব তুচ্ছ জিনিসের ও মেয়েদের কাছে অনেক মূল্য আছে। মোট কথা ওদের জীবনের সুখ দুঃখ কবিতা ওরা নিজেরা রচনা করে।

সন্ধ্যাকালে মণ্ডপের চারিদিকে লম্বা শেকলের মত করে চীনে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এতে ত কুলায় না, এর আলোতে আঙিনা আলোই হয় না। হঠাৎ দুই প্রান্ত থেকে দুটি সূর্যের নীল আলোতে যেন সারা আঙিনাটা ধাঁধিয়ে দিল. এ দুটি হচ্ছে দুটি মস্ত বড় উচ্চশক্তির বৈদ্যুতিক আলো,—এতক্ষণ পর্যন্ত সবুজ লতাপাতার আড়ালে সন্তর্পণে লুকানো ছিল। আশেপাশের বার্চ আর হর্নবীম গাছগুলি যেন এবার মাথা তুলে দাঁড়াল। ওদের নিশ্চল কুণ্ঠিত শাখা-গুলি উজ্জ্বল কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে রঙ্গমঞ্চের সামনের দৃশ্যপটের মত দেখাতে লাগল। ওদের পিছনে আবছা ধূসর সবুজ আলোর মাঝে অন্যান্য

গাছের গোল খাঁজ কাটা মাথাগুলি দেখাতে লাগল যেন ঘন কৃষ্ণ আকাশ পটে আঁকা কতকগুলি অস্পষ্ট বনরেখা। স্তেপে ঘাসফড়িঙদের কোরাস সুরু হয়ে গিয়েছিল, অদ্ভুত ঐকতান এ,—ডাইন বাঁ উপর—সর্বস্থান থেকে যেন মাত্র একটি ফড়িঙ তান ধরেছে, ব্যাণ্ডের বাজনা এ তানকে ডুবিয়ে দিতে পারছিল না।

বল-নাচ চলতেই লাগল,—ক্রমেই জমে উঠছে নাচ। চলেছে একটির পর একটি। ব্যান্ড বাদকেরা যে একটু নিঃশ্বাস ফেলে নেবে তার অবসর নেই। রূপকথার পরিবেশে সঙ্গীত মদিরা পান করে মহিলারা যেন সব মত্ত হয়ে উঠেছেন।

মানুষের উত্তপ্ত দেহ আর সেণ্টের গন্ধের সঙ্গে সোমরাজ পচাপাতা ভিজে বনের গন্ধ এবং দূর থেকে আসা নতুন-কাটা-ঘাসের মৃদু সুবাস মিশে এক অদ্ভুত সুরভির সৃষ্টি করেছে। পাখা চলেছে সর্বত্র, দেখে মনে হচ্ছে বিচিত্র পক্ষ পাখীরা যেন ডানা মেলে উড়বার উপক্রম করছে। কথা ও হাসির উচ্চ রবের সঙ্গে বালুকাস্তীর্ণ মাটির উপর পা ফেলার থপ থপ শব্দ একত্র মিশে একঘেয়ে হলেও এক রকম মধুর কলধ্বনির সৃষ্টি করছে,—ব্যান্ড থামলে এ ধ্বনিটা হয়ে উঠছে আরও প্রবল।

ববরভ নিনার দিক থেকে একবারও চোখ ফিরাচ্ছিল না। দু'একবার নিনার পোষাকের ঘেষা লেগে গেল তার গায়ে, পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যাবার সময় তার গায়ের বাতাসও লাগল একবার ববরভের গায়ে। ববরভ দেখতে লাগল নাচবার সময় সে তার বাঁ হাতটা রাখছে নৃত্য-সঙ্গীর কাঁধের উপর, অসহায়ের মত বার বার মধুর ভঙ্গীতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে,—এক একবার তার মাথাটা এমন করে নোওয়াচ্ছে যে দেখে মনে হচ্ছে এখনই সে সেটা তার সঙ্গীর কাঁধের উপর রাখবে।

নিনা যখন দ্রুতগতিতে ঘুরছে তখন মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য তার সাদা পেটিকোটের নীচের লেজটা চোখে পড়ছে ববরভের, চোখে পড়ছে সুন্দর গুল্ফ-শোভিত কালো স্টকিংপরা ছোট্ট দুটি পা,—উপরে 'কাফ মাসলের' কঠিন বক্ররেখা। এই সব দেখবার সময় নিজের মনেই লজ্জা লাগছে তার, এবং আর যারা নিনাকে দেখতে পাচ্ছে তাদের উপর হচ্ছে রাগ।

মজুরকা সুরু হল। রাত্রি তখন ন'টার কাছাকাছি। মজুরকা নাচে নিনার নৃত্য সঙ্গী ছিল। সেজহেভস্কী, হঠাৎ নাচের একটা জটিল ভঙ্গী নিয়ে সেজ-হেভস্কী বিব্রত হয়ে পড়ায় নিনা সেই সুযোগে সঙ্গীতের তালে তালে গা ফুলিয়ে মাথার এলো চুল দু'হাতে ধরে সাজঘরের দিকে ছুটে গেল। ববরভ আঙিনার অপর প্রান্ত থেকে তা দেখতে পেয়ে সে-ও সেই দিকে ছুটল। সেখানে গিয়ে সাজঘরের বাইরে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে রইল সে। ওখানে বেশ খানিকটা অন্ধকার। মন্ডপের পিছনে কয়েকখানা তক্তা ফেলে তৈরী ছোট্ট সাজঘরটা ঘন-ছায়ার আড়ালে, কেউ সহজে দেখতে পায় না। ববরভ ঠিক করলে নিনা না বেরুনো পর্যন্ত সে ওখানে অপেক্ষা করবে, এবং বেরুলেই তার মুখ থেকে

ব্যাপার কি সব বুঝে নেবে। বুকটা তার তখন বেদনায় টনটন করছিল, কাঁপ-ছিল—মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলগুলি ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

মিনিট পাঁচেক পরে নিনা সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ববরভ ছায়া থেকে সরে এসে তার সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ সামনে এমনি করে একটা লোক পড়ায় সে চমকে অস্ফুট একটা শব্দ করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

নিজের অজ্ঞাতেই হাত দুটি যুক্ত করে একরকম অনুনয়ের সুরেই ববরভ বললে,—নিনা গ্রিগোরেভনা, তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছ কেন, বলত? তোমার ব্যবহারে কত কষ্ট পাচ্ছি আমি, দেখছ না? আমার দুঃখ দেখে মজা পাচ্ছ তুমি, তুমি আমায় দেখে হাসছ?

নিনা নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উত্তর দিলে, কি বলতে চাও তুমি, কিছুই বুঝছি না আমি। তোমায় দেখে হাসবার কথা কোনদিন ভাবতেও পারি নি আমি।

নিনার মনে তাদের বংশের ধারা কাজ করছিল তখন।

ববরভ ম্রিয়মান হয়ে বললে, ভাবতেও পার নি তুমি? তবে আজকের রাতে তোমার এ ব্যবহারের মানে কি?

কোন ব্যবহার?

আজ তুমি আমার প্রতি উদাসীন,—একরকম বিরূপ বললেও হয়। তুমি আমার কাছ থেকে কেবল সরে সরে বেড়াচ্ছ, আমার উপস্থিতি তোমার অপ্রীতিকর।

তোমার উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে আমার কিছু এসে যায় না।

সে ত আরও খারাপ। আমি দেখছি ভয়ংকর একটা পরিবর্তন এসেছে তোমার মাঝে. কেন—তা বুঝছি না। প্রাণ খুলে কথা বল, নিনা,—সত্যি করে বল, আমি জানি তুমি আজও আমার কাছে সত্যি কথাই বলবে। ব্যাপারটা যতই নিষ্ঠুর হক, ভয়ংকর হক তুমি সত্যি করে বল। অমরা একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলি।

হেস্তনেস্ত করবার কি আছে? আমি ত বুঝতেই পারছি না তোমার কথা।

কপালের দু' পাশে রক্ত উঠে দপদপ করছিল ববরভের, সেখানটা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরলে সে। বললে,—

হাঁ, বুঝতেই পারছ তুমি নিশ্চয়। ভান করো না। হেস্তনেস্ত করবার আছে। আমরা পরস্পরকে অনেক মিষ্টি-মধুর কথা বলেছি, সে-সব কথা এক-রকম প্রেমেরই স্বীকারোক্তি; যে দিব্যসুন্দর মুহূর্তে এই সব কথা হয়েছে তখন আমাদের মধ্যে একটা কোমল মধুর সম্বন্ধের জালও রচিত হয়ে গেছে। আমি জানি তুমি এখনই বলবে—আমি ভুল বুঝেছি। হয় ত তাই। কিন্তু তুমিই কি আমায় এই বনভোজনে ডেকে আন নি—যাতে আমরা নির্বিঘ্নে কথাবার্তা বলতে পারি?

নিনা হঠাৎ ববরভের জন্য দুঃখ বোধ করল মনে। মাথাটা নীচু করে সে

বললে, হাঁ, আমিই আসতে বলেছিলাম তোমায়। আমি তোমায় বলতে যাচ্ছিলাম —বলতে যাচ্ছিলাম যে আমাদের এখন চিরকালের জন্য ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার।

কে যেন ববরভের বুকে হঠাৎ জোরে এক ঘা দিল, পাক খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে। মুখটা এমন বিবর্ণ হয়ে গেল যে ঐ অন্ধকারেও তা চোখে পড়ে।

আর্তনাদ করে সে বলে উঠল, ছাড়াছাড়ি? নিনা গ্রিগোরেভনা, বলো না ও কথা, বিচ্ছেদের কথা বড় কঠিন, বড় তিক্ত।

তবু বলতে আমার হবেই।

হবেই?

হাঁ,—আমি চাই নি এ।

কে তবে?

কে যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। নিনা আঁধারে গা ঢাকা দিলে। তারপর সেখান থেকেই চুপি চুপি বললে, কে? এই যে তিনি আসছেন।

আসছিলেন আনা আফানাসেভ্না। কাছে এসে নিনা আর ববরভের দিকে কটমট করে চাইলেন তিনি, তারপর নিনার হাত ধরে তিরস্কারের সুরে বললেন, পালিয়ে এলি কেন? এই আঁধারে দাঁড়িয়ে তোর কি কথা? খুব মজা পেয়েছ, —না? আর এদিকে আমি তোমায় সারা রাজ্যি খুঁজে মরছি। তারপর হঠাৎ ববরভের দিকে ফিরে তিনি উচ্চ কণ্ঠে তিরস্কার করে বললেন, আর তোমাকেও বলি—তুমি নিজে যদি নাচতে না জান, না চাও, তবে তরুণী মেয়েদের আঁধার কোণে ডেকে এনে ফিস ফিস করে তাদের ভজাবার চেষ্টা না করে তাদের থেকে দূরে সরে থেক।

বলেই নিনাকে হাত ধরে টানতে টানতে তিনি নিয়ে চললেন।

ববরভও উচ্চকণ্ঠে তাঁর পিছন থেকে বলে উঠল, ভাববেন না, মাদাম,— ভজাবার মেয়ে আপনার এ নয়, তারপরই হো হো করে এমন উৎকট আর তিক্ত হাসি হাসতে লাগল যে মা আর মেয়েই দু'জনাই না পিছন ফিরে থাকতে পারলেন না।

আনা আফানাসেভ্না অমনি মেয়ের হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, দেখলি, বলেছিলাম না আমি যে লোকটা যেমনি বোকা তেমনি দুর্বিনীত। ওর মুখে থুথু দিলেও ও হাসবে—যেন কিছুই হয় নি। তারপর অপেক্ষাকৃত শান্ত সুরে তিনি বললেন, যাক, এখন মেয়েরা সব তাদের নাচের সঙ্গী বেছে নিচ্ছে, তুই গিয়ে খার্শনিনকে আমন্ত্রণ কর দেখি। তিনি এই সবে বাজনা শেষ করলেন,— ঐ যে মণ্ডপের দরজায়ই দাঁড়িয়ে তিনি!

কিন্তু মা, উনি নাচবেন কি করে, উনি নড়তেই যে পারেন না?

যা বলছি, তাই করো। একদিন ওঁকে মস্কোর শ্রেষ্ঠ নর্তক বলে মনে করা হোত। যাই হোক, ওঁকে ডাকলে,—খুশি হবেন উনি।

ববরভের চোখ দুটি যেন কুয়াশায় ঢেকে গেল। তার মাঝ দিয়েই সে দেখলে

নিনা হালকা পায়ে আঙিনা পার হয়ে খাশনিনের সামনে এসে মন-কাড়া হাসি হেসে দাঁড়াল, মাথাটা এক দিকে একটু হেলিয়ে মনভোলানো ভঙ্গীতে আবেদন জানাচ্ছে সে। খাশনিন তার উপর একটু নত হয়ে শুনলেন তার কথা। সহসা উচ্চ হাসিতে তাঁর বিরাট দেহ কেঁপে উঠল, মাথা নাড়লেন তিনি। নিনা অনেকক্ষণ ধরে সাধাসাধি করার পর মুখ ভার করে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু খাশনিন তাঁর বিপুল দেহের পক্ষে যা এক রকম অসম্ভব এমন এক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার হাত ধরে নিজের কাঁধটায় একটা ঝাঁকুনি দিলেন, যেন বলতে চান ছেলেপিলেদের মজা দেখানোই যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত, তাই হক। এবার তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি নিনার দিকে। আর যারা সব নাচছিলেন তারা তাদের নাচ থামিয়ে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল—এই নূতন যুগল মূর্তির দিকে। খাশনিন মাজুরকা নাচবেন—দৃশ্যটা উপভোগ করবারই মত।

খাশনিন বাদ্যের প্রথম তালের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন, তারপর হঠাৎ দিব্য-গম্ভীর ভঙ্গীতে তাঁর সঙ্গিনীর দিকে ফিরে এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রথম পদক্ষেপ করলেন যে দর্শকেরা সবাই বুঝলেন যে একদিন খুব ভালই নাচতে পারতেন তিনি। নিনার দিকে তাকিয়ে তিনি এমন এক ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন যার মাঝে আছে কিছুটা গর্ব, কিছুটা আনন্দ এবং কিছুটা—এস না কেমন পারি—ভাব,—তার পরে তিনি যেন প্রথমে না নেচে সঙ্গীতের তালে তালে ঈষৎ হেলে দুলে স্প্রিং-এর মত পা ফেলে হেঁটে চললেন। দেখে মনে হতে লাগল তাঁর বিশাল দেহ তখন নৃত্যের প্রতিবন্ধক না হয়ে তাতে ধ্যানগম্ভীর সুষমা দান করছে। ঘুরবার জায়গায় গিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য থেমে, গোড়ালিতে গোড়ালি ঠোক্কর লাগিয়ে নিনাকে একটা ঘুরপাক দিয়ে ঐ মোটা পায়েই আঙিনার কেন্দ্রস্থানের দিকে স্প্রিং-এর মত ছুটে চললেন, মুখে তাঁর মৃদুমন্দ হাসি। যে জায়গা থেকে তিনি নাচ শুরু করেছিলেন অতি দ্রুত অপরূপ ভঙ্গীতে নিনাকে এক ঘূর্ণি দিয়ে ঠিক তার সামনে এনে ফেললেন, তারপর তাকে এক চেয়ারে বসিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়ালেন।

মহিলারা অমনি তাঁর চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়ালেন, প্রত্যেকেই চান একবার তিনি তাঁর সঙ্গে নাচেন। কিন্তু নাচের এই অনভ্যস্ত পরিশ্রম তাঁকে ক্লান্ত করে ফেলেছিল, নিজের রুমাল দিয়ে বাতাস খেতে খেতে তিনি তখন হাঁফাচ্ছিলেন, তাই তিনি হেসে হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন,—এই বুড়োকে একটু অনুকম্পা করুন আপনারা। নাচের বয়স আমার অনেক দিন পার হয়ে গেছে,—তার চেয়ে চলুন খেতে বসি গিয়ে।

বনভোজনকারীরা তখন খটখট করে চেয়ার টেনে টেনে টেবিলের ধারে বসতে লাগল। ববরভ—নিনা তাকে যেখানে ফেলে চলে গেছে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। কখনও বা সে এক নিদারুণ অপমান-বোধে কষ্ট পাচ্ছিল, কখনও বা নৈরাশ্যে, উদ্বেগে। চোখে জল ছিল না তার, কিন্তু চোখ দুটি তার যেন পুড়ে যাচ্ছিল—

বুকের মাঝে শুকনো কাঁটার মত কি যেন ঠেলে ঠেলে উঠছিল। বাজনা তার মাথার মাঝে কেমন যেন এক একঘেয়ে বেদনার প্রতিধ্বনি তুলছিল।

হঠাৎ সে শুনলে ডাক্তার তারই পাশে দাঁড়িয়ে বলছে,—আরে, আমি কতক্ষণ ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে দিব্যি পালিয়ে রয়েছ? আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমায় তাসের আড্ডায় ধরে নিয়ে গেল। কোন রকমে পালিয়ে এসেছি আমি। চল এবার খেতে বসা যাক। দুটি সীট রিজার্ভ করে রেখে এসেছি আমি,—আমরা দুজনে এক সঙ্গে বসতে পারব।

ববরভ ক্লান্তস্বরে বললে,—তুমিই যাও, ডাক্তার, আমি আর যাব না, খেতে ইচ্ছে নেই আমার।

আসছ না তুমি?—বেশ, বেশ!

ডাক্তার ববরভের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললে,—কিন্তু, বন্ধু, কি হয়েছে তোমার বলত, মুখ যে তোমার একেবারে চুপসে গেছে। ডাক্তার তখন সত্যিকার দরদ দিয়ে বললে,—যাই বল না, তোমাকে আমি এখানে একা ছেড়ে যাচ্ছি না। এস, চলে এস, আর তর্ক নয়।

গোল্ডবার্গ তাকে হাত ধরে টানতে থাকলে সে তার পিছু পিছু যন্ত্রচালিতের মত যেতে যেতে বলতে লাগল,—কেমন যেন লাগছে আমার, ডাক্তার, বড্ড খারাপ লাগছে।

পাগলামি করে না,—এস। পুরুষ মানুষ না তুমি? একটা হাত দিয়ে ববরভকে গভীর প্রীতিভরে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ডাক্তার বলতে লাগল,—তোমার বুকটা কি খুব ব্যথা করছে, না বিবেকের দংশন? আমি এক সর্বরোগের ওষুধ প্রেস্‌ক্রিপশন করছি তোমার জন্য। বন্ধু দানিয়া, চল কিছু পান করি গিয়ে আমরা, বুকে বল পাবে তুমি। সত্যি বলছি, ভাই, আমাদের ঐ আন্দ্রিয়াসের কাছে বেশ কয়েক বোতল কনিয়াক্‌ আছে। আর কি খাওয়াটাই ও খেতে পারে ও-জিনিস? বেটাছেলে, বেটাছেলের মত হও তুমি। জান. আন্দ্রিয়াসের তোমাকে বড় পছন্দ! এস।

ডাক্তার এই সব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ববরভকে টানতে টানতে নিয়ে গেল মণ্ডপে। সেখানে পাশাপাশি বসল গিয়ে দুজনে। তাদের টেবিলে বসেছে আন্দ্রিয়াসও।

আন্দ্রিয়াস অনেক দূর থেকেই ববরভকে দেখে হাসছিল, এবার কাছে পেয়ে পাশে বসিয়ে তার পিঠে আদরের চাপড় দিতে লাগল।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত পরম স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলতে লাগল, তোমাকে কাছে পেয়ে বড্ড খুশি হয়েছি। বড় ভাল ছেলে তুমি, এই রকমটিই আমার বড় পছন্দ . .কনিয়াক?

আন্দ্রিয়াসের তখন মত্তাবস্থা। তার ফ্যাকাশে মুখে কাঁচের মত চোখ দুটি তখন জ্বলজ্বল করছে। প্রায় মাস ছয়েক পরে জানা গেল এই অতি গম্ভীর,

কঠোর পরিশ্রমী প্রতিভাবান লোকটি প্রতি সন্ধ্যায় নির্জনে একা একা মদ খেয়ে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে।

ববরভের মনে হল, একটু খেলে বোধ হয় আমার ভাল হয়, একটু ভাল বোধ করব। মরুক গিয়ে, একটু খেয়েই দেখি না।

বোতলটায় ঝাঁকি দিয়ে ধরে অপেক্ষা করছিল আন্দ্রিয়াস। ববরভ একটা বড় গেলাস এগিয়ে ধরল।

ভুরু টান করে আন্দ্রিয়াস বললে,—ঐটায় করে খেতে চাও?

ঈষৎ ম্লান হাসি হেসে ববরভ বললে, হাঁ।

বেশ ভাল কথা। কখন থামতে হবে বলো।

গ্লাসই বলে দেবে।

চমৎকার। লোকে মনে করবে তুমি সুইডেনের নৌবাহিনীতে কাজ করে এসেছ।...হয়েছে?

ঢালতে থাক।

কিন্তু, বন্ধু ভুলে যেও না—এ হচ্ছে ভ্ সপ্ ব্রান্ডের 'মারতেল্'—সত্যিকার কড়া পুরানো কনিয়াক।

ঢালতে থাক. ভাবনার দরকার নেই।

ববরভ দুঃখের জ্বালায় নিজের মনেই বলতে লাগল,—ধরো, যদি আমি মদে চুর হয়েই পড়ি তা হলে? বেশ ত, দেখুক ও।

গ্লাস ভরতি হয়ে গেল। আন্দ্রিয়াস বোতলটা নামিয়ে রেখে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল ববরভের দিকে। ববরভ এক ঢোকে সবটুকু শেষ করলে। শরীরটা তার একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল।

ববরভের চোখের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আন্দ্রিয়াস বললে, কিছু যেন তোমাকে খেয়ে ফেলবার মত করছে?

ববরভ বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বললে, হাঁ।

বুকটায় খাবল দিচ্ছে কিছু?

হাঁ।

হুঁ,—তা হলে আরও খানিকটা দরকার তোমার।

দাও, গ্লাসে ভর্তি কর,—ববরভ বিষণ্ণ সুরে নিতান্ত অনুগতের মত বললে।

মনের জ্বালাটা যদি কিছুটা কমে এই ভেবে ববরভ বিরক্তির সঙ্গে ঢক ঢক করে মদ গিলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য মদে কোন কিছুই হল না তার। সে যত খেতে লাগল দুঃখ তার তত বেশি যেন বেড়ে উঠতে লাগল, চোখ থেকে আরও বেশি জল পড়তে লাগল, চোখ করতে লাগল জ্বালা।

পরিবেষক ভৃত্যেরা চারিদিকে শ্যাম্পেন পরিবেষণ করে বেড়াতে লাগল। খাশনিন তাঁর আসন থেকে উঠে দুটি আঙুলে মদের গ্লাস ধরে তার মাঝ দিয়ে ঝাড়লণ্ঠনের আলোর দিকে চাইলেন। সব কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল, শব্দের

মাঝে শুধু ঘাস-ফড়িঙের বিরামহীন ঝি'-ঝি', আর 'আর্ক ল্যাম্পে'র হিস্‌হিস্‌।
খাশনিন খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সুরু করলেন—
ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ!
একটু থেমে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন তিনি, তারপর বলে চললেন, —আমি যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকলের কুশল কামনা করে এই পান করছি, আমার বিশ্বাস তাতে কারোই কোন সন্দেহ নেই। ইভানকোভোতে আমায় যে বিপুল সম্বর্ধনা করা হয়েছে তার কথা আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না, আজকের এই বনভোজনটির কথাও আমি চিরকাল আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করব। যে সব মহিলারা অনুগ্রহ করে এতে যোগদান করেছেন তাঁদের সহৃদয়তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করছি আমি।
খাশনিন এইটুকু বলে গ্লাসটা একটু উ'চু করলেন, তারপর ত্বরিত হস্তে ওটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ও থেকে একটুখানি পান করলেন।
আমার সহচর ও সহকর্মিবৃন্দ, এবার আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা যদি বক্তৃতার মত শোনায় তাতে নিন্দা করবেন না আমাকে। আপনাদের অধিকাংশের তুলনায় আমি বৃদ্ধ, এবং বৃদ্ধদের বক্তৃতা দেবার অধিকার আছে।
আন্দ্রিয়াস অমনি ববরভের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে,—দেখ, দেখ 'রাসকেল' সেজহেভস্কীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ!
খাশনিন বলে যেতে লাগলেন, আমি একটা পুরানো বহু-উচ্চারিত সম্পাদকীয় মন্তব্যের পুনরুচ্চারণ করেই বলতে যাচ্ছি, আমরা যেন আমাদের পতাকা উ'চুতেই ধরে রাখি। আমাদের ভুললে চলবে না যে পৃথিবীর যে-কোন কাজে আমরা অত্যাবশ্যক, এবং ভবিষ্যতে আমাদেরই জয়। সারা পৃথিবীকে আমরাই রেল-ওয়ের জালে ছেয়ে ফেলেছি, পৃথিবীর পেট চিরে তার নাড়িভু'ড়ি বের করে তাই দিয়ে আমরা বন্দুক, কামান, ব্রিজ, এঞ্জিন, রেল, বড় বড় কত যন্ত্র তৈরি করেছি—করি নি কি? আমাদেরই বুদ্ধি বলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বড় বড় সব প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বাণিজ্যে খাটছে না কি? ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, প্রকৃতি একটি জাতিকে গড়ে তুলবার জন্য তার থেকে মাত্র দু'তিন ডজন লোককে বেছে নেয় এবং তাই দিয়েই সে তার গঠন কার্য করিয়ে নেয়। সুতরাং হে ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আপনারা সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের প্রাপ্য গৌরব অর্জন করতে সাহস ও যত্ন অবলম্বন করুন! হুর্‌-রে।
সঙ্গে সঙ্গে বনভোজনকারীরা সবাই হুর্‌-রে বলে উঠলেন—সেজহেভস্কীর গলা উঠল সবার উপরে।
ওরা সবাই এবার খাশনিনের কাছে এগিয়ে গেলেন তাঁর গ্লাসে গ্লাস লাগিয়ে ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলতে।

ডাক্তার ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললে, কি জঘন্য!

এরপর বক্তৃতা দিতে উঠলেন, শেলকভনিকোভ।

তিনি জোর গলায় বলে উঠলেন, ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের পৃষ্ঠপোষক, প্রিয় গুরু এবং আজ এই মুহূর্তে আমরা যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছি আসুন সেই মহামান্য ভাসিলি তেরেন্তিভিচ্ খার্শাননের স্বাস্থ্যপান করি আমরা! হুর্‌-রে!

বনভোজনকারীরা একসঙ্গে হুর্‌-রে বলে চীৎকার করে উঠে গ্লাসে গ্লাস লাগাতে আবার তাঁরা খার্শাননের কাছে এগিয়ে গেলেন।

এর পর বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলল। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে, অনুপস্থিত শেয়ার-হোল্ডারদের উদ্দেশ্যে, বনভোজনে উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে, অনুপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপান করা হল। কোন কোন বক্তৃতার মানেই ঠিক বোঝা গেল না, কৌতুক সৃষ্টি করতে গিয়ে কোন কোন বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াল অশ্লীল।

ডজনখানেক শ্যাম্পেন বোতল শেষ হয়ে গেছে, তার ক্রিয়াও সুরু হয়ে গেছে, স্খলিত কণ্ঠের গুঞ্জরণ সুরু হয়েছে। প্রত্যেক বক্তাই বক্তৃতা সুরু করার আগে বেশ কিছুক্ষণ গ্লাসের উপর ছুরির ঘা লাগাচ্ছেন। দূরে সরানো ছোট্ট একটা টেবিলের ধারে বসে প্রিয়দর্শন মিলার একটা রুপোর বাটিতে মদের গরম পাঁচমিশেলি তৈরি করছে।

হঠাৎ খার্শানন আবার উঠে দাঁড়ালেন, মুখে তাঁর একটু দুষ্টুমিভরা হাসি।

মধুর বিনয়ের সুরে তিনি বলতে সুরু করলেন—ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজকের এই অনুষ্ঠানটি আর একটি পারিবারিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে। আসুন আমরা এক বাগদত্ত তরুণ তরুণীকে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। নিনা গ্রিগোরেভনা জিনেঙ্কো আর—এর পরেই কিছুটা থেমে যেতে হল খার্শাননকে, কারণ সেজহেভস্কীর পুরা নাম ভুলে গিয়েছিলেন তিনি, অগত্যা তিনি আমতা আমতা করে বলতে বাধ্য হলেন, আর আমাদের সহকর্মী মিঃ সেজহেভস্কীর স্বাস্থ্যপান করি আমরা।

খার্শাননের কথায় যে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠল তার তুলনায় আগেকার হর্ষধ্বনি সব তুচ্ছ, কারণ ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। আন্দ্রিয়াস হঠাৎ তার পাশে একটা কাতরানির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে ববরভ,—যন্ত্রণায় তার বিবর্ণ মুখটা একেবারে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

আন্দ্রিয়াস তার কানে কানে বলবার মত করে বললে, বন্ধু সহকর্মী, সব ব্যাপার তুমি এখনও জানো না, আমি যে সুন্দর বক্তৃতাটি দিতে যাচ্ছি এখন তা একটু কান পেতে শোন।

চেয়ারটা উল্টে ফেলে গ্লাসের অর্ধেক মদ চলকে দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল আন্দ্রিয়াস। সে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল,—ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ,

আমাদের মহামান্য ভোজদাতা তাঁর মহানুভবতা ও সুবিবেচনার জন্যই যে তাঁর স্বাস্থ্যপান-বক্তৃতাটা অসম্পূর্ণ রেখে গেলেন, এটা সহজেই বোঝা যায়। আমাদের প্রিয় সহকর্মী সেজহেভস্কীর পদোন্নতির জন্যও আমরা তাকে অভিনন্দন জানাব, আমাদের মাঝেই কোম্পানীর 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস্'-এর কর্মসচিবের পদে উন্নীত হতে যাচ্ছেন তিনি। মহামান্য ভাসিলি তেরেন্তিভিচ নবদম্পতিকে—তাদের বিবাহ উপলক্ষে এই নতুন চাকরিটি একরকম যৌতুক দিচ্ছেন বলা যেতে পারে। আমাদের মাননীয় পৃষ্ঠপোষকের মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার বক্তৃতায় তিনি একটু অপ্রসন্ন হয়েছেন। যে কথাটা তিনি হঠাৎ বলে সবাইকে তাক লাগাবেন বলে অনুক্ত রেখেছিলেন, অসাবধানতাবশত সেটা আমি প্রকাশ করে ফেলেছি বলে আমি দুঃখিত, —ক্ষমা চাইছি আমি এরজন্য। যাই হোক, মিঃ সেজহেভস্কীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির দাবীতে আমরা আশা করি এখানেও তিনি যেমন আমাদের প্রিয় বন্ধু ও নিরলস কর্মী ছিলেন, পিতার্সবার্গে নতুন পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তিনি ঠিক তেমনটি থাকবেন। ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানি আপনারা কেউ তাঁকে ঈর্ষা করবেন না,—এই পর্যন্ত বলে আন্দ্রিয়াস সেজহেভস্কীর দিকে একবার বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাইল, তারপর আবার সুরু করল—ঈর্ষা করবেন না কারণ আমরা সবাই এত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর সৌভাগ্য কামনা করি যে—

হঠাৎ অশ্বক্ষুরের খটাখট আওয়াজ শুনে বক্তৃতা আর সে শেষ করতে পারলে না। ঝোপের মাঝ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল অশ্বারোহী, সামনে আসবার পর দেখা গেল ঘোড়াটি গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে, আরোহীর মাথায় টুপি নেই, সারা মুখ-খানা তার ভয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। লোকটি কনট্রাক্টর দেক্তেরেভের অধীনে কাজ করে,—একজন ফোরম্যান। ঘোড়াটা তার থর থর করে কাঁপছিল। আঙিনার মাঝখানে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে সে খার্শাননের কাছে এগিয়ে গেল, তারপর অন্তরঙ্গের মত নত হয়ে তাঁর কানে কানে কি যেন বলতে লাগল। আঙিনার সর্বত্র যেন মৃত্যুর নীরবতা নেমে এল, শব্দের মাঝে শুধু ঘাসফড়িঙের ঝিঁ-ঝিঁ—আর আলোর হিসহিসানি।

খার্শাননের মদিরাবিহ্বল মুখখানা হঠাৎ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাতের গেলাসটা নামিয়ে রাখতে গেলেন তিনি, হাত কাঁপছিল, খানিকটা মদ চলকে পড়ল টেবিল-ক্লথের উপর।

তিনি কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, বেলজিয়ানদের খবর কি?

উত্তরে ফোরম্যানটা একবার মাথা নেড়ে খার্শাননের কানে কানে আবার যেন কি বলতে সুরু করল।

ন্যাপকিনটা হাতে দলা-মোচড়া করতে করতে—'ধুত্তোরি' বলে খার্শানন উঠে পড়লেন চেয়ার থেকেঃ যত সব কাণ্ড! দাঁড়াও,—এখনই একটা টেলিগ্রাম নিয়ে যাও তুমি গবর্নরের কাছে।

এরপর তিনি উচ্চ কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—ভদ্রমহিলা—ভদ্রমহোদয়গণ,—

মিলে দাঙ্গা বেধেছে এখনই কিছু একটা করা দরকার, সুতরাং আমাদের সভা ভঙ্গ হল।

মনের রাগ চেপে আন্দ্রিয়াস ঘৃণাভরে বলে উঠলেন,—এমন যে হবে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।

সবাই ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, আন্দ্রিয়াস ধীরে সুস্থে একটা নতুন সিগার বের করে, দেশলাইয়ের জন্য কিছুক্ষণ পকেট হাতড়ালেন, তারপর তাঁর গেলাসটা আবার কনিয়াকে ভর্তি করে নিলেন।

১১

এইবার মদিরা-স্খলিত উন্মত্ত হট্টগোল সুরু হয়ে গেল। সবাই উঠে ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে আবোল-তাবোল বকতে বকতে উল্টে-পড়া চেয়ারের উপর আছাড় খেতে লাগল। মহিলারা কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি তাঁদের টুপি পরতে লাগলেন। সব চেয়ে মুস্কিল হল—এই সময়ে কে যেন আবার বৈদ্যুতিক আলোগুলি নিভিয়ে ফেলবার হুকুম দিয়েছিলেন। আঁধার দেখে মেয়েরা হিস্টিরিয়া রোগীর মত কান্নাকাটি সুরু করে দিলে।

তখন ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা বাজে। সূর্য ওঠেনি বটে, কিন্তু পূবের দিকে বেশ ফরসা হয়ে উঠেছে। আকাশের রঙটা কেমন একঘেয়ে ধোঁয়াটে, শীগগিরই বোধ হয় বৃষ্টি আসবে। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর পরই ঊষার এই বিদঘুটে আবছা আলোর মাঝে পড়ে সবার অবস্থাই যেন আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল, আরও হতভম্ব হয়ে পড়ল তারা, আরও মিইয়ে পড়ল। হঠাৎ যেন তারা আর এক জগতে এসে গেছে। লোকগুলির চেহারা দেখাচ্ছে যেন রূপকথায় শোনা কিম্ভুত-কিমাকার ভূতের মতন। রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত মুখখানি দেখাচ্ছে ভয়ংকর। মদে নোংরা টেবিলগুলির উপর প্লেট, গ্লাস, বোতল ইত্যাদি এলোমেলো ছড়ানো পড়ে রয়েছে, দেখলেই মনে হয়—একটা উৎকট ভোজ যেন সহসা কিসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গাড়ির কাছে যে হৈ চৈ চলছে সে আরও ভীষণ। ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে নাসিকাধ্বনি করছে, পেছিয়ে যাচ্ছে, লাগাম থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে, চাকায় চাকায় আটকে যাচ্ছে, ধুরো মটমট্ করছে। গাড়োয়ানরা নিজেদের মাঝে ও সব নিয়ে ভীষণ বাগ্‌বিতণ্ডা করছে। ইনজিনীয়াররা সব নিজের নিজের গাড়োয়ানকে ডাকছেন। রাত্রিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেলে যেমন হৈচৈ চলে এ যেন

অনেকটা সেই রকম। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শোনা গেল, কে যেন গাড়ি চাপা পড়ল, নয়ত গাড়ি চাপা পড়ে মারাই গেল।

ববরভ তার গাড়োয়ান মিত্রোফানকে খুঁজেই পাচ্ছে না। দু'একবার মনে হল গাড়ির ভিড়ের মধ্য থেকে মিত্রোফান তাকে ডাকছে, কিন্তু গাড়িগুলির ওখানে ভিড় ক্রমশই এত বেড়ে উঠতে লাগল যে সেখানে যাওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব হল না।

সহসা জনতার মাথার উপরে একটা বিরাট প্যারাফিন টর্চ জ্বলে উঠল,—সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শোনা গেল, ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা পথ ছাড়ুন, সরে দাঁড়ান, পিছনে সরে দাঁড়ান। প্রবল চাপের ফলে জনতার মাঝে যেন এক ভীষণ ঢেউ উঠল, সেই ঢেউয়ে ববরভকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলল। মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে সে দুই গাড়ির আগু-পিছুর মাঝে কীলকের মত আবদ্ধ হয়ে পড়ল। সেখান থেকেই সে দেখতে পেল গাড়িগুলি দ্রুত দুদিকে সার দিয়ে মাঝ দিয়ে এক চওড়া পথ তৈরী করে দিল এবং সেই পথ দিয়ে খার্শনিনকে নিয়ে তার ট্রইকা চলল। ট্রইকার উপর কম্পমান মশালের শিখা খার্শনিনের বিরাট দেহের উপর রক্তের মত লাল আলো ফেলতে লাগল।

সমস্ত দিক থেকে দলিত-পিষ্ট হয়ে—ভয় যন্ত্রণা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে জনতা ট্রইকার চারিদিকে উচ্চরবে চিৎকার সুরু করে দিল। ববরভের কপালের দুপাশ দব্‌দব্‌ করতে লাগল। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল ট্রইকার আরোহী যেন খার্শনিন ন'ন.—প্রাচ্যের যে-সব দেবমূর্তিবাহী রথচক্রতলে শোভাযাত্রাকালে ধর্মোন্মত্ত জনগণ দিব্য ভাবোন্মাদে নিজেদের দেহ নিক্ষেপ করে, এ যেন তাদেরই মত শোণিতাপ্লুত কোন দেবতা। নিষ্ফল ক্রোধে কাঁপতে লাগল সে।

খার্শনিনের গাড়ি বেরিয়ে গেলে গাড়ির চাপও একটু কম পড়ল, ববরভ তখন পিছন ফিরে দেখে, যে গাড়ির সম্মুখভাগ তার পিঠে এসে লেগেছিল, সেটা তার নিজেরই ফিটন। মিত্রোফান সামনের বাকসে বসে মশাল জ্বালাচ্ছে।

ববরভ তখনই গাড়িতে উঠে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, কারখানায় চলো, জলদি। দশ মিনিটের মাঝে আমাদের সেখানে হাজির হওয়া চাই, বুঝলে?

মিত্রোফান রুক্ষস্বরে বললে, হাঁ, সার!

অন্যান্য বনেদী গাড়োয়ানরা যেমন করে, ঠিক তেমনি করে ফিটনটার চারি-দিক ঘুরে ডাইনে থেকে সে ওর বাক্‌সে উঠে বসল, তারপর লাগামটা হাতে নিয়ে ববরভের দিকে একটু ফিরে বললে, ঘোড়া যদি মারা যায়, আমাকে দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু।

না।

মিত্রোফান বিশেষ সাবধানে গাড়ি ঘোড়া ভিড় কাটিয়ে অতি কষ্টে নিজেদের ফিটনটা বের করে আনল। সংকীর্ণ বনপথে এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোড়ার লাগাম দিলে ছেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জোর টানে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলল।

উ'চু নিচু রাস্তার উপরে গাছের সব লম্বা লম্বা শেকড় এসে পড়েছিল, তার উপর দিয়ে ফিটন লাফিয়ে লাফিয়ে ঘড় ঘড় করে ছুটে চলল। কখনও বাঁ-দিকে কখনও ডান দিকে কাত হয়ে হয়ে আরোহী ও গাড়োয়ান দু'জনকেই টাল সামলাতে হচ্ছিল।

মশালের লাল শিখা এদিক ওদিক ঘুরে গর্জন করছিল, তার সঙ্গে গাছের কিম্ভুতকিমাকার দীর্ঘ ছায়াগুলিও ফিটনের চারিদিকে ঘুরছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ফিটনের আশেপাশে যেন দীর্ঘ শীর্ণ অস্পষ্ট কতকগুলি প্রেতমূর্তি কৌতুক নৃত্য নেচে নেচে চলছে। ভূতগুলি কখনও বা বিরাট আকার ধারণ করে ঘোড়াগুলিকে ধরে ফেলছে, পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, ফিটন দ্রুতবেগে এগিয়ে গেলে ওগুলি দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে ববরভের পিছনের অন্ধকারে আত্মগোপন করছে, তার পরেই কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঝোপের মাঝে ছুটে এসে লাফিয়ে গিয়ে ফিটনের গা ঘেষে দাঁড়াচ্ছে, কখনও বা তারা সারি বেঁধে হেলে দুলে চমকে চমকে চলেছে, দেখে মনে হয় নিজেদের মাঝে চুপে চুপে কি যেন বলাবলি করতে করতে ছুটেছে। কয়েকবার রাস্তার উপর ঝুলে পড়া সরু হাতের মত ঘন ব্রাশ-উডের ডাল মিত্রোফান আর ববরভের মুখে চাবুক লাগিয়ে দিল।

গাড়ি এবার বন পার হয়ে এল। খানার ভিতর দিয়ে ঝুপঝাপ শব্দে চলতে লাগল ঘোড়া, মশালের লাল আলোর নাচন লেগে খানার জল দেখাতে লাগল যেন চষা ক্ষেত। ঘোড়াগুলি হঠাৎ ধাপে চলে ফিটনটাকে একটা খাড়া পাহাড়ের মাথায় নিয়ে চলল। সামনেই পড়ল একটা ভয়ংকর কালো মাঠ।

ফিটন যদিও তখন প্রাণপণে ছুটে চলেছে, তবুও ববরভ অধীর উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, মিত্রোফান, আরও জলদি চালাও, নইলে পৌঁছোতে পারব না কিছুতেই।

মিত্রোফান নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করতে হুস করে একটা শব্দ করে ফেয়ার-ওয়ের পিঠে কষে একটা চাবুক লাগিয়ে ভাবতে লাগল, তার মনিবের আজ কি হল, যে ঘোড়াকে তিনি এত ভালবাসতেন, যে কোন কষ্ট দিতে চাইতেন না—তাদের, তাদের কথা একবার ভুলেও ভাবছেন না!

ওদিকে চক্রবাল রেখার ওখানে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড চলেছে, চলন্ত মেঘের উপর তার প্রতিবিম্ব যেন কেঁপে কেঁপে চলেছে। অগ্নিদীপ্ত আকাশের দিকে চেয়ে ববরভের মনটা এক নিষ্ঠুর বিজয়গর্বে উল্লসিত হয়ে উঠল। আন্দ্রিয়াসের উদ্ধত নিষ্করুণ স্বাস্থ্যপান-বক্তৃতা তার চোখ খুলে দিয়েছে, গত সন্ধ্যায় নিনার হৃদয়হীন ঔদাসীন্য, মাজুর্কার সময় তার মায়ের রাগ, খাশনিনের সঙ্গে সেজ-হেভস্কীর অন্তরঙ্গতা সব কিছুর অর্থ এখন তার কাছে জলের মত পরিষ্কার। কারখানায় খাশনিন নিনার সঙ্গে প্রেম করছেন বলে যে-সব গুজব উঠেছিল সে-সব কথাই মনে পড়তে লাগল এখন তার। ঘৃণায় অন্তরটা ভরে উঠল তার, নিদারুণ লাঞ্ছনা বোধে মুখ শুকিয়ে উঠল, নিজের মনেই সে বলতে লাগল, ঐ

লাল মাথা দানবটার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। সামনে পেতাম এখন একবার তরুণী-দেহ-ক্রেতা ঐ পাষণ্ড বুড়োটাকে,—ঐ সোনায় ভর্তি মোটা নোংরা বস্তাটাকে. —তা হলে আমি ওর পরিপাটি ঘুচিয়ে দিতাম; ওর তামার কপালে আচ্ছা করে একটা ছাপ লাগিয়ে দিতাম আমি।

এত যে মদ খেয়েছে ববরভ তাতে একটুও মাতাল হয় নি সে. কিন্তু ভিতরের শক্তি উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে তার. কোন কিছু একটা করবার অধীর আকাঙ্ক্ষা জাগছে তার মনে। ভীষণ কাঁপছে সে. দাঁতে দাঁত ঘষা লেগে খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে, জ্বরের বিকারে লোকের মাথায় যেমন সব চিন্তা আসে তেমনি চিন্তা আসছে তার মনে। নিজের অজ্ঞাতেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে সে. কাতরাচ্ছে, কখনও হো হো করে হাসছে. সঙেগ সঙেগ হাত দুটো তার আপনা আপনি মুষ্টি বন্ধ হয়ে আসছে।

মিত্রোফান বিনীতভাবে বললে, সার. আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বাড়ি গেলে ভাল হয় না ?

ভীষণ রেগে গিয়ে ববরভ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, চুপ কর, মূর্খ। এগিয়ে চল।

একটু পরেই একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়ে তারা দেখতে পেল সারা কারখানাটা লালচে সাদা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে—ওর ওপারে কাঠের গুদামটায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড চলেছে। আগুনের পিছনে অসংখ্য ছোট ছোট কালো মানুষের মূর্তি সব এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। শুকনো কাঠ পোড়ার পটাপট আওয়াজ দূর থেকেই বেশ কানে আসছে। হঠাৎ ঝলকে-ওঠা আগুনের আলোতে উষ্ণ বায়ুপ্রবাহক কক্ষ ও ধাতুগলানো চুল্লীর গোল দুর্গের মত বাড়িগুলি মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েই তখনই আবার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। আগুনের লালচে আভা বড় চারকোণা দীঘিটায় ঘোলাটে জলের উপর পড়ে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। দীঘির উঁচু সেতুটার উপর দিয়ে কালো এক বিরাট জনতা দগ্ধ হতে হতে এগিয়ে চলেছে। ঐ সংকীর্ণ জায়গায় আটকে-পড়া জনতা থেকে দূর সমুদ্র গর্জনের মত এক অস্পষ্ট অশুভ অদ্ভুত আওয়াজ কানে এসে লাগছে।

এই মূর্খ. কুকুরের বাচ্চা. কোথায় গাড়ি চালাচ্ছিস, মানুষ দেখতে পাস না ? ধমকানিটা এল রাস্তার সামনে থেকে,—পরক্ষণেই চোখে পড়ল দীর্ঘাকার. দাড়ি-ওয়ালা একটা লোক। লোকটা যেন হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে. মাথায় টুপি নেই তার, সারা মাথা জুড়ে সাদা কাপড়ের ব্যান্ডেজ।

ববরভ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল. মিত্রোফান, এগিয়ে চল। তার পরেই শুনলে মিত্রোফান কম্পিত কণ্ঠে বলছে, সার, ওরা কারখানায় আগুন লাগিয়েছে।

পরক্ষণেই পিছন থেকে ছোড়া মস্ত বড় একখানা পাথরের ঢিল শাঁ করে চলে গেল,—কপালের উপরে ডান দিকে ভীষণ ব্যথা লাগায় ববরভ হাত দিয়ে দেখে সেখান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, তাজা রক্তে তার হাতটা আঠা হয়ে গেল।

ফিটন তখনও ছুটে চলেছে। আগুনের দীপ্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘোড়া দুটির লম্বা ছায়া রাস্তার এধার-ওধার ছোটাছুটি করতে লাগল। মাঝে মাঝে ববরভের মনে হতে লাগল—ভয়ঙ্কর একটা উতরাই পথে ছুটে চলেছে সে, এক্ষুনি হয়ত খাড়া পাহাড়ের নিচে গাড়ি সমেত উল্টে পড়বে। নিজের হুঁশ বজায় রাখবার সমস্ত ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে সে, যে পথ দিয়ে চলেছে তা চিনতে পারছে না। হঠাৎ ঘোড়াগুলি একেবারে দাঁড়িয়ে গেল।

কি, মিত্রোফান, থামলে কেন? উচ্চ রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল ববরভ।

মিত্রোফান একটু রাগতভাবে জবাব দিলে, মানুষ ঠেলে যাই কি করে?

ভোরের আবছা আলোয় ভাল করে চোখ মেলে তাকালে ববরভ। সামনে একটা উঁচু নিচু এবড়ো-খেবড়ো কালো পাঁচিল, আর তার উপরের আকাশে আগুন জ্বলছে,—এ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না তার।

ধুত্তোরি, কি সব মানুষ মানুষ করছ তুমি?

ববরভ গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াদুটোর চারিধারে একবার ঘুরে দেখলে, ওদের গা ঘামে একেবারে চিক্‌চিক করছে।

ঘোড়ার কাছ থেকে কয়েক পা এগুবার পরই সে বুঝলে, যা সে একটা কালো পাঁচিল বলে মনে করেছিল, সেটা মোটেই পাঁচিল নয়, শ্রমিকদের একটা বিরাট ঘন জনতা—ওরা রাস্তা জুড়ে নীরবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। ববরভ হেঁটে জনতার প্রায় পঞ্চাশ পা পিছনে গিয়ে ফিরে এল, মিত্রোফানকে বলে অন্য পথে সে বাড়ি যাবে। কিন্তু কোথায় মিত্রোফান? মিত্রোফান, ঘোড়া—সব উধাও। মিত্রোফানই তাকে খুঁজতে কোথায় গেল, না সে-ই পথ ভুলে কোথায় চলে এসেছে, কিছুই বুঝতে পারলে না সে। মিত্রোফানের নাম ধরে কয়েকবার সে ডাকলে, কোন সাড়া পেল না। তখন সে ঠিক করলে, যে জনতার কাছ থেকে সে এইমাত্র এল, তার কাছেই সে ফিরে যাবে। এই ভেবে যেদিক থেকে সে ফিরে এসেছে মনে হচ্ছিল সেই দিকে সে ছুটে চলল। কিন্তু কি আশ্চর্য, জনতাও যে হাওয়া। জনতার বদলে সামনে পড়ল তার কাঠের নিচু একটা বেড়া, সেই বেড়ার গায়ে দুম করে এক জোর ধাক্কা খেলে সে।

কিন্তু এ বেড়ারও যে শেষ নেই, না ডাইনে, না বাঁয়ে। ববরভ অগত্যা কোন-রকমে সেটা টপকে ঘন উঁচু জঙ্গলে ভরা খাড়া একটা পাহাড়ে উঠতে লাগল। মুখে তখন তার ঘাম ঝরছে, জিভটা শুকিয়ে হয়েছে যেন এক টুকরো শুকনো কঠিন কাঠ। নিঃশ্বাস নিতে বুকটা রীতিমত ব্যথা করছে তার, রক্ত উঠে মাথার উপরের দিকটা দব্‌ দব্‌ করছে, ললাটের আহত স্থানটারও অসহ্য যন্ত্রণা।

পাহাড়ে চড়াও যেন শেষ হতে চায় না, কি রকম নিস্তেজ নৈরাশ্যের ভারে কাতর হয়ে পড়লে ববরভ। তবুও সে উঠতে লাগল, বার বার আছাড় খেয়ে পড়ে তার হাঁটু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল, কাঁটা-গাছের ঝোপ ধরে ধরে তবুও সে উপরে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে তার মনে হতে লাগল জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন

দেখার মত এ সবই বুঝি মিথ্যা। এই আতঙ্কগ্রস্ত জনতা, রাস্তায় এই সুদীর্ঘ পাদচারণ, এই অন্তহীন পর্বতারোহণ—এ সব কিছুই সেই বিকারের স্বপ্নের মতই বেদনাদায়ক, তারই মত অলীক, অপ্রত্যাশিত এবং ভয়ঙ্কর!

অবশেষে পাহাড়ে ওঠা শেষ হল—ববরভ ভাল করে তাকিয়ে দেখে বুঝলে এ পাহাড় নয়, এ রেল-বাঁধ। এখানে দাঁড়িয়েই আগের দিন ধর্মানুষ্ঠানের সময় ফোটোগ্রাফার ইনজিনীয়ার আর শ্রমিকদের গ্রুপ-ফোটো নিয়েছে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সে একখানা রেলওয়ে স্লীপারের উপর বসে পড়ল এবং পরক্ষণেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেলঃ পা দুটো তার ব্যথা করে অবশ হয়ে এল, পেট আর বুক কি রকম এক অস্বাভাবিক বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, কপাল আর গাল দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গেল, চোখের সামনে থেকে সবই কিছু সরে যেতে যেতে গভীর অন্ধকারে একেবারে বিলীন হয়ে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ববরভের সম্বিত ফিরে এল। নিচে বাঁধের পাদদেশে, বিরাট আকার মিলের ঝন ঝন শব্দে যেখানে দিনরাত কান পাতা যেত না সেখানে এখন মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। ববরভ কোন রকমে হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গলানো চুল্লীর দিকে হাঁটতে সুরু করলে। মাথাটা তার এত ভারি হয়ে আছে যে সেটা সে তুলে রাখতে পারছে না, প্রতি পদক্ষেপে কপালের আহত স্থানটায় ভয়ঙ্কর ব্যথা বোধ হচ্ছে। ওখানে হাত দিতে আবার তার আঙুলে সেই আঠার মত রক্ত লেগে গেল। ঠোঁটে মুখেও তার রক্ত, রক্তের লোনা ধাতব স্বাদ তার মুখে যাচ্ছে। পূর্ণ চেতনা সে এখনও ফিরে পায়নি, যা সব ঘটে গেল তা পুরোপুরি মনে করতে এবং তার মানে বুঝতে চেষ্টা করতে গিয়ে তার ভীষণ মাথা ধরে গেছে। মনটা গভীর বিষাদ, নৈরাশ্য এবং অকারণ ক্রোধে ভরা।

ভোরের আলো তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশ, মাটি, সামান্য কিছু হলদে ঘাস রাস্তার দুধারে নানা আকারে স্তূপীকৃত পাথর সব কিছুই দেখাচ্ছে ধোঁয়াটে ভিজে ভিজে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। মিলের জনশূন্য বড় বড় বাড়িগুলির মাঝে উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল ববরভ, আর সাংঘাতিক মানসিক আঘাত পাবার পরে লোকে যেমন উচ্চ কণ্ঠে নিজের মনেই কথা বলে, ঠিক তেমনি করেই কথা বলে যেতে লাগল। তার সাম্প্রতিক এলোমেলো চিন্তাগুলিকে একত্র করে তার মাঝে একটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করছিল সে।

কে একজন বাইরের লোক তার মনের মাঝেই যেন বসে আছে, তার উদ্দেশ্যে সে পরম আবেগ ভরে বলে চলেছে, আচ্ছা, বলত ভাই আমি এখন কি করি? ভগবানের দোহাই, বল, ওঃ কি কষ্ট, কি অসহ্য কষ্ট, এ যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারছি না,—আমি আত্মহত্যা করব।

সেই বাইরের লোকটা তখন তার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ থেকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের সুরে উচ্চ কণ্ঠেই বলে উঠল, না, তুমি আত্মহত্যা করবে না। এ সব

ভানের দরকার কি? জীবনকে তুমি এত ভালবাস যে আত্মহত্যা করা চলে না। আর আত্মহত্যা করবার মত মনের বলও নেই তোমার। শারীরিক যন্ত্রণাকে তুমি বড্ড বেশি ভয় কর। তা ছাড়া তুমি বড় বেশি ভেবে চিন্তে কাজ কর।

ববরভ হাত দুটি মোচড়াতে মোচড়াতে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, তা হলে কি করব আমি, কি? নিনা আমার এত কোমল, এত পবিত্র! সে ছাড়া জগতে আমার আর কেউ নেই। অকস্মাৎ তারই কি না...ওঃ ভাবতে গেলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়—তারই কি না যৌবন, আর কুমারী দেহটা বিক্রী করে দিতে হচ্ছে।

অন্তরের লোকটির কাছ থেকে ব্যঙ্গের সুরে উত্তর শোনা গেল, এ সব নাটকীয় উক্তি আউড়ে লাভ কি? খাশনিনকে যদি এতই ঘৃণা কর তুমি, যাও না খুন কর গিয়ে তাঁকে।

উত্তেজিত ববরভ মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত ঊর্ধ্বে আস্ফালন করে চীৎকার করে বলে উঠল, হাঁ, তাই আমি করব, করবই, ওর পাপ-নিঃশ্বাসে সৎ লোকের জীবন কলুষিত করতে দেওয়া আর চলবে না। ওকে আমি খুন করব।

কিন্তু সেই লোকটি কণ্ঠে ব্যঙ্গের বিষ ঢেলে বললে, উঁহু, পারবে না তুমি, তুমি নিজেই বেশ জানো—তা তুমি করবে না, কারণ ও করবার সঙ্কল্প ও সাহস দুইয়ের একটিও তোমার নেই। কালই তোমার বিবেক ফিরে আসবে, এবং এ উত্তেজনা হারিয়ে তুমি আবার দুর্বল বোধ করবে।

মানসিক দ্বন্দ্বের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মাঝেও এমন কতকগুলি শান্ত মুহূর্ত এসেছে—যখন ববরভ অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারে নি—কি হয়েছে তার, যেখানে সে রয়েছে সেখানে সে এলই বা কি করে, আর এখন করবেই বা সে কি? একটা কিছু করতে তাকে হবেই, একটা কিছু বড় আর গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সে কিছুটা যে কি তা সে কিছুতে মনে করতে পারছিল না, চেষ্টা করতে গিয়ে মুখের ভঙ্গী শুধু বিকৃত হয়ে উঠছিল। এইরকম একটা মুহূর্তে মনটা তখন কিছুটা স্থির হয়ে আসছিল—সে হঠাৎ বুঝলে আগুনে কয়লা দেবার গর্তের কিনারায় সে দাঁড়িয়ে। এইখানে দাঁড়িয়েই, সম্প্রতি ডাক্তারের সঙ্গে তার যে কথাবার্তা হয়েছে—সে সব কিছুই এবার স্পষ্ট মনে পড়ে গেল তার।

নিচে কয়লা দেবার একটি লোকও নেই,—সবই চলে গেছে। বয়েলারগুলি অনেক আগেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একেবারে ডাইনের এবং একেবারে বাঁয়ের দুটি চুল্লীতে কিছুটা কয়লা তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। এই দেখে হঠাৎ ববরভের মনে একটা পাগলা খেয়াল চাপল। উবু হয়ে বসে সে তার পা দুটো নামিয়ে দিল গর্তের ভিতর, তার পর দুই হাতে ভর দিয়ে নিচের দিকে দিলে এক লাফ।

একটা কয়লা স্তূপের গায়ে একটা বেলচা আটকানো ছিল। ববরভ সেটা টেনে বের করে কয়লা দেবার দুটো খোড়লেই কয়লা পুরে দিলে। এক মিনিট কি দু মিনিট পরেই চুল্লী দুটিতে আগুনের শিখা দাউ দাউ করে উঠল,—বয়লারের জল শোঁ শোঁ করে ফুটতে লাগল। ববরভ বেলচার পরে বেলচা কয়লা দিয়ে

চললে,—সঙ্গে সঙ্গে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সে, অদৃশ্য কার উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে নেড়ে অর্থহীন কি সব প্রলাপ বকে যেতে লাগল। পথে আসবার সময় অসুস্থ মস্তিষ্কে যে প্রতিহিংসার কল্পনা উঁকিঝুঁকি মারছিল সে-ই এখন দৃঢ় সংকল্প হয়ে দেখা দিল তার মনে। আগুন পেয়ে বিরাটাকার বয়েলারটা যখন শোঁ শোঁ শব্দ করতে লাগল তখন তা আরও জীবন্ত আর ঘৃণ্য বলে বোধ হতে লাগল ববরভের কাছে।

তাকে বাধা দেবার আর কেউ নেই। পরিমাপ-যন্ত্রে দেখা যাচ্ছিল জল ক্রমেই কমে যাচ্ছে। বয়েলারের শোঁ শোঁ আর চুল্লীর গর্জন বেড়ে বেড়ে ক্রমেই ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই অনভ্যস্ত পরিশ্রম করতে গিয়ে ববরভ শীগগিরই ক্লান্ত হয়ে পড়ল,—কপালের শিরাগুলি জ্বরাক্রান্তের মত দপ দপ করতে লাগল, গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ যে আসুরিক শক্তি এসেছিল তার দেহে তা যেন সব শেষ হয়ে গেল। তার অন্তবে যে আরেকটা লোক কথা বলছিল সে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলে উঠল, আর একটু হলেই ত হয়। কিন্তু সে আর পেরে উঠবে না তুমি। আর কিছু তুমি করতে পারবে না। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই এমন হাস্যকর যে—এই তুমিই কাল সকালে যে স্টীম বয়েলার উড়িয়ে দিতে গিয়েছিলে এ কথা স্বীকার করতেই সাহস পাবে না।

ববরভ যখন হেঁটে হেঁটে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হল—তখন চক্রবাল রেখার উপরে মস্ত বড় এক কলঙ্কের মত সূর্য উঠেছে।

ডাক্তার গোল্ডবার্গ এই একটু আগে আহত আর ছিন্নাঙ্গ লোকদের ড্রেসিং শেষ করেছেন,—এখন পেতলের একটা ওয়াস-স্টাণ্ডের উপর হাত ধুচ্ছিল। তার সহকারী একটা তোয়ালে হাতে তার পাশে দাঁড়িয়ে। ববরভকে দেখে ডাক্তার চমকে উঠল।

সে ভীত কণ্ঠে বলে উঠল,—আন্দ্রি ইলিয়িচ, কি হয়েছে তোমার? তোমায় দেখলে যে ভয় করে!

সত্যিই কিম্ভূতকিমাকার চেহারাই হয়েছে ববরভের। তার ফ্যাকাশে মুখে জমাট বাঁধা রক্তের সঙ্গে কয়লার গুড়ো এসে মিশে বিশ্রী সব দাগের সৃষ্টি করেছে। বাহু আর জানু থেকে ভিজে পোশাক ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়েছে। এলো চুল কপালের উপর এসে পড়েছে।

ডাক্তার গোল্ডবার্গ তাড়াতাড়ি হাত মুছে ববরভের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, —কি হয়েছে তোমার, ভগবানের দোহাই, ঠিক করে বল।

ববরভ কাত্‌রে বলে উঠলে,—কিছুই না,—দোহাই ডাক্তার, শীগগিরই আমায় কিছু মরফিয়া দাও,—নইলে পাগল হয়ে যাব আমি। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি আমি।

ডাক্তার গোল্ডবার্গ ববরভের হাত ধরে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

শোন,—কিসে যন্ত্রণা পাচ্ছ তুমি, বুঝেছি আমি। বিশ্বাস করো তোমার জন্য সত্যিই বড় দুঃখিত আমি, তোমাকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত,—কিন্তু বন্ধু—বলতে গিয়ে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যেন অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে এল, তার পর রুদ্ধ কণ্ঠেই সে বললে, বন্ধু আন্দ্রি ইলিয়িচ্,—এ না হলে কি তোমার কোন রকমেই চলে না? এই বিশ্রী অভ্যাসটা ছাড়াতে কি কষ্ট পেতে হয়েছে তোমার একবার ভেবে দেখ। এখন যদি তোমায় একটা ইনজেক্শান দিই,—ফল তার বড় খারাপ হবে। তুমি কখনও—বুঝেছ আমার কথা—কখনও এ অভ্যাস আর ছাড়াতে পারবে না তুমি।

ববরভ অয়েলস্কিনে মোড়া চওড়া সোফার উপর মুখ গুঁজে আপাদমস্তক কাঁপতে কাঁপতে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বললে, না পারি, না পারলাম,—কিচ্ছু গ্রাহ্য করি না আমি, ডাক্তার। আমি এ আর সহ্য করতে পারছি না।

ডাক্তার গোল্ডবার্গ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে,—কাঁধটায় একটা ঝাঁকি দিলে, তারপর ওষুধের বাকসো থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করলে। পাঁচ মিনিট পর সোফার উপরেই ববরভ গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ল। একরাত্রের মধ্যেই তার মুখখানা শীর্ণ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল,—সেই বিবর্ণ মুখেই মধুর হাসির রেখা ফুটে উঠল। ডাক্তার গোল্ডবার্গ অতি সন্তর্পণে নিদ্রিতের মাথার ক্ষতস্থান ধৌত করতে লাগলেন।

১৮৯৬

ওলেস্যা

১

কাঠুরে য়ারমোলা এক বোঝা কাঠ মাথায় করে ঘরের মাঝে এসে ধপ্ করে সেটা মেঝেয় ফেললে,—তার পর শীতে জমে যাওয়া আঙুলগুলিকে একটু গরম করবার জন্য তার উপর নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। য়ারমোলা একসঙ্গে আমার চাকর, পাচক এবং শিকারের সঙ্গী।

স্টোভের দরজার সামনে উবু হয়ে বসে সে বললে,—বাইরে বড় ঠাণ্ডা বাতাস, কত্তা, স্টোভটা একটু ভাল করে জ্বালা দরকার। আপনার 'লাইটার'টা একটু নিতে পারি ?

কাল আর তা হলে আমরা খরগোস শিকারে যেতে পারছি না ?—কি বলো,—য়ারমোলা ?

কোনই আশা নেই। ব্যাপার হচ্ছে, ওরা এখন ঘাপ্‌টি মেরে আছে। ওদের চলাফেরার পথের একটা চিহ্নও দেখতে পাবেন না কাল।

পোলিসিয়ের ভলহীন সীমান্তে পেরেব্রোদ নামে এক অজ পাড়াগাঁয়ে একবার সুদীর্ঘ ছয় মাস কাটাতে হয়েছিল আমায়,—সময় কাটাবার জন্য একমাত্র শিকার ছাড়া অন্য কিছু করবার ছিল না সেখানে। সত্যি বলতে কি, আফিস থেকে আমাকে যখন এখানে যেতে বলা হ'ল তখন আমি ভাবতেই পারি নি যে জায়গাটা এমন ভীষণ এক ঘেয়ে। খুশি মনেই আমি যেতে রাজী হয়েছিলাম। ট্রেনে যেতে যেতে আমি ভেবেছি,—সভ্যতার লেশমাত্রহীন, পৃথিবীর এক কোণে পড়ে থাকা পোলিসিয়ের প্রকৃতির লীলা নিকেতন, সরল অনাড়ম্বর এখানকার জীবন, মানুষ সব আদিম প্রকৃতির,—কিছুই জানি না আমি এদের সম্বন্ধে, অদ্ভুত এদের ভাষা, অদ্ভুত এদের রীতিনীতি, এদের গল্প, প্রবাদ গানও নিশ্চয়ই কাব্য-সম্পদে ভরা। (এই দেখুন, আমি একবার আরম্ভ করলে কেমন চালিয়ে হেতে পারি,—আর তা হবেই ত) ছোট্ট একটা কাগজে আমার গল্প ছাপা হয়েছে,—ও গল্পে দুটো খুন এবং একটা আত্মহত্যার কথা বলেছি আমি, আর এ কথাও জানি লেখক হতে হলে বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই তার।

সে যাই হক, পেরেব্রোদের চাষীরা নিতান্ত অসামাজিক বলেই হক—অথবা আমি ওদের সঙ্গে ঠিক মত মিশতে পারি নি বলেই হক—ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা আমার তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে নি। আমাকে দূর থেকে দেখলে আমাকে

শুধু টুপি খুলে সম্মান দেখাত, ওরা কাছে এলে রুক্ষস্বরে বলত—'স্পীডজু'—। এর মানে হচ্ছে, ভগবান আপনার ত্বরিতগতি দিন! তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করলে তারা আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত, সামান্য সোজা কথা কিছু বললেও তা না বুঝে বার বার আমার হস্ত চুম্বন করতে চেষ্টা করত। পোলাণ্ডের লোকেরা যখন তাদের ক্রীতদাস করে রেখেছিল তখন থেকে এই অভ্যাসটা তাদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে।

যে সামান্য কয়েকখানা বই আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম অল্প কয়েক দিনের মাঝেই তা আমার পড়া হয়ে গেল। একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রথম দিকে না হলেও শেষের দিকে আমি ওখানকার বুদ্ধিজীবী লোকদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করলাম, দশ মাইল দূরে পোলাণ্ডের যে পুরোহিত থাকেন তাঁর সঙ্গে,—তাঁর গির্জের অ্যার্গ-বাজিয়ের সঙ্গে,—স্থানীয় উর‍্যাদ্‌নিক,* পাশের তালুকের এক কেরানি এবং সনদহীন সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

এরপর গ্রামের লোকের চিকিৎসা করে আমি সময় কাটাব ঠিক করলাম। ক্যাস্টর অয়েল, কার্বলিক এ্যাসিড্‌, বোরিক এ্যাসিড্‌, আইওডিন ইত্যাদি আমার সঙ্গেই ছিল,—কিন্তু তবু এ ব্যাপারে ঠিক মত এগুতে পারছিলাম না আমি, কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ছাড়াও এদের রোগনির্ণয় দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল: সকল রোগীর মুখেই ঐ এক কথা; শরীরের ভিতরে ব্যথা, আর খেতে পারি না কিছু।

ধরুন, একটা বুড়ী এল। সামনে এসে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে তার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকটা মুছে নিল,—বুকের কাছ থেকে কয়েকটা ডিম বের করে আমার ডেস্কের উপর রাখল, তার গায়ের তামাটে রঙটা আমার চোখে পড়ল। বুড়ী তারপর চুমু দেবে বলে আমার হাত দুটো ধরবার চেষ্টা করল। আমি আমার হাত টেনে নিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললাম,—ঠাকুমা এ সব কি, আমি পুরোহিত নই, আমাকে এমনি করে সম্মান দেখাতে হয় না।...তোমার কি অসুখ, —কি কষ্ট হচ্ছে বল!

শরীরের ভিতরে—একেবারে ভিতরে ব্যথা, কত্তা,—কিছ্‌ছু খেতে পারি না আমি।

কবে থেকে শুরু হয়েছে এ?

তাই বা কি করে জানব আমি, সে-ই ফিরে জিজ্ঞাসা করে,—বলে, ভিতরটা একেবারে পুড়ে যায়,—কিছ্‌ছু খেতে পারি না আমি।

আমি যতই চেষ্টা করি না কেন তার অসুখের আর কোন উপসর্গের কথা কিছুতেই বের করতে পারি না তার কাছ থেকে।

অবসরপ্রাপ্ত সনদহীন সামরিক কর্মচারীটি একদিন আমায় বললেন,—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার আপনার দরকার নেই। অসুখ ওদের আপনা আপনিই সেরে

যাবে. কুকুরদের যেমন হয়। জানেন—আমি ওদের কেবল একটা ওষুধ দিই, সেটা হচ্ছে—'সল-এ্যামোনিয়াক্'। একটা মুজিক এলে জিজ্ঞাসা করি তাকে,—কি চাই? ও বলে, অসুখ করেছে আমার। সঙ্গে সঙ্গে এক বোতল এ্যামোনিয়া তার নাকের সামনে ধরে বলি,—শোঁকো এটা। সে শুঁকতে থাকে। আমি বলি,—শোঁকো,—আরও বেশি করে শোঁকো। ও আরও শোঁকে। আমি জিজ্ঞাসা করি,—কি একটু ভাল লাগে এখন? ও উত্তর দেয়, হাঁ, একটু ভালই ত বোধ হচ্ছে। তখন বলি, হ্যাঁ, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি চলে যাও।

আর ঐ হাতে চুমু দেওয়াও আমার বড় বিশ্রী লাগে। আমার কোন কোন রোগী আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে আমার জুতোয় চুমু দিতে যায়। ওরা যে কৃতজ্ঞতাবশে এ সব করতে যায় তা নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ওদের উপর দাসত্ব চাপিয়ে দিয়ে যে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তারই ফলে এ অভ্যাসটা ওদের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অনেক সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছি অবসরপ্রাপ্ত সনদহীন সামরিক কর্মচারী আর উর্যাদ্নিক্ তাঁদের লালচে হাত নিঃসঙ্কোচে ওদের ওষ্ঠাধরে এগিয়ে ধরেছেন।

যাই হোক. সব দেখে শুনে এক শিকার ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর রইল না। কিন্তু জানুয়ারীর শেষের দিকে আবহাওয়া এমন খারাপ হয়ে উঠল যে শিকার করাও আর সম্ভব রইল না। দিনের বেলা ভীষণ জোর হাওয়া, আর রাত্রিবেলা তুষারের উপর এমন কঠিন বরফের আস্তরণ জমে উঠতে লাগল যে খরগোস তার উপর কোন রকম পদচিহ্ন না রেখেই চলাফেরা করে বেড়াতে পারে। সারাদিন ধরে আটকা থেকে বাতাসের ঐ শোঁ-শোঁ শনশনানি শুনতে শুনতে আমি একেবারে মারা যাবার যোগাড়। এমনি সময় হঠাৎ একদিন আমি সময় কাটানোর এক নির্দোষ উপায় উদ্ভাবন করে বসলাম,—এটা আর কিছু নয়,—য়ারমোলাকে একটু লেখাপড়া শেখানো।

এক রকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই এটা ঘটে গেল। একদিন আমি যখন বসে চিঠি লিখছি তখন মনে হল কে যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিরে দেখি য়ারমোলা। নরম ছোবড়ার জুতো পরে ও এমন নিঃশব্দে চলাফিরা করে যে কখন ও আসে তা বোঝাই যায় না।

কি ব্যাপার, য়ারমোলা?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কিছু নয়,—এমনিই দেখছি। আপনার মত যদি লিখতে পারতাম আমি!

কথাটা শুনে আমাকে একটু হাসতে দেখে সে একটু লজ্জা পেয়ে বললে,—না, না,—আপনার মত নয়;—আমি বলছি আমার নিজের নামটা যদি লিখতে পারতাম আমি!

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম,—কেন বলত?

এইখানে বলে রাখা দরকার—য়ারমোলা হচ্ছে সারা পেরেব্রোদ গ্রামের মাঝে সব চেয়ে গরিব আর সব চেয়ে কুঁড়ে চাষী। কাঠ আর তার ক্ষেতের ফসল বিক্রি করে

সে যা পায় তার সবটাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়, তার গরুগুলিও হচ্ছে সব চেয়ে নিরেস। এমন লোকের যে লেখাপড়া শেখার কি দরকার বুঝতে পারছিলাম না আমি। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার নিজের নাম লেখা কেন শিখতে চাও তুমি?

সে নিতান্ত কোমল কণ্ঠে বললে,—দেখুন কত্তা, এ গ্রামের কেউই লেখাপড়া জানে না,—সুতরাং যখনই কোন কাগজ পত্রে সই দিতে হয় কিম্বা সদরে গিয়ে গ্রামের কোন কাজ করে দিয়ে আসতে হয়,—কারোরই সাধ্যে তা কুলায় না। গ্রামের মোড়ল একটা সীল মেরে দেয় বটে,—কিন্তু কাগজে কি লেখা আছে তা আর সে জানে না। সুতরাং কেউ যদি এখানকার নামটাও সই করতে জানত তাতে সারা গাঁয়ের মঙ্গলই হত।

য়ারমোলা অপরের শিকার চুরি করে খায়,—যা থাকে কপালে ভেবে শুধু টোটো করে ঘুরে বেড়ায়,—গ্রামবাসী তার মতামতের কোন তোয়াক্কা করে না,—তবু সে গ্রামের কল্যাণের জন্য কিছু করতে চাইছে দেখে আমার মনটা একটু নরম হল। আমি কথা দিলাম তাকে লেখাপড়া শেখাব। কথা ত দিলাম, কিন্তু পরে বুঝলাম কি কঠিন এই কাজ। বনের সব পথগুলি এমন কি ঐ সব পথের ধারের প্রায় সব গাছগুলি সে চেনে, দিন হোক রাত্রি হোক আশেপাশের সকল রাস্তা চিনে সে যাতায়াত করতে পারে,—শুধু পায়ের চিহ্ন দেখে আশেপাশের কোন নেকড়ে, কোন খরগোস বা কোন খেঁকশেয়ালটা সেই পথ দিয়ে গেছে তা সে বলে দিতে পারে, কিন্তু 'এম্' আর—'এ'-তে মিলে যে 'মা' হয় এ তার মাথায় আমি কিছুতেই ঢোকাতে পারলাম না। এ যেন এক মহাসমস্যা—মস্ত বড় গোঁফ আর কালো কড়া দাড়ি ওয়ালা শীর্ণ মুখে আর বসে যাওয়া কালো চোখে নিদারুণ দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়ে সে দশ মিনিট বা তারও বেশি বসে এই সমস্যা নিয়ে ভাববে।

আমি এদিক থেকে তাড়া দিতে থাকি,—কই, য়ারমোলা,—মা বলো,—শুধু মা। কাগজের দিকে অমনি করে তাকিয়ে থেক না,—আমার দিকে চাও। হাঁ, ঠিক আছে। এইবার বলো—মা।

য়ারমোলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অক্ষর দেখানোর কাঠিটা টেবিলের উপর রেখে মুখ ভার করে বলে,—না, আমি পারি না।

কিন্তু কেন পারবে না?—এত সহজ!—ঠিক আমি যেমন বলছি তেমনি করে বলো—মা।

না, কত্তা, আমি পারি না,—ভুলে যাই।

মাথায় ওর কিছুই নেই, সুতরাং যেমন করে চেষ্টাই আমি করি না কেন, যে উপমাই দিই, সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু শিখবার আগ্রহ তার একটুও কমে না।

সে বার বার আমায় বলতে থাকে,—যদি আমার নামটা আমি শুধু সই করতে

জানতাম! আর কিছু শিখতে চাই না আমি, শুধু আমার নাম সই—য়ারমোলা পোপরুঝুক,—ব্যাস।

শেষে আমি তাকে ঠিকমত লেখাপড়া শেখানোর আশা ছেড়ে দিয়ে কোন রকমে নাম সইটা শেখানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। আশ্চর্য, এটা শিখতে তার তেমন কষ্ট হল না। দ্বিতীয় মাসের শেষের দিকে কলমের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে কোন রকমে তার নামের শেষ অংশটুকু লিখতে শিখল, তার কষ্ট লাঘব করবার জন্য নামের প্রথমাংশ একেবারে বাদ দেওয়া হবে সাব্যস্ত করলাম।

সন্ধ্যাকালে স্টোভে আগুন দেওয়া হয়ে গেলে য়ারমোলা অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকত—কখন আমি তাকে ডাকি।

আমি বলতাম,—হাঁ, য়ারমোলা, এস পড়াশোনা করা যাক।

সে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে কনুইটা তার উপর রেখে শক্ত কালো বাঁকা আঙুলের মাঝে কলমটা কোন রকমে গুঁজে দিয়ে ভুরু দুটো টান করে বলত, এবার শুরু করি?

হাঁ।

কতকটা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই সে তার নামের শেষাংশের আদ্যাক্ষর 'পি'-টা লিখত, আমরা অক্ষরটাকে বলতাম—একটা লাঠির মাথায় ফাঁস, এর পরই আবার জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠত তার চোখে মুখে।

থামলে কেন—আবার ভুলে গেলে না কি?

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলত, হাঁ।

কি অদ্ভুত লোক রে বাবা।...আচ্ছা,—এর পরে একটা চাকা বসাও ত!

হাঁ, হাঁ,—চাকা,—এইবার মনে পড়েছে আমার।

খুশিতে ভরে উঠত তার মুখ। তারপর অতি সন্তর্পণে—সযত্নে সে একটা ছবি আঁকত,—দেখতে অনেকটা কাস্পিয়ান হ্রদের রেখাচিত্রের মত। এটা হয়ে গেলে সে অনেকক্ষণ ধরে মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে হেলিয়ে চোখ দুটো টান টান করে নীরবে নিজের মনেই নিজের লেখার তারিফ করত।

কি হল আবার,—লিখে যাও।

দাঁড়ান, কত্তা,—আর একটু।

দু এক মিনিট ভাববার পর সে আবার বলত, এটা প্রথমটা হল, না?

হাঁ, এস লেখা যাক।

এমনি করে এগিয়ে এগিয়ে—শেষে আমরা নামের শেষ অক্ষর কে-তে এসে হাজির হলাম। অক্ষরটার নাম দিয়েছিলাম আমরা—লাঠির সঙ্গে একটা পাঁচন-বাড়ি আর একটা লেজ।

নামটা পুরো লেখা হয়ে গেলে সে অনেক দিন গর্বিত প্রীত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলত, কত্তা, আর পাঁচ ছয় মাস লিখতে পারলেই আমি পাকা হয়ে যাব এতে,—কি বলেন?

২

য়ারমোলা স্টোভের সামনে উবু হয়ে বসে কয়লা খুঁচিয়ে দিচ্ছিল, আর আমি আমার ঘরের মাঝে পায়চারি করছিলাম। জমিদারের বিরাট অট্টালিকার বারোটা ঘরের মাঝে মাত্র একটি ঘরে আমি থাকতাম, এ-ঘরটাকে আগে বলা হত 'সোফা-ঘর'। আর আর ঘর সব তালাবন্ধ, বুটিদার কাপড়ে মোড়া, পুরানো ফার্নিচার, বিদেশী সব ব্রোঞ্জের মূর্তি, সরঞ্জাম এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ছবিগুলির উপর যেন ধুলোর পাহাড় জমে উঠেছে।

বাইরে ঝটিকার গর্জন শুনে মনে হচ্ছে এক বুড়ো দৈত্য যেন শীতে কাঁপতে কাঁপতে গরজাচ্ছে, গর্জনের পরেই যেন আসছে পর পর কাতরানি, আর্তনাদ, আর অট্টহাসির শব্দ। রাত্রির দিকে ঝড়টা আরও প্রবল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়া শুরু হল। দেখে মনে হতে লাগল কে যেন মুঠো মুঠো শুকনো মিহি তুষার-কণা জানলার কাঁচের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। কাছের বন থেকে অবিরাম এমন শোঁশোঁ শব্দ উঠতে লাগল যে শুনলে ভয়ে বুকটা দুর দুর করতে থাকে।

খালি ঘরে চিমনির মধ্যে বাতাস ঢুকে শোঁ-শোঁ শব্দ শুরু করল। জলপড়া নড়বড়ে জিরজিরে বাড়িটার মাঝে হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত শব্দ হতে শুরু করল যে শুনে নিতান্ত সাহসী লোকেরও বুক কাঁপে। সাদা হল ঘরটার মধ্যে থেকে থেকে কে যেন দীর্ঘশ্বাস,—বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কার গুরু পদভরে মেঝের শুকনো পচা কাঠের পাটাতনগুলি মড় মড় করে উঠছে। পর মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছি কে যেন আমার ঘরের সামনে লোক চলাচলের পথটায় এসে অতি সন্তর্পণে, নাছোড়বান্দা হয়ে ঘরের দরজা ধরে ঠেলছে,—তখনই সে আবার হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে সারা বাড়িময় ছুটোছুটি করছে কখনও বা সে সবগুলো খড়খড়ি আর দরজা ধরে ঝাঁকাচ্ছে, কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে চিমনির মাঝে গিয়ে অবিরাম একঘেয়ে করুণ সুরে বিলাপ করে চলেছে,—বিলাপটা কখনও শোনাচ্ছে ঘ্যানঘ্যানানির মত, কখনও আর্তনাদ, এবং পরক্ষণে সেই আর্তনাদই আবার পশুর ক্রুদ্ধ গর্জনে পরিণত হচ্ছে। কখনও এই অদৃশ্য আগন্তুক হঠাৎ কোত্থেকে আমার ঘরের মাঝে ঢুকে আমার শিরদাঁড়ায় তার কনকনে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে ঝলসানো ঢাকনার নিচে সবুজ কাগজের আড়াল দেওয়া স্তিমিত আলোর শিখাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

কি রকম এক দারুণ উদ্বেগে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি। নাগরিক জীবন, সমাজ, নারীর কলহাস্য, মানুষের কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে শত শত মাইল দূরে বন আর তুষারের মাঝে হারিয়ে যাওয়া একটা গ্রামের নড়বড়ে একটা ঘরে—শীতের ঝড়ো রাতের আঁধারে বসে আমার মনে হতে লাগল,—এ ঝড় আর থামবে না,—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ এ চলতে থাকবে, আমাকে একেবারে না শেষ

করে ছাড়বে না। মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে এমনি করেই ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকবে,— নোংরা সবুজ কাগজের আড়ালে মিইয়ে-পড়া আলোটা এমনি করেই জ্বলতে থাকবে,—এমনি অস্থির চিত্তেই আমি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াব আর য়ারমোলা আপন মনে স্টোভের সামনে এমনি করেই নীরবে বসে থাকবে,—না-ভাববে ও ওর বাড়ির লোকের খাওয়া-দাওয়ার কথা, না-ভাববে এ নিদারুণ ঝড়ের কথা, আর আমি যে এদিকে ভাবনায় দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি তাও সে একবার ফিরে দেখবে না,—আসলে পৃথিবীর সব কিছুতেই সে উদাসীন,—এই অদ্ভুত লোকটিকে এতদিন কাছে থেকেও চিনতেই পারলাম না আমি।

বিশেষ করে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে না পেয়েই যেন দমটা আমার আটকে আসছিল। তাই য়ারমোলাকে কথা বলাবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা য়ারমোলা,—এ ভয়ংকর ঝড়ো হাওয়াটা কোত্থেকে আসছে বলতে পার?

য়ারমোলা অলস দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে,—হাওয়া?...কেন, আপনি জানেন না?

না,—কি করে জানব আমি বল?

সত্যি জানেন না আপনি?

য়ারমোলার অন্তরাত্মা এবার যেন জেগে উঠল, কথার সুরে একটু রহস্যের আমেজ এনে সে বললে, হয় কোন ডাইনী জন্মাল, না হয় কোন ডাইনী একটু ফুর্তি করছে।

এইবার সুযোগ পেয়ে গেলাম আমি। ওর কাছে থেকে কোন না কোন মজার গল্প আদায় করতে পারব এবার,—কোন যাদু, গুপ্তধন, অথবা একদিন যারা নেকড়ে ছিল—এই ধরণের কিছু।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের এই পালিস্যিতে কোন ডাইনী আছে?

জানি না। হয়ত ছিল।—আগেকার সেই ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে উত্তর দিলে, তার পর স্টোভের দরজার সামনে আবার সে মাথাটা নত করলঃ গ্রামের বুড়ো বুড়ীরা বলে—আগে ছিল এখানে ডাইনী। আমার মনে হয় এ কথা সত্যি নয়।

নিরাশ হতে হল আমায়। বেশি কথা না বলা যেন য়ারমোলার এক ব্রত, সুতরাং এই রকম এক চিত্তাকর্ষক ব্যাপারের কথা শুনবার সকল আশা ত্যাগ করতে হ'ল আমায়। কিন্তু আশ্চর্য, হঠাৎ সে তার স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্যের সঙ্গে অলস কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করলে—কিন্তু কথা বলছে যেন আমার সঙ্গে নয়, ঐ গর্জনশীল স্টোভের সঙ্গে। সে বলতে লাগল—

বছর পাঁচেক আগে একটা ডাইনী ছিল এখানে, কিন্তু এখানকার ছেলেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কোথায় তাড়িয়ে দিয়েছে?

বনে, তা ছাড়া আর কোথায়? তার ঘরবাড়িও ওরা ভেঙ্গে দিয়েছে, এমন

করে ভেঙেছে যে তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ডাইনীটাকে চোরি বাগানের ওধারে নিয়ে গিয়ে লাথি মারতে মারতে দূর করেছে।

কেন ছেলেরা তাকে অমন করলে কেন? কি করেছিল সে?

করেছিল সে অনেক কিছু, অনেক ক্ষতি। সে প্রত্যেকের সঙ্গে ঝগড়া করত, —তুক তাক্ করে গেরস্থের ক্ষতি করত,—আঁটিবাঁধা ফসলের ডাঁটায় ডাঁটায় জট পাকিয়ে দিত। একবার এক অল্পবয়সী বউয়ের কাছে সে একটা জ্লোটি* চায়। বউটি বলে,—নেই আমার কাছে,—দূর হও। ডাইনী বললে,—বেশ,—এই যে জ্লোটি দিলে না আমায়,—এর মজা টের পাবে তুমি একদিন।...আর এরপর কি হল, কত্তা, জানেন? বউটির একটা বাচ্চা ছিল, বাচ্চাটার এর পরই অসুখ হল। অনেকদিন ধরে ভুগল,—তার পর মারা গেল। এর পরই ছেলেরা ডাইনীটাকে লাথি মেরে এখান থেকে তাড়িয়ে দিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে ডাইনীটা এখন কোথায়?

পূর্বাভ্যাস মত অলস কণ্ঠে সে বললে, সেই ডাইনীটা? কোথায় তা আমি কি করে বলব?

তার কোন আত্মীয় স্বজন নেই এখানে?

না। সে বাইরের লোক,—কাতসাপ ** কি বেদেনী টেদিনী হবে। ও যখন এখানে, আমি তখন ছোট। ওর একটা মেয়ে না নাতনী ছিল, ওর সঙ্গেই থাকত। ছেলেরা দুটোকেই তাড়িয়েছে।

ভাগ্য গণনা করতে বা ওষুধ টষুধ নিতে কেউ যায় না আর তার কাছে?

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে সে বললে, মেয়েরা যায়।

তারা তা হলে তার আস্তানা চেনে?

জানি না আমি। লোকে বলে 'শয়তানের ঘুঁজি'র কাছাকাছি কোথায় যেন সে থাকে। ইরিনোভো রোডের ওপাশে যে জলাটা আছে, সেটা ত আপনার জানা, —শয়তানী ডাইনীটা ওরই পাশে থাকে।

মাত্র কয়েক মাইল দূরে এক সত্যিকার পলিসিয়ো ডাইনী রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বাস করে, খবরটা শুনে মনটা আমার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

বললাম, আচ্ছা য়ারমোলা,—ওর সঙ্গে, মানে, ঐ ডাইনীটার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি করে?

য়ারমোলা রেগে থুথু ফেলে বললে,—বাঃ চমৎকার, পরিচয় করবার মতই লোক বটে সে!

চমৎকার হোক আর না হোক, আমি তাকে দেখতে চাই, ঠান্ডাটা একটু কেটে গেলেই আমি তার ওখানে যাব, তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে,—যাবে না?

আমার শেষের কথাগুলি শুনে সে এত চটে গেল যে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে

* পনের কোপেক্।

** উক্রেইনে রুশীয় লোককে কাতসাপ বলে।

সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠল,—আমি যাব? জগতে যত সোনা আছে সব পেলেও না, কিছুতেই যাব না আমি সেখানে।

পাগলামি রাখো, তুমি যাবে, অবশ্য যাবে।

না, কত্তা, আমি যেতে পারব না, সারা দুনিয়া পেলেও না। আবার যেন নতুন করে রাগের জোয়ার এল তার মনে। সে বলতে লাগল, আমি যাব? আমি যাব ডাইনীর বাসায়? ভগবান রক্ষে করুন!...আপনিও যাবেন না কত্তা, বলছি আমি।

তুমি যাও, না যাও, তোমার খুশি। আমি যাবই। তাকে দেখবার জন্য বড় কৌতূহল জমেছে আমার মনে।

রাগে গরগর করতে করতে দড়াম করে স্টোভের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে য়ারমোলা বললে,—অদ্ভুত কিছুই নেই সেখানে।

ঘণ্টাখানেক পরে আঁধার দরদালানটায় চা খাওয়া শেষ করে যখন সে বাড়ি যাচ্ছিল তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—ডাইনীটার কি নাম?

য়ারমোলা গোমড়া মুখে বললে,—ম্যানুইলিখা।

য়ারমোলা মুখে কোনদিন কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারতাম ও আমাকে খুবই ভালবাসে। এর কারণও অবশ্য ছিল। প্রথমত, দুজনেরই আমাদের শিকারের ঝোঁক, তারপর, তার সঙ্গে সরল সহজভাবে মিশতাম আমি, তার নিত্য-অনাহারক্লিষ্ট পরিবারকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতাম; তা ছাড়া যে মদ্যাসক্তিকে সে নিজেই ঘৃণা করে তার জন্য আমি শুধু তাকে কোন দিন বকিনি। এই জন্যই আমার ডাইনীর বাড়ির যাবার সংকল্প দেখে তার মেজাজটা এমন বিগড়ে গেছে, এইজন্যই সে রেগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে এবং তার কুকুর রিয়াবচিক বারান্দায় এলে তার পাঁজরে মোক্ষম জোরে এক লাথি ঝেড়েছে। কুকুরটা লাথি খেয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে এক পাশে ছিটকে গেছে, এবং তারপরেই ঐ রকম শব্দ করতে করতে য়ারমোলার পিছু পিছু ছুটেছে।

৩

দিন তিনেক পরেই একটু গরম পড়ে গেল। এই সময় একদিন সকাল হতে না হতেই য়ারমোলা আমার ঘরে এসে বললে,—কত্তা, বন্দুকগুলো একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

কেন, কি ব্যাপার? কম্বলের নিচে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কাল রাত্রে খরগোস বেরিয়েছে অনেক। তাদের পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে অনেক। শিকারে বেরুলে মন্দ হয় না।

দেখেই স্পষ্ট বুঝা যায়, বনে যাবার তর সইছে না য়ারমোলার, কিন্তু বাইরে নিস্পৃহতা দিয়ে মনের ঔৎসুক্য চেপে রাখবার চেষ্টা করছে সে। তার ছোট্ট কারবাইন্ বন্দুকটা এর মাঝেই হল-ঘরে এসে গেছে। এই বন্দুকে একটা কাদা-খোঁচা পাখিও কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি তার, যদিও বন্দুকটা নিতান্তই পুরানো, --কয়েক জায়গায় তার টিনের তালি, তা ছাড়া কলটার ওখানকার লোহা মরচে আর পাউডার গ্যাসে ক্ষয়ে গেছে।

বনে ঢুকতে না ঢুকতেই খরগোস যাতায়াতের একটা পথ দেখতে পেলাম আমরাঃ পাশাপাশি দুটো পায়ের দাগ,—তার পিছনে আর দুটো। খরগোসটা রাস্তায় বেরিয়ে কয়েক শো গজ দৌড়ে চারা পাইনগাছের এক ঝোপের মাঝে লাফিয়ে পড়েছে।

য়ারমোলা বললে, ও চুপটি করে কোথায় পড়ে আছে, খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। আপনি কত্তা,...কোন পথে আমার যেতে হবে চিহ্ন দেখে বের করতে ও-ই শুধু জানে, সুতরাং আমাকে ডাকবার পর একটু থেমে সেইটা ঠিক করে নিয়ে বললে. আপনি ঐ পুরানো শুঁড়ীখানার ওখানে যান,—আমি জার্মালিনের ওদিক থেকে এদিকে আসব, কুকুর দৌড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি ডাকব আপনাকে।

ঘন ঝোপ জঙ্গলের মাঝে তখনই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কান খাড়া করে রইলাম, কিন্তু শিকার-চোর য়ারমোলার পায়ের একটু শব্দও আমার কানে এল না,—তার পায়ের চাপে একটি ডাল একটু খস্ করলে না।

আমি হাঁটতে হাঁটতে পুরানো শুঁড়ীখানায় এসে হাজির হলাম। দেখলাম বনের এক কিনারে পত্রবর্জিত লম্বা একটা গাছের নিচে এটা-একটা জীর্ণ নড়-বড়ে কুড়ে ঘর,—সম্পূর্ণ জনহীন। শীতের কোন শান্ত দিনে বনের মধ্যে যতটা শান্ত হওয়া সম্ভব, ততটা শান্ত ছিল চারিদিক। গাছের ডালগুলি তুষারের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়েছিল, বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল,—যেন উৎসবের বেশে সেজেছে তারা। মাঝে মাঝে একেকটা গাছের মাথা থেকে একেকখানা ডাল ভেঙে পড়ছিল —মাটিতে পড়বার আগে অন্যান্য ডালের সঙ্গে লেগে তার যে শব্দ হচ্ছিল তা বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। বরফগুলি রৌদ্রে দেখাচ্ছিল গোলাপী আর ছায়ায় দেখাচ্ছিল নীল। সেই দিব্য শীতল নীরবতার শান্ত মাধুর্যে আমি একে-বারে অভিভূত হয়ে পড়লাম, মনে হতে লাগল গানের নীরব স্রোত আমার সমুখ দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে।

হঠাৎ কানে এল দূরের কোন ঝোপের মাঝে রিয়াবচিক ডাকছে,—শিকারের সন্ধান পেয়ে তার পিছনে ছোটার ডাক এ, উচ্চ, ভীত কণ্ঠের আর্তনাদেরই কাছা-কাছি। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম য়ারমোলা—ও-ও-বী, ও-ও-বী করে তার কুকুরকে ডাকছে। প্রথম দিকের সুরটা তার চাপা-চড়া, শেষের দিকে একটু ঝাঁকি

দিয়ে ফেটে পড়বার মত। আমি অনেক পরে জেনেছি পলিসিয়া শিকারীদের এই ও-ও-বী ডাকটা নেওয়া হয়েছে ওবীভাত* শব্দ থেকে।

কুকুরটার ডাক শুনে মনে হল ও আমার বাঁ দিকে খরগোসটার অনুসরণ করছে,—সুতরাং বনের মাঝের খোলা জায়গাটা পার হয়ে আমি ঐ দিকে ছুটলাম। কিন্তু গজ বিশেক যেতে না যেতেই দেখলাম ছাই-রঙের মস্ত বড় একটা খরগোস তীরের মত একটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে, লম্বা কান দুটো মাথার সংগে লাগিয়ে, তার পালাবার তেমন তাড়া নেই এমন ভাব দেখিয়ে, কয়েকটা লাফে রাস্তা পার হয়ে নিচের ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই সেই পথে ছুটে এল রিয়াবচিক, আমাকে দেখে দু একবার লেজ নেড়ে বরফে দু একটা কামড় দিয়ে সে আবার খরগোসের খোঁজে ছুটল।

এই সময় হঠাৎ একটা ঝোপের মাঝ থেকে য়ারমোলা বেরিয়ে এল। এসেই সে চিৎকার করে বলে উঠল, ওটাকে মারলেন না কেন, কত্তা? সংগে সংগে আমাকে তিরস্কার করতে জিভ দিয়ে কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ করলে।

আমি অনেক দূরে ছিলাম যে, দু শো ফুট, কি তারও কিছু বেশি!

আমার মুখে কাতরতার চিহ্ন দেখে তার মনটা একটু নরম হল। সে বললে, যাক, ভাববেন না। পালাতে পারবে না ও। আপনি ইরিনোভো রোড-টায় যান, এক্ষুনি ও ঐখানটায় যাবে।

আমি ঐ রাস্তার দিকে রওনা হলাম, এবং মিনিট দুয়েক পরেই আমি শব্দ শুনে বুঝলাম, আমি যেখানে ছিলাম তার কাছেই কোথাও কুকুরটা আবার খরগোস-টাকে তাড়া করেছে। শিকারের উত্তেজনায় ঘন ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বন্দুকটা ছুড়বার মত করে ধরে ডালপালার নিষ্ঠুর আঘাত তুচ্ছ করে আমি ছুটলাম। কিছুক্ষণ এই রকম দৌড়ানোর পর আমি যখন প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছি তখন কুকুরের ডাক থেমে গেল। আমিও সংগে সংগে আমার গতিবেগ কমিয়ে দিলাম। ভাবলাম এইভাবে সামনে এগিয়ে গেলেই ইরিনোভা রোডের ধারে য়ারমোলার সংগে আমার দেখা হবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি বুঝলাম কাটাগাছের গুঁড়ি আর ঝোপ এড়িয়ে এড়িয়ে দৌড়বার সময় আমি দিক ভুল করে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তখন য়ারমোলাকে ডাকতে শুরু করলাম আমি। কিন্তু আমার ডাকের সাড়া মিলল না।

যন্ত্রচালিতের মত আমি এগিয়ে চললাম। বন ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসতে লাগল, মাটিতে জলার চিহ্ন। তুষারের উপর আমার পায়ের ছাপ শিগগিরই কালো হয়ে যেতে লাগল, এবং সেখানে জল উঠতে লাগল। কয়েক বার আমার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল, শেষে এক উঁচু জায়গা থেকে আর এক উঁচু জায়গায়

* হত্যা করা।

লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলাম আমি। নরম কম্বলের ভিতর যেমন পা ডুবে যায়, বাদামী শেওলার মাঝে তেমনি আমার পা ডুবে যেতে লাগল।

শিগগিরই ঝোপ ঝাপ পার হয়ে গেলাম আমি। সামনে পড়ল তুষারে ঢাকা মস্ত বড় গোল এক জলা, এখানে-ওখানে তার ঘন ঘাসের গোছা। জলাটার ওধারে গাছের মাঝে একটা কুড়ে ঘরের সাদা দেওয়াল দেখা যাচ্ছিল। ভাবলাম এটা ইরিনোভোর কোন বনবাসীর বাড়ি। ওখানে গিয়ে আমার পথটা জেনে নেওয়াই ভাল।

ভাল ত,—কিন্তু ঐ কুড়ে ঘরটার কাছে পেঁছিনো আমার তেমন সহজ হল না। প্রতি মুহূর্তে জল কাদার মাঝে আমার পা ডুবে ডুবে যেতে লাগল। আমার উঁচু বুটের ভিতর জল ঢুকে প্যাচ প্যাচ করতে লাগল,—সেই জল ভরতি ভারী বুট নিয়ে চলা আমার ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে লাগল।

যাই হোক অতি কষ্টে জলা পার হয়ে আমি শেষে একটা ছোট পাহাড়ের মত উঁচু জায়গায় উঠলাম। এখান থেকে কুড়ে ঘরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। রূপকথায় ডাইনীদের কুড়ে ঘরের যে বর্ণনা আছে,—তার সঙ্গে যেন এর অনেকটা মিল আছে। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে কতকগুলি কাঠের স্তূপের উপর বাড়িটা তৈরি,—ইরিনোভো বনে বসন্ত কালে প্রায়ই বন্যার জল ঢোকে বলে হয়ত এমনি করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অনেক দিনের পুরানো বলে কিছুটা নুয়ে পড়েছে,—কেমন যেন টলমলে, দেখলে মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। দু একটা জানালায় কাঁচ নেই,—সেখানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কতকগুলি ময়লা ছেঁড়া নেকড়া,—বাইরে বেরিয়ে আছে সেগুলি।

হাতল ধরে ধাক্কা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেললাম আমি। ভিতরে দস্তুর মত অন্ধকার, তা ছাড়া অনেকক্ষণ বরফের দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলে চোখের সামনে তখন আমি বেগুনে চাকা দেখছি,—সুতরাং ঘরে কেউ আছে কি না তা বুঝতে আমার বেশ বেগ পেতে হল।

আমি বেশ জোর গলায়ই হাঁকলাম,—ঘরে কেউ আছ?

স্টোভটার কাছে কি যেন নড়ল। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম সেখানে মেঝের উপর এক বুড়ী বসে, আর তার সামনে রয়েছে এক রাশ মুরগীর পালক। একটি একটি করে পালক তুলে ওর মাঝের ডাঁটার মত শক্ত অংশ থেকে নরম অংশ বার করে একটা চুপড়ীর মাঝে রাখছে বুড়ী, শক্ত ডাঁটাগুলি মেঝেতে ফেলে দিচ্ছে।

বুড়ীটার দিকে ভাল করে চাইতেই আমার হঠাৎ মনে হল,—এ নিশ্চয়ই সেই ইরিনোভোর ডাইনী ম্যানুইলিখা। এর চেহারাটাও সেই উপকথায় শোনা ডাইনীর মত—লিকলিকে শরীর,—তুবড়ানো গাল, টিয়ার ঠোঁটের মত নাকটা লম্বা সুচল থুতনীতে এসে প্রায় লেগে গেছে। চুপসে যাওয়া ফোকলা মুখখানা অনবরত নড়ছে, যেন কি চিবুচ্ছে। ফুলো ফুলো চোখ দুটোর রঙ একদিন নীল থাকলেও এমন কেমন ফ্যাকাশে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে চোখের পাতা ছোট আর লাল,—সব

কিছু মিলিয়ে দেখলে মনে হয় যেন কোন অদ্ভুত অমঙ্গলে পাখির চোখ।

কণ্ঠে যতদূর সম্ভব বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়ে বললাম,—ঠাকুমা, নমস্কার। আচ্ছা,—তুমিই কি ম্যানুইলিখা?

কথা বলতে গিয়ে বুড়ীর বুক থেকে কেমন ঘড় ঘড় সাঁ সাঁ শব্দ আসতে লাগল,—মুখ থেকে বেরুতে লাগল হাঁপিয়ে পড়া বুড়ো কাকের মত কর্কশ শব্দ, —তা-ও আবার অস্পষ্ট,—ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

বুড়ী ঐ রকম সুরেই বললে,—ভাল মানুষের বেটাবেটীরা একদিন আমায় ঐ নামেই ডাকত বটে,—কিন্তু এখন আমার কোন নামও নেই; খ্যাতিও নেই। সে যাক,—তুমি এখন কি চাও বল ত?

বুড়ীর রকম সকম তেমন ভাল বোধ হল না,—তা ছাড়া কথা বলবার সময় তার ঐ একঘেয়ে কাজ থেকে একটু থামল না পর্যন্ত।

ঠাকুমা, আমি পথ ভুলে এসে পড়েছি এখানে, একটু দুধ পেতে পারি?

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী বলে উঠল,—না, দুধ—দুধ নেই এখানে। তোমার মত অনেকেই এসে পড়ে এখানে, সবাইকে খাওয়ানোর মত সঙ্গতি নেই আমার।

ঠাকুমা, তুমি দেখছি, লোকের যত্ন আর্তি করতে জান না।

সত্যিই তাই। ও সব জানি না আমি। খাবার-টাবার কিছু দেওয়া হয় না এখানে। ক্লান্ত হয়ে থাক,—বসতে পার তুমি, কিছু্ছু মনে করব না তাতে। জানো ত,— লোকে কথায় বলে, এসো, আমাদের বাড়ির ধারে বসো, আমাদের গির্জের ঘণ্টা শোনো,—কিন্তু খাবারের কথা যদি তোলো, তা হলে তোমার বাড়িতেই বরং আমরা যাব।—এই বৃত্তান্ত।

বুড়ীর উপমায় রঙ-চড়ানো কথা শুনে মনে হল সে এমন কোন অঞ্চল থেকে আসেনি যেখানে ছন্দোবদ্ধ মালস্কায়া ভাষার আদর নেই, আরও মনে পড়ল যে উত্তর অঞ্চলের লোকেরাই এইরকম ভাষা বেশি পছন্দ করে। বুড়ী তখনও যন্ত্র-চালিতের মত তার কাজ করে যাচ্ছে, আর আপন মনে বিড় বিড় করে কি সব বকে যাচ্ছে, কণ্ঠস্বর ক্রমেই তার অস্পষ্ট আর অনুচ্চ হয়ে আসছে। অসংলগ্ন প্রলাপের মত তার কয়েকটি কথা শুধু আমার কানে এলঃ হাঁ, তোমার কাছে আমি ঠাকুমা ম্যানুইলিখা,—কিন্তু একে তাই ত কেউ মানে না—বুড়ো হয়ে যাচ্ছি এখন,—আর অস্থির ম্যাগপাই পাখির মত কেবল কিচ্ কিচ্ কিচির মিচির শব্দ করছি।

কিছুক্ষণ এর এই সব শুনবার পর আমার হঠাৎ মনে হল এক পাগলী-বুড়ীর সামনে এমন করে বসে থাকবার কোন মানে হয় না।

তবু যাবার আগে ঘরটার চারিদিক একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম আমি। ঘরের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে চেলা ভর্তি মস্ত বড় এক স্টোভ। সামনের কোণে যীশুর কোন মূর্তি নেই। এ রকম বাড়ির দেয়ালে সাধারণত ছবি থাকে বেগুনে রঙের কুকুরের সঙ্গে সবুজ গোঁফওয়ালা শিকারীর, আর

অজ্ঞাতনামা কোন সেনাপতির, তার বদলে এখানকার দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে সব শুকনো গাছগাছড়া, থোপা থোপা কুঁচকে-যাওয়া শেকড় আর রান্নার বাসন-কোসন। পেঁচা বা কালো বেড়াল—এ সব কিছু দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু তার বদলে দেখলাম—বিচিত্র ডোরা-কাটা গম্ভীর এক জোড়া শুকপাখি স্টোভের উপর থেকে বিস্মিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে।

আগেকার চেয়ে একটু জোরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঠাকুমা, একটু জল ত পেতে পারি আমি ?

ঐ যে ঐ বালতিতে রয়েছে, উত্তর দিলে বুড়ী।

জলটায় দেখলাম কেমন জলা জায়গার গন্ধ। যাই হোক, বুড়ীকে ধন্যবাদ জানালাম আমি, কিন্তু সে তা গ্রাহ্যও করলে না। এর পর জিজ্ঞাসা করলাম আমি রাস্তায় বেরুব কি করে।

বুড়ী এইবার তার মাথাটা তুলে পাখির মত ঠান্ডা চোখে একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দ্রুত বিড় বিড় করে বলে গেল,—যাও না ? যেখানে যাবার চলে যাও, এখানে তোমার কোন দরকার নেই। অতিথি আদরের, যখন তাকে ডাকা হয়, নইলে নয়। যাও, চলে যাও।

এখন যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রইল না। কিন্তু হঠাৎ এই কড়া-মেজাজের বুড়ীর মন নরম করবার একটা উপায়ের কথা মনে পড়ে গেল আমার। এটা খাটবে কিনা দেখবার জন্য পকেট থেকে চকচকে একটা রৌপ্যমুদ্রা বের করে বুড়ীর সামনে ধরলাম। দেখলাম আমি ঠিকই ধরেছি। টাকাটা দেখবামাত্র তার চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁকা গিঁট-বেরুনো কম্পিত আঙুলগুলি বাড়িয়ে দিলে সে।

টাকাটা লুকিয়ে তাকে একটু খেলাবার জন্য বললাম, না ঠাকুরমা ম্যানুইলিখা, টাকাটা শুধু শুধু দিচ্ছি না আমি। আমার ভাগ্য গণনা করে বলো আগে ?

ডাইনীর কোঁচকান বাদামী মুখখানায় বিরক্তি আর ক্রোধের রেখা ফুটে উঠল। দেখে মনে হল—আমার মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে চেয়ে সে দোটানায় পড়ে গেছে। শেষে ধনলোভই জয়ী হল।

বুড়ী অনেক কষ্টে মেঝে থেকে উঠে বললে, ঠিক আছে, এস তুমি, বলছি। এখন আর কারো ভাগ্যগণনা করি না আমি, বাবা। এক রকম ভুলেই গেছি। বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি চোখে দেখতে পাই না। তবু তোমায় খুশি করবার জন্য গণনা করছি আমি।

দেয়ালটা ধরে ধরে শীর্ণ দেহে কাঁপতে কাঁপতে সে টেবিলটার কাছে গিয়ে বাদামী রঙের বহুদিনের ব্যবহারে রোয়া বেরুনো এক গোছা তাস টেনে নিলে,—তার পর সেগুলি আচ্ছা করে তাসলে।

তারপর তাস গোছা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, তোমার বাঁ হাত দিয়ে কাট, ঐ হাতটাই হৃদয়ের কাছাকাছি বটে।

এরপর নিজের আঙুলগুলির উপর থুথু ফেলে নিয়ে তাসগুলি এমন থবথব শব্দে টেবিলের উপর রাখতে লাগল, যেন সেগুলি মাখা ময়দা দিয়ে তৈরী, সেগুলি দিয়ে একটা অষ্টভুজের মত তারকা চিহ্ন তৈরী হয়ে গেল। শেষের তাস-খানা গিয়ে উল্টোমুখ রাজার উপর পড়বার পর ম্যানুইলিখা তার হাতের তালুটা মেলে ধরে বললে, এর উপর রুপো দিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকো।...তুমি সুখী হবে, ধনী হবে। বেদেনীরা ভিক্ষা করতে এসে যেমন সুরে কথা বলে ঠিক তেমন সুরে বললে সে এই কথাগুলি।

টাকাটা তার হাতের উপর দিতেই সে বানরের মত ক্ষিপ্র হস্তে সেটা গালের আড়ালে লুকালে। তার পর গড়গড় করে বলে যেতে লাগল,—এক দীর্ঘ পথ ভ্রমণকালে লাভবান হবে তুমি, এক হরতনের বিবির সঙ্গে দেখা হবে তোমার, নামকরা একটা ঘরে চমৎকার একটা আলোচনা শুনবার সুযোগ পাবে তুমি; চিড়িয়ার সাহেবের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত খবর পাবে তুমি। সামান্য একটু মুস্কিলে পড়বে তুমি, তার পরেই কিছু অর্থলাভ হবে তোমার। বড় একটা দলে পড়ে মাতাল হবে,—অবশ্য খুব বেশি নয়, তবু মদ তোমায় খেতেই হবে, —এ তোমার ভাগ্যে লেখা আছে। দীর্ঘায়ু লাভ করবে তুমি। সাতষট্টি বৎসরে যদি না মর—

বুড়ী বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে কি যেন শুনবার জন্য কান খাড়া করলে। আমিও কান পেতে রইলাম। বাড়িটার দিকে আসতে আসতে কে যেন একটি মেয়ে দরাজ আর কাঁপানো গলায় গান ধরেছে। শুনেই বুঝলাম উক্রেইনের মধুর পল্লীগীতি এ। মেয়েটি গাইছে—

শুধু মঞ্জরিত শাখা কি গো
লাল গোলাপকে নুইয়ে দেয় ?
আমার ক্লান্ত মাথা এলিয়ে পড়ে
সে কি শুধু তন্দ্রায় ?

ম্যানুইলিখা চঞ্চল অস্থির হয়ে আমাকে টেবিলের কাছ থেকে ঠেলে দিয়ে বললে,—এখন, বাপু, তুমি এস। অপরিচিত লোকের বাড়িতে এমন শুধু শুধু পড়ে থাকবার মানে হয় না। যেখানে যাবে তুমি, চলে যাও।

এমন কি আমার জামার আস্তিন ধরে আমায় দরজার দিকে টানতে সে শুরু করলে। চোখে মুখে তার ভীত চকিতের ভাব।

কুঠিটার কাছাকাছি এসে গানটা থেমে গেল, লোহার হাতলটায় খট করে একটা শব্দ হল এবং তার পরেই দেখা গেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে। হাসছে সে। দুই হাতে সে তার ডোরাকাটা এ্যাপ্রনটা তুলে ধরেছে, এবং তার মাঝ থেকে তিনটে ছোট পাখি মুখ বের করে রয়েছে। গলা তাদের লাল,—চোখগুলি কালো পুঁতির মত।

মেয়েটি প্রাণ খোলা হাসি হাসতে হাসতে বললে,—দেখ, এই ফিনচ্‌গুলি

আবার কেমন আমায় আঁকড়ে ধরেছে। কেমন মজার পাখি দেখ!...খিদে পেয়েছে ওদের, অথচ আমার কাছে একটুও রুটি নেই।

এর পরই সে আমায় দেখতে পেলে, সঙ্গে সঙ্গে তার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। লজ্জা পেল সে। কালো ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত করে ম্যানুইলিখার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলে সে।

বুড়ী বললে,—এই ভদ্রলোক পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তার পর আমার দিকে ফিরে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি, অনেক হয়েছে, আর না। জল খেয়েছ তুমি, তোমার যা বলবার ছিল বলেছ, আর বেশি থাকলে সব কিছু তেতো হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে মিশবার মত লোক নই আমরা।

আমি মেয়েটির দিকে চেয়ে বললাম, তুমি আমায় ইরিনোভো রোডের দিকে যাবার পথটা দেখিয়ে দেবে? আমি নিজে নিজে তোমাদের এ জলা থেকে কিছুতেই বেরুতে পারব না।

মেয়েটির হাবভাব দেখে মনে হল, আমার শান্ত অনুনয়ের ভঙ্গীতে মনটা তার গলেছে। ফিনচ্‌গুলিকে অতি সন্তর্পণে স্টার্লিংগুলির পাশে রেখে,—নিজের গায়ের খোলা কোটটা সে বেঞ্চের উপর ছুড়ে ফেলে দিলে, তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি তার পিছু পিছু এলাম।

তার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে বললাম, তোমার পাখিগুলি পোষা?

আমার দিকে না চেয়েই সে সংক্ষেপে উত্তর দিলে, হাঁ। তারপর ডালপালার বেড়ার কাছে এসে থেমে সে বললে, এই দিকে তাকান।...দুটো পাইন গাছের মাঝে পথ দেখতে পাচ্ছেন একটা?

হাঁ।

ঐ পথ ধরে সামনে এগিয়ে যান। একটা ওকের ডাল পড়ে রয়েছে দেখবেন, সেখান থেকে ডাইনে বনের মাঝ দিয়ে চলতে থাকবেন, তা হলে ইরিনোভো রোড পেয়ে যাবেন।

মেয়েটি তার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে যখন আমাকে পথের নির্দেশ দিচ্ছিল, তখন তার দিকে চেয়ে মনে মনে তার সৌন্দর্যের তারিফ না করে পারছিলাম না। মেয়েটি এখানকার গ্রাম্য মেয়েদের মত মোটেই নয়, এখানকার মেয়েরা মস্ত বড় রুমাল দিয়ে উপর থেকে তাদের কপাল এবং নিচে থেকে তাদের চিবুক ঢেকে দেয়, বড় কুৎসিত দেখায়, তা ছাড়া সব সময়ই ভীতু ভীতু তাদের মুখের ভাব। আর আমার পাশের এই দীর্ঘকায়া তন্বঙ্গী মেয়েটির ও সব বালাই নেই, স্বচ্ছন্দ তার গতি, হাবভাব অতি সুন্দর। বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মাঝামাঝি। তার সুগঠিত বক্ষদেশ একটা সাদা ব্লাউজে ঢাকা। তার মুখখানা এত সুন্দর যে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। মেয়েটির সৌন্দর্য এমন যে বারবার দেখলেও তা বর্ণনা করা যায় না। তার সৌন্দর্যের এক উৎস হচ্ছে তার বড় বড়

কালো উজ্জ্বল দুটি চোখ, সংযোগহীন সুন্দর বাঁকা দুটি ভ্রূ যাতে এক সঙ্গে ঔদ্ধত্য আর সারল্যের আমেজ এনে দিচ্ছে, আর হচ্ছে গোলাপীর ছোঁয়াচ লাগা জলপাইয়ের মত গায়ের রঙ,—আর তার ঠোঁটের এক গুম্মির বক্ররেখা।

বেড়াটার ধারে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে এই বনে একা একা থাকতে ভয় করে না তোমাদের?

আমার প্রশ্ন শুনে কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়ে নিলে সে, তার পর বললে, কিসের ভয়? নেকড়ে আসে না এদিকে।

শুধু নেকড়ের কথা আমি বলছি না, বলছি মানে,—তোমরা তুষার চাপা পড়তে পার, আগুন লাগতে পারে, কত কি হতে পারে। তোমরা একা-একা থাক এখানে,—আর কেউ এসে যে সাহায্য করবে তারও উপায় নেই।

ভালই ত! বলতে গিয়ে ঘৃণার রেখা ফুটে উঠল মেয়েটির মুখেঃ চিরকাল যদি লোকে দিদিমা আর আমাকে এমনি থাকতে দিত, তা হলে ত ভালই হত,—কিন্তু—

কিন্তু কি?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, থাক, বেশি জানা ভাল নয়, জানেনই ত,—বেশি জ্ঞানে মাথায় টাক পড়ে যায়। তার পর একটু ভয় সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু আপনি কে?

বেশ বুঝছিলাম, বুড়ী ও এই মেয়েটি দুই জনেরই মনে ভয়—কর্তৃপক্ষ পাছে তাদের কোন না কোন রকম নির্যাতন করেন। তাই তাদের ভয় ভাঙানোর জন্যে বললাম, ভয় নেই, উর‍্যাদনিক, কেরানী বা আবগারির কোন লোক আমি নই,—মোট কথা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

সত্যি?

দিব্যি করে বলছি, বিশ্বাস কর আমায়। আমি সম্পূর্ণ বিদেশী লোক, কয়েক মাসের জন্য এখানে এসেছি, কয়েক মাস পরেই চলে যাব। তুমি যদি বলতে মানা কর, তবে কাউকেই বলব না যে আমি এখানে এসেছিলাম, এবং তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

শুনে মেয়েটির মুখখানা একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আপনি যা বলছেন তা যদি মিথ্যে না হয় তা হলে সত্যিই বটে। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে আগে কিছু শুনেছেন আপনি, না আপনিই এসে পড়েছেন এখানে?

এর কি উত্তর দেব সত্যি বুঝছি না আমি। স্বীকার করছি তোমাদের কথা আমি আগেই শুনেছি, একদিন তোমাদের এখানে আসব তা-ও ভেবে রেখেছি,—আজ কিন্তু আমি পথ ভুলে এমনি এসে পড়েছি। কিন্তু তোমরা লোকজন দেখে এত ভয় পাও কেন বলত? ওরা তোমাদের কি ক্ষতি করে?

সে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল, কিন্তু আমি তাদের কোন ক্ষতি করবার মতলব নিয়ে আসিনি বলে তার সে চাউনিতে

কিছুমাত্র বিচলিত হলাম না। সে শেষে কিছু নিশ্চিন্ত হয়ে বেশ একটু আগ্রহ নিয়েই বলতে আরম্ভ করল, লোকের অত্যাচারে আমাদের নিশ্চিন্তে থাকবার উপায় নেই। সাধারণ লোক তেমন কিছু খারাপ নয়, কিন্তু ঐ যে সব সরকারী হোমরা-চোমরা—উর‍্যাদনিক, স্টানোভই* আর ঐ ধরনের সব কর্মচারী, এরা এলেই কিছু না কিছু খসবে আমাদের। শুধু তাই নয়, দিদিমাকে বলে তারা—ডাইনী, সয়তানী, জেলপালানো কয়েদী, আরও কত কি। যাক গিয়ে, এ সব বলেই বা কি হবে।

ওরা কেউ কোনদিন তোমার দেহের উপর অত্যাচার করেছে?—কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই লজ্জা পেলাম আমি।

কিন্তু ও আমার কথাটা শুনবামাত্র গর্বিত উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথাটায় একটা নাড়া দিলে, বিজয়ের গর্বে ওর চোখের কোণে একবর বিদ্যুৎ খেলে গেল। ও আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে—

না। একবার এক সার্ভেয়ার একটু চেষ্টা করেছিল,—মানে প্রেম করতে এসেছিল আমার সঙ্গে, প্রতিদানে আমি এমন পেয়ার করেছি যে কোনদিন ভুলতে পারবে না সে কথা।

মেয়েটির মুখে এই ব্যঙ্গাত্মক গর্বোক্তি শুনবার সময় তার এমন এক অমার্জিত স্বাধীন মনের পরিচয় পেলাম যে, তখনই আমার মনে হতে লাগল—হাঁ, চালাকি নয়, পোলিস্যির অরণ্যে প্যালিত মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবার মানা আছে।

আমার উপর বিশ্বাস যেন তার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে মেয়েটি বলতে লাগল,—আমরা ত কারো উপর অত্যাচার করি না। লোকের সঙ্গে মিশিও না। কিছু সাবান আর লবণ কিনবার জন্য বছরে একবার মাত্র আমি শহরে যাই। আর দিদিমার জন্যে কিছু চা আনি,—উনি চা বড় ভালবাসেন। এই সব আনতে না হলে কোন লোকের মুখ না দেখেই আমার চলে যেত।

আমি দেখছি তোমার দিদিমা আর তুমি—দুইজনের একজনও লোকজন আসা যাওয়া তেমন পছন্দ কর না। কিন্তু আমি যদি তোমাদের এখানে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে কোনদিন আসি, কিছু মনে করবে তোমরা?

আমার এই কথা শুনে মেয়েটি হেসে উঠল,—আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের কঠিন রেখা নিঃশেষে মুছে গিয়ে তাতে এক শিশুসুলভ কমনীয়তা আর সলজ্জভাব ফুটে উঠল।

সে বললে, কেন, আপনিই বা আসতে চান কেন আমাদের এখানে? দিদিমা বা আমার সঙ্গে কথা বলে কেউ সুখ পায় না। যাই হোক, আপনি যদি সৎলোক হন, ত আসতে পারেন, তবে এইটুকু শুধু বলে রাখছি, আমাদের এদিকে আসতে হলে, আপনার বন্দুকটা বরং আপনি রেখে আসবেন।

---

*জেলা পুলিশ কমিশনার

কেন, ভয় পাও না কি তুমি?

ভয় কিসের? ভয় পাই না আমি কিছুতেই, বলবার সময় দেখলাম তার কণ্ঠে আবার সেই আগেকার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। সে বলতে লাগল, মোট কথা আমি ও সব পছন্দ করিনা, পাখি কিংবা খরগোশই বা মারা কেন? কারো ত কোন ক্ষতি করে না ওরা, আপনি আমি যেমন বাঁচতে চাই, ওরাও তেমনি বাঁচতে চায়,—তা ছাড়া ওরা কত ছোট আর অসহায়।...

এরপর হঠাৎ সে বলে উঠল,—যাক, এবার আমার বিদায় নিতে হবে। আপনার নামটা পর্যন্ত জানা হল না আমার।...দিদিমা আমায় বকবে।

বাতাসে তার চুল এলিয়ে পড়েছিল, দুই হাতে সেইগুলি ধরে, মাথাটা একটু নিচু করে হালকা দ্রুতপদে সে তার কুটীরের দিকে ছুটল।

আমি চিৎকার করে ডাকলাম,—শোন, এক মিনিট। তোমার নামটা বলে যাও। ঠিকমত পরিচয় হোক আমাদের।

এক সেকেণ্ডের জন্য সে থামলে, ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,—আমার নাম য়্যাল্যোনা। সবাই এখানে আমাকে ওলেস্যা বলে ডাকে।

বন্দুক কাঁধে নিয়ে আমি মেয়েটির নির্দিষ্ট পথে চলতে শুরু করলাম। প্রথমে ছোট্ট একটা পাহাড়ে উঠতে হল আমার, সেখান থেকে অতি সরু একটা বনপথ শুরু হয়েছে,—পথটা ক্বচিৎ চোখে পড়ে। ঐ পাহাড়টায় দাঁড়িয়েই পিছন ফিরে চাইলাম আমি একবার; সিঁড়ির উপর ওলেস্যার লাল স্কার্টটা তখনও চোখে পড়ছে, বাতাসে ওটা একটু দুলছে,—ধবধবে সাদা বরফের পাশে ঐ লাল চিহ্নটা বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

আমি পোঁছবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে য়্যারমোলা বাড়ি ফিরল। বাজে কথা বলা য়্যারমোলা কোনদিনই পছন্দ করেনা, তাই কি করে কোথায় আমি পথ হারিয়েছিলাম সে সবের কিছুই সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে না, শুধু বললে, খরগোশটা রান্নাঘরে রেখেছি, ওটা রোস্ট করব, না কাউকে পাঠাবেন আপনি?

শুনে ও আশ্চর্য হবে ভেবে আমি বললাম,—য়্যারমোলা, আজ আমি কোথায় গিয়েছিলাম, জানো?

য়্যারমোলা গর্জে উঠল শুনেঃ জানিনা? আপনি ডাইনী দেখতে গিয়েছিলেন। কি করে বুঝলে?

বুঝা আর এমন কি কঠিন? আপনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন না, সুতরাং আপনার পায়ের দাগ দেখে কোনদিকে গিয়েছেন আপনি ঠিক করতে হল। এ সব করবেন না, কত্তা,—এতে পাপ হয়। য়্যারমোলার কণ্ঠে তিরস্কারের সুর।

৪

সেবার বসন্তকালটা একটু শীগগিরই এসে গেল এবং অন্যান্যবারের মতই পোলিসিয়্যতে এসে গেল যেন কোন খবরবার্তা না দিয়ে অতি অকস্মাৎ। গ্রামের

রাস্তার উপর দিয়ে ভয়ঙ্কর বেগে যেন ছোট ছোট নদী বয়ে যেতে লাগল, চক্‌চকে আর ঘোলাটে তাদের জল। ছুটে যাবার সময় পাথরে লেগে তারা ফেন উদ্গীরণ করতে লাগল—তাদের ঘূর্ণীর মাঝে পড়ে কাঠের চেলা সব হাঁসের মত ডুব মারতে লাগল। বড় বড় সব খানা ডোবার স্থির জলে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব পড়তে লাগছে, আকাশে সাদা মেঘ ভেসে যাবার সময় মাঝে মাঝে যে ঘূরপাক খাচ্ছে—তারও। রাস্তার ধারের সব উইলোগাছে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই-পাখি আনন্দের উত্তেজনায় এত জোরে কিচিরমিচির শুরু করল যে, আর কোন শব্দ কানেই যায় না। অতিদ্রুত জীবন জেগে উঠছে সর্বত্র, চারিদিকে তারই আনন্দোৎসব।

খোড়ল আর রোদ পায় না এমন ঝোপঝাপ ছাড়া আর সর্বত্রই বরফ গলতে সুরু করছে, যে সব জায়গায় আছে সেখানেও ওগুলি দেখাচ্ছে যেন কতকগুলি ময়লা স্পঞ্জের তালি। বরফ গলে যাওয়ায় সিক্তোক্ষ পৃথিবী আবার অনাবৃত হয়ে পড়েছে, সারা শীতকাল বিশ্রামের পর রসপূর্ণ হয়েছে তার দেহ, মনে এখন নব মাতৃত্বের আকাঙ্খা। কালো কালো মাঠের বুক থেকে হালকা ধোঁয়ার মত বাষ্প ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে, বরফগলা মাটির সঙ্গে বাতাস ভরে উঠেছে,—বসন্তের এই দিব্য, নতুন কড়া গন্ধ যে অন্য রকমের গন্ধ থেকে পৃথক, তা শহর বাজারে থেকেও বুঝা যায়। এই গন্ধের সঙ্গে বসন্ত-সুলভ এক সতৃষ্ণ প্রত্যাশা অস্পষ্ট আশায়-ভরা এক মধুর কোমল বেদনা আমার মনে ভেসে আসছিল, এই কবিজনোচিত বিষণ্ণতা যখন কারো মনে জাগে তখন তার চোখে প্রত্যেক নারী হয়ে ওঠে সুন্দর, আর বিগত বসন্তের জন্য একটা অস্পষ্ট হাহাকার জাগে মনে। রাত্রি সুখোষ্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তার গভীর আর্দ্র অন্ধকারে প্রকৃতির সৃজনীশক্তি যে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল।

এই বসন্তের দিনগুলিতে ওলেস্যার মূর্তি প্রতিক্ষণ আমার মনে জেগেছে। একা থাকবার সময় আমি শুয়ে শুয়ে মনকে নিবিষ্ট করবার জন্য চোখ বুজে তার, ক্ষণে ভ্রূকুটিকুটিল কঠিন, ক্ষণে হাস্যোজ্জ্বল কমনীয় মুখখানা কল্পনা করতে চেষ্টা করতাম, মনশ্চক্ষে দেখতে চাইতাম তার প্রাচীন আরণ্য স্বাধীনতায় পরি-বর্ধিত তরুণ 'ফার' গাছের মত কঠিন-তনু-দেহ,—মনে আনতে চেষ্টা করতাম তার মখমলের মত কোমল অনুচ্চ তরুণ কণ্ঠস্বর। দিব্য কথাটা এখন বহুবার উচ্চারিত হয়ে বাসি হয়ে গেছে, কিন্তু এই কথাটার ঠিকমত মানে করতে গেলে যা হয় সেই ভাব রয়েছে তার প্রত্যেকটি কথায়, প্রতিটি ভঙ্গীতে, কি এক দিব্য সামঞ্জস্য—আর এভাব তার সহজাত। ওলেস্যার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হবার আর যে কারণ ছিল তা হচ্ছে তার জীবনের রহস্যময় পরিবেশ, গহন অরণ্যের জলার ধারে তাদের ডাইনীর জীবন যাপন, তা ছাড়া যে দুচারটে কথা বলেছে আমার সঙ্গে তার মাঝেই প্রকাশিত তার দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়।

বনের পথঘাট একটু শুকুলেই আমি ডাইনীর কুটীরের দিকে রওয়ানা হলাম।

বদমেজাজী বুড়ীর মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্য দরকার হতে পারে মনে করে আমি আধ পাউণ্ড চা এবং কিছুটা চিনি সঙ্গে নিয়ে চললাম।

ওরা দুজনেই বাড়িতে ছিল। ম্যানুইলিখা গরম স্টোভের কাছে বসে বক্‌বক্‌ করছিল, আর ওলেস্যা একটা উঁচু বেঞ্চেত বসে শনের সুতো কাটছিল। আমি ঘরে ঢুকবার সময় একটু শব্দ হওয়ায় ও যেই একটু ফিরে তাকিয়েছে, অমনি ওর সুতো কেটে গেল আর টাকুটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

স্টোভের আঁচ থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য হাতের তালু দিয়ে কুঞ্চিত মুখখানা ঢেকে বুড়ী ক্রুদ্ধ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি উচ্চ উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠলাম,—নমস্কার ঠাকুমা। আমাকে চিনতে পারছ না বোধ হয়। মনে করে দেখ, গত মাসে আমি পথ ভুলে তোমার এখানে পথের সন্ধান নিতে এসেছিলাম। তুমি আমার ভাগ্য গণনা করে বললে, মনে পড়ে?

অপ্রসন্নমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বিড় বিড় করে বললে,—আমার মনে নেই। সত্যিই বলছি কিছুই মনে পড়ে না আমার। আর তুমি যে এখানে কি চাও তা-ও আমি বুঝি না। তোমার মিশবার যোগ্য লোক নই আমরা,—আমরা সাধারণ অজ্ঞ লোক। আমাদের এখানে তোমার কোন কাজ থাকতে পারে না। এ বনে অনেক জায়গা আছে, অন্য কোথাও বেড়াও গিয়ে তুমি, এই আমার কথা।

অভ্যর্থনার রকম দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, বোকা বনে গেলাম, বুঝতেই পারছিলাম না কি করা উচিত হবে আমার ঃ বুড়ীর এই রূঢ়তা রসিকতা মনে করে উড়িয়ে দেব, রেগে উঠব, না আর একটি কথাও না বলে চলে যাব? আমি অসহায়ের মত ওলেস্যার দিকে চাইলাম। সে একটু সহৃদয় ব্যঙ্গের হাসি হেসে তার টাকু ছেড়ে উঠে বুড়ীর কাছে এগিয়ে গেল।

বুড়ীকে ঠাণ্ডা করতে সে নরম সুরে বললে, ভয় পেও না, দিদিমা,—উনি ভাল লোক, আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। তারপর সামনের কোণের বেঞ্চটা দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, ওর উপর বসে পড় তুমি। বুড়ীর অসন্তোষের কথায় সে আর কানই দিলে না।

ওলেস্যার ব্যবহারে একটু উৎসাহ পেয়ে আমি আমার মোক্ষম ওষুধ প্রয়োগ করব ঠিক করলাম।

ঠাকুমা, তুমি যেন কেমনতর লোক। লোক বাড়িতে এলেই তুমি তাকে বকতে শুরু কর। ভেবেছিলাম তোমায় কিছু উপহার দেব আমি।—বলেই আমার ব্যাগ থেকে প্যাকেটগুলি বের করলাম।

ম্যানুইলিখা প্যাকেটগুলির দিকে একবার চেয়েই আবার স্টোভের ধারে গিয়ে বসল।

আগুন খোঁচানোর কাঠি দিয়ে জোরে জোরে কয়লা ঠেলতে ঠেলতে সে বললে, চাই না তোমার উপহার। তোমার মত লোকদের আমি চিনি। প্রথমে তারা এ ও তা দিয়ে মন জয় করে নেবে,—তারপর...।

হঠাৎ বুড়ী আমার দিকে ফিরে বলে উঠল,—দেখি কি আছে তোমার ঐ ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে।

আমি চা আর চিনির প্যাকেট দুটো তার হাতে তুলে দিলাম। দেখলাম, এতে তার মন বেশ একটু নরম হয়েছে, কথায় অবশ্য সেই অসন্তোষের সুরই আছে, কিন্তু সে সুর আগের মত অত তীব্র নয়,—শুনে মনে হয় একটু পরেই ভাব হোতে আর বাধবে না। ওলেস্যা আবার গিয়ে সুতো কাটতে বসল, আর আমি তারই পাশে ছোট নিচু আর নড়বড়ে এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। বাঁ হাতে সে দ্রুত সাদা রেশমের মত নরম আঁশগুলিতে পাক দিচ্ছিল আর ডান হাতে টাকুটা অতি হালকা ভাবে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল,—ঘুরতে ঘুরতে টাকুটা একেবারে মাটির কাছে নেমে আসছিল, তারপর সেটা আবার ধরে নিপুণ হাতে সুতো গুটিয়ে স্বল্প অঙ্গুলি চালনে আবার তাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল। কাজটি অতি সহজেই সে করে যাচ্ছিল বটে, এবং দেখতেও প্রথমে এটা সহজই লাগে, কিন্তু এ করতে যে নৈপুণ্য আর কৌশলের প্রয়োজন হয় তা অর্জন করতে মানুষের এক যুগ কেটে যায়। কাজ করবার সময় ওর হাতের দিকেও না তাকিয়ে পারছিলাম না আমি, কাজ করে করে ওর আঙুল দুটি একটু কড়া আর ময়লা হয়ে গেছে বটে, কিন্তু দেখতে ও দুটি এত ছোট আর সুন্দর যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও তা দেখে হিংসা না করে পারে না।

ওলেস্যা বললে, আগের বার দিদিমা যে আপনার ভাগ্যগণনা করেছে এ কথা ত বলেন নি আমায়! এরপর আমি ভয়ে ভয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছি দেখে সে বললে, ভয় নেই, শুনতে পাবে না, দিদিমা কানে একটু কম শোনে। আমার গলাটা শুধু ও শুনতে পায়।

হ্যাঁ, আমার ভাগ্যগণনা করেছিলেন তোমার দিদিমা। কেন--এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

কিছু নয়, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। এতে বিশ্বাস করেন আপনি? ওলেস্যা আমার দিকে দ্রুত অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠল।

এতে মানে কিসে বলতে চাও, তুমি—তোমার দিদিমার গণনায় না, এমনি ভাগ্যগণনায়?

ভাগ্যগণনায়।

বলা বড় শক্ত। আমার মনে হয় এতে বিশ্বাস আমার নেই, তবু, কে জানে? লোকে বলে সময় সময় এসব সত্যি হয়েও যায়। অনেক পণ্ডিত লোকও তাঁদের বইতে এসব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তোমার দিদিমা আমায় যা যা বলেছেন তাতে আমার বিশ্বাস নেই। গ্রামের যে কোন মেয়েছেলে ওরকম বলতে পারে।

ওলেস্যা একটু হাসল।

হ্যাঁ, এখন আর ও ও-সব ভাল বলতে পারে না। বুড়ো হয়ে গেছে, তা ছাড়া ভয়ও পায়। কিন্তু তাস থেকে কি জানা গেল আপনার সম্বন্ধে?

তেমন কিছু নয়, তা ছাড়া সব মনেও নেই আমার। বলেছেন উনি অতি সাধারণ সব কথা, যা সবার জীবনেই ঘটে, যেমন, দীর্ঘ যাত্রা, চিড়িতন থেকে কিছু লাভ,—এইরকম সব।

হ্যাঁ, ভাগ্যগণনা এখন আর ও ভাল করতে পারে না, বুড়ো হয়ে গেছে বলে অনেক কথাই এখন ভুলে যায়। কিন্তু আগে কি সুন্দর বলতে পারত! দিদিমা এখন ভয়ও পায়। টাকা পেলে কখন-সখন অবশ্য এখনো ও সব করে।

ভয় ভয় করছ,—কিসের ভয় তোমার দিদিমার?

ভয় কর্তৃপক্ষের। উর‍্যাদনিক এখানে এলেই ওকে ধমকাতে থাকেন, বলেন, জানো যে-কোনদিন তোমাকে হাজতে পুরতে পারি? তুকতাক করার জন্য তোমার মত ডাইনীদের কি শাস্তি হয় তা জানো? সারাজীবনের জন্য দ্বীপান্তর—সাখালিন দ্বীপে সশ্রমদণ্ড। বিশ্বাস কর এসব কথা?

উর‍্যাদনিক যা বলেন—কিছুটা তার সত্যি। এসব কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অতটা নয়।...আচ্ছা, ওলেস্যা, তুমি ভাগ্যগণনা করতে পার?

শুনে একটু যেন হকচাকিয়ে গেল সে, কিন্তু সে কেবল এক সেকেণ্ডের জন্য, পরক্ষণেই সে বললে, হাঁ, পারি, কিন্তু টাকা নিয়ে নয়।

আমি যদি তোমায় তাসের সাহায্যে আমার ভাগ্যগণনা করতে বলি কিছু মনে করবে তুমি?

হাঁ, করব, কোমল অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলে ওলেস্যা।

কিন্তু কেন? আমি এখনই তো করতে বলছি না তোমায়, অন্য যে কোনদিন করলেই চলবে। আমি ভাবছি, তুমি বললে সত্যি কথা বলবে।

আমি করবই না গণনা, কিছুতেই না।

এটা কিন্তু তোমার অন্যায়, ওলেস্যা। আমরা পরস্পরের পরিচিত, এজন্যও তোমার এ অস্বীকার করা উচিত নয়। আর গণনা করতে চাওই বা না কেন তুমি?

চাই না, কারণ তাস দিয়ে আপনার ভাগ্যগণনা করেছি আমি একবার—আর একবার আমি ও কিছুতেই করব না।

কিছুতেই না? কিন্তু কেন? বুঝছি না—আমি কিছুই।

এইবার ওলেস্যা যেন কিসের ভয় পেয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলার মত করে বললে,—না, না, ও আমি কিছুতেই পারব না। দুবার করে আপনার ভাগ্য জানতে চাইবেন না আপনি। এ ভাল নয়। ও শুনে ফেলতে পারে আপনার কথা, ভাগ্য তার নির্দেশ সন্বন্ধে প্রশ্ন করলে চটে যায়, এইজন্যই গণনাকারীরা কেউ-ই সুখী হয় না।

কোন একটা রহস্য করে ওলেস্যার কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু পেরে উঠলাম না : দেখলাম যে, সে যা বলেছে ও তার গভীর বিশ্বাস থেকেই বলেছে, ভাগ্যের নাম করবার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজার দিকে এমন এক অদ্ভুত আতঙ্কের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে তার দেখাদেখি আমাকেও তাই করতে হল।

বেশ, তুমি যখন নতুন করে আমার ভাগ্যগণনা কিছুতেই করবে না, তখন, এর আগের বারের গণনায় যা পেয়েছ তাই বল—বিশেষ মিনতির মত করেই আমি তাকে বললাম।

ওলেস্যা হঠাৎ তার টাকুটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে আমার হাতে হাত দিয়ে বললে, না, তা-ও বলতে পারব না আমি। দেখলাম—চোখে মুখে তার ছোট্ট মেয়েদের মত আবদার-ভরা মিনতির ভাব ফুটে উঠেছে ঃ জানতে চাইবেন না আপনি। গণনায় ভাল কিছু পাইনি আমি, আপনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

জানবার জন্য তখনও অবশ্য আমি জিদ করতে লাগলাম। কিন্তু আমি বুঝে উঠছিলাম না, সে যে আমার ভাগ্যগণনা করতে চাইছে না, আর এ সম্বন্ধে সামান্য অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে এ কি তার গণনার ব্যবসাদারী চাল, না সত্যিই এ সবে এমনি করে বিশ্বাস করে সে। যাই হক কেমন যেন এক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, এ অস্বস্তি প্রায় আতঙ্কেরই কাছাকাছি।

আমার জিদ দেখে ওলেস্যা শেষে রাজী হয়ে গেল। সে বললে, বেশ বলছি আমি, কিন্তু মনে রাখবেন গণনা গণনাই। আপনি পছন্দ করেন না—এমন কিছু যদি বলতে হয় আমায়—রাগ করবেন না আপনি। আপনার ভাগ্যগণনায় যা পেয়েছি তা হচ্ছে এই ঃ আপনার মনে দয়াধর্ম আছে, এ কথা ঠিক, কিন্তু আপনি বড় দুর্বল। আপনার দয়া খুব উঁচু দরের নয়, কারণ এ দয়া আন্তরিক নয়। কথাও ঠিক রাখতে পারেন না আপনি। লোকের উপর কর্তৃত্ব করতে চান আপনি, অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের কাছে নতি স্বীকার করেন। মদ ভালবাসেন আপনি, আর...। বলছি যখন তখন সবই বলব আপনাকে, আর ভালবাসেন আমাদের—মানে মেয়েদের। আর এই শেষেরটা নিয়ে বেশ কিছুটা মুস্কিলে পড়তে হবে আপনার। টাকার মূল্য বোঝেন না আপনি, আর কি করে তা জমাতে হয় তা-ও জানেন না। ধনী হতে আপনি কোনদিন পারবেন না। আরও বলব?

হাঁ বলে যাও—তুমি যতটা জেনেছ।

তাসে পেলাম আমি—জীবন আপনার খুব সুখের হবে না। অন্তর দিয়ে আপনি কাউকে কোনদিন ভালবাসবেন না, কারণ হৃদয়ে আপনার আন্তরিকতা নেই, তা ছাড়া আপনি অলস প্রকৃতির। আর যারা আপনাকে ভালবাসবে তারা অনেক দুঃখ পাবে আপনার কাছ থেকে। বিয়ে আপনার হবে না, সুতরাং কোন প্রিয়জন না রেখেই জগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে আপনার। বড় রকমের সুখ কিছু পাবেন না আপনি জীবনে,—পাবেন অনেক দুঃখ আর কষ্ট। এমন দিন আসবে যখন আপনি আত্মহত্যা করতে চাইবেন। বিশেষ একটা দুঃখের দরুণই অবশ্য এ ইচ্ছা জাগবে আপনার মনে, কিন্তু এ করতে সাহস পাবেন না আপনি, সুতরাং দুঃখের জ্বালাটা সয়ে থাকতেই হবে আপনার। বেশ অভাবে দিন কাটাতে

হবে আপনার, কেবল জীবনের শেষের দিকে অকস্মাৎ কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে কিছু ধনপ্রাপ্তি ঘটবে আপনার। কিন্তু সে ত অনেক দিন পরের কথা। আর এই বৎসরে—ঠিক কখন সে কথা অবশ্য তাস-ই আমায় বলে দেবে,—হতে পারে এই মাসেই—

বলতে গিয়ে থেমে গেল ওলেস্যা। আমি বললাম, থামলে কেন, এই বৎসরে কি ঘটবে আমার ভাগ্যে বল।

বলতে ভয় পাচ্ছি আমি,—সত্যি। এক চিড়িয়ার বিবি ভীষণভাবে প্রেমে পড়বেন আপনার। তিনি বিবাহিতা না কুমারী সে কথা অবশ্য আমি বলতে পারি না, তবে এইটুকু জানি তার মাথার চুল কালো।

আমি তখনই তার মাথার দিকে চাইলাম।

মেয়েদের সহজাত বুদ্ধিবলেই আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে ওলেস্যা লজ্জায় মুখ রাঙা করে বললে, আমার দিকে চাইছেন কেন আপনি? লজ্জায় মুখ আর একটু রাঙা করে যন্ত্রচালিতের মত মাথার চুল সমান করতে করতে সে বললে,—হাঁ অনেকটা আমারই মত।

আমি রহস্য করে বললাম,—চিড়িয়ার বিবির প্রেম,—য়্যাঁ?

আমাকে তিরস্কারের—কঠোর তিরস্কারের সুরে সে বললে,—হাসবেন, না, হাসবেন না বলছি। আমি সত্যি কথাই বলেছি।

বেশ হাসব না। কিন্তু গণনায় আর কি পেলে বল।

আর কি? আর পেলাম—এই ব্যাপারের ফল চিড়িয়ার বিবির পক্ষে খুব খারাপ হবে—মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। আপনার জন্য লজ্জায় সে মরে যাবে, লজ্জা আর নিদারুণ দুঃখের কথা সারা জীবনেও সে ভুলতে পারবে না। কিন্তু তার প্রেমের জন্য আপনার কিছু মন্দ হবে না।

আচ্ছা ওলেস্যা, এমন কি হতে পারে না যে তাস তোমায় ভুল খবর বলেছে? আমার জন্য চিড়িয়ার বিবির এত মন্দ হতে যাবে কেন? আমি অতি শান্ত সাদাসিধে লোক, অথচ কি সাংঘাতিক সব কথা বললে তুমি আমার সম্বন্ধে?

তা আমি কিছু বলতে পারব না। তা ছাড়া আপনি নিজে ত কিছু তার করবেন না।—আপনার জন্য তার এই সব দুর্ভোগ হবে। যখন এসব হবে তখনই বুঝতে পারবেন আমার কথা।

আর এসব কথা—তাস দেখেই তুমি জানতে পেরেছ, ওলেস্যা?

তখনই কোন জবাব দিল না ওলেস্যা।

কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্য সে যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই বললে,—তাস দেখেও বটে, তাস ছাড়াও আমি অনেক কথা বলতে পারি,—যেমন ধরুন—মানুষের মুখ দেখেও পারি। ভয়ঙ্কর মৃত্যু কারো ভাগ্যে লেখা থাকলে আমি তার মুখ দেখা মাত্র তা বলে দিতে পারি,—তার সঙ্গে কোন কথা বলার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না আমার।

কি দেখতে পাও তুমি তার মুখে?

আমি নিজেই তা জানি না। শুধু এই জানি আমি তার মুখ দেখলেই কেমন ভয় পেয়ে যাই,—দেখতে পাই সে যেন আমার সামনে মরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি জানতে পারবেন আমি সত্যি কথাই বলছি। গেল বছর, জাঁতা কল চালিয়ে ট্রফিম তার জাঁতা কলের ওখানেই গলায় দড়ি দিয়ে মরলে। মরার দুদিন আগে আমি তাকে দেখেই দিদিমাকে বলেছিলাম, —দেখো দিদিমা, দুএকদিনের মধ্যে ভয়ঙ্কর মৃত্যু হবে ট্রফিমের এবং তাই হল। গত বড়দিনে ঘোড়া চোর য়শকা আমাদের বাড়িতে এসে দিদিমাকে তার ভাগ্যগণনা করে দিতে বললে। দিদিমা তাস বিছিয়ে সবে গণনা আরম্ভ করেছে এমন সময় সে রহস্য করে বললে, আচ্ছা বলত ঠাকুমা, কেমন মৃত্যু হবে আমার? সে অবশ্য এই কথা বলে হাসতে লাগল, কিন্তু আমি তার মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। দেখলাম—সে ঐখানে বসে রয়েছে বটে, কিন্তু তার মুখ একেবারে মরা মানুষের মুখ—সবুজ। চোখ বন্ধ, আর ঠোঁট কালো হয়ে গেছে তার। এক হপ্তা পরে আমরা শুনলাম ঘোড়া চুরি করবার সময় চাষীরা য়শকাকে ধরে ফেলে, তারপর সারারাত্রি তাকে আচ্ছা করে পেটায়। এখানকার লোকগুলি বড় নিষ্ঠুর, দয়াধর্ম নেই তাদের মনে। চাষীরা ওর পায়ে পেরেক পোঁতে, লাঠি মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেয়,—সকাল হতে না হতে সে মারা যায়।

তার যে বিপদ হতে যাচ্ছে এ কথা তুমি তাকে আগে থেকে সমঝিয়ে দিলে না কেন?

ওলেস্যা উত্তর দিলে, তা করতে যাব কেন আমি? ভাগ্য থেকে কি কারো নিস্তার আছে? শেষের দিকে এসব ভেবে ভেবে সে মিছিমিছি কষ্ট পেয়েছে। এসব দেখতে পাই বলে আমার নিজেরই বিশ্রী লাগে, নিজেকে ঘৃণা করি। কিন্তু কি করব, উপায় নেই। এ যে দেখতে পাব এ-ও আমার ভাগ্য। বয়স যখন কম ছিল তখন আমার দিদিমা কারো মৃত্যুর কথা বলে দিতে পারত, আমার মা, আমার দিদিমার মা সবাই এমনি পারত, এ আমাদের দোষ নয়, এ আমাদের রক্তে রয়েছে।

ওলেস্যা সুতো কাটা বন্ধ করে, মাথাটা নত করে নিশ্চল হাত দুটি কোলের উপর রেখে বিস্ফারিত নেত্রে বসে ছিল। কি যেন এক অজানা আতঙ্ক—তার নিজের আত্মার উপর আবির্ভূত এক রহস্যময় শক্তি আর অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের নিকট অনিচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের আভাস ফুটে উঠেছিল সেই চোখে।

৫

ম্যানুইলিখা তখন টেবিলের উপর পাশে নক্সা করা পরিষ্কার চাদর পেতে তার উপর এক ধূমায়িত পাত্র রাখলে। তারপর সে তার নাতনীকে ডেকে

বললে, টেবিলে খাবার দিয়েছি, ওলেস্যা। একটুখানি ইতস্তত করে সে আমাকে বললে, আমাদের এখানে খেতে আপত্তি আছে? খেলে খুশি হব, খাবার কিন্তু আমাদের অতি সাধারণ সাদামাঠা সুপ।

ম্যানুইলিখার আমন্ত্রণের মাঝে খুব যে আন্তরিকতা ছিল, তা নয়,—সুতরাং আমি প্রত্যাখ্যানই করতে যাচ্ছিলাম—এমন সময় ওলেস্যা এমন মধুর সারল্যে বন্ধুর মত হেসে আমায় আমন্ত্রণ করলে যে তাতে আর আমি না করতে পারলাম না। সে নিজে হাতা দিয়ে আমার প্লেটটা ভর্তি করে শূকরের মাংস, মুরগীর মাংস, আলু আর পেঁয়াজ মিশানো মোটা গমের সুপ দিলে,—এ সুপ যেমনি খেতে, তেমনি পুষ্টিকর। খেতে বসে দিদিমা আর তার নাতনী কেউই বুকের উপর ক্রুশচিহ্ন করলে না। খাবার সময় ওদের দুজনের দিকেই আমি বিশেষ করে দৃষ্টি রাখতে লাগলাম, কারণ আমার চিরদিনের বিশ্বাস, এই সময় মানুষের চরিত্র বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ম্যানুইলিখা লোভীর মত সুপ দ্রুত গিলে যাচ্ছিল, শব্দ করে মস্ত বড় বড় এক এক খণ্ড রুটী গালে পুরছিল, ফলে তার থলথলে গালটা ফুলে ফুলে উঠছিল,—আর এদিকে ওলেস্যার খাবার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছিল তার সহজাত সুরুচির পরিচয়।

আহারের এক ঘণ্টা পরে আমি ডাইনী বাড়ির বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ওলেস্যা বললে, আপনাকে একটু এগিয়ে দেব না কি?

ম্যানুইলিখা রেগে বিড়বিড় করতে লাগল, ওকে এগিয়ে দিতে যাওয়া—এসব কি? একটুও স্থির হয়ে বসতে পারিস না তুই অস্থির মেয়ে?

কিন্তু ওলেস্যা এর মধ্যেই তার কাশ্মীরী শালটা গায়ে চাপিয়েছে, সে হঠাৎ তার দিদিমার কাছে ছুটে গিয়ে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে কষে এক চুমো দিলে।

দিদিমা, লক্ষ্মীটি, মাত্র এক মিনিটের জন্য যাচ্ছি আমি, এক্ষুনি ফিরে আসছি।

বুড়ীর মন কিছুটা নরম হয়ে এল, সে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। তারপর আমার উদ্দেশ্যে বললে, বড় পাগলী মেয়ে, ওর কিছুতে কিছু মনে করো না তুমি, মাপ করো।

একটা সরু পথ থেকে বনের মাঝকার একটা বড় রাস্তায় এসে পড়লাম আমরা। রাস্তাটা কাদার কালো দাগ, ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ আর গাড়ির চাকার দাগে ভর্তি, চাকার চাপে নিচু হওয়া জায়গায় যে জল জমে ছিল তার উপর পড়েছে সূর্যাস্তের লাল আভা। আগের বছরের বাদামী পাতার উপর পা ফেলে ফেলে আমরা সেই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম, পাতাগুলি তখনও বরফে ভিজে। এখানে সেখানে হলদে পচা পাতার ভিতর দিয়ে পোলিস্যি অঞ্চলের বড় বড় সব ক্যাম্পানুলাস ফুলের নীল মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, শোন ওলেস্যা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি, কিন্তু তা শুনে তুমি বোধ হয় রাগ করবে।...আমি জানতে চাই,—মানে—এ কি সত্যি যে তোমার দিদিমা...কি বলব কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

ডাইনী কি না, এই ত? ওলেস্যা বেশ শান্ত কণ্ঠেই বলে উঠল।

না, না,—ডাইনী নয়, আমতা আমতা করে বললাম আমি, আবার তার পরই বললাম, হাঁ,—বলতে পার ডাইনী কি না এই ছিল আমার জিজ্ঞাস্য। লোকে এই রকম কত বাজে কথাই বলে। আমার মনে হয় তিনি শুধু কতকগুলি ওষুধপত্র, তুকতাক জানেন—এই মাত্র। তোমার ইচ্ছা না হয় ত আমার এ প্রশ্নের উত্তর না-ই দিলে।

উত্তর না দেবার কি আছে? কিছুছু মনে করব না আমি।—দিদিমা ডাইনী-ই বটে,—কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গেছে, আগে যা পারত তা আর এখন পারে না।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আগে কি পারতেন তিনি?

পারত অনেক কিছু। লোকের অসুখ সারিয়ে দিতে পারত,—দাঁতে ব্যথা সারাতে পারত, রক্ত বন্ধ করতে পারত পাগলা কুকুর বা সাপে কামড়ালে—তা ভাল করে দিতে পারত, এমন কিছু ছিল না যা করতে পারত না।

জানো ওলেস্যা, কিছু মনে করো না তুমি, আমার কিন্তু এ সবে বিশ্বাস হয় না। সত্যি করে বল,—কাউকে বলব না আমি,—এসব নিশ্চয়ই বোকাদের মন ভোলাবার ভাঁওতা,—তাই নয়?

ওলেস্যা কাঁধটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, আপনার যা খুশি ভাবতে পারেন আপনি,—সরল গ্রামের মেয়েদের অবশ্য এসব ব্যাপারে অবিশ্বাস আসতেই পারে না, তবে আমিও আপনার কাছে মিছে কথা বলব—এ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে।

তা হলে কি বুঝব, তুমি ডাইনী-বিদ্যায় সত্যিই বিশ্বাস করো?

নিশ্চয়! আমাদের বংশটাই চিরকাল এ করে আসছে, আমি নিজেও কিছু কিছু জানি।

ওলেস্যা লক্ষ্মীটি, এ দেখবার জন্য আমার যে কি আগ্রহ হচ্ছে,—তা কি বলব! কিছু দেখাবে তুমি আমায়?

ওলেস্যা তখনই উত্তর দিলে, কেন নয়, এখনই দেখতে চান আপনি?

হাঁ, তুমি যদি দেখাও।

ভয় পাবেন না ত?

পাগল! ভয় পেতে পারতাম যদি এ রাত্রি হোত—কিন্তু এখনও যে দিনের আলো রয়েছে!

বেশ, আপনার হাতটা দিন দেখি।

আমি তার কথামত আমার হাতটা এগিয়ে দিলাম। সে তাড়াতাড়ি আমার ওভার কোটটার আস্তিনটা গুটিয়ে নিচের জামার কাফের বোতাম খুলে ফেললে।

তারপর সে তার পকেট থেকে পাঁচ ইঞ্চির মত একটা ছোরা বের করে চামড়ার খাপ থেকে তা খুলে ফেললে।

কেমন একটু ভয় ভয় করতে লাগল আমার, বললাম, কি করবে তুমি এ দিয়ে?

সবুর, আপনি ত বলেছেন—ভয় পাবেন না আপনি!

হঠাৎ তার হাতটা কেমন একটু নাড়লে সে, সঙ্গে সঙ্গে আমার কব্জীতে—লোকে যেখানে নাড়ী দেখে তার একটু উপরে—ছোরার ঘায়ে ভীষণ জবালা করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরুতে লাগল সেখান থেকে, রক্ত কব্জী বেয়ে টপ টপ করে মাটিতে পড়তে লাগল। দেখে চিৎকার না করে আর থাকতে পারলাম না,—মুখটাও বোধ হয় ভয়ে একটু বিবর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবে আমার।

ওলেস্যা হেসে উঠে বললে, ভয় পাবেন না, মরবেন না আপনি।

সে তখন আমার ক্ষতস্থানের উপরটা জোর করে ধরে মাথাটা খুব নিচু করে বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াতে লাগল, আর তার তপ্ত উন্মত্ত নিঃশ্বাস যেন আমার হাতের চামড়া ঝলসে দিতে লাগল। যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত ছেড়ে দিলে তখন দেখি আমার কাটা জায়গায় একটু সরু লাল আঁচড়ের দাগ ছাড়া আর কিছু নেই।

ওলেস্যা তার ছোরাটা সরিয়ে একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললে, কেমন হল ত? না আরও দেখতে চান?

হাঁ, চাই ত বটেই, কিন্তু এর চেয়ে কম ভয় পাবার মত কিছু, আর রক্তপাতের কিছু যেন না হয়।

তাই ত কি দেখাই আর? ওলেস্যা কি যেন একটু ভেবে নিলে, তার পরেই বলে উঠল,—ঠিক আছে, আপনি এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে থাকুন, কিন্তু সাবধান, পিছনে ফিরে চাইবেন না যেন।

কোন একটা অপ্রীতিকর বিস্ময়ের আশঙ্কা করছিলাম আমি, কিন্তু সে ভয়টা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে আমি বললাম, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে না ত?

না, মোটেই না, এগিয়ে যান আপনি।

কি ঘটবে জানবার জন্য প্রবল কৌতূহল নিয়ে সামনে এগিয়ে চললাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে বোধ করতে লাগলাম ওলেস্যা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমার পিঠের দিকে। কুড়ি পা-ও বুঝি চলি নি আমি, এমন সময় একটা একেবারে সমান জায়গায় হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম আমি।

ওলেস্যা চিৎকার করে বলতে লাগল, এগিয়ে যান, এগিয়ে যান। পিছনে ফিরে চাইবেন না। কিচ্ছু হয় নি আপনার, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। পড়ে গেলে মাটি ধরে থাকবেন।

আমি এগুতে থাকলাম, কিন্তু এবার দশ পা যেতে না যেতে আবার মুখ থুবড়ে পড়লাম আমি মাটির উপর।

ওলেস্যা হো হো করে হেসে হাতে তালি দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার সাদা দাঁতগুলি চিক চিক করতে লাগল।

তারপর সে জোর গলায় বললে, কেমন, হয়েছে? এখন বিশ্বাস হল আমার কথা? যাক, আপনি নিচেই পড়েছেন, উপরে উঠে যান নি!

আমার জামা কাপড় থেকে শুকনো ঘাস পাতা কুটো ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—কি করে এ করলে—বলত? এ গোপন করবার মত কিছু নয়, নিশ্চয়?

না, গোপন কিছু নয়। সব আপনাকে খুলেই বলছি,—কিন্তু আমার মনে হয় তবুও আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। মানে—আমি ঠিকমত হয়ত বোঝাতে পারব না।

ওলেস্যা ঠিকই বলেছিল, আমি তার সব কথা ঠিক মত বুঝতে পারলাম না। তবে যতটুকু বুঝেছি তা যদি ঠিক হয় তা হলে তার কৌশলটা হচ্ছে এই। আমি যেমন করে পা ফেলে যেমন অঙ্গভঙ্গী করে হাঁটছিলাম, ও ঠিক তেমনি করে আমার অনুকরণ করে আমার দিকে অপলক দৃষ্টি রেখে আমার পিছু পিছু আসছিল, শুধু তাই নয় আমার সঙ্গে সে নিজের একাত্মতাও কল্পনা করছিল। এমনি করে কয়েক পা আসবার পর সে কল্পনা করলে, আমার কিছু সামনে মাটি থেকে ইঞ্চি দশেক উপরে রয়েছে একটা দড়ি। তার সেই কল্পিত দড়ির কাছে যেই আমি এলাম তখন সে নিজেই তা বেধে যেন পড়ে গিয়েছে এমনি ভান করলে। ওলেস্যা বললে এমনি করলে যে কোন লোক—যতই সে শক্তিশালী হোক পড়ে যেতে বাধ্য। এর অনেক দিন পরে ডক্টর চারকোট স্যালপিত্রিয়েরের দুই ব্যবসাদার ডাইনীর হিস্টিরিয়া রোগ নিয়ে পরীক্ষা করে যে বিবরণ দিয়েছেন তাই পড়বার সময় ওলেস্যার এই এলোমেলো ব্যাখ্যার কথা মনে পড়েছিল আমার। ফ্রান্সের ডাইনীরাও পলেস্যির এই সুন্দরী তরুণী ডাইনীর পদ্ধতি অবলম্বন করেই লোককে তাক লাগায় দেখে রীতিমত বিস্ময় বোধ করেছিলাম আমি।

ওলেস্যা বললে, আরও অনেক কিছু করতে পারি আমি। যেমন ধরুন আপনাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিতে পারি।

সে আবার কি রকম?

ভয় পাইয়ে দিতে পারি কি রকম? ধরুন সন্ধ্যাকালে নিজের ঘরে আপনি বসে আছেন, হঠাৎ আপনি এমনি ভয় পেয়ে যাবেন যে, আপনি থরথর করে কাঁপতে থাকবেন,—এমন কি জুতোর মধ্যে আপনার পা-টা পর্যন্ত কাঁপতে থাকবে, ভয়ে পিছনে ফিরে চাইতে পারবেন না পর্যন্ত। কিন্তু এ করতে হলে আপনি কোথায় থাকেন তা আমার জানা চাই, এমন কি আপনার ঘরটা পর্যন্ত আমার দেখা চাই।

আমি তার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, বললাম,—এ আর এমন কি কঠিন? তুমি আমার জানলার ধারে গিয়ে ধাক্কা দিতে থাকবে অথবা হঠাৎ চমকে দিয়ে কিছু বলে চিৎকার করে উঠবে।

মোটেই না। আমি এই বনে আমার ঘরেই বসে থাকব। কিন্তু সেখানে বসে বসে ভাবতে থাকব—যেন রাস্তা দিয়ে হে'টে হে'টে আপনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছি, তারপর দরজা খুলে আপনার ঘরে ঢুকেছি। আপনি কোথায় বসে আছেন, ধরুন টেবিলের ধারেই বসে আছেন। আমি একটুও শব্দ না করে অতি চুপে চুপে গিয়ে হঠাৎ আপনার কাঁধটা চেপে ধরেছি, ভীষণ জোরে চেপে ধরেছি, আরও জোরে, আরও, সঙ্গে সঙ্গে এমনি করে আপনার দিকে চেয়ে রয়েছি,—

বলেই হঠাৎ সে তার সুন্দর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে ভয়ঙ্কর অথচ মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিতে একভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে, চোখের মণি দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে গভীর নীল বর্ণ ধারণ করল। মস্কোর ত্রেতিয়াকোব আর্ট গ্যালারিতে মেডুসার যে মাথা দেখেছিলাম, তখনই তার কথা মনে পড়ে গেল আমার,—ছবিটা কার আঁকা তা ভুলে গেছি। ওর ঐ দৃঢ় নিবদ্ধ ভয়ঙ্কর অমানুষিক দৃষ্টির সামনে পড়ে কি রকম এক অতিপ্রাকৃত ভয়ে সারা শরীরটা যেন আমার হিম হয়ে গেল।

চেষ্টা করে আনা কৃত্রিম হাসি হেসে বললাম, ওলেস্যা, যথেষ্ট হয়েছে, এবার থাম। এর চেয়ে হাসলে তোমায় আমি অনেক সুন্দর দেখি,—ছোট্ট মেয়েদের মতন কি মিষ্টি দেখায় তোমার মুখ।

আমরা হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি ওলেস্যার কথা বলার ভঙ্গীটির কথাই ভাবছিলাম ঃ এই মেয়েটি লেখাপড়া জানে না, অথচ নিজের বক্তব্য কি সুন্দরভাবে প্রকাশ করে, আর কি মার্জিত তার কথা বলার ভঙ্গী! আমি তাকে বললাম, দেখ ওলেস্যা, তোমার কিসে আমি সব চাইতে আশ্চর্য হই জানো? তুমি এই বনে মানুষ হয়েছ, লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা হয় নি তোমার, লেখা-পড়াও বেশি সম্ভব হয় নি নিশ্চয়।

আমি মোটেই পড়তে পারি না।

এই দেখ, ঠিক ধরেছি আমি, অথচ এসব সত্ত্বেও তুমি একজন শিক্ষিতা মহিলার মতই কথা বল। এ কি করে হল? বুঝতে পেরেছ—কি বলতে চাইছি আমি?

হাঁ, বুঝেছি। এর উত্তর হচ্ছে—এসব পেয়েছি আমি আমার দিদিমার কাছ থেকে। বাইরে থেকে ওর চেহারা দেখে ওর বিচার করতে চাইবেন না। কি বুদ্ধি ওর! আপনার সঙ্গে আরও একটু জানাশোনা হয়ে গেলে ও যখন আপনার সঙ্গে ঠিকমত কথাবার্তা বলতে শুরু করবে তখন দেখবেন। ও সব জানে, আপনি যা জিজ্ঞাসা করবেন তাই বলতে পারবে ও। অবশ্য এখন ও বুড়ী হয়ে গেছে, এই যা কথা।

জীবনে উনি অনেক কিছু দেখেছেন নিশ্চয়। কোত্থেকে এসেছেন উনি এখানে,—আগে কোথায় ছিলেন?

এ প্রশ্নে ওলেস্যা তেমন খুশি হল বলে মনে হল না। কিছুক্ষণ সে কোন

উত্তরই দিলে না। তারপর সে যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন রকমে বললে, আমি ঠিক জানি না,—সে কথা বলতে চায় না ও। কোনদিন একটু কিছু বলে ফেললেও সে কথা আবার আমায় ভুলে যেতে বলে, বলে—আর যেন কোনদিন আমি ও নিয়ে উচ্চবাচ্য করি না।...এর পরেই ওলেস্যা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এইবার বাড়ি যেতে হবে আমার, নইলে দিদিমা রাগ করবে।—নমস্কার! ভাল কথা, আপনার নামটা জানা হয় নি এখনও আমার।

আমি আমার নাম বললাম।

ইভান তিমোফেয়িভিচ্? বেশ। আচ্ছা ইভান তিমোফেয়িভিচ্, এইবার আমি বিদায় নিচ্ছি। আমাদের একেবারে ভুলে যাবেন না, মাঝে মাঝে আসবেন আমাদের ওখানে।

করমর্দন করতে আমি আমার হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, ও ওর ছোট্ট শক্ত হাত দিয়ে আমার হাতটায় বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই জোরে চাপ্ দিলে।

৬

এর পর থেকে ডাইনীর বাড়িতে আমি প্রায়ই যাতায়াত করতে লাগলাম। যখনই আমি যেতাম ওলেস্যা শান্ত গাম্ভীর্য নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করত। কিন্তু বাইরে এত গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করলেও, আমি লক্ষ্য করেছি, আমাকে দেখেই সে খুশি হয়ে উঠেছে। ম্যানুইলিখা নিজের মনেই কি সব বিড়বিড় করে যেত, কোন রকম ক্রোধ বিরক্তি আর দেখাত না, বুঝতাম এর মূলে তার নাতনীর অদৃশ্য হস্তক্ষেপ আছে। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তার জন্য গরম শাল, এক কৌটো জ্যাম, এক বোতল চেরীর মদ ইত্যাদি যেসব উপহার নিয়ে যেতাম আমি,—তাতে সে আমার উপর ক্রমেই প্রসন্ন হয়ে উঠছিল। দুইজনের একজনেও মুখে কিছু না বললেও ওলেস্যা ও আমার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিল—ফিরবার সময় ওলেস্যা আমাকে ইরিনোভা রোড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত! এই সময় আমাদের নানা রকমের ভাল ভাল সব আলাপ আলোচনা কথাবার্তা হোত বলে ঐ শান্ত বনপথ দিয়ে চলবার সময় গতি আমাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে আপনিই মন্থর হয়ে যেত—যতক্ষণ কথা বলা যায় সেই ভাল। রাস্তাটায় পৌঁছনোর পরও আধ মাইলের মত আমি তার সঙ্গে ফিরে আসতাম। ফিরে এসেও বিদায় নেবার আগে বহুক্ষণ ধরে পাইন গাছের সুবাসিত ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা কথাবার্তা বলতাম।

ওলেস্যার সৌন্দর্যই শুধু আমাকে মুগ্ধ করে নি, মুগ্ধ হয়েছি আমি তার আরও অনেক রকম কিছু দেখে, যেমন তার নীতিজ্ঞান, তার স্বাধীন চরিত্র বৈশিষ্ট্য, তার মন—যে মন তার বংশগত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হলেও স্বচ্ছ, শিশুর মত নিষ্পাপ হলেও পুরুষের মনভোলানোর ছলাকলা জানে না এমন নয়। তার আদিম মনের কল্পনায় যত কিছু ছবি ধরা দেয় সে সব দিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন

করে যেত সে আমায়, ক্লান্ত হোত না ঃ বিভিন্ন দেশ ও তার অধিবাসী, প্রাকৃতিক ঘটনা, পৃথিবী ও বিশ্বের আকার আয়তন, পণ্ডিত লোক, বড় বড় নগর ইত্যাদির কিছুই বাদ যেত না তার প্রশ্নের বিষয়বস্তু থেকে। উত্তর শুনে কোন কোন জিনিস মনে হত তার আশ্চর্য, কোনটা অদ্ভুত, কোনটা অসম্ভব। কিন্তু আমি সব সময়ই তার সঙ্গে আগ্রহ আর আন্তরিকতা নিয়ে সহজভাবে কথা বলতাম বলে আমি যা কিছু বলতাম তাই সে প্রশ্ন না করে অকপটে বিশ্বাস করত। যে সব কথা তার মত মেয়ে বুঝতে পারবে না বলে মনে করতাম অথবা যে সব কথা আমার নিজের কাছেই তেমন পরিষ্কার নয় সে সব সম্বন্ধে ও যখন প্রশ্ন করত তখন কি বলব বুঝতে না পেরে বলতাম,—এ সব তোমায় আমি বুঝাতে পারব না। বুঝবে না তুমি।

সে তখন মিনতি করে বলত,—বলুন আমায়,—বুঝতে চেষ্টা করব আমি। ঠিকমত বললে যদি বুঝতে না পারি আমি, ত যেমন করে খুশি বলুন আপনি।

এইজন্য তাকে বুঝাতে অনেক সময় অদ্ভুত উপমার সাহায্য নিতে হ'ত আমার অনেক সব বিদঘুটে উদাহরণ দিতে হোত,—যখন কোন কিছু প্রকাশ করবার উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেতাম না—তখন তোতলাদের কোন কথা আটকে গেলে তা বের করতে যেমন করা হয় তেমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সে আমার বক্তব্যটা বুঝে নিত। সর্বশেষে দেখা যেত তার বিচিত্র ঔৎসুক্যে ভরা মন আর অভিনব কল্পনার কাছে আমার নৈপুণ্যহীন গুরুগিরি হার মেনেছে। যে পরিবেশে সে মানুষ, লেখাপড়ার দিক দিয়ে যেরূপ তার শিক্ষা, অর্থাৎ শিক্ষার অভাব তাতে এসব দিকে তার এতটা ক্ষমতা থাকা খুবই আশ্চর্যের কথা।

একবার কি এক কারণে পিটার্সবার্গের নাম করতে হয় আমার,—ওলেস্যা অমনি প্রশ্ন করে বসল, পিটার্সবার্গ কি একটা ছোট্ট শহর?

না, ছোট নয়,—রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর এটা!

সবচেয়ে বড়? মানে, আপনি বলতে চান এর চেয়ে বড় শহর আর নেই রাশিয়ায়? সে সরল শিশুর মত প্রশ্ন করে বসল আমায়।

উত্তর দিলাম,—না, নেই। যত বড় বড় হোমরা-চোমরা সব থাকেন সেখানে। বাড়ি-ঘর সব পাথর দিয়ে তৈরী, কাঠের বাড়ি একটিও নেই সেখানে।

সে সরল বিশ্বাসে বললে, তা বলে ও শহরটা আমাদের স্তেপান শহরের চেয়ে বেশ কিছুটা বড় বলতে হবে?

হাঁ, কিছুটা বটে, প্রায় পাঁচশো গুণের মত—বলতে হবে। এর কোন কোন বাড়িতে সারা স্তেপানে যত লোক বাস করে তার দ্বিগুণ লোক বাস করে।

বাপ রে বাপ,—তা হলে সে বাড়িগুলি কি? বলতে গিয়ে তার চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

তাকে ঠিকমত বুঝানোর জন্য শেষে আমার উপমার সাহায্যই নিতে হল। বলতে হল—

ভয়ঙ্কর সে সব বাড়ি। পাঁচ তলা, ছয় তলা, কোন কোনটা আবার সাত তলা পর্যন্ত। ঐ যে পাইন গাছটা রয়েছে ওখানে,—দেখছ?

সবচেয়ে বড়টা?—হাঁ।

সেখানকার বাড়িগুলি সব ঐ গাছটার মত উঁচু, আর নিচে থেকে উপর পর্যন্ত লোকে ঠাসা। পাখির খাঁচায় যেমন খোপ থাকে—ঐ সব বাড়িতেও আছে তেমনি সব ছোট ছোট ঘর, তার এক এক ঘরে বাস করে প্রায় ডজনখানেক লোক। ঐ সব বাড়ির তলায়ও লোক বাস করে, মাটির নিচে স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা সব ঘরে, সারা বছরে একটু রোদের মুখ দেখবার জো নেই সেখানে।

আমি আমার এ বন ছেড়ে কিছুতেই আপনাদের ও শহরে থাকতে পারি না। স্তেপানের বাজারে যখন আমি যাই তখন স্তেপানই আমার বিশ্রী লাগে। কেবল ঠেলাঠেলি, চেঁচামিচি আর দামদস্তুর নিয়ে ঝগড়া। দেখে বনে ফিরবার জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে আমার মন যে সব কিছু কাজকর্ম ফেলে বনে ছুটে আসতে ইচ্ছা করে। শহরে আমি কিছুতেই কোনদিন থাকতে পারব না।

একটুখানি হেসে আমি বললাম, কিন্তু ধরো—তোমার স্বামী যিনি হবেন—তিনি যদি শহরে থাকেন, তা হলে—?

শুনে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল ওলেস্যার মুখে,—নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

ছ্যা,—ঘৃণাভরে বলে উঠল সে, স্বামী চাই না আমি।

ওলেস্যা, তুমি এখন বলছ এই কথা, ও রকম সব মেয়েই বলে থাকে, শেষে আবার সবাই তারা বিয়ে করে। সবুর কর, আগে কারো প্রেমে পড় তখন দেখবে শহর ত ভাল, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তুমি তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।

ওলেস্যা বিরক্ত হয়ে বললে,—ও সব কথা থাক। কি লাভ ও সব আলোচনা করে। অনুগ্রহ করে থামুন।

তোমার রকম দেখে হাসি পায়, ওলেস্যা। তুমি কি মনে কর,—কোনদিনই কাউকে ভালবাসবে না তুমি? তোমার বয়স কম,—রূপ আছে, স্বাস্থ্য আছে,—মন একবার জাগলে আর কোন কিছুর কথা মনে থাকবে না তোমার, সব ভুলে যাবে।

যদি আমি প্রেমেই পড়ি, কি হবে তা হলে?—বলতে গিয়ে চোখ দুটি তার স্পর্ধায় চক্‌চক করে উঠল ঃ কারো অনুমতির তোয়াক্কা রাখব না আমি তখন।

আমি তাকে একটু ক্ষেপানোর জন্য বললাম, তা হ'লে তুমিও বিয়ে করবে, বলো?

কি,—গির্জেয় গিয়ে,—বলতে চান আপনি?

নিশ্চয়,—পুরোহিত এসে তোমায় নিয়ে মঞ্চের কাছে যাবেন, সেখানে 'ডিকন' এসে আওড়াবেন,—'ইসায়া,—তুমি আনন্দ কর', তারপর তোমার মাথায় একটা মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে।

ওলেস্যা শুনে ম্লান হাসি হেসে মাথা নাড়তে লাগল, চোখের পাতা দুটি নুয়ে পড়ল তার।

না, বন্ধু এমন কিছু ঘটবে না আমার জীবনে। আমি যা বলছি তা হয়ত পছন্দ হবে না আপনার। কিন্তু, আমি বলছি আমাদের বংশের কারোই গির্জেয় গিয়ে বিয়ে হয় নি। আমার মা, আমার দিদিমা কেউই এরা বিয়ের জন্য গির্জেয় যাননি। এমন কি আমরা গির্জেয় ঢুকি না পর্যন্ত।

কেন, তোমাদের এই ডাইনী-বিদ্যার জন্য?

ওলেস্যা শান্তকণ্ঠে উত্তর করলে, হাঁ, তাই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমার আত্মা তার কাছে বিক্রীত হয়ে গেছে তখন আমি কোন্ সাহসে গির্জেয় ঢুকি?

ওলেস্যা—সত্যি বলছি এ কিন্তু তোমার আত্মপ্রবঞ্চনা। তুমি যা কিছু বলছ, সবই হাসির কথা, বাজে কথা।

কি এক রহস্যময় শক্তির হাতে নিজেকে তুলে দিতে হয়েছে তার—এজন্য কেমন এক অদ্ভুত কাঠিন্যের ভাব ফুটে উঠল তার মুখে,—এ ভাব তার মুখে আগেও দেখেছি আমি। সে উত্তর দিলে—

না, না, হাসির কথা নয়। আপনি বুঝতে পারবেন না এসব, কিন্তু আমি বুঝি। নিজের বুকের ওখানটায় হাত দিয়ে সে বললে, আমি আমার এইখানটায় অনুভব করি। আমাদের বংশের উপর চিরকালের অভিশাপ আছে। নিজে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন ঃ সে না হলে কে সাহায্য করছে আমাদের? তা না হলে আমি যা করতে পারি, একটা সাধারণ মেয়ের কি তা করবার কথা? আমাদের সমস্ত শক্তি আসে তার কাছ থেকে।

এই প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের কথাবার্তা ঠিক এইভাবে শেষ হ'ত। সে যা বুঝতে পারে এমন যুক্তির অবতারণা করে, অতি সহজ কথায় আমি তাকে সম্মোহন, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ, মনোচিকিৎসা ও ভারতীয় যোগীদের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। সে যে রক্ত বন্ধ করতে পারে এটাও কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তি নয়, শারীরবিজ্ঞানে বলে কৌশলে একটি শিরাকে চেপে রাখতে পারলেই এটা সম্ভব হয়, এ-ও বলেছি, তাতেও কিছু ফল হয়নি। সে আমার অন্য সব কথাই অকপটে বিশ্বাস করে, কিন্তু এই বিষয়ের কোন ব্যাখ্যাই তার মনে লাগে না।

সহসা উচ্চ ও উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলতে শুরু করল,—রক্ত বন্ধ হবার কারণ সম্বন্ধে যা বললেন, তা না হয় মানলাম, কিন্তু আমি ত শুধু রক্ত বন্ধই করতে পারি না, আরও অনেক কিছু পারি। একদিনের মধ্যে আপনার বাড়ি থেকে ইঁদুর আরসোলা সব দূর করতে পারি। দেখতে চান? ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গিয়েছে এমন জ্বরো রুগীকে শুধু জল দিয়ে দু'দিনে আরাম করে দিতে পারি,—দেখতে চান? যে কোন একটা কথা আপনার একেবারে ভুলিয়ে দিতে পারি—দেখতে চান? এ ছাড়া, স্বপ্নের মানে বলে দিতে পারি আমি, ভবিষ্যৎ বলতে পারি।

ওলেস্যা ও আমার কলহ শেষ হ'ত সব সময়ই প্রসঙ্গ পরিবর্তনে, মনের গরম

অবশ্য কিছুক্ষণ কারোই যেত না। ওর ডাইনী-বিদ্যার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল আমার সামান্য বুদ্ধি দিয়ে যার আমি কারণ নির্ণয় করতে পারতাম না। যা যা সব করতে পারে বলে তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল তার অর্ধেকও সে সত্যি সত্যি পারে কি না জানি না। তবে তার অনেক কিছু বার বার দেখে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, বিজ্ঞানের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্ব থেকেই হঠাৎ কি করে পাওয়া একটা অস্পষ্ট রহস্যময় জ্ঞান সহজাত জ্ঞানের মতই অজ্ঞ লোকের মাঝে নিবদ্ধ হয়ে আছে, বংশপরম্পরায় এটা এ যুগে এসেও পৌঁছেছে. এর সঙ্গে মিশানো রয়েছে কতকগুলি হাস্যকর ঘৃণ্য কুসংস্কার,—ওলেস্যা তার বংশ থেকে এই জ্ঞানের শক্তিই কিছুটা লাভ করেছে।

এই এক বিষয়ে আমাদের দারুণ মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। ভালবাসার কথা আমরা কেউই মুখে উচ্চারণ করি নি বটে, কিন্তু প্রতিদিন আমাদের দেখাসাক্ষাৎ না হলে চলত না, এবং এরই অনেক নীরব মুহূর্তে যখন আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হত, তখন দেখতাম ওলেস্যার চোখ দুটি যেন ভিজে উঠেছে, কপালের নীল শিরাটা একটু বেশি দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে।

আর এদিকে য়্যারমোলার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এক রকম চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেছে বললেই চলে। ডাইনীর কুটীরে আমার আনাগোনা, রোজ সন্ধ্যাকালে ওলেস্যার সঙ্গে বেড়ানো—এ সবই এখন তার জানা। তার এই বনে কখন কি ঘটে তা সে একেবারে নির্ভুল করে বলতে পারে। কিছুদিন থেকেই সে আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল। আমি বনে রওয়ানা হবার আয়োজন করছি—দূর থেকে দেখলেই তার চোখে মুখে অসন্তোষ আর তিরস্কারের রেখা ফুটে উঠত,—মুখে সে অবশ্য কিছুই বলত না। আমাদের পড়াশুনার প্রহসন অবশ্য অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোন সন্ধ্যায় আমি তাকে পড়াতে চাইলেই সে নিতান্ত বৈরাগ্যের সুরে উত্তর দিত—

কি হবে আর ও সব দিয়ে, কত্তা,—কেবল সময় নষ্ট। বলবার সময় কেমন এক অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠত তার মুখে।

আর শিকারেও বেরুতাম না আমরা। শিকারের কথা তুললেই কোন না কোন অজুহাত তুলে সে অস্বীকার করত ঃ হয় বন্দুক খারাপ, নয় কুকুরের অসুখ. নয় সময়ের অভাব।

অনেক সময় শিকারের কথা তুলব্যরও দরকার হ'ত না, সে এমনি বলে যেত,—একেবারে সময় নেই, কত্তা,—একটা জমিতে চাষ দিতে হবে। আমি অবশ্য জানতাম ঐ চাষটাষ সব বাজে কথা,—যাবে তখন সে গ্রামের সরাইখানার আশে-পাশে ঘুরতে, আশা নেই তবু কেউ যদি দয়া করে এক গেলাস খাইয়ে যায়। তার এই নীরব ধূমায়িত বিদ্রোহে ক্রমেই আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম, ভাবছিলাম সুযোগ পেলেই আমি তাকে বরখাস্ত করব। দ্বিধা করছিলাম শুধু তার দারিদ্র্য-

ক্লিষ্ট বুভুক্ষু বৃহৎ পরিবারের কথা ভেবে, আমার কাছে যে চার রুবল মাইনে সে পায় তাতেই তারা কোন রকমে খেয়ে বেঁচে আছে।

৭

একদিন অন্যান্য দিনের মত সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই ডাইনীর বাড়িতে এসে দেখি ওরা দুইজনেই কেমন মনমরা হয়ে রয়েছে। ম্যানুইলিখা তার বিছানাতেই পা দুটো গুটিয়ে কুঁজো হয়ে বসে আছে, মাথাটা দু হাতে ধরে সে দুলছে আর কি যেন বিড়বিড় করছে। আমার নমস্কার গ্রাহ্যই করলে না সে। ওলেস্যা অবশ্য প্রতিদিনকার মতই প্রতিনমস্কার করলে, কিন্তু কথাবার্তা আমাদের তেমন জমে উঠল না। আমার কথাগুলির দিকে সে ঠিকমত মন দিতে পারছিল না, কারণ তার উত্তরগুলি দেখছিলাম খাপছাড়া। অন্তরের কি এক দারুণ উদ্বেগে তার সুন্দর মুখখানি আঁধার হয়ে ছিল।

ওলেস্যা, তোমাদের আজ কি যেন হয়েছে,—বলে তার বেঞ্চের উপর রাখা হাতটা আমি সস্নেহে স্পর্শ করলাম।

হঠাৎ সে মুখখানা ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। মুখখানা শান্ত রাখার চেষ্টা করছিল বটে সে, কিন্তু তবু তার কুঞ্চিত ভ্রূদুটি বার বার কেঁপে উঠছিল। ঠোঁটের উপর দাঁতের কামড় একেবারে বসে যাচ্ছিল।

নিতান্ত উদাসীনের মত সে বললে, কি আর হবে আমাদের, যেমন ছিলাম ঠিক তেমনি আছি আমরা।

আমার কাছে কথা লুকোচ্ছ কেন, ওলেস্যা? এ ত ভাল কথা নয়। আমি জানতাম আমরা পরস্পরের বন্ধু।

সত্যি বলছি, কিছুই হয়নি আমাদের। সামান্য একটু আধটু মুস্কিল, এ ত কত থাকে মানুষের।

না, ওলেস্যা, সামান্য হলে অমন চেহারা হত না তোমার।

এ আপনার কল্পনা।

আমার কাছে কিছু গোপন করো না, ওলেস্যা। জানি না, এ বিষয়ে আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারব কি না, তবে কিছু পরামর্শ অন্তত দিতে পারব এ কথা ঠিক। মোটের উপর আমাকে তোমাদের দুঃখের ভাগ দিতে পারলে একটু হালকা হবে তোমার মন।

ওলেস্যা অধীরভাবে বলে উঠল, এ সব আলোচনা করে কিছু লাভ নেই, আপনি এ বিষয়ে আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবেন না।

বুড়ী এইবার বিশেষ উত্তেজিত হয়ে আমাদের কথাবার্তার মাঝেই ওলেস্যার উদ্দেশ্যে বলে উঠল,—বোকার মত কথা বলবি না, জানিস? উনি যখন তোর ভালর জন্য কিছু করতে চাইছেন, তখন নিজের গোঁ ছেড়ে শোন না ওঁর কথা?

তুই ভাবিস জগতে তুই সবচেয়ে বেশি চালাক, না? এর পর বুড়ী আমার দিকে চেয়ে বললে,—আমিই সব কিছু খুলে বলছি।

ওলেস্যা আত্মাভিমানে সব কথা চেপে রাখছিল,—তার কথাবার্তা শুনে হাবভাব দেখে আমার যে ধারণা জন্মেছিল, ব্যাপারটা দেখলাম তার চেয়ে অনেক গুরুতর। আগের দিন উর‍্যাদনিক এসে ডাইনীর কুটীরে হানা দিয়ে গেছে।

ম্যানুইলিখা বলতে লাগল,—প্রথমে উনি এসে বেশ আরাম করে বসে কিছু ভদকা খেতে চাইলেন। তারপরই ভিন্নমূর্তি ধরে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের জিনিসপত্র নিয়ে তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এরপর আমি এসে যদি দেখি তোমরা এ বাড়িতে রয়েছ তা হলে তোমাদের দ্বীপান্তরে পাঠাব, এর একটুও নড়চড় নেই। দুইজন সৈন্য দিয়ে তোমাদের নিজেদের দেশে পাঠাব। এই সব বললেন উনি। এখন আমার বাড়ি হচ্ছে অনেক দূরে—সেই আমচেনস্ক শহরে,—একটিও চেনা লোকের দেখা পাব না সেখানে। তা ছাড়া পাসপোর্টের মেয়াদ আমার বহুদিন হল ফুরিয়ে গেছে। অবশ্য গোড়ার দিকেও ওগুলি একটু গোলমেলেই ছিল। এখন আমি কি করি?

আমি বললাম, উনি ত আগে তোমার এখানে থাকায় আপত্তি করেননি,—তবে এখনই বা এসব ধমকানি কেন?

আমিও ত তাই ভাবি। অবশ্য কি সব বক্‌বক্‌ করলেন উনি, মাথামুণ্ডু তার কিছুই আমি বুঝলাম না।...এখন এই যে বাড়িটায় রয়েছি আমরা এটা আমাদের নয়, এটা জমিদারের। প্রথমে গ্রামে থাকতাম আমরা,—তারপর—

জানি, ঠাকুমা,—সব,—সে সব শুনেছি আমি। চাষীরা অত্যাচার করেছিল তোমার উপর।

হাঁ,—তাই। আমি আমার পুরানো জমিদার মিঃ য়্যাবরোসিমোভের কাছে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি করলে তিনি আমাকে এ কুড়ে ঘরটায় থাকতে দিলেন। এখন শুনছি অন্য কোন জমিদার নাকি এই পুরো বনটা কিনে নিয়েছেন, তিনি নাকি এ জলার সব জলনিকাশ, না কি করতে চান। কিন্তু আমি বুঝছি না তাতে আমার এখানে থাকতে বাধা কি?

আমি বললাম, আমার কি মনে হয়, ঠাকুমা, জানো? এ সবই তাঁর বানানো কথা। আসলে উর‍্যাদনিক চান তুমি তাঁর হাতে কিছু গুঁজে দাও।

তা-ও চেষ্টা করে দেখেছি আমি। অনেক চেষ্টা করেছি, তিনি কিছুতেই তা নেবেন না। জানো, পঁচিশ রুবল আমি তাকে সেধেছি, তিনি তা-ও নেবেন না। এমন উন্মাদের মত করতে লাগলেন তিনি যে তা দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কেবলি ধমকাতে থাকেন,—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।...অসহায় অনাথা আমরা—এখন কি করি বল ত? দেখ ত লক্ষ্মীটি, তুমি কোন সাহায্য করতে পার না কি আমাদের, ঐ লোভী কুকুরটার হাত থেকে কোন রকমে যদি আমাদের রক্ষা করতে পার। চিরদিন ঋণী হয়ে থাকব আমরা।

হঠাৎ ধমকে উঠল ওলেস্যা,—দিদিমা!

ম্যানুইলিখা তখনই জবাব দিলে,—দিদিমা—কি? আমি চব্বিশ বছর ধরে তোর দিদিমা,—তুই কি চাস আমরা এখন ভিক্ষা করে বেড়াব?...তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল,—ওর কথা শুনুন না তুমি,—দেখ, আমাদের জন্য যদি কিছু করতে পার।

বুড়ীকে বললাম বটে আমি তাদের জন্য চেষ্টা করব,—কিন্তু সত্যি বলতে কি, আশা করবার মত কোন কিছু পাচ্ছিলাম না আমি। উর‍্যাদনিক ঘুষ নিতে চায় না, এ ত বড় সাংঘাতিক কথা! সেদিন সন্ধ্যায় ওলেস্যার বিদায় সম্ভাষণের মাঝে তেমন আন্তরিকতা পেলাম না,—অন্যান্য দিনের মত এগিয়ে দিতেও এল না সে। বুঝলাম আমি সাহায্য করতে চাওয়ায় তার আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে। তা ছাড়া তার দিদিমার কান্নাকাটি দেখেও বেশ একটু লজ্জা পেয়েছে।

৮

সকালবেলা,—ঠাণ্ডা একরকম নেই বললেই হয়. চারিদিক কেমন ধোঁয়াটে। কয়েকবার স্বল্পস্থায়ী কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এ বৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চোখের সামনে যেন ঘাসগুলি বেড়ে ওঠে. নতুন অঙ্কুর দেখা দেয়। প্রত্যেক পশলার পরই সূর্য মুহূর্তের জন্য এক একবার উঁকি মেরে যাচ্ছিল, আমার বাড়ির সামনের বাগানের সদ্যধৌত কচি সবুজ লিলাক্‌পাতাগুলি তার কিরণে চক্‌চক্‌ করে উঠছিল। সদ্য কোপানো সব্‌জী বাগানে বাচাল চড়ুইগুলি আরও জোরে কিচিরমিচির করছিল। পপলারের বাদামী চটচটে কুঁড়িগুলি থেকে বেশ কড়া গন্ধ বেরুচ্ছিল। আমি বসে এখানকার বনের এক কুটীরের ছবি আঁকছিলাম. এমন সময় য়ারমোলা ঘরে ঢুকে অপ্রসন্ন মুখে বললে,—উর‍্যাদনিক আসছেন।

দুদিন আগে আমি যে তাকে উর‍্যাদনিক এলে খবর দিতে বলেছিলাম সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম. সুতরাং কর্তৃপক্ষের এই লোকটির আমার সঙ্গে কি কাজ থাকতে পারে বুঝতে না পেরে বললাম.—কি ব্যাপার?

য়ারমোলা কিছুদিন থেকে আমার সঙ্গে বেশ রুক্ষ সুরে কথা বলছে, সেই রুক্ষ সুরেই সে বললে, আমি বলছি উর‍্যাদনিক এসেছেন এখানে। এক মিনিট আগে আমি তাঁকে বাঁধের ওখানে দেখে এলাম, এই দিকেই আসছেন তিনি।

বাইরে চাকার ঘড়ঘড়ানি শুনে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলাটা খুলে দিলাম। অস্থিচর্মসার চকলেট রঙের একটা দামড়া ঘোড়া বেতে তৈরী উঁচু নড়বড়ে দু চাকার একখানা গাড়ি টেনে কদমে আসছে, গাড়ির একটা মাত্র হাতলে ঘোড়াটা জোতা, অন্য হাতলের জায়গায় লাগানো হয়েছে একটা মোটা দড়ি। ঘোড়াটার একটি ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, দেখে মনে হয় ঘোড়াটা তেমন সুস্থ নয়। লোকে বলে উর‍্যাদনিক যে এমন জীর্ণ গাড়িতে চড়ে আসে তার কারণ হচ্ছে

অবাঞ্ছিত গুজবের মুখ বন্ধ করা। উর্‌য়াদনিক নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। দামী ধূসর রঙের ওভারকোটে ঢাকা তার বিরাট দেহ,—একসঙ্গে একেবারে দুই-জনের জায়গা অধিকার করে বসেছিল।

জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি বলে উঠলাম, নমস্কার, য়েভপ্সিখি য়্যাফ্রিকানোভিচ্।

তিনি অমায়িক অথচ মুরব্বির মত গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন, সুপ্রভাত, কেমন আছেন?

তারপর ঘোড়াটার লাগাম টেনে, আমাকে নমস্কার করে নতমুখে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

এক সেকেণ্ডের জন্য আসুন না একবার, কথা আছে কিছু আপনার সঙ্গে।

উত্তরে মাথা নাড়লেন তিনি : না, এখন হবার উপায় নেই,—কাজে যাচ্ছি আমি। ভোলোশায় যেতে হবে,—একটা লোক জলে ডুবে মারা গেছে, তার দেহটা তদারক করতে হবে।

আমি এর মধ্যেই তাঁর দুর্বলতার কথা জেনে নিয়েছিলাম, তাই বাইরে ঔদাসীন্যের ভাণ করে বললাম, তা হলে তো বড় মুস্কিলই হল, আমি যে এদিকে কাউণ্ট ওর্তজেলের মহল থেকে দু বোতল খুব ভাল মালের যোগাড় করে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম—

না, পেরে উঠব না, জানেনই তো কাজের বড় কিছু নয়।

একটা জানা লোকের কাছ থেকে কিনেছি আমি জিনিসটা। লোকটা বাড়ির ধনরত্নের মত রেখে দিয়েছিল এটা তার ভাঁড়ারে। আসুন না একবার। আপনার ঘোড়াটাকে ততক্ষণ কিছু ওট্ দেওয়াচ্ছি আমি।

না, না এত পীড়াপীড়ি করবেন না আপনি। জানেনই ত কর্তব্য হচ্ছে সবার আগে। যাই হক—বোতলের মালটা কি আপনার প্লাম্ ব্রাণ্ডী?

প্লাম্ ব্রাণ্ডী-ই বটে! মালটা হচ্ছে পুরোনো ভদকা, একেবারে রীতিমত পুরোনো।

কিন্তু এই একটু আগে যে আমি কিছুটা খেয়ে এলাম,—বলে তিনি অনুতাপে মুখখানা বিকৃত করে গাল আঁচড়াতে লাগলেন।

আগের মতই শান্ত কণ্ঠে আমি উত্তর দিলাম, এ সত্যি বলছেন না আপনি।... অবশ্য এতটা বিশ্বাস হয় না, তবে লোকটা বললে এ দুশো বছরের পুরোনো। গন্ধটা কিন্তু এর একেবারে খাঁটি কনিয়াকের মত,—রঙটা 'য়্যাম্বারের' মত হলদে।

দেখুন তো কি মুস্কিলে ফেললেন আমায়,—বলে তিনি এমন ভয়ের ভাব দেখালেন যে দেখলে হাসি পায় : এখন ঘোড়াটার ভার কে নেবে?

কয়েক বোতল পুরোনো ভদকা সত্যিই আমার ছিল, কিন্তু যত পুরোনো বলেছি অত নয়। একটু বাড়িয়ে বললে আস্বাদটা একটু বেশি লাগবে ভেবেই কয়েক কুঁড়ি বছর বাড়িয়ে বলেছি। যাই হোক—মালটা আমার ঘরে তৈরী আসল

পুরোনো ভদকাই বটে,—খেলে মাথা ঘুরে যায়, বনেদী বড়লোকের বাড়ির ভাঁড়ারের গর্বের বস্তু। যাজক বংশের সন্তান এই উর‍্যাদনিক—ঠাণ্ডা লেগে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে তখনই এক বোতল নিয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে। এর সঙ্গে চাট দিলাম আমি টাটকা মুলো আর সদ্যটানা মাখন।

পাঁচ গ্লাস শেষ করে তিনি বললেন, এবার আপনার কাজের কথা বলুন তো, কি ব্যাপার? বলে তিনি একটা ইজিচেয়ারে বেশ আরামে ঠেসান দিয়ে বসলেন, তাঁর দেহভারে চেয়ারটা মচ্‌মচ্‌ করে উঠল।

আমি তখন বুড়ীর অসহায় অবস্থা, নৈরাশ্য ইত্যাদির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম—দু একটা দুঃখের কথা বানিয়েও বললাম। তিনি মাথা নিচু করে বেশ মন দিয়েই শুনতে লাগলেন আমার কথা, সঙ্গে সঙ্গে শক্ত লাল মুলোর শিকড়গুলি কচ্‌কচ্‌ করে চিবুতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তাঁর ঘোলাটে, নীল অস্বাভাবিক ছোট চোখে নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে চাইতে লাগলেন আমার মুখের দিকে, তাঁর বিরাট লাল মুখ দেখে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি, না দরদ, না প্রতিবাদ।

অবশেষে আমার কথা বলা শেষ হলে তিনি শুধু বললেন, আমায় কি করতে বলেন আপনি?

একটু উত্তেজিত হয়েই বললাম আমি, কি করতে বলেন মানে—? বুঝছেন না আপনি—দুটি অসহায়, গরিব মেয়েছেলে কি দুরবস্থায় পড়েছে?

উর‍্যাদনিক ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন,—হাঁ, আর তাদের একটি যখন আধ-ফোটা গোলাপের মত সুন্দর!

হয়ত তাই, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কথা নয়, কথা হচ্ছে, আপনি তাদের প্রতি একটুখানি দয়াধর্ম করতে পারেন না কেন? এত শীগগির ওদের উচ্ছেদ করবার জন্য আপনার তাড়া পড়ে গেছে—এই কি বিশ্বাস করতে বলেন আমায়? কিছুকাল অন্তত অপেক্ষা করুন আপনি, যাতে ওদের হয়ে জমিদারের কাছে কিছু বলতে পারি আমি। মাসখানেক অপেক্ষা করতে গেলে কি খুবই মুস্কিল হবে আপনার?

কি মুস্কিল হবে? বলতে গিয়ে ইজিচেয়ার থেকে একেবারে লাফিয়ে উঠলেন তিনি,—মুস্কিল হবে না? এতে যে কোন কিছু হতে পারে আমার, প্রথমত ধরুন আমার চাকরিটাই চলে যেতে পারে। এই নতুন জমিদার ইলাস-হোভিচ্‌ কি ধরনের লোক তা কে জানে? হয়ত তিনি খুবই ব্যস্তবাগীশ লোক,—সামান্য একটু কিছু শুনলেই অমনি পিটার্সবার্গে রিপোর্ট করে বসবেন। এ-রকম লোকের অভাব নেই এখানে।

উত্তেজিত উর‍্যাদনিককে শান্ত করবার জন্য বলতে লাগলাম,—শুনুন স্লেভ্‌পেসিখি য়াফ্রিকানোভিচ্‌ আপনি সব কিছুই একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখছেন। আর ধরুন বিপদের ঝক্কি একটু থাকেও যদি, কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে?

শুনে তার মস্ত বড় ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকাতে ঢুকাতে তিনি বললেন, খুব বলেছেন আপনি, কৃতজ্ঞতা! আপনি কি বলতে চান সামান্য পঁচিশ রুবলের জন্য চাকরিটিও খোয়াতে রাজী আমি? না, স্যার, এ যদি ভেবে থাকেন আপনি তা হলে চেনেন না আপনি আমায়।

য়েভ্‌পসিখি য়াফ্রিকানোভিচ্, ভুল বুঝবেন না আমায়, টাকার কথা মোটেই বলছি না আমি, বলছি আমি দয়াধর্মের কথা।

উর্‌য়াদনিক ব্যঙ্গের সুরে টেনে টেনে বলতে লাগলেন,—দ-য়া, ধম্-মো। মশায়,—দয়া-ধম্ম আমার এইখানে,—বলেই তার কলার ছাড়িয়ে উঠা ভাঁজে ভাঁজে পড়া ব্রোঞ্জ রঙের নির্লোম মজবুত ঘাড়টার উপর একটা জোর চাপড় লাগালেন।

য়েভ্‌পসিখি য়াফ্রিকানোভিচ্, আপনি বড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলছেন।

মোটেই না। বিখ্যাত গল্পলিখিয়ে মঃ ক্রাইলোভের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, ওরা এখানকার যন্ত্রণা বিশেষ, ঐ দুটো স্ত্রীলোক! 'পুলিশ অফিসার' বইখানা পড়েছেন আপনি,—মহামান্য প্রিন্স উরুসভের লেখা?

না, পড়িনি।

মস্ত বড় একটা ভাল জিনিস পড়া হয়নি তা হলে আপনার। চমৎকার বই, মশায়, মনকে উঁচু করে দেয়। আমি বলছি অবসরমত পড়ে দেখবেন আপনি বইটা।

বেশ, নিশ্চয়ই পড়ে দেখব আমি বইটা, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, সে বইয়ের সঙ্গে এই দুটি বেচারার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে।

এদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ অনেক। প্রথমত ধরুন—বলেই তাঁর মোটা লোমশ তর্জনীটি বাঁকিয়ে ধরলেন তিনি, তারপর বলে চললেন, পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক লোক যাতে নিয়মিত গির্জেয় যায় তা দেখা এবং এ কাজ তিনি কখনও ভারস্বরূপ মনে করতে পারবেন না। আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ বুড়ীর কি নাম বলেন যেন আপনি, ম্যানুইলিখা—না কি? ও কি কোনদিনই গির্জেয় যায়?

কথাবার্তার মোড় হঠাৎ অন্য দিকে ঘুরে গেল দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি,—কোন মন্তব্য করলাম না। তিনিই যেন জিতে গেছেন মুখে চোখে এমন একটা ভাব দেখিয়ে এবার তাঁর মাঝের আঙুলটা বাঁকিয়ে তিনি বললেন,—

দু নম্বর—যে কোন জায়গায়ই মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা বা মিথ্যে গণনা করা নিষেধ, কেমন কিনা? তিন নম্বর,—ডাইনীগিরি বা যাদুবিদ্যার চর্চা বা ঐ ধরনের কোন জোচ্চুরি,—এ সবও নিষেধ রয়েছে আমাদের। কি বলেন আপনি, ঠিক বলেছি কিনা? এখন ধরুন কোন রকমে যদি এ সব ব্যাপার কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় তবে কাকে জবাবদিহি করতে হবে? আমাকে। কার চাকরি খতম করা হবে?—আমার। তবেই বুঝুন।

উর্‌য়াদনিক বসে পড়লেন আবার চেয়ারে। বসে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দেয়ালের দিকে, আঙুলগুলি দিয়ে ড্রাম বাজাতে লাগলেন টেবিলের উপর।

তাঁর মন গলাবার জন্য বেশ নরম সুরে আমি আবার আরম্ভ করলাম,—স্লেভ্‌পসিখি য়াক্লিকানোভিচ্‌, ধরুন একটু অনুগ্রহই যদি চাই আপনার কাছে,—আপনার কর্তব্য অবশ্য খুবই জটিল এবং কঠিন, বড়ই মুশ্কিলের ব্যাপার এ, কিন্তু লোকের প্রতি আপনার দয়াধর্মের কথাও আমার জানা। অতি সহৃদয় ব্যক্তি আপনি। ঐ স্ত্রীলোক দুটির উপর আর কোন উপদ্রব করবেন না এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া আপনার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

উর‍্যাদনিকের চোখ তখন আমার মাথার উপর দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিল। টেবিলটা বাজাতে বাজাতেই তিনি বলে উঠলেন, সুন্দর একটা বন্দুক যোগাড় করেছেন তো আপনি! অতি সুন্দর। আগের বার যখন এখানে আসি, তখন আপনাকে বাড়ি পাইনি, কিন্তু বন্দুকটা দেখে রীতিমত তারিফ করে গেছি, অতি চমৎকার জিনিসটি আপনার।

আমিও মাথা ঘুরিয়ে বন্দুকটার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, ঠিকই বলেছেন, খুব সুন্দর জিনিস এটা। ইউরোপে তৈরী। পুরোনো জিনিস কিনে গেল বছর একে নতুন করে গড়েছি, মানে—গুলি ছুঁড়বার জায়গাটা এর মাঝখানে করে নিয়েছি। এর ব্যারেলের দিকে চেয়ে দেখুন একবার।

নিশ্চয়,—ঐ ব্যারেলই তো আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। চমৎকার! এ একটা রত্ন বিশেষ।

ওঁর দিকে তাকাতেই ওঁর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল, দেখলাম ওঁর ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। হাসিটার অর্থ বুঝতে আমার দেরি হল না। আমি উঠে গিয়ে বন্দুকটা দেয়াল থেকে পেড়ে ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম—

সারকেশিয়ানদের মধ্যে একটি সুন্দর রীতি প্রচলিত আছে ঃ অতিথি এসে তাদের কোন জিনিসকে প্রশংসা করলে তারা তাকে ঐ জিনিসটি উপহার দেয়। আপনি আমি কেউই আমরা সারকেশিয়ান নই; তবুও স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই বন্দুকটা যদি আপনি গ্রহণ করেন, তবে ধন্য হব আমি।

কথাটা শুনে হকচকিয়ে গেছেন এমন ভাব দেখাতে লাগলেন তিনি। বললেন,—উঁহু, এমন সুন্দর জিনিসটা আপনি দিয়ে দেবেন, তা হয় না। সারকেশিয়ানদের রীতিটার আমি তেমন প্রশংসা করতে পারছি না।

অবশ্য বেশিক্ষণ আমায় পীড়াপীড়ি করতে হল না। শীগগিরই তিনি বন্দুকটা নিয়ে দুই হাঁটুর মাঝে রেখে সযত্নে নতুন রুমাল দিয়ে তার ট্রিগার থেকে ধুলো মুছতে লাগলেন। তাঁর হাবভাব দেখে বুঝলাম বন্দুকটা আমার একজন সমজদার লোকের হাতে গিয়েই পড়ল। হস্তান্তরের লেখাপড়া শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি উঠে পড়লেন, যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গ্যালোশ পরবার জন্য মেঝেতে পা রেখে তিনি বললেন, ব্যাপার দেখুন, জরুরি কাজে বেরিয়েছি আমি, অথচ তা না করে এখানে বসে আপনার সঙ্গে

গল্প করছি আমি। হাঁ, আমাদের ওদিক যদি কোনদিন যান তো আমার বাড়িতে নিশ্চয় আসবেন।

সময় থাকতে আমি বুদ্ধি করে বললাম,—ম্যানুইলিখাদের ও ব্যাপারটার কি ব্যবস্থা করলেন?

কোনকিছু স্বীকার না করে তিনি রুক্ষ স্বরে বললেন,—দেখব'খন।—তার-পরেই একটু মোলায়েম সুরে বললেন,—একটা জিনিস চাইছিলাম আপনার কাছে। আপনার এখানকার মুলোটা দেখলাম বড় সুন্দর।

হাঁ,—নিজে করিয়েছি আমি।

চমৎকার জিনিসটি। আমার গিন্নী আবার এদিকে সব্‌জী বড় ভালবাসেন। যদি পারেন ত—অবশ্য এক আঁটি হলেই চলবে,—বুঝছেন?

এ ত আনন্দের কথা, য়েভ্‌পসিখি য়াফ্রিকানোভিচ্। আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব। আমি আজই লোক দিয়ে এক ঝুড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার বাড়িতে। আর যদি কিছু মনে না করেন—তবে কিছু মাখনও পাঠাব। খুব ভাল মাখন আছে আমার বাড়িতে,—সচরাচর এমনটি বড় দেখা যায় না।

বেশ, কিছু মাখনও পাঠাবেন তা হলে।...হাঁ, আর ঐ দুটি স্ত্রীলোককে জানিয়ে দেবেন যে, আপাতত এখন আর কিছু বলছি না আমি ওদের,—তারপর কণ্ঠস্বর একটু উঁচু করে বললেন, তবে এ কথাও যেন তারা মনে রাখে যে আমি জানি ভাল কথায় যাবার লোক নয় ওরা। আচ্ছা আসি, নমস্কার। আপনার উপহার আর আপ্যায়নের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

সামরিক কায়দা—জুতোর হিলে হিলে ঠোক্কর দিয়ে মাতব্বর বড়লোকের মত ভারী চালে পা ফেলে তিনি তাঁর গাড়ির কাছে এগিয়ে গেলেন। সেখানে সতস্‌কী,* গ্রামের মোড়ল আর য়ারমোলা তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য টুপি হাতে দাঁড়িয়েছিল।

৯

উর্‌য়াদনিক তার কথা রাখলেন, অর্থাৎ কিছুদিন আর বনের বাসিন্দাদের উপর উপদ্রব অত্যাচার করলেন না। কিন্তু ওলেস্যা আর আমার সম্বন্ধের মাঝে কি যেন একটা ঘটে গেল ঃ হঠাৎ ভীষণ একটা পরিবর্তন দেখা দিল ওলেস্যার ব্যবহারে। সে এখন আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করছিল তার মাঝে আগেকার সেই বিশ্বাস আর অকপট বন্ধুত্বের লেশমাত্র ছিল না—তা ছাড়া আগেকার সেই স্ফূর্তির ভাবও ছিল না, সুন্দরী নারীর ছলাকলা আর দুষ্টু ছেলের চাঞ্চল্য এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে তার চরিত্র অপূর্ব আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছিল আমার কাছে,—এ সবের কিছুই এখন পাচ্ছিলাম না। আমাদের কথাবার্তার মাঝেও কিসের যেন

* গ্রাম্যপুলিশ

একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য আগে যে সব বিষয়ের আলোচনায় সে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিত, এখন সে সব বিষয়ে কোন কথা উঠলেও সে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে দ্রুত এড়িয়ে যেত।

আমি যখন যেতাম তখন সে কঠোর মূর্তিতে নিবিষ্ট মনে কাজই করে যেত, আবার মাঝে মাঝে এমনও দেখতাম যে হাত দুটো এলিয়ে পড়েছে তার কোলের উপর আর সে একদৃষ্টে মেঝের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই সময় যদি আমি তার নাম ধরে ডাকতাম বা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম, তা হলে সে চমকে উঠত, এবং তার ভীত চকিত দৃষ্টি আমার দিকে ন্যস্ত করতে চেষ্টা করত, তখন তার রকম দেখে মনে হত—কি বলছি আমি ঠিক বুঝতে পারছে না সে, শুধু বুঝবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে মনে হত আমার উপস্থিতিই বুঝি তার কাছে অসহ্য এবং ক্লেশদায়ক,—কিন্তু এই কয়েকদিন আগে যে আমার প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক টিপ্পনীতে এত আনন্দ পেয়েছে, উৎসাহ দেখিয়েছে, তার মনই বা এমন হবে কিসে? অনেক ভেবে চিন্তে শেষে মনে হতে লাগল সম্প্রতি উর্যাদনিকের কাছে তাদের হয়ে ওকালতি করেছি, তারই জন্যে সে এমন করছে—ওদের সাহায্য করতে যাওয়ায় তার স্বাধীন সত্তায় আঘাত লেগেছে। কিন্তু আমার এ অনুমানেও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি আমি, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছে অরণ্যে পালিত একটা সাধারণ মেয়ের এত আত্মসম্মানজ্ঞানই বা জন্মাবে কি করে?

এরকম ব্যবহারের অর্থ কি—সে কথা ওলেস্যাকে জিজ্ঞাসাও করেছি, কিন্তু প্রাণ খুলে কথা বলবার সমস্ত সুযোগই সে এড়িয়ে গিয়েছে। আমাদের সে সান্ধ্য-ভ্রমণও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওদের ওখান থেকে উঠবার সময় আমি চোখের ইশারায় কত বলেছি আসতে, কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয়েছে সে বুঝতেই পারছে না আমার কথা। এ ছাড়া বুড়ীর উপস্থিতিও কেমন বিশ্রী লাগত আমার, যদিও সে ভাল কানে শুনতে পায় না।

মাঝে মাঝে নিজের উপরই রাগ হত আমার ঃ রোজ রোজ ওলেস্যাকে দেখতে যাওয়াই বা কেন? এই রহস্যময়ী মেয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের অচ্ছেদ্য সূক্ষ্ম যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা আমি এর আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি। প্রেমের কথা অবশ্য তখনও আমি বুঝতে পারিনি, প্রেমের ঠিক আগে হৃদয়ে যে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণাদায়ক বিষাদের অনুভূমি জাগে তাই শুধু অনুভব করছিলাম আমি। যেখানে থেকে যেমন করেই আমি অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করতাম ওলেস্যার মূর্তিটি অমনি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত, আমার সমগ্র সত্তাটা ব্যাকুল হয়ে উঠত তার জন্য, কবে কি সব কথা বলেছে, কখনও কত সামান্য কথা, কি ভঙ্গী করেছে, কি করে হেসেছ—সব কিছুর স্মৃতিই একটা মধুর বেদনার সৃষ্টি করত আমার মনে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত, আমি তাদের সেই নিচু নড়বড়ে বেঞ্চটার ওপর তার পাশেই বসে থাকতাম। কেন যেন বিরক্তি লাগত, মনে হত আমি যেন ক্রমেই ভীরু, জবুথবু আর বোকা বনে যাচ্ছি।

একবার সারাদিনটাই আমি ওলেস্যার পাশে অমনি করে বসে কাটিয়ে দিলাম। সেদিন সকাল থেকেই শরীরটা আমার ভাল ছিল না, অথচ কি যে আমার হয়েছে তা-ও ঠিক বুঝছিলাম না। সন্ধ্যার দিকে আমি আরও বেশি খারাপ বোধ করতে লাগলাম ঃ মাথাটা ভারী, কানের মাঝে কি যেন ঝনঝন করে বাজছে, মাথার পিছন দিকে অনবরত বেদনা,—কে যেন সবল কোমল হাতে নাছোড়বান্দা হয়ে চেপে ধরে রেখেছে সেখানে। মুখটা শুকিয়ে আসছিল আমার, তা ছাড়া আলস্য আর দৌর্বল্যে কেবলি হাই তুলছিলাম আর আড়মোড়া ভাঙছিলাম। চোখ ঝলসানো কোন কিছুর দিকে চেয়ে থাকলে যেমন চোখ ব্যথা করে ঠিক তেমনি ব্যথা বোধ করছিলাম আমি চোখে।

সেদিন সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ি ফিরবার সময় পথে আমি হঠাৎ ভীষণ কাঁপতে শুরু করলাম; দাঁতগুলি আমার খটখট করতে লাগল, তারপর মাতালের মত আমি পথেই গড়িয়ে পড়লাম।

সে রাত্রে কি করে আমি বাড়ি এলাম, কে আমাকে আনলে, আজ পর্যন্ত তা আমি জানি না। ভয়ংকর পলিসিস্য-জ্বরে আমি ছটফট করতে লাগলাম। দিনের বেলা জ্বরটা যেন একটু কমত,—আমি আমার জ্ঞান ফিরে পেতাম। হাঁটুটার ওখানে ব্যথা করত, দুর্বল বোধ করতাম তবুও হাঁটু ভেঙে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরময় আমি চলাফেরা করতাম, একটু বেশি জোর দিতে গেলেই মাথায় রক্ত উঠায় চারিদিক অন্ধকার দেখতাম। রাত্রি প্রায় সাতটার কাছাকাছি আবার নব বিক্রমে জ্বর আমায় আক্রমণ করত, শুরু হত আবার নিদারুণ যন্ত্রণা—রাত্রিও যেন শেষ হতে জানে না ঃ যেন এক শতাব্দী। এই দীর্ঘকাল ধরে কখনও আমি কম্বলের নিচে থর থর করে কাঁপতাম, কখনও বা গা পুড়ে যেত। একটু তন্দ্রার ভাব এলেই নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখতাম, নানা রকম উদ্ভট কিম্ভূতকিমাকার সব স্বপ্ন, এতে আমার মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যেত। স্বপ্নে অনেক সূক্ষ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ সব ঘটনা একসঙ্গে মিশে তালগোল পাকিয়ে বিশ্রী একটা অনুভূতির সৃষ্টি করত। দেখতাম—অদ্ভুত আকারের রঙিন বাক্‌সো খুলে খুলে সাজাচ্ছি আমি, বড় বাক্‌সোর ভিতর থেকে ছোট বাক্‌সো, তার মাঝ থেকে আরও ছোট বের করে সাজাচ্ছি আমি,—ছোটর থেকে আরও ছোট বের হওয়া যেন আর শেষ হতে চাইত না,—বিরক্তিতে মন ভরে যেত। আবার দেখতাম লম্বা রঙিন 'ওয়ালপেপার' অসম্ভব দ্রুতগতিতে আমার সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, এবং স্পষ্ট দেখতে পেতাম ওগুলির উপর কোন ফুল লতাপাতা আঁকা নেই, আঁকা আছে অসংখ্য মানুষের মুখের মালা, কোন কোন মুখ সুন্দর, প্রসন্ন, হাসিহাসি, আবার কোন কোন মুখের ভঙ্গী অতি বিকট ঃ জিভগুলি তাদের বেরিয়ে পড়েছে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কিংবা বড় বড় চোখের মণিগুলি তারা কেবলি ঘুরাচ্ছে। তারপর দেখতাম য়ারমোলা আর আমি একটা অতীব জটিল সূক্ষ্ম বিষয়ে তর্ক শুরু করেছি নিজ নিজ মত সমর্থনে আমরা ক্রমেই গভীর তত্ত্বপূর্ণ দুর্বোধ্য

যুক্তির অবতারণা করে চলেছি, আমাদের বাদানুবাদের কোন কোন শব্দ এমন কি অক্ষরের অর্থ পর্যন্ত গভীর রহস্যে ভরা, দুর্জ্ঞেয়। বিতর্ক আর মোটেই ভাল লাগছে না, কিন্তু কে শুনবে সে কথা, এক রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক যেন আমার মাথার ভিতর থেকে কেবলি কূট তর্কের যুক্তি বের করে করে আমাকে তর্কে প্রবৃত্ত করাচ্ছে, এর নিবৃত্তি নেই দেখে ভয় পেয়ে যেতাম আমি।

এই সময় আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন একটা ভীষণ ঘূর্ণি চলেছিল,—নরমূর্তি, পশুমূর্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, অদ্ভুত উদ্ভট আকারের সব বস্তু, শব্দ আর বাক্যাংশের ঘূর্ণি। শেষোক্তের অর্থ আমার বেশ বোধগম্য হচ্ছিল। আরও আশ্চর্য, ঠিক একই সময়ে সিলিং-এর গায়ে নিখুঁত বৃত্তাকারে একটা আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আলোটা আসছিল সবুজ শেড দেওয়া একটা ল্যাম্প থেকে। আমি বেশ বুঝছিলাম ঐ অস্পষ্টপ্রান্ত আপাত শান্ত বৃত্তের মাঝে যে জীবনের নির্দেশ রয়েছে তা নীরব হলেও গভীর রহস্যময়, ভয়ঙ্কর, আমার স্বপ্নে দেখা জীবনের চেয়েও তা অধিকতর পীড়াদায়ক।

এই রকম সব হাবিজাবি স্বপ্ন দেখার পরই হঠাৎ আমি জেগে যেতাম। কিছুটা চৈতন্যলাভের পরই আমি বুঝতে পারতাম, আমি অসুস্থ, বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলাম। তখনও আঁধার সিলিং-এর উপরকার সেই বৃত্তাকার আলোর কথা মনে করে আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি। এর পর অনেক কষ্টে আমার ঘড়িটা বের করে আমি দেখতাম—এই ভয়ঙ্কর সুদীর্ঘ স্বপ্ন দেখতে সময় লেগেছে আমার মাত্র দুই তিন মিনিট, দেখে হতভম্ব হয়ে যেতাম আমি। বালিশের উপর মাথাটা নাড়তে আমি নিরাশ হয়ে ভাবতাম, ভগবান, কখন রাত পোহাবে! নিজের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের জ্বালায় আমার ঠোঁট পুড়ে যেত। এর পর আবার একটু তন্দ্রার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তাম আমি, তার মাঝে আবার সেই আগেকার মত দুঃস্বপ্ন। আবার দু মিনিট পরেই জেগে যেতাম আমি, জেগেই আবার সেই প্রাণান্তকর উদ্বেগ।

খুব শক্ত ধাঁচের শরীর আমার। কুইনাইন খেয়ে আর অন্যান্য ওষুধ ইনজেক্‌শান দিয়ে ছ দিন পরই আমার জ্বর গেল। কিন্তু শরীর আমার তখন নড়বড় করছে,—অতিশয় দুর্বল। বেশ তাড়াতাড়িই সেরে উঠতে লাগলাম। ছয় দিনের বিকারে ক্লান্ত মস্তিষ্ক এখন বেশ সুস্থ, সর্বচিন্তাশূন্য। ক্ষুধা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল, প্রতি ঘণ্টাতেই শরীর খাদ্যদ্রব্য থেকে নতুন বল আর প্রাণশক্তি লাভ করতে লাগল, আনন্দের আকাঙ্ক্ষা জাগাতে লাগল মনে। বনের সেই নির্জন কুটীরটায় যাবার জন্য মন আঁকুপাঁকু করতে লাগল। অসুখের পর আমার স্নায়ুগুলি তখনও সবল হয়ে ওঠেনি তাই ওলেস্যার মুখ আর কণ্ঠস্বরের কথা মনে পড়লেই কেমন যেন কান্না পেতে লাগল আমার।

আরও পাঁচ দিন কেটে গেল। আমার গায়ের বল তখন আমি বেশ ফিরে পেয়েছি, ডাইনীর কুটীর পর্যন্ত হে'টে যেতে আমার একটুও কণ্ট হল না। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আমার বুক ভয়ে দুরদুর করতে লাগল। প্রায় একপক্ষ কাল আমি ওলেস্যাকে দেখিনি, তাই বেশ বুঝতে পারছিলাম সে আমার জীবনের কতখানি। দরজার হাতলের উপর হাত রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। দরজায় ধাক্কা দেবার আগে কয়েক সেকেন্ড চোখ দুটোও বন্ধ করেছিলাম আমি।

ঘরে ঢুকবার পর আমার মনের যে অবস্থা হল তা বর্ণনা করা সহজ নয়। মা ছেলে, স্বামী স্ত্রী কিংবা প্রণয়ী প্রণয়িনীদের প্রথম সাক্ষাতের সময় যে কথাবার্তা হয় তা মনে রাখা সম্ভব কি? অতি সাধারণ সব কথা, লিখে রাখতে গেলে সেগুলি হাস্যকর মনে হবে,—কিন্তু সে কথাগুলি প্রিয়কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে কতই না মধুর, কত আদরের!

আমার এখন পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট মনে আছে ওলেস্যা যখন আমার দিকে দ্রুত মুখ ফিরাল, দেখলাম তার মুখখানা এ কয়দিনে বিবর্ণ হয়ে গেছে, ওর সেই মিষ্টি মুখখানা যেন নতুন করে দেখলাম আমি, আর দেখলাম বিহ্বলতা, ভয় আর প্রেম যেন পর পর দ্রুত ছায়া ফেলে গেল তার মুখে। বুড়ী বিড়বিড় করে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন কি বললে, কিন্তু তার সম্ভাষণ আর আমার কানে এল না, কানে এল শুধু সঙ্গীতের মত মধুর ওলেস্যার কণ্ঠস্বর ঃ

কি হয়েছিল তোমার? অসুখ করেছিল? ইস্ কি রোগা হয়ে গেছ তুমি!

উত্তরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই যোগালো না আমার মুখে, আমরা শুধু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই সামান্য নীরব মুহূর্ত কয়েকটিই আমার জীবনের চরম আনন্দের মুহূর্ত। এর আগে বা পরে এমন অনাবিল,—পূর্ণাঙ্গ গভীর দিব্য আনন্দ আমি উপলব্ধি করি নি। ওলেস্যার ডাগর কালো চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি আমায় দেখার আনন্দ, আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য তিরস্কার, আর— আর আমার প্রতি প্রবল গভীর অনুরাগ। আমি বেশ বুঝছিলাম ঐ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বিনা দ্বিধায় বিনা শর্তে সে নিজেকে আমায় সঁপে দিয়েছে।

ওলেস্যা চোখের ইশারায় ম্যানুইলিখার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আমরা যেন আবার এই জগতে ফিরে এলাম। আমরা পাশাপাশি বসলাম। সে পরম আবেগে আমার অসুখের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, কি ওষুধ খেয়েছি, ডাক্তার কি বলেছেন (শহর থেকে দু বার ডাক্তার আসেন আমায় দেখতে) ইত্যাদি। ডাক্তারের

কথা ফিরে ফিরে সে আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, দেখছিলাম এই সময় মাঝে মাঝে তার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠছিল।

শেষে সে বিশেষ আক্ষেপ করে বললে, আমি যদি তোমার অসুখের কথা জানতাম, তা হলে একদিনে আমি তোমায় সারিয়ে দিতে পারতাম। যারা কিছু জানে না, বোঝে না, তাদের ডাকো কেন তোমরা বল ত? আমায় ডেকে পাঠালে না কেন তুমি?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, দেখ ওলেস্যা, অসুখটা আমার এমন হঠাৎ করল, তা ছাড়া তোমায় বিঘ্ন করতেও চাইনি আমি। কিছুদিন যাবৎ তুমি আমার সঙ্গে এমন অদ্ভুত ব্যবহার করছিলে যে,—মানে আমি বলতে চাই তুমি হয় আমার উপর রাগ করেছিলে, কিংবা আমাকে আর ভাল লাগছিল না তোমার। শোন ওলেস্যা,—কণ্ঠস্বর আমি একটু নিচু করে বললাম, অনেক—অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, সে কথা আমরা একটু নিরালায়...বুঝছ আমার কথা।

চোখ দুটি নত করে সে জানালে যে, সে বুঝেছে, তারপরে একটু ভয়ে ভয়ে ম্যানুইলিখার দিকে তাকিয়ে তখনই চাপা গলায় বললে, হাঁ আমিও তাই চাই, তবে ঠিক এখন নয়, একটু পরে।

সূর্যাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমায় বাড়ি ফিরবার জন্য তাগিদ দিতে লাগল। বেঞ্চ থেকেই সে আমার হাত ধরে বললে, এইবার উঠে পড়, আর দেরী নয়, ঠাণ্ডা লাগলেই আবার অসুখে পড়বে তুমি।

নাতনীকে তার ধোঁয়াটে রঙের পশমী শাল গায়ে দিতে দেখেই ম্যানুইলিখা বলে উঠলে, কোথায় চললি তুই, ওলেস্যা?

ওঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

ম্যানুইলিখার দিকে না চেয়ে, কেবল জানলার দিকে চেয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়েই কথাটা বললে বটে ওলেস্যা, কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু রাগের ভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বুড়ী একটু জোর দিয়েই বললে,—তা হলে চল্লিই তুই?

ওলেস্যা ম্যানুইলিখার দিকে চাইলে, চোখ দুটি তার চক্‌চক্ করে উঠল। সে উদ্ধতভাবে বললে, হাঁ চল্লাম। এ সব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে আমাদের। আমার ব্যাপার এ, যা কিছু হবার, আমারই হবে।

ম্যানুইলিখা উত্তেজিতভাবে তিরস্কারের সুরে শুধু বলে উঠল,—ওঃ।

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল বুড়ী, কিন্তু তা না বলে নিরাশভাবে হাতটা নেড়ে কাঁপতে কাঁপতে এক কোণে গিয়ে একটা চুপড়ী নিয়ে কি যেন করতে লাগল।

বুঝলাম এই দ্রুত রাগারাগির কথা শুধু এখনকার কথা নয়, এর আগেই অনেক ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গিয়েছে ওদের।

বনে ঢুকবার সময় আমি ওলেস্যাকে বললাম, তোমার দিদিমা চান না যে তুমি আমার সঙ্গে এস,—কেমন, তাই ত?

ওলেস্যা বিরক্তি জানাতে নিজের কাঁধটায় একটা ঝাঁকি দিলে।

ও সব দেখবার দরকার নেই তোমার। হাঁ,—তিনি চান না। তাতে হয়েছে কি? আমার যা খুশি করব—সে অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

হঠাৎ তার পূর্বের কঠোর ব্যবহারের জন্য তাকে একটু তিরস্কার করবার ইচ্ছা জাগল আমার মনে। বললাম—

তা হলে এর আগেও তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে বাইরে আসতে পারতে, কিন্তু তা আসতে চাওনি তুমি। তুমি জানো না, ওলেস্যা, এতে কি কষ্ট পেয়েছি আমি। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় আমি ভেবেছি—তুমি আমায় এগিয়ে দিতে আসবে, কিন্তু আমার দিকে দৃকপাতই করনি তুমি,—হয় রাগ, নয় অবহেলা,—নয় অন্য কিছু। কি কষ্ট যে তুমি আমায় দিয়েছ, ওলেস্যা!

আর বলো না, লক্ষ্মীটি, ও সব ভুলে যাও ঃ কণ্ঠে করুণ মিনতি আর ক্ষমা প্রার্থনার সুর ধ্বনিত হল ওলেস্যার।

এ জন্য আমি কিছু বলছি না তোমায়, হঠাৎ মনে এল তাই বলে ফেলেছি। এখন অবশ্য এর কারণ বুঝতে পারছি। প্রথমে আমি কি ভেবেছিলাম—জানো? ভাবলে হাসি পায় এখন, আমি ভেবেছিলাম উর‍্যাদনিকের ব্যাপার নিয়ে তুমি আমার উপর রাগ করেছ। বড্ড কষ্ট পেয়েছি আমি। মনে হয়েছে তুমি আমাকে এত পর ভাব যে, যে কোন বন্ধুর কাছ থেকে যে উপকার নেওয়া যায়, আমার কাছ থেকে তা নিতেও তুমি কুণ্ঠিত। বড় দুঃখ পেয়েছি আমি। তখন কি জানতাম, এ সব তোমার দিদিমার জন্য।

হঠাৎ ওলেস্যার মুখ চোখ বড্ড বেশি রাঙা হয়ে উঠল। সে বললে, দিদিমার জন্য নয়, আমি নিজেই অমন করেছি।

বলবার সময় মাথাটা ঈষৎ নত হয়ে পড়েছিল, আমি পাশ থেকেই তার সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আগে তেমন খেয়াল করিনি কিন্তু তখন নজরে পড়ল ও নিজেও বড় রোগা হয়ে গেছে, চোখের নিচেটায় কেমন নীল ছায়া পড়েছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখছি বুঝতে পেরে সে একবার মুখ তুলে চাইলে আমার দিকে, আবার তখনই চোখ নত করে লজ্জার হাসি হেসে মুখ ফিরাল।

আমি তার হাত ধরে ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেন অমন করেছ, ওলেস্যা, কেন?

আমরা তখন এক সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ বনপথের মাঝে এসে গেছি. দুদিকে তার লম্বা সরু পাইন গাছের শ্রেণী. দুপাশ থেকে ওদের ডালগুলি এসে পরস্পর আঁকড়ে ধরে একটা সুদীর্ঘ ছত্রের সৃষ্টি করেছে. ওখান থেকে আসছে একটা মিষ্টি গন্ধ। সূর্যাস্তের লাল আভা এসে পড়েছে গাছের পত্রবর্জিত কাণ্ডে।

আমি বার বার ওলেস্যাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, তুমি কেন অমন করেছিলে.—বল. বল।

অতি অনুচ্চ কণ্ঠে ওলেস্যা উত্তর দিলে,—ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু পারলাম না,—ভেবেছিলাম ভাগ্যকে এড়িয়ে যাব আমি, কিন্তু এড়াতে পারলাম না। এখন—

বলতে গিয়ে দমটা যেন আটকে গেল তার। হঠাৎ দুটি হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কঠিন আলিঙ্গনে বদ্ধ করলে সে আমায়,—আমার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে আবেগভরা দ্রুত মধুর অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলে উঠল, আর কিছু ভাবব না আমি,—ভাবব না—কারণ আমি তোমায় ভালবাসি, আমার সোনা, মাণিক, জীবন।

বলতে বলতে আরও জোরে বুকে চেপে ধরলে সে আমায়,—আরও আরও জোরে। আমার দুই বাহুর মাঝে তার উষ্ণ বলিষ্ঠ দেহের দ্রুত কম্পন অনুভব করতে লাগলাম আমি, আমার বুকের উপর তার বুক যেন এখনই ফেটে ভেঙে পড়বে। সুতীব্র মদিরার মত তার চুম্বন মদিরায় আমার রোগদুর্বল মস্তিষ্ক যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, আর যেন নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না আমি।

ওলেস্যার বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে আমি বললাম, ভগবানের দোহাই, ওলেস্যা, আর না, এবার ছেড়ে দাও আমায়। এখন ভয় করছে আমার, নিজের সম্বন্ধেই শঙ্কিত হয়ে উঠছি আমি, লক্ষ্মীটি, ছেড়ে দাও।

ওলেস্যা এবার তার মুখটা তুলে ধরে ক্লান্ত হাসি হেসে অতি স্নিগ্ধ অথচ অন্তরস্পর্শী দৃপ্ত কণ্ঠে বললে, ভয় পেও না, লক্ষ্মীটি, আমি কোনদিন তোমায় কিছু মন্দ বলব না, হিংসা করব না—শুধু আজ তুমি আমায় বল, তুমি আমায় ভালবাস কি না।

হাঁ, ওলেস্যা, আমি বহুদিন থেকে তোমায় ভালবাসি, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। কিন্তু আর চুমু দিও না আমায়। বড় দুর্বল লাগছে আমার, মাথা ঘুরছে,—বড্ড ভয় লাগছে।

তার ওষ্ঠযুগল আবার আমার ওষ্ঠ দুটিকে সুদীর্ঘ মধুর চুম্বনে বদ্ধ করে রাখল, তারপর অতি অনুচ্চ কণ্ঠে সে আমায় বললে, এখন থেকে আর ভয় রেখ না,—আর কিছু ভেবো না, এ স্মরণীয় দিনটা আমাদের কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারবে না।

সেদিনকার সারা রাত্রিটায় যেন এক অপরূপ রূপকথার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সারা বনকে বিচিত্র রহস্যময় রঙে চিত্রিত করে চাঁদ উঠল আকাশে, কাঁটাগাছের এবড়ো খেবড়ো মাথা,—আঁকাবাঁকা গাছের ডাল আর গালিচার মত নরম শেওলার উপর ছিটে ছিটে নীল আলো এসে পড়তে লাগল—চাঁদের। বার্চগাছের সরু সাদা কাণ্ডগুলি অতি স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল, কিন্তু তাদের ফাঁক ফাঁক পাতাগুলি দেখাতে লাগল যেন রূপোর জালতিতে ঢাকা। শুঁয়া বেরুনো পাইনের ঘন ডালপালার জন্যে যেখানে যেখানে আলো ঢুকতে পারছিল না, সেই সেইখানে শুধু ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকার—। এই অন্ধকারের মাঝেও কোত্থেকে

এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়ে সুদীর্ঘ সারিবদ্ধ গাছের পাশ দিয়ে সরল রেখায় চলা সংকীর্ণ পথকে প্রকাশিত করে দিচ্ছিল। এই পথটা এত সুন্দর আর উজ্জ্বল যে, দেখলে মনে হয় 'ওবেরল' আর 'টাইটেনিয়া' আসবেন বলে পরীরা সব ধারে ধারে গাছ বসিয়ে এই সুন্দর পথটা তৈরি করেছে। সেই পথে, সেই জীবন্ত রূপকথার রাজ্যে, গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে একটিও কথা না বলে শুধু নিজেদের সুখে বিভোর হয়ে বাহুবদ্ধ হয়ে আমরা চলতে লাগলাম।

হঠাৎ ওলেস্যা বলে উঠল, সোনা, তোমার যে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে সে কথা ত আমি ভুলেই গেছি! কি স্বার্থপর আমি! সবে অসুখ থেকে উঠেছ তুমি, অথচ এতক্ষণ তোমায় আমি বনের মাঝে আটকে রেখেছি!

আমি তাকে আলিঙ্গন করে তার ঘন চুলে ভরা মাথা থেকে শালটা সরিয়ে তার কানের কাছে মুখ রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার আফশোষ হচ্ছে না ত কিছু?

ওলেস্যা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, না,—কিচ্ছু আফশোষ নেই আমার, এর ফলে যাই ঘটুক না কেন, আফশোষ করব না আমি। খুবই সুখী বোধ করছি আমি।

কিছু ঘটার কথা বলছ, এর ফলে কিছু ঘটবে কি?

হঠাৎ তার চোখমুখে সেই আগেকার মত অদ্ভুত ভয়ের ভাব দেখা দিল, সে উত্তর দিলে, হাঁ, ঘটবেই,—ঘটতে বাধ্য। যে চিড়ের বিবির কথা তোমায় বলেছিলাম,—মনে আছে? আমি সেই চিড়ের বিবি। তাসের গণনায় যে দুর্ভাগ্যের নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল, সে দুর্ভাগ্য ঘটবে আমার। জানো, এই জন্যই আমি তোমায় আমাদের ওখানে আসা একেবারে বন্ধ করতে বলব ভাবছিলাম। ঠিক এই সময় তোমার অসুখ করে বসল, এক পক্ষকাল তোমায় দেখতে না পেয়ে মন আমার এত খারাপ হয়ে গেল যে, মনে হতে লাগল শুধু এক মুহূর্ত তোমার পাশে থাকবার জন্য আমি আমার জীবনের সব কিছু দিতে পারি। এই সময়ই আমি আমার মন ঠিক করে ফেললাম, ভাবলাম, যা ঘটে ঘটুক—আমি আমার জীবনের একমাত্র সুখ ত্যাগ করব না।

আমি তার কপালে চুমু দিয়ে বললাম, ঠিকই করেছ তুমি, ওলেস্যা, আমারও ঠিক এই দশা হয়েছে। তোমায় ছেড়ে থাকবার আগে আমি বুঝতে পারিনি যে, আমি তোমায় এত ভালবাসি। যেই বলুক না কেন, ঐ যে কথা আছে—বাতাসে আগুনের যা করে, বিচ্ছেদে তাই করে প্রেমের,—প্রেম অল্প হলে বিচ্ছেদের বাতাসে তা নিভে যায়, আর বেশি হলে বিচ্ছেদে তা আরও দাউ দাউ করে ওঠে।

কি বললে,—আবার বল ত! ওলেস্যার যেন বড্ড ভাল লেগে গেল কথাটা।

প্রবচনটার পুনরুক্তি করলাম আমি, ওলেস্যা কি যেন ভাবতে লাগল,—তার ঠোঁট নড়া দেখে বুঝলাম কথাগুলি মনে মনে আওড়াচ্ছে সে।

এই সময় সে তার বিবর্ণ মুখখানা তুলে ধরায় তার বড় বড় চোখের তারায়

চন্দ্রকিরণ পড়ে ঝিকমিক করছিল,—আমি সেদিকে একটু ভালো করে চাইতেই—ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুকটা যেন হিম হয়ে গেল।

১১

প্রায় একমাস ধরে আমরা আমাদের এই প্রেমের স্বর্গলোকে বাস করেছি। ওলেস্যার অপরূপ মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই উজ্জ্বল সূর্যাস্ত, সেই শিশিরস্নাত লিলি আর মধুর গন্ধে ভরা নবীন প্রাণ জাগানো প্রভাত, পাখির কাকলী, আর জুন মাসের সেই অলস, উষ্ণ উদাস-করা দিনগুলির কথা আমার স্মৃতিপটে চির-উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এই সময়টার মধ্যে বিরক্তি, ক্লান্তি বা এখানে ওখানে যাওয়ার কথা একবারও মনে হয়নি আমার। হিদেন দেবতা বা সবল তরুণ জীবের মত আমি এই আলো, এই সুখোষ্ণ আবহাওয়া, সচেতন জীবনানন্দ আর শান্ত সুস্থ দৈহিক প্রেমের মাঝে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আমার অসুখ থেকে উঠবার পর ম্যানুইলিখা এমন খিট খিট করত, আমাকে এমন স্পষ্ট ঘৃণার ভাব প্রকাশ করত, ওদের বাড়ি বসে থাকবার সময় রাগ দেখাতে স্টোভের আশেপাশের জিনিসপত্র এমন শব্দ করে নাড়াচাড়া করত যে ওলেস্যা আর আমি—আমাদের দেখাশুনা বনে করাই সাব্যস্ত করেছিলাম। সবুজ পাইন বনের অপরূপ সৌন্দর্যই আমাদের দিব্যমধুর প্রেমের সুযোগ্য অনুকূল পটভূমি।

ওলেস্যার ব্যবহারে প্রতিদিনই আমার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল। সে বনে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়াও শেখেনি তবুও তার মধ্যে এমন সুরুচি, শালীনতা, সূক্ষ্ম দিব্য অনুভূতি এল কোথা থেকে? প্রেমের স্থূল ব্যবহারিক দিকে এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যাতে স্পর্শকাতর কবিচিত্ত ব্যথা পায়, লজ্জিত বিব্রত বোধ করে,—ওলেস্যা এমন কৌশলে সেগুলি এড়িয়ে যেত যে, আমাদের মিলনের মাঝে একদিনও সেই রকম লজ্জা বেদনার কারণ ঘটেনি।

এদিকে আমার বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। অফিসের যে কাজ নিয়ে আমি পেরিব্রোদে এসেছিলাম, সে কাজ অবশ্য অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমি শুধু ইচ্ছা করেই আমার শহরে ফিরবার দিন পিছিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছিলাম। এ সব কথা অবশ্য ওলেস্যার কাছে আমি একটুও বলিনি, এ শুনলে ওলেস্যার মনের অবস্থা কি হবে তা ভাবতেও ভয় পাচ্ছিলাম আমি। মহা মুস্কিল বোধ করছিলাম আমি। এদিকে আবার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আমার যে, প্রতিদিন ওলেস্যার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই, তার মধুর কণ্ঠস্বর আর ঝরণার মত

হাস্যধ্বনি শোনা চাই; তার কোমল মধুর আদরের স্পর্শ পাওয়া চাই, নইলে আমার কিছুতেই চলত না। কোনদিন যদি বৃষ্টির জন্য আমাদের দেখাশুনা বন্ধ থাকত তা হলে বড় বিশ্রী লাগত, মনে হত আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি যেন হারিয়ে গেছে। কোন কাজে মন বসতে চাইত না, মন বসবে কি করে, মন তখন আলোঝলমল বনের সুখোষ্ণ পরিবেশে ওলেস্যার মধুর মূর্তির ধ্যানে বিভোর।

ক্রমেই ওলেস্যাকে বিয়ে করবার চিন্তা আমার পেয়ে বসতে লাগল। প্রথমে মাঝে মাঝে কথাটা মনে আসত, ভাবতাম, আমাদের সম্বন্ধ যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ওলেস্যাকে বিয়ে করা। অথচ প্রাচীন অরণ্যের এই মনোরম রহস্যময় পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে হালফ্যাশানের পোশাক পরিয়ে ওলেস্যাকে আমার ড্রয়িং-রুমে বসিয়েছি, সেখানে সে আমার সহকর্মীদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, এ কল্পনা করতেও আমার মন বাধত।

কিন্তু বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই আমার মন কেমন যেন এক বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগল, ওলেস্যাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে ভেবে অস্থির হয়ে পড়তে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিয়ে করবার আগ্রহও আমার প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। তাকে বিয়ে করলে সমাজে কি অসুবিধা হতে পারে তা-ও ভেবে পাচ্ছিলাম না আমি। মনে হচ্ছিল—কেন, কত সৎলোক, পণ্ডিত লোকেও ত দর্জীমেয়ে, পরিচারিকা—এ সব বিয়ে করেছেন,—করেননি? তাঁরা ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই তাঁদের জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন,—জীবনের শেষে বরং তাঁরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন যে, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আমার ভাগ্যই বা তাঁদের চেয়ে মন্দ হবে কেন?

জুনের মাঝামাঝি একদিন বনের একটি পথের বাঁকে আমি ওলেস্যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম,—ওখানটার দুধারেই হথর্ণ ঝোপে সব থোপা থোপা ফুল ফুটেছিল। দূর থেকেই ওলেস্যার মৃদু দ্রুত পদক্ষেপ শুনে আমি বুঝলাম—ও আসছে।

ওলেস্যা এসে দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, সোনা আমার, অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি তোমায়,—না? আসতেই পারছিলাম না আমি। এইমাত্র দিদিমার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল।

এখনও ঝগড়া চলেছে?

চলেছে না?—বলে, ঐ লোকটা তোর শেষ করবে, তোকে নিয়ে যতটা খুশি মজা করে নিয়ে শেষে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবে, তোকে সে ভালবাসে না একটুও।

সেই লোকটা মানে আমি ত?

হাঁ সোনা। কিন্তু তার এ কথার একবিন্দুও বিশ্বাস করি না আমি।

আমাদের সকল ব্যাপার তার জানা?

ঠিক বলতে পারি না, তবে আমার যতদূর মনে হয়—সে জানে। আমি অবশ্য তার কাছে কিছুই বলি না, তবে হাবভাব দেখে সে বোঝে নিশ্চয়ই। যাক গিয়ে,—ও সব কথা থাক,—এখন চলো।

হথর্ণ গাছ থেকে এক রাশ সাদা ফুলে ভরা একটা ডগা ভেঙে মাথায় গুঁজে নিলে ওলেস্যা, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম আমরা। অস্তোম্মুখ সূর্যের হালকা গোলাপী আলোয় তখন ভরে উঠেছে আমাদের বনপথ।

আগের দিন রাত্রেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম—যেমন করেই হোক আজ সন্ধ্যায় খুলে বলবই আমি সব কথা। কিন্তু কিসে যেন আমার কথা আটকে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম—এখান থেকে চলে যাওয়ার কথার সঙ্গে যদি তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কথা বলি, তা হলে ওলেস্যা কি বিশ্বাস করবে আমার কথা? সে হয়ত ভাববে বিদায়ের কথা বলে তার যে আঘাত দিচ্ছি মনে—তারই বেদনা লাঘব করতে বলছি—ঐ বিয়ের কথা। ঠিক করলাম, ঐ যে বাকল-বেরুনো ম্যাপল গাছটা আছে, ওর কাছে গিয়েই কথাটা শুরু করব। গাছটির কাছাকাছি এসে একটু উত্তেজিত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম আমি,—কথাটা বলতে যাব এমন সময় আমার সাহসে ভাঁটা পড়ায় বুকটা আমার দুর দুর করতে লাগল, মুখের ভেতরটা যেন ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে এল। কয়েক মিনিট পরে মনে হল—সাতাশ হল গিয়ে আমার পয়া সংখ্যা, সুতরাং মনে মনে আগে সাতাশ গণি—তারপর—। মনে মনে গুণতে শুরু করলাম, কিন্তু সাতাশে পেঁছে দেখি, তখনও আমার বলবার মত সাহস হয়নি। তারপর ভাবলাম, ও সব কিছু নয়, মনে মনে ষাট গোণা যাক, ঐ অবধি গুণলেই এক মিনিট হবে তখন আমি নিশ্চয়ই আরম্ভ করতে পারব।

এই সময় ওলেস্যা হঠাৎ বলে উঠল,—কি হয়েছে সোনা? তুমি কি যেন ভাবছ, কোন অপ্রিয় কথা। কি হয়েছে?

এইবার আমার বলতেই হল,—কিন্তু এমন করে বললাম যে, সে ভঙ্গিটাকে আমার নিজেরই ঘৃণা করতে ইচ্ছা করছিল ঃ ব্যাপারটা যেন তেমন কিছুই নয় এমনি ভাব দেখিয়ে বললাম, হাঁ, ওলেস্যা, তুমি ঠিকই ধরেছ, সামান্য একটু অপ্রিয় কথাই ভাবছি আমি। ব্যাপারটা হচ্ছে—মানে—এখানকার কাজ আমার শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার উপর-ওয়ালারা চান এইবার আমি শহরে ফিরে যাই।

ওলেস্যার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটি কাঁপছে। মুখে একটিও কথা বললে না সে। ধীরে ধীরে তার সঙ্গে এগিয়ে চললাম। কানে আসতে লাগল শুধু ঘাসফড়িংয়ের কিচ্‌কিচ্‌ আর অনেক দূরের রেলগাড়ির একঘেয়ে ঘড়ঘড়ানি।

আমি আবার নতুন করে শুরু করলাম, দেখ ওলেস্যা, আমার কথাটাও একবার বুঝে দেখ ঃ আমি ত চিরকাল এখানে থাকতে পারি না, থাকবার জায়গাও আমার নেই। তা ছাড়া আমার কর্তব্য অবহেলা করাও আমার উচিত নয়।

নিশ্চয়ই নয়, এ কথা বুঝিয়ে বলার আর কি আছে?—ওলেস্যা কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য শান্ত রেখেই কথাটা বললে বটে, কিন্তু সে কণ্ঠে যেন সুর নেই, প্রাণ নেই, দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। সে আবার বললে, যাওয়া যখন তোমার কর্তব্য, তখন তুমি নিশ্চয়ই যাবে।

সে হঠাৎ একটা গাছের কাছে থেমে গাছটা হেলান দিয়ে দাঁড়ালে। তাকিয়ে দেখি তার মুখটা একেবারে কাগজের মত সাদা, হাত দুটো ঝুলে পড়েছে, মুখে এমন একটা হাসি যে, দেখলে কান্না পায়। তার এই অবস্থা দেখে দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলাম।

ওলেস্যা, আমার জীবন, কি হল তোমার, কেমন লাগছে?

ও কিছু নয়। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। মাথাটা ঘুরে উঠেছিল একটু। বলেই—ওখান থেকে নড়বার চেষ্টা করলে। হাতটা আমার কাছ থেকে না টেনে নিয়েই সে শেষে আমার সঙ্গে চলতে লাগল।

আমি একটু তিরস্কারের সুরে তাকে বললাম, তুমি নিশ্চয়ই এখন আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করে বসেছ, ছি, ছি, ওলেস্যা, তুমি কি ভাব আমি তোমায় ছেড়ে চলে যেতে পারি? না, ওলেস্যা, তা নয়। আসলে আজ রাত্রেই তোমার দিদিমাকে বলতে চাইছি—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,—এ তারই ভূমিকা।

আশ্চর্য—এ কথা শুনে সে একটুও বিস্ময় প্রকাশ করল না, ম্লান মুখে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সে বললে,—বিয়ে? না, ভান্যা, তা হয় না, এ অসম্ভব।

কেন, ওলেস্যা, অসম্ভব কেন?

না, না। তুমি নিজেই বোঝ, এ পাগলামি। তোমার কেমন স্ত্রী হব আমি। তুমি ভদ্রঘরের সন্তান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান,—আর আমি? আমি একটা অক্ষর পড়তে পারি না, সমাজে কি করে চলতে হয় জানি না। আমায় স্ত্রী করলে—লজ্জায় মরে যাবে তুমি।

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম,—কি সব বাজে বকছ, ওলেস্যা! ছ মাস পরে তুমি নিজেকে নিজেই চিনতে পারবে না। তোমার কি বুদ্ধি আর কত শীগগির তুমি সব কিছু শিখে নিতে পার, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। আমরা দুজন একসঙ্গে বসে কত সব বই পড়ব, কত সব ভাল ভাল বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে মেলামেশা করব,—পৃথিবীর কত সব দেশ দেখব। এখন যেমন আছি ঠিক তেমনি সারা জীবন আমরা একসঙ্গে থাকব। তোমায় স্ত্রী করে লজ্জা?—বরং গুমোর করব আমি, তোমায় পেয়ে। চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমি তোমার কাছে।

আমার এই আবেগের কথা শুনে সে একটুও বিচলিত হল না,—শুধু নিজের অনুরাগ জানাতে আমার হাতটায় একটু জোরে চাপ দিলে।

সব বলা হয়নি। সব বোধ হয় তুমি জানও না। আমি কখনও বলিনি তোমায়। পিতৃ-পরিচয় দেবার উপায় নেই আমার। আমি—

তুমি থাম, ওলেস্যা,—চুপ কর। ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

তোমার বংশের পরিচয় দিয়ে আমি কি করব,—আমি তোমায় ভালবাসি, আমার নিজের মা-বাপের চেয়ে, জগতের সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসি, এই হলে আর কি কিছুর দরকার আছে? যে সব অজুহাত তুমি দেখাচ্ছ ও সব অতি বাজে, তুচ্ছ ব্যাপার।

সে পরম স্নেহে পরম নির্ভরতায় নিজের কাঁধটা আমার কাঁধে রেখে বললে, সোনা, এ সব কথা তুমি না বললেই ভাল করতে। তোমার বয়স অল্প, বিয়ে করনি এখনও। তুমি কি মনে কর চিরকাল আমি তোমায় এমনি আটকে রাখতে পারব? এর পর হয়ত তুমি অন্য কোন মেয়েকে ভালবেসে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে. যে সময়টায় আমি তোমায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলাম, সেই সময়টাকে অভিসম্পাত দেবে। তার কথা শুনে আমি কষ্ট পাচ্ছি দেখে সে তখনই আবার মিনতির সুরে বললে, রাগ করো না, লক্ষ্মীটি,—আমি তোমায় আঘাত দিতে এ সব বলছি না, তোমার ভবিষ্যৎ সুখের কথা ভেবেই বলছি। তারপর দিদিমার কথা একবার ভেবেও দেখছ না,—একবার নিজেই ভেবে দেখ না, তাকে এমনি একলা ফেলে যাওয়া কি আমার উচিত হবে?

সত্যি বলতে কি, এ কথাটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি। বললাম, তাঁর জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে বই কি? আমাদের সঙ্গে যদি তিনি থাকতে না চান, তা হলে শহরে শহরে স্থবির বৃদ্ধাদের জন্য যে সব আশ্রম আছে,—তারই একটাতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। বৃদ্ধাদের যা দরকার সবই করা হয় সেখানে।

সে অসম্ভব। দিদিমা বন ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবে না, লোকজন দেখে তার বড় ভয়।

তা হলে—কি করবে তুমি নিজেই ভেবে ঠিক কর, ওলেস্যা,—দিদিমা আর আমি, এই দুইজনের একজনকে বেছে নিতে হবে তোমায়. তবে এইটুকু শুধু তোমায় জানিয়ে রাখি, তোমায় ছেড়ে জীবন আমার দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

ওলেস্যা মধুক্ষরা কণ্ঠে বললে, সোনা, তুমি যা বললে, এতে জীবন ধন্য হয়ে গেল আমার। প্রাণটা আমার ভরে গেল, কিন্তু তবু বলছি, বিয়ে তোমায় আমি করব না। তুমি যদি আমায় চাও, তবে যেমন আছি ঠিক তেমনি থেকেই আমি তোমার সঙ্গে যাব। শুধু দোহাই তোমার তাড়াহুড়ো করো না, আমায় চাপ দিও না, আমায় ভাবতে দুদিন সময় দাও। দিদিমার কাছেও কথাটা বলতে হবে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আমি তাকে বললাম, আচ্ছা, ওলেস্যা তুমি ত গির্জেয় যেতেও ভয় পাও,—তাই না?

প্রথম আলোচনা আমাদের ঐ দিক থেকে শুরু হওয়াই উচিত ছিল। ওলেস্যাদের বংশের লোকেরা ডাইনী-বিদ্যা চর্চা করে বলে ভগবানের অভিশাপ আছে তাদের উপর—এই ওলেস্যার বিশ্বাস। এ ভুল ভাঙবার জন্য প্রতিদিন আমি তাকে বুঝিয়েছি। সত্যি বলতে কি রাশিয়ার জ্ঞানমার্গীদের প্রত্যেকেই

লোকের কুসংস্কার দূর করবার চেষ্টা করে থাকেন। বিগত যুগের সাহিত্যই এ আগ্রহ আমাদের মজ্জাগত করে দিয়েছে। ওলেস্যা যদি ধর্মাচরণের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মেনে চলত, উপোসের দিনে উপোস করত, উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট দিনে গির্জেয় যাওয়া একদিনের জন্যও বাদ না দিত,—তা হলে তার মনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দিকটার উৎকর্ষ সাধন করতে ঐ সব নিয়ে আমিই হয়ত তাকে একটু ঠাট্টা করতাম,—কারণ ধর্মের তত্ত্বের দিকটা আমি নিজেও মেনে চলি। কিন্তু ওলেস্যা ও সব কিছুই করত না, সে অকপটে স্বীকার করত অন্তরের যোগ তার ভগবানের সঙ্গে নয়, ভগবানের বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করতেও সে ভয় পায়।

তার এই কুসংস্কার ভাঙতে অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিছুতেই কিছু হয়নি। আমি কত যুক্তি দেখিয়েছি, কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছি, অনেক সময় তীব্র কঠোর ভাষায় বিদ্রূপ করেছি কিন্তু এ সবের কিছুই তাকে তার মারাত্মক রহস্যময় স্বধর্মে বিশ্বাস থেকে টলাতে পারেনি।

আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—গির্জেকে ভয় কর তুমি, ওলেস্যা?

ওলেস্যা নীরবে মাথাটা নিচু করলে।

তোমার ধারণা ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করবেন না?—আমি পরম আবেগে বলে চললাম, তোমার ধারণা তোমাকে ক্ষমা করবার মত উদারতা তাঁর নেই? লক্ষ লক্ষ দেবদূতের অধিনায়ক হয়েও যিনি সর্বজনের মুক্তির জন্য পৃথিবীতে এসে ভয়ঙ্কর জঘন্য মৃত্যুবরণ করলেন, অনুতপ্তা পতিতাকে যিনি ঘৃণা করেননি, দস্যু তস্কর তাঁরই সঙ্গে একদিনে স্বর্গে যেতে পারবে বলে যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তোমায় গ্রহণ করবেন না?

এ সব কথা অবশ্য ওলেস্যার কাছে নতুন নয়, আগেও এ সব নিয়ে আলোচনা করেছি তার সঙ্গে, কিন্তু এবার আমার কথায় কান দিলে না পর্যন্ত সে। এক টানে তার গা থেকে শালটা খুলে ডলামোচড় করে সে আমার মুখে ছুঁড়ে মারল। আমি তার কাছ থেকে হথর্ণের মঞ্জরীটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলাম। আমাকে বাধা দিতে গিয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও টেনে নিল। দ্রুত নিঃশ্বাসের ফলে তার ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, সে হাসতে হাসতে তখন তার সেই সিক্ত উন্মুক্ত মধুর ওষ্ঠপুট আমার দিকে এগিয়ে দিল।

সেদিন একটু বেশি রাত্রে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আমি কিছুটা দূর গিয়েছি, তখন দেখি সে আমায় ডাকছে,—ভান্যা, একটু দাঁড়াও, একটা কথা বলব তোমায়।

আমি ফিরে চললাম তার দিকে, সে-ও আমার দিকে ছুটে এল। আকাশে তখন শুক্লপক্ষের একফালি চাঁদ, তারই আলোকে দেখলাম ওলেস্যার চোখ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে ওলেস্যা?

সে আমার দুটো হাত ধরে, এ-হাতে একবার, ও-হাতে একবার চুমু দিতে লাগল। তারপর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললে, সোনা, তুমি কত ভাল, কত দয়া তোমার, আমায় তুমি কত ভালবাস, তোমাকে খুশি করতে আমি কি করতে পারি তাই ভাবছিলাম।

ওলেস্যা, লক্ষ্মী, মাণিক আমার, একটু শান্ত হও তুমি।

সে বলে চলল, আমি গির্জেয় গেলে সত্যিই খুশি হও তুমি? ঠিক করে বল, সত্যি করে।

তখনই উত্তর দিতে পারলাম না আমি,—ভাবতে লাগলাম ঃ এতে কোন অমঙ্গল হবে না ত ওর?

কথা বলছ না কেন তুমি? শীগগির করে বল, তুমি এতে খুশি হও, না, ওখানে যাওয়া-না-যাওয়ায় কিছুই তোমার আসে-যায় না?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, এর কি উত্তর দিই, বল? হাঁ, খুশি হই বই কি? পুরুষের কথা স্বতন্ত্র, তারা ইচ্ছা হলে ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে, না বিশ্বাস করতেও পারে, এমন কি ও সব নিয়ে নাক সিঁটকালেও লোকে কিছু মনে করে না, কিন্তু মেয়েদের ধর্ম করা নিতান্ত দরকার। ওরা সরল বিশ্বাস নিয়ে ভগবানের পায়ে শরণ নিচ্ছে দেখলে সত্যিই বড় ভাল লাগে আমার, এও যেন নারীর একটা মাধুর্য, একটা অলঙ্কার।

আমি এইটুকু বলেই থামলাম, ওলেস্যা কোন উত্তর দিলে না, নিজের মাথাটা শুধু আমার বুকের উপর রাখলে।

কিন্তু এ সব জিজ্ঞাসা করছ কেন বল ত?

ওলেস্যা আমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলে ঃ এমনি জানতে চাইছিলাম আমি। থাক ও সব কথা। এখন আসি। কাল আসতে ভুলো না কিন্তু।

ওলেস্যা চলে গেল। আমি চক্ষুকে পীড়িত করে তার যাওয়া দেখতে লাগলাম, তার পায়ের ক্রমবিলীয়মান শব্দ শুনতে থাকলাম। হঠাৎ এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা বুকটা যেন আমার চেপে ধরতে লাগল। ইচ্ছা করতে লাগল তখনই আমি তার কাছে ছুটে যাই—গিয়ে তাকে বিশেষ মিনতি করে বলি—এমন কি, দরকার হলে জোর করে বলি—সে যেন গির্জেয় না যায়। যাই হক, সে ইচ্ছাটা দমন করলাম আমি, এবং বাড়ি ফিরবার পথে নিজের মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, ভান্যা,—এ কি ব্যাপার, তুমি নিজেই যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলে?

হায় ভগবান, তখন কেন আমি আমার হৃদয়ের সতর্কবাণী শুনিনি? এখন আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি—হৃদয়ের এ সব বাণী কখনও মিথ্যা হয় না।

১২

এর পরের দিন 'ট্রিনিটি সান্‌ডে'। সেবার পরবটা পড়েছিল 'টিমোথি দি মার্টারে'র দিনে, লোকে বলে ঐ দিনে পরব পড়লে শস্যহানির লক্ষণ দেখা দেয়। পেরিব্রোজ গ্রামটায় গির্জে ছিল, কিন্তু কোন পুরোহিত ছিলেন না, উপবাস-পর্ব বা অন্যান্য বড় বড় পর্বে মাঝে মাঝে যখন উপাসনা করবার প্রয়োজন হত তখন ভলচ্যি গ্রাম থেকে পুরোহিত আসতেন।

সেদিন কি একটা কাজে আমার পাশের শহরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই সকাল আটটায় ঠাণ্ডা থাকতে থাকতেই আমি ঘোড়ায় চড়ে সেখানে রওয়ানা হলাম। এখানে ওখানে যাবার জন্য অনেক আগেই আমি ছয় সাত বছরের ছোট্ট একটা ঘোড়া কিনেছিলাম। ঘোড়াটা স্থানীয় সাধারণ ঘোড়া বটে কিন্তু এর আগেকার মালিক—এক আমিন—এর শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিলেন বেশ। এর নাম ছিল তারানচিক। তারানচিকের পাগুলির গড়ন যেমন সুন্দর, তেমনি তার জোর, সামনের চুলগুলি একেবারে মাথার উপর এসে পড়ত,—তার মাঝ দিয়ে দেখা যেত তার ক্রুদ্ধ দুটি চোখ, সে চোখে যেন অবিশ্বাস ফুটে বেরুত, জোরালো ঠোঁট দুটি সে সব সময়ই চেপে থাকত। বড্ড পছন্দ করতাম আমি ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটার রঙও ছিল অদ্ভুত। সারা গা তার ইঁদুরের গায়ের রঙ, কিন্তু পিছনটায় ছিল সাদা আর কালোর ছিট।

ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় গ্রামের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। দেখলাম—গির্জে আর শুঁড়িখানার মাঝে যে বড় 'স্কোয়ার'টা—তার পাশে লম্বা সার বেঁধে সব চাষীদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। তাতে করে এসেছে ভলোশা, জুলন্যা, পেচালোভ্‌কা প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামের সব চাষী, তাদের বউ আর ছেলেমেয়ে। পরবের জন্য এসেছে তারা। গাড়ির ওখানে বিরাট হট্টগোল। যদিও তখনও সকালবেলা, তা ছাড়া আইনের নিষেধ তবুও এর মধ্যেই মদ খেয়ে লোকে মাতলামি শুরু করে দিয়েছে। (পরবের দিনে এবং রাত্রে শুঁড়ি স্রুলের কাছ থেকে লুকিয়ে ভদকা কেনা যায়)। দিনটায় বাতাসের নামগন্ধ ছিল না,—ভীষণ গুমোট। বায়ু আর্দ্র, দেখে মনে হয় অসহ্য গরম পড়বে। খটখটে আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, সারা আকাশ যেন রুপোলি ধুলোয় ছাওয়া।

শহরে আমার কাজকর্ম সেরে সরাইখানায় ঢুকে ইহুদীদের কায়দায় রাঁধা

সে আমার দুটো হাত ধরে, এ-হাতে একবার, ও-হাতে একবার চুমু দিতে লাগল। তারপর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললে, সোনা, তুমি কত ভাল, কত দয়া তোমার, আমায় তুমি কত ভালবাস, তোমাকে খুশি করতে আমি কি করতে পারি তাই ভাবছিলাম।

ওলেস্যা, লক্ষ্মী, মাণিক আমার, একটু শান্ত হও তুমি।

সে বলে চলল, আমি গির্জেয় গেলে সত্যিই খুশি হও তুমি? ঠিক করে বল, সত্যি করে।

তখনই উত্তর দিতে পারলাম না আমি,—ভাবতে লাগলাম ঃ এতে কোন অমঙ্গল হবে না ত ওর?

কথা বলছ না কেন তুমি? শীগগির করে বল, তুমি এতে খুশি হও, না, ওখানে যাওয়া-না-যাওয়ায় কিছুই তোমার আসে-যায় না?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, এর কি উত্তর দিই, বল? হাঁ, খুশি হই বই কি? পুরুষের কথা স্বতন্ত্র, তারা ইচ্ছা হলে ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে, না বিশ্বাস করতেও পারে, এমন কি ও সব নিয়ে নাক সিঁটকালেও লোকে কিছু মনে করে না, কিন্তু মেয়েদের ধর্ম করা নিতান্ত দরকার। ওরা সরল বিশ্বাস নিয়ে ভগবানের পায়ে শরণ নিচ্ছে দেখলে সত্যিই বড় ভাল লাগে আমার, এও যেন নারীর একটা মাধুর্য, একটা অলঙ্কার।

আমি এইটুকু বলেই থামলাম, ওলেস্যা কোন উত্তর দিলে না, নিজের মাথাটা শুধু আমার বুকের উপর রাখলে।

কিন্তু এ সব জিজ্ঞাসা করছ কেন বল ত?

ওলেস্যা আমার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলে ঃ এমনি জানতে চাইছিলাম আমি। থাক ও সব কথা। এখন আসি। কাল আসতে ভুলো না কিন্তু।

ওলেস্যা চলে গেল। আমি চক্ষুকে পীড়িত করে তার যাওয়া দেখতে লাগলাম, তার পায়ের ক্রমবিলীয়মান শব্দ শুনতে থাকলাম। হঠাৎ এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা বুকটা যেন আমার চেপে ধরতে লাগল। ইচ্ছা করতে লাগল তখনই আমি তার কাছে ছুটে যাই—গিয়ে তাকে বিশেষ মিনতি করে বলি—এমন কি, দরকার হলে জোর করে বলি—সে যেন গির্জেয় না যায়। যাই হক, সে ইচ্ছাটা দমন করলাম আমি, এবং বাড়ি ফিরবার পথে নিজের মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, ভান্যা,—এ কি ব্যাপার, তুমি নিজেই যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলে?

হায় ভগবান, তখন কেন আমি আমার হৃদয়ের সতর্কবাণী শুনিনি? এখন আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি—হৃদয়ের এ সব বাণী কখনও মিথ্যা হয় না।

১২

এর পরের দিন 'ট্রিনিটি সান্‌ডে'। সেবার পরবটা পড়েছিল 'টিমোথি দি মার্টারে'র দিনে, লোকে বলে ঐ দিনে পরব পড়লে শস্যহানির লক্ষণ দেখা দেয়। পেরিব্রোজ গ্রামটায় গির্জে ছিল, কিন্তু কোন পুরোহিত ছিলেন না, উপবাস-পর্ব বা অন্যান্য বড় বড় পর্বে মাঝে মাঝে যখন উপাসনা করবার প্রয়োজন হত তখন ভলাচ্যি গ্রাম থেকে পুরোহিত আসতেন।

সেদিন কি একটা কাজে আমার পাশের শহরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই সকাল আটটায় ঠাণ্ডা থাকতে থাকতেই আমি ঘোড়ায় চড়ে সেখানে রওয়ানা হলাম। এখানে ওখানে যাবার জন্য অনেক আগেই আমি ছয় সাত বছরের ছোট্ট একটা ঘোড়া কিনেছিলাম। ঘোড়াটা স্থানীয় সাধারণ ঘোড়া বটে কিন্তু এর আগেকার মালিক—এক আমিন—এর শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিলেন বেশ। এর নাম ছিল তারানচিক। তারানচিকের পাগুলির গড়ন যেমন সুন্দর, তেমনি তার জোর, সামনের চুলগুলি একেবারে মাথার উপর এসে পড়ত,—তার মাঝ দিয়ে দেখা যেত তার ক্রুদ্ধ দুটি চোখ, সে চোখে যেন অবিশ্বাস ফুটে বেরুত, জোরালো ঠোঁট দুটি সে সব সময়ই চেপে থাকত। বড্ড পছন্দ করতাম আমি ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটার রঙও ছিল অদ্ভুত। সারা গা তার ইঁদুরের গায়ের রঙ, কিন্তু পিছনটায় ছিল সাদা আর কালোর ছিট।

ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় গ্রামের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। দেখলাম—গির্জে আর শুঁড়িখানার মাঝে যে বড় 'স্কোয়ার'টা—তার পাশে লম্বা সার বেঁধে সব চাষীদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। তাতে করে এসেছে ভলোশা, জুলন্যা, পেচালোভ্‌কা প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামের সব চাষী, তাদের বউ আর ছেলেমেয়ে। পরবের জন্য এসেছে তারা। গাড়ির ওখানে বিরাট হট্টগোল। যদিও তখনও সকালবেলা, তা ছাড়া আইনের নিষেধ তবুও এর মধ্যেই মদ খেয়ে লোকে মাতলামি শুরু করে দিয়েছে। (পরবের দিনে এবং রাত্রে শুঁড়ি স্রুলের কাছ থেকে লুকিয়ে ভদকা কেনা যায়)। দিনটায় বাতাসের নামগন্ধ ছিল না,—ভীষণ গুমোট। বায়ু আর্দ্র, দেখে মনে হয় অসহ্য গরম পড়বে। খটখটে আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, সারা আকাশ যেন রুপোলি ধুলোয় ছাওয়া।

শহরে আমার কাজকর্ম সেরে সরাইখানায় ঢুকে ইহুদীদের কায়দায় রাঁধা

খানিকটা মাছের পোলাও আর খানিকটা ঘোলাটে জঘন্য বিয়ার খেয়ে নিলাম, তারপর বাড়ি রওয়ানা হলাম। কামারশালার পাশ দিয়ে আসবার সময়, হঠাৎ মনে পড়ে গেল তারানচিকের সামনের বাঁ পায়ের নালটা কিছুদিন হল ঢিলে হয়ে রয়েছে, ওটা ঠিক করে নেওয়া দরকার। ও কাজ সারতেও ঘণ্টা দেড়েকের মত দেরি হয়ে গেল। সুতরাং যখন আমি পেরিব্রোদে এসে পেঁছিলাম, তখন বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা।

স্কোয়ারটা মাতালের হুল্লোড়ে ভরে উঠেছিল। খরিদ্দারের ঠেলাঠেলি, হুড়ো-হুড়ি চলেছিল সরাইখানার শুধু বারান্দায় নয় তার উঠানে পর্যন্ত; পেরিব্রোদের চাষীদের সঙ্গে এসে মিশছিল আশেপাশের গ্রামের অন্যান্য চাষীরা, গাড়ির ছায়ায় ঘাসের উপরই তারা বসে পড়ছিল। যেদিকে তাকাও দেখবে, মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে সামনে বোতল তুলে ধরছে সবাই। প্রকৃতিস্থ আর কেউই নেই। মাতলামি বাড়তে বাড়তে শেষে এমন একটা পর্যায় এসে পেঁছিছে যখন মাতালেরা নিজেদের মাতলামির বড়াই করতে গিয়ে এমন ভাব দেখায় যে তাদের দেহভার আর তারা বহন করতে পারছে না, প্রতি পদক্ষেপেই দেহ যেন টাল খেয়ে পড়ছে, মাথাটা নোয়াতে গিয়ে হাঁটুটা নুয়ে পড়ছে, উরু নুয়ে পড়ছে, তারপর হঠাৎ এক সময় দেহের ভারসাম্য হারিয়ে নিতান্ত অসহায়ের মত পিছনে চিত হয়ে পড়ছে। ঘোড়াগুলি চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘাস চিবুচ্ছিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের পায়ের কাছে লাফালাফি করছে আর চেঁচাচ্ছে। এর মাঝে কোন কোন জায়গায় দেখা যাচ্ছিল কারও স্ত্রী সুর করে কাঁদতে কাঁদতে গালাগালি দিতে দিতে তার মাতাল স্বামীকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য তার জামার আস্তিন ধরে টানছে,—অথচ সে নিজেও এতটা টেনেছে যে ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একটা বেড়ার ধারের ছায়াতে দেখলাম জনকুড়িক মেয়েপুরুষ এক অন্ধ 'হার্ডি-গার্ডি' বাজিয়ের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। লোকটা বাজনার সঙ্গে দরাজ গলায় গান ধরেছে,—তার কণ্ঠস্বর অন্য সব কলরব ছাড়িয়ে উঠেছে। তার গানের পদ শুনেই বুঝলাম সে আমাদের এক অতি পরিচিত গীতিকাব্য থেকে গাইছে। সে গাইছে—

আরে—ও-ও—সাঁঝের সূর্য্যি যখন নামল পাটে
আঁধার রাত্রি এল জেঁকে।
তুর্কীর দল তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল
কালো মেঘ যেন নরক থেকে॥

গীতিকাব্যে আছে তুর্কীরা পোচায়েব মঠ জোর করে দখল করতে না পেরে শেষে এক কৌশল অবলম্বন করল। তারা মঠে বিরাটকায় একটা মোমবাতি উপহার পাঠালে, ঐ বাতির ভিতর ছিল বারুদ ঠাসা। বারো জোড়া ষাঁড় বহন করে নিয়ে এল ঐ বিরাট বাতিটা, মঠের সন্ন্যাসীরা ত দেখে মহাখুশি। তাঁরা

মঠের দেবী কুমারী মেরীর সামনে জ্বালাবার আয়োজন করতে গেলেন,—কিন্তু ভগবান এ ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। ছড়ায় আছে—

শাস্ত্র-পাঠক তখন দেখলেন স্বপন—
প্রভু তাঁরে করলেন সাবধান।
বললেন,—বাতিটা নিয়ে যাও মাঠে—
তরোয়াল দিয়ে কর খান খান।।
মঠের সন্ন্যাসীরা তখন তাই করলে ঃ
তখন তাঁরা বাতি নিয়ে মাঠে—
আঘাত করলেন বারে বারে।
ভেতর থেকে তাই গোলাগুলি সব—
ছড়িয়ে পড়ল চারিধারে।।

একে গরম বাতাস,—তারপর তার সঙ্গে এসে মিশছিল ভদকা, পেঁয়াজ, ভেড়ার চামড়ার কোট, দেশী কড়া তামাক, আর নোংরা ঘর্মাক্ত নরদেহের বোটকা গন্ধ। প্রাণান্তকর ব্যাপার। অস্থির তারানচিককে কোন রকমে বাগ মানিয়ে অতি কষ্টে জনতার ভিতর দিয়ে আমি আমার যাবার পথ করে নিলাম,—এই সময় ওরা সব যেমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তা বড় সুবিধার মনে হল না, আমার প্রতি সবাই যেন কি একটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে, অথচ তা গোপন করবার প্রয়োজন বোধ করছে না। তা ছাড়া তাদের চোখে মুখে কি যেন এক কৌতূহল। আমায় দেখলে ওরা টুপি খুলত এবং টুপি খুলবারই ওদের কথা, কিন্তু দেখলাম কেউ ওরা এবার টুপি খুললে না, তবে আমায় দেখে চেঁচামেচিটা ওদের একটু কমল মনে হল। হঠাৎ জনতার মাঝখান থেকে মদিরাস্খলিত কর্কশ-কণ্ঠে কে যেন চিৎকার করে কি বলে উঠল, আর সবাই তা শুনে চাপাগলায় হাসলে। একটি স্ত্রীলোক যেন একটু ভয় পেয়ে চিৎকারকারীকে ধমকালে,—থাম না, বোকাটা, শুনে ফেলবে তোর কথা!

লোকটা নির্ভীক কণ্ঠে বললে,—শুনলেই বা, ও কি আমার ওপরওয়ালা না মনিব? বনের মাঝে ওর—

এরপর অতি অশ্লীল কুৎসিত এক মন্তব্য করলে সে,—সঙ্গে সঙ্গে হাসির তুবড়ি ছুটল। তখনই আমি ঘোড়াটা ফিরিয়ে আমার চাবুকের হাতলটা এমন রেগে চেপে ধরলাম, যে রাগ হলে মানুষের হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা ভয় থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মাঝে এক অদ্ভুত চিন্তার উদয় হল ঃ এ সবকিছুই যেন আমার জানা ঘটনা, বহু বহু বছর আগে ঘটে গেছে আমার জীবনে। সেদিনও ঠিক এমনি গরম, বিরাট স্কোয়ারটিতে ঠিক আজকের মতই ভিড়, আর গোলমাল। সেদিনও ঠিক আজকের মত রেগে

ধরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। কিন্তু সে কোথায়?—কখন? চাবুকটা নামিয়ে আমি বাড়ির দিকে ঘোড়া ছোটালাম।

বাড়ি যেতেই য়ারমোলা রান্নাঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল, তারপর রুক্ষ কণ্ঠে বললে, মরিনোবকা থেকে নায়েব মশায় এসে আপনার ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মনে হল এ-ও অপ্রিয় জবর কিছু শোনাতে যাচ্ছে আমাকে, কল্পনা নেত্রে দেখলাম কৃত্রিম ক্রুর হাসির রেখা যেন খেলে যাচ্ছে তার মুখে। ইচ্ছা করেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উদ্ধতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু সে তখন মুখ ফিরিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানছে—ঘোড়াটাও গলা টান করে নিতান্ত অনুগতের মত তার পিছু পিছু চলেছে।

তখন ঘরে গিয়ে দেখি, পাশের তালুক থেকে নিকিতা মিশচেনকো এসেছেন। গায়ে তাঁর বড় বড় পাটকেলি ডোরাকাটা খাটো ধূসর রঙের জ্যাকেট, পরনে সরষে ফুলের মত নীল ট্রাউজার্স, গলায় আগুনে রঙের টাই। পমেড দেওয়া চুলের মাঝখান থেকে সীঁথি কাটা। তার গা থেকে বেরুচ্ছে পারশ্য দেশীয় লাইল্যাকের গন্ধ। আমাকে দেখবামাত্র তিনি চেয়ার থেকে যেন এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন,—মাথা ত নোয়ালেনই না, বরং যেন বড্ড বেশি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তা ছাড়া এমন উৎকট হাসি হাসতে লাগলেন যে, তাঁর দুই দিকের বিশ্রী মাড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল।

এরপর বেশ অমায়িক ভাবে তিনি বলে উঠলেন, নমস্কার, দেখা পেয়ে বড় খুশি হলাম। উৎসবের পরই এখানে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। কতকাল দেখা হয় না আপনার সঙ্গে, তাই ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে যাই। আমাদের ওদিকে যান না কেন—মোটে? মেয়েরা সব আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করছে।

বলেই হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন, হাসিতে তার দম আটকে আসতে লাগল, সে হাসি না থামিয়ে কোন রকমে তিনি বললেন, জানেন,—আজ ভারী এক মজা হয়েছে,—হা, হা, হা, ভাবতে গেলে হাসিতে আমার পাঁজর ভেঙে যাবার যোগাড়।

আমার মনের বিরক্তি কোন রকম লুকানোর চেষ্টা না করে রুক্ষ স্বরে আমি বললাম, -কি বলতে চাইছেন আপনি, মজার ব্যাপার কি হল?

হাসির চোটে কথাগুলি তিনি একটানা বলতে পারছিলেন না,—তাই থেমে থেকে বললেন, উৎসবের পরে এখানে এক বিরাট হৈ-চৈ।...পেরিব্রোদের কতক-গুলি মেয়ে...না,—আর পারলাম না আমি...পেরিব্রোদের কতকগুলি মেয়ে—এই স্কোয়ারটার এখানে এক ডাইনীকে পাকড়াও করে। ডাইনী—মানে, ওরা তাকে ডাইনী বলে জানে,—অজ্ঞ গাঁয়ের মেয়ে ত সব! তাই খুব পেছনে লেগেছিল তার, তার গায়ে আলকাতরা মাখাতে যাচ্ছিল, এমন সময় সে কি করে কেটে পড়ল।

শুনেই হঠাৎ ভীষণ এক আশঙ্কা জেগে উঠল আমার মনে, আমি উদ্বেগে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে লোকটার কাঁধটা আচ্ছা করে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে গর্জে উঠলাম,—কি বলছেন আপনি? হাসি থামান, কোন ডাইনীর কথা বলছেন?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাসি থেমে গেল,—ভয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে তোতলার মত তিনি বললেন,—আ—আ মি ঠিক জানি না, স্যার। তার নাম বোধ হয়—সামুইলিখা কি ম্যানুইলিখা...দাঁড়ান—হাঁ,—খুব সম্ভব ম্যানুইলিখা নামে কোন ডাইনীর মেয়ে সে। মুজিকেরা ওর কথা বলাবলি করছিল, ওরা কি বলছিল—সত্যি বলছি আমি তা ভুলে গেছি।

তিনি যা দেখেছেন যা শুনেছেন—সব গোড়া থেকে বলতে তাঁকে বাধ্য করলাম। তিনি কখনও আনাড়ির মত খাপছাড়া কথা বলতে লাগলেন কখনও এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে ফেলতে লাগলেন, সুতরাং বার বার প্রশ্ন করতে হচ্ছিল, প্রতি মুহূর্তে তাঁকে ধমক দিতে হচ্ছিল আমার, শুধু গালাগালি দিতে বাকি রাখছিলাম। এ সব সত্ত্বেও আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা গেল না তাঁর কাছ থেকে। এর প্রায় দুই মাস পরে বন দারোগার স্ত্রীর কাছে থেকে শুনবার পর সব কিছু আমার বোধগম্য হল—উনি ও দিনের উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন।

ওঁর কথা শুনে বুঝলাম আগে থেকে যে আশঙ্কার কথা আমার মনে আসছিল, তাই ঘটেছিল সেদিন। ওলেস্যা তার মন থেকে সর্ব ভয় বিসর্জন দিয়ে সেদিন গির্জেয় গিয়েছিল। সে যখন ওখানে হাজির হয় তখন উৎসব অর্ধেক হয়ে গিয়েছে, ভিতরে ঢুকে ও পিছনে গিয়ে বসলো আশেপাশে যে সব চাষী বসেছিল, তারা সবাই তার দিকে তাকিয়ে দেখলে। উপাসনার সময় মেয়েরা সব পিছন ফিরে তার দিকে তাকাতে লাগল আর ফিস্ ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে লাগল।

ওলেস্যা তবুও উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত সাহস করে গির্জেয়ই রয়ে গেল। ওদের ঐ রকমের চাওয়ার অর্থ যে কি তা হয়ত সে বুঝতে পারেনি, অথবা একবার গিয়ে ওদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া তার আত্মসম্মানে বেধেছে। পরে গির্জে থেকে যখন সে বেরিয়ে এল তখন বেড়ার ধারে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাকে ঘিরে দাঁড়াল, প্রতি মুহূর্তে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং তারা ক্রমেই তার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথমে তারা ওলেস্যার দিকে একদৃষ্টে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল, ওলেস্যাও নিজেকে অসহায় মনে করে চারিদিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল। এর পরই তার উদ্দেশ্যে শুরু হল নানা রকম জঘন্য ঠাট্টাবিদ্রূপ, গা-জ্বালানি কথা, গালাগালি, সঙ্গে সঙ্গে হাসি, শেষে এ সবকিছু একসঙ্গে মিলে কর্ণভেদী এক বিরামহীন চিৎকারে পরিণত হল। স্ত্রীলোকেরা তখন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওলেস্যা কয়েকবার এই জীবন্ত মানুষের বেষ্টনী ভেদ করবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু প্রতিবারেই ওরা তাকে ধাক্কা মেরে মাঝখানে ঠেলে দিলে। হঠাৎ এক বুড়ি জনতার পিছন থেকে চিৎকার করে

বলে উঠলে,—ঐ বেহায়া মেয়েটাকে আলকাতরা মাখিয়ে দে। (উক্রেইনে যে বাড়িতে কোন মেয়ে থাকে তার গেটে আলকাতরা মাখানোও মেয়েটির পক্ষে এক দুরপনেয় কলঙ্ক)। বুড়ী এই বলতে না বলতে এক ভাঁড় আলকাতরা আর একটা বুরুশ এসে গেল, এবং উত্তেজিত মেয়েরা তা তাদের মাথার উপর দিয়ে হাতে হাতে চালান করে দিতে লাগল।

ওলেস্যা তখন ক্রোধ, ভয় আর নৈরাশ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের একজনকে এমন জোরে আঘাত করলে যে, সে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। এরপর তার সঙ্গে শুরু হল হাতাহাতি,—মারামারি,—কয়েক ডজন স্ত্রীলোক একসঙ্গে তাকে নিয়ে পড়ল, চলল তুমুল হট্টগোল। ওলেস্যা অনেক কষ্টে কৌশলে এই ব্যূহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথে ছুটতে লাগল, তখন তার মাথার রুমাল গেছে কোথায় উড়ে, জামা কাপড় ছিঁড়ে দেহের অনেক স্থান অনাবৃত হয়ে পড়েছে। জনতা তখন তাকে গালাগালি দিচ্ছে, তার উদ্দেশ্যে হাসছে, অদ্ভুত শব্দ করছে, ঢিল ছুড়ছে। তার পিছনে ছুটছে মাত্র কয়েকজন। কিছুক্ষণ পরে তারাও পিছিয়ে পড়ল। জনতা থেকে পঞ্চাশ ফুটের মত গিয়ে ওলেস্যা হঠাৎ থেমে ফিরে দাঁড়াল। সারা মুখে তার তখন আঁচড়ের দাগ,—রক্ত ঝরছে মুখ থেকে,—বিবর্ণ। সেই মুখে সে জনতার দিকে ফিরে স্কোয়ারের সকল লোক শুনতে পায় এমন উচ্চ কণ্ঠে বললে,—আচ্ছা, তোমরাও এর মজা টের পাবে,—কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে তোমাদের।

প্রত্যক্ষদর্শিনীর মুখে শুনলাম,—ওলেস্যা এই কথাগুলি এমন নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে এমন দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিল,—আর বলবার সময় এমন ভবিষ্যদ্বাণীর মত শুনিয়েছিল যে, সমস্ত জনতা ভয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই আবার তারা নতুন করে তাকে গালি দিতে শুরু করলে।

এ ঘটনার প্রায় সব কথাই অবশ্য আমার পরে শোনা। মিশচেনকোর দেওয়া বিবরণ শেষ পর্যন্ত শোনবার মত ধৈর্য এবং সামর্থ্য কিছুই আমার ছিল না। ওর কথা শেষ অবধি না শুনে কোন কিছু না বলে আমি উঠানে বেরিয়ে এলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম য়ারমোলা হয়ত তখনও ঘোড়ার জিন খোলেনি। সত্যিই তাই, বাইরে এসে দেখি সে তখন তারানচিককে বেড়ার ধারে নিয়ে এদিকে ওদিকে হাঁটিয়ে ঠাণ্ডা করছে। আমি তখনই তার লাগাম লাগিয়ে জিনের পেটি ভাল করে এ'টে ঘুরো পথে ছোটালাম বনের দিকে, সিধে পথে মাতাল জনতার ভিতর দিয়ে আর যাবার ইচ্ছা ছিল না আমার।

১৩

ভীষণ জোরে ঘোড়া ছোটাচ্ছিলাম আমি, আর তখন যা আমার মনের অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি ঘোড়া ছ্বটিয়ে কোথায় চলেছি কেন যাচ্ছি, কিছ্বই মনে ছিল না আমার, শ্বধ্ব এইটুকু আবছা আবছা মনে হচ্ছিল যে, উদ্ভট ভয়ঙ্কর একটা কিছ্ব ঘটে গেছে, একটা অপ্বরণীয় ক্ষতি,—লোকে বিকারের ঘোরে যেমন দ্বঃস্বপ্ন দেখে, কারণহীন গভীর উদ্বেগে যেমন দমটা বন্ধ হয়ে আসতে চায় ঠিক তেমনি একটা অন্বভূতি জাগছিল আমার মনে। তা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত অন্বভূতিও হচ্ছিল ঃ ঘোড়ার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে সেই অন্ধ হার্ডিগার্ডি বাজিয়ে যেন দ্বর থেকে ভাঙা গলায় গেয়ে চলেছে—

আরে—ও-ও—সাঁঝের স্বয্যি যখন নামল পাটে
আঁধার রাত্রি এল জে'কে।

যে সংকীর্ণ পথটা সোজা ম্যান্বইলিখার কুটীরের সামনে গিয়ে থেমেছে সেখানে এসে তারানচিকের উপর থেকে নেমে তার লাগাম ধরে নিয়ে চললাম। জিনের নিচের কাপড়ের প্রান্তদেশ এবং ওর দেহের যে যে অংশ সাজে ঢাকা পড়েছিল সে সব জায়গা ঘামে ভিজে জবজব করছিল। একে ত ভয়ঙ্কর গরম তাতে ভীষণ জোরে ঘোড়া ছ্বটিয়ে এসেছিলাম, তাই মাথার মধ্যে আমার রক্তের চাপ এত বেড়ে উঠেছিল যে, মনে হচ্ছিল কে যেন মস্ত বড় এক পিচকারি দিয়ে নিষ্ঠুরের মত অবিরাম রক্ত ছ্বঁড়ছে সেখানে।

ঘোড়াটা বেড়ার গায়ে বে'ধে রেখে আমি ওলেস্যাদের কুটীরে ঢুকলাম। প্রথমে মনে হল, ওলেস্যা বাড়িতে নেই, ভয়ে আমি একেবারে আধমরা হয়ে গেলাম, কিন্তু প্রায় তখনই দেখলাম সে বিছানায় শ্বয়ে, ম্বখখানা তার দেয়ালের দিকে ফেরানো, মাথাটা বালিশের মাঝে একেবারে ডুবে গেছে। আমার দরজা খোলার শব্দ শ্বনে সে একবার মাথাটা ফিরালেও না।

ম্যান্বইলিখা বিছানার পাশে মেঝেয় বসেছিল, আমাকে দেখে সে একবার উঠবার চেষ্টা করে হাত নেড়ে অন্বচ্চ কণ্ঠে বললে, চুপ, আস্তে। তারপর সে আমার কাছে এগিয়ে এসে তার জ্যোতিহীন বিবর্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধস্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, তোমার জন্য আমাদের কি অবস্থা হল, একবার দেখ!

আমি র্বক্ষ স্বরেই উত্তর দিলাম, দেখ, ঠাকুমা,—কার কি দোষ তা নিয়ে ঝগড়া করবার সময় এ নয়; ওলেস্যা কেমন আছে, তাই বল।

চুপ, আস্তে আস্তে। ও এখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তোমার জন্যই ত

এ হল। তুমি যদি অনধিকার চর্চা করতে না যেতে, মেয়েটির মাথায় যা তা হাবিজাবি না ঢোকাতে, তা হলে এ সব ঘটতই না। আর আমিও যেমন, এ সব দেখেও দেখিনি। আমি জানতাম—বিপদ আসছে, যেদিন তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছ, সেই দিন থেকেই বুঝেছি আমি। হঠাৎ ঘৃণায় সারা মুখ তার বিকৃত হয়ে উঠল, উত্তেজিত হয়ে সে বলতে লাগল, আচ্ছা, ঠিক করে বল ত, তুমিই তাকে গির্জেয় যাবার কথা বলনি? মিছে কথা বলবে না, নির্লজ্জ ইতর, তুমিই তাকে গির্জেয় যেতে বাধ্য করনি? কথা ঘুরিয়ে বলতে চেষ্টা করবে না,—সোজাসুজি উত্তর দাও।

আমি তাকে যেতে বলিনি, বিশ্বাস করো আমার কথা, ঠাকুমা, আমি বলিনি, সে নিজেই গিয়েছে।

হায় ভগবান,—যন্ত্রণায় হাত দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে ম্যানুইলিখা বলতে লাগল, যখন সে ফিরে এল, তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না, ব্লাউজ ছিঁড়ে গেছে, রুমাল উড়ে গেছে,—সে কি দৃশ্য! সে সবকিছু বলতে গিয়ে একবার হাসে, একবার কাঁদে, মনে হল সে পাগল হয়ে গেছে। তারপর বিছানায় শুয়ে সে কেবলি কাঁদতে লাগল। তারপর যেন একটু তন্দ্রার মত এল তার। আমি যেমন বোকা, ভাবলাম ঘুমুলেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে। দেখলাম, হাতটা ওর ঝুলে পড়েছে, ভাবলাম হাতটা ঠিক করে দি, নইলে অবশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হাতটা ছুঁয়েই দেখি—একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। সোনার আমার জ্বর হয়েছে। তারপর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সে ঝড়ের মত বকে গিয়েছে,—ভাবলে বুক ফেটে যায়। এই একটু আগে সে চুপ করলে। দেখ, তুমি তার কি অবস্থা করেছ, কি করেছ তুমি, দেখ,—বলেই বুড়ি আবার নতুন করে কাঁদতে শুরু করলে।

কাঁদতে গিয়ে হঠাৎ তার তামাটে মুখখানা এমন বিকৃত হয়ে উঠল যে, দেখলে ভয় হয় ঃ তার ঠোঁট দুটো কোণের দিকে পড়ল ঝুলে, মুখের পেশীগুলিতে টান পড়ে কাঁপতে লাগল, ভ্রূদুটি উপরে উঠে গেল, কপালে পড়ল খাঁজ, চোখ থেকে দ্রুত গড়িয়ে পড়তে লাগল বড় বড় জলের ফোঁটা। কনুই দুটো টেবিলের উপর রেখে দুই হাতে মাথা ধরে সে যন্ত্রণায় দুলে দুলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,—আমার সোনামণি, আমার লক্ষ্মী দিদিমণি,—আমি এখন কি করি!

আমি তাকে রূঢ়স্বরে ধমক দিয়ে বললাম,—চুপ করো না—! কান্না থামাও, ও জেগে যাবে যে!

বুড়ি চুপ করল বটে, কিন্তু মুখের ভঙ্গি তার তেমনি বিকৃত হয়েই রইল,—যন্ত্রণায় তেমনি করেই সে দুলতে লাগল, আর বড় বড় জলের ফোঁটা তখনও তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে টেবিলের উপর পড়তে লাগল। এমনি করে প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। আমি গভীর উদ্বেগ নিয়ে ম্যানুইলিখার পাশে বসে একটা মাছি জানলার কাঁচের গায়ে বার বার ধাক্কা মেরে একটানা ভন ভন করে যাচ্ছিল তাই শুনতে লাগলাম।

দিদিমা! হঠাৎ ওলেস্যার অনুচ্চ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কানে এল আমাদের,—দিদিমা, কে কথা বলে?

ম্যানুইলিখা টলতে টলতে দ্রুত তার বিছানার কাছে গিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করলেঃ ও, সোনামণি, মাণিক রে আমার, আমার কি হল রে, আমি এখন কি করি?

দিদিমা, চুপ কর, পায়ে পড়ি তোমার,—চুপ কর: আমাদের ঘরে কে এসেছে? অতি করুণ কণ্ঠে মিনতি করে ওলেস্যা বললে এ কথাগুলি, বেশ বুঝা গেল কথা বলতে তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।

আমি পা টিপে টিপে তার বিছানার কাছে গেলাম, আমি নিজে সুস্থ, সে অসুস্থ, সুস্থ লোকের অসুস্থের কাছে যাবার সময় যে এক অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে তাই জাগছিল আমার মনেঃ এক বিশেষ ধরনের অপরাধ বোধ।

ওলেস্যার কাছে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম. ওলেস্যা. আমি এসেছি, গ্রাম থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এই এলাম আমি। সারা সকালটা আমার শহরে কেটেছে। খুব খারাপ লাগছে, ওলেস্যা?

বালিশ থেকে মুখ না ফিরিয়েই তার অনাবৃত বাহুটা সে বাড়িয়ে দিল,—কি যেন হাতড়ে পেতে চায় সে। তার অভিলাষ বুঝে দুই হাতে আমি তার উত্তপ্ত হাতটা জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম তার নরম ফরসা হাতের দুই জায়গায় বড় বড় দুটো কালশিরে পড়ে গেছে,—একটা কব্জীর উপরে, আর একটা কনুইয়ের উপর।

ওলেস্যা ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বললে, সোনা. মানিক আমার, তোমাকে এত দেখতে ইচ্ছা করছে আমার,—কিন্তু পারছি না। ওরা আমার মুখখানা একেবারে কদাকার করে দিয়েছে। মনে পড়ে,—আমার মুখখানা তোমার ভাল লাগত? হাঁ, সোনা, ভাল লাগত তোমার, আমি জানি। আর তাতে কত খুশি বোধ করতাম আমি।...কিন্তু এখন আমার মুখ দেখে তোমার বিশ্রী লাগবে, তাই এ মুখ আর আমি তোমায় দেখাতে চাই না।

আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম,—ওলেস্যা, আমায় তুমি ক্ষমা কর।

ওলেস্যা তার উত্তপ্ত হাতে অনেকক্ষণ আমার হাত নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রেখে বললে, এ কি বলছ তুমি, মানিক আমার? লজ্জা করছে না তোমার এ বলতে? দোষ কি তোমার না কি? বোকার মত আমিই এ সব করতে গেছি। কেন যে করতে গেলাম!...না, সোনা, নিজেকে দোষী বলে ভেব না তুমি।

ওলেস্যা, একটা কথা,—হাঁ প্রথমে কথা দাও. আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে।

তোমার যে-কোন কথাই আমি রাখব সোনা।

তা হলে ডাক্তার ডাকতে দাও আমায়. আমি মিনতি করছি তোমার কাছে। ডাক্তার যা করতে বলেন, তা তুমি না করতে চাও না করো—শুধু ডাক্তার আনতে দাও আমায়।...ওলেস্যা?

ও সোনা, কি রকম ফাঁদে ফেললে আমায় তুমি! না, লক্ষ্মী, তুমি আমায়

প্রতিশ্রুতি ভাঙতে অনুমতি দাও। আমি যদি সত্যি সত্যি অসুখ করে মরতে বসি তবুও ডাক্তারকে আসতে দেব না আমার কাছে। আর এ ত সত্যি সত্যি অসুখ করেনি আমার, আমি শুধু ভয় পেয়ে গেছি, এর বেশি কিছু নয়। আজ রাত্রের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব। আর যদি না হই তাহলে—দিদিমাই আমাকে যা হয় কিছু একটা দেবে,—হয় এখানকার পদ্মের ক্বাথ, না হয় র‍্যাজ্‌পবেরী দিয়ে চা। ডাক্তার ডাকতে যাব কেন? তুমিই আমার বড় ডাক্তার। তুমি এখন এখানে আছ তাই আমি কত ভাল বোধ করছি। কেবল একটা কষ্ট হচ্ছে মনে ঃ তোমায় আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করছে,—কিন্তু পারছি না, ভয় করছে।

পরম স্নেহে অতি সন্তর্পণে বালিশ থেকে তার মাথাটা আমি তুলে ধরলাম। সারা মুখখানা তার জ্বরে রাঙা হয়ে উঠেছে, কালো চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে, শুকনো ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কপাল আর চোখের নিচে রয়েছে আঘাতের কালো দাগ।

নিজের হাতে আমার চোখ দুটো বন্ধ করবার চেষ্টা করে বহু মিনতি করে সে বললে, দোহাই তোমার, তুমি চেয়ো না আমার মুখের দিকে, আমি এখন কুৎসিত।

অনুকম্পায় বুকটা আমার ভরে উঠল। কম্বলের উপর তার হাতটা অনড় অবস্থায় পড়েছিল, সেটা তুলে ধরে তাতে আমার ওষ্ঠাধার স্পর্শ করলাম, ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে চুমু দিলাম হাতটায়। এর আগেও আমি তার হাতে চুমু দিয়েছি, তখন চুমু দিতে গেলেই লজ্জা পেয়ে হাতটা সে টেনে নিত, এবার আমার আদর করায় বাধা ত দিলেই না, বরং অপর হাতে আমার মাথায় ধীরে ধীরে চাপড় দিতে লাগল।

অতি অনুচ্চকণ্ঠে সে বললে,—সব শুনেছ তুমি?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানালাম,—হাঁ। মিশচেন্‌কো যে মাথামুণ্ডু কি সব আমায় বলেছে তার কিছুই বুঝতে পারিনি আমি, তবু ওলেস্যার কাছে শুনতে গেলে, সকালের ঐ সব ব্যাপারের কথা মনে পড়ে সে আবার নতুন করে পীড়িত বোধ করবে ভেবে আমি তার কাছে আর কিছু শুনতে চাইলাম না। তবু ওরা যে ওলেস্যার প্রতি অত্যাচার করেছে সেই কথা ভেবেই আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। হঠাৎ সিধে হয়ে বসে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আমি বলে উঠলাম,—থাকতাম আমি সেখানে, তা হলে—

ওলেস্যা অতি শান্তকণ্ঠে বললে,—ছি, অমন উত্তেজিত হতে নেই। ও সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। রাগ করে না।

কান্নায় দমটা আমার আটকে আসছিল, এতক্ষণ পর্যন্ত কোনরকমে চোখের জল চেপে রেখেছিলাম আমি, আর পারলাম না। ওলেস্যার কাঁধের উপর মুখটা রেখে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম, সারা শরীর আমার থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এ কি কাঁদছ তুমি?—বলে উঠল ওলেস্যা। কণ্ঠে তার বিস্ময়, স্নেহ আর

অনুকম্পার সুর : কাঁদে না, লক্ষ্মীটি, নিজেকে এত যন্ত্রণা দিতে নেই। তুমি কাছে থাকলেই কত সুখী বোধ করি আমি। দুজনে যখন একসঙ্গে থাকতে পাই, তখন কেঁদ না। শেষের এই কটা দিন যদি একটু খুশিতে কাটাতে পারি, তা হলে বিদায় নেওয়া আমাদের তেমন কষ্টকর হবে না।

বিস্ময়ে চমকে উঠলাম আমি, মাথাটা উঁচু করলাম। একটা অজানা আতঙ্কে বুকটা যেন আমার অবশ হয়ে এল :

শেষের কটা দিন?—তুমি এ কি বলছ, ওলেস্যা? আমাদের বিদায় নেবার কথাই বা আসে কোত্থেকে, ছাড়াছাড়ি হবে কেন আমাদের?

আমার কথা শুনে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করলে ওলেস্যা, কিছুক্ষণ কোন কথাই বললে না। তারপর অতি দৃঢ়কণ্ঠে সে বললে, ছাড়াছাড়ি আমাদের হতেই হবে, ভান্যা। আমি একটু সুস্থ হলেই আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আর আমাদের এখানে থাকা চলবে না।

ভয় পাচ্ছ কিছুতে?

না, সোনা, ভয় পাই না আমি কিছুতে। কিন্তু মিছিমিছি লোকগুলিকে অপরাধজনক কাজে প্রবৃত্ত করানোই বা কেন? তুমি হয় ত সব শোননি। পেরিব্রোদে আমি ওদের শাসিয়ে এসেছি,—এত রাগ হয়েছিল আমার—আর এত লজ্জা যে এ না করে পারিনি। এরপর যা কিছু ঘটবে তার জন্যই ওরা আমাদের দায়ী করবে, সে গরুঘোড়াই মরুক, আগুনই লাগুক, যাই হোক—আমাদের দোষ দেবে ওরা। এরপর কণ্ঠস্বর একটু উঁচু করে সে ম্যানুইলিখার উদ্দেশ্যে বললে, কি, ঠিক বলিনি,—দিদিমা?

ম্যানুইলিখা কানে হাত রেখে কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বললে,—কি বলছিস তুই, বুঝছি না আমি।

আমি বলছিলাম,—এরপর পেরিব্রোদে যা কিছু মন্দই ঘটুক না কেন, আমাদের দোষ দেবে।

দেবেই ত। যা ঘটবে তার জন্যই আমাদের দুষবে। ওরা আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে দেবে না, ঘর থেকে বেরুতে দেবে না, এ সব করবেই ঐ সব হতভাগা-হতভাগীর দল। সেবার কি হল, যেবার ওরা আমায় গ্রাম থেকে তাড়ালে? রাগে পড়ে এক হতভাগীকে আমি শাসিয়েছিলাম,—তারপরই তার বাচ্চা ছেলেটা মারা গেল। ভগবান জানেন, এই মরার সঙ্গে আমার শাসানির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু হলে হবে কি? তারা আমায় প্রায় মেরে ফেলার যোগাড় করলে, হতভাগারা। আমি দৌড়ে পালাতে গেলাম ত ওরা আমার দিকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল,—তুই তখন খুব ছোট,—তোকে কোন রকমে আগলে রাখবার চেষ্টা করলাম আমি। ভাবলাম,—আমাকে মারতে চায় ওরা মারুক কিন্তু একটা নির্দোষ, নিষ্পাপ শিশুকে আঘাত করতে দেব কেন ওদের। ওরা অসভ্য বর্বর, অধার্মিক, ওদের ফাঁসিকাঠে ঝুলানো উচিত।

আমি বললাম, কিন্তু তোমরা যাবে কোথায়, আত্মীয়স্বজন তোমাদের কেউ কোথাও নেই, তা ছাড়া নতুন জায়গায় বসবাস করতে গেলে টাকাও ত চাই তোমাদের!

ওলেস্যা আমার কথার তেমন কোন মূল্য না দিয়ে বললে, সে কোন রকমে চালিয়ে নেব আমরা। দিদিমার কিছু টাকা পোঁতা আছে,—সেটা বের করে নিলেই চলবে।

ম্যানুইলিখা চটে গিয়ে বিছানা থেকে সরে গিয়ে বললে,—কি বলছিস তুই,— সে কি টাকা নাকি? সে তো চোখের জলে ভেজা কয়েকটা খুদে খুদে কোপেক!

নিতান্ত ব্যথিত হয়ে ওলেস্যাকে তিরস্কার করে বললাম,—আর আমার দশা কি হবে? সে কথা তুমি একবার ভাবছ না, ওলেস্যা!

আমার কথা শুনে উঠে বসলে ওলেস্যা এবং ম্যানুইলিখা সেখানে থাকলেও তাতে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে সে আমার মাথাটা দুই হাতে টেনে নিয়ে কয়েকবার আমার গালে আর কপালে চুমু দিলে।

সোনা, তোমার কথা আমি সবচেয়েও বেশি করে ভাবছি। কিন্তু একসঙ্গে থাকা আমাদের ভাগ্যে নেই। তোমার জন্য আমি একবার তাস বিছিয়েছিলাম,— মনে পড়ে তোমার? ঐ তাসের গণনায় যা যা পেয়েছিলাম, তার সব কিছুই এ পর্যন্ত ফলে গেছে। এর অর্থ হচ্ছে—ভাগ্য আমাদের নির্দিষ্ট হয়েই আছে : আমরা দুজন একসঙ্গে সুখে বাস করতে পারব না। এ না হলে, তুমি কি মনে কর,—আর কিছুতে আমি ভয় পেতাম?

আমি অধীরভাবে বলে উঠলাম, আবার সেই ভাগ্যের কথা? আমি এ সবে কিছুমাত্র বিশ্বাস কোনদিন করিনি, করবও না।

ওলেস্যা ভয় পেয়ে আস্তে আস্তে বললে, না, না, এ সব কথা বলতে নেই। ভয় পাই আমি তোমার জন্যে, আমার জন্যে নয়। এ সব কথা নিয়ে আর আলোচনা করো না, লক্ষ্মীটি।

ওলেস্যার কাছে ভবিষ্যতের এমন এক নিরঙ্কুশ সুখের চিত্র উপস্থাপিত করলাম আমি,—সে সুখ ভাগ্যই বল আর বর্বর নিষ্ঠুর মানুষের দলই বল—কেউই কোনদিন বিঘ্নিত করতে পারবে না, কিন্তু কিছুতেই তার মত পরিবর্তিত করতে পারলাম না। সে আমার হাতে চুমু দিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে শুধু বলতে লাগল, না, না, তা হয় না, আমি জানি, দুঃখ পাওয়া ছাড়া এতে আর কিছুই লাভ হবে না।

ওলেস্যার কুসংস্কার আর একগুঁয়েমির কাছে হার মানতে হল আমার,—এখন কি করব দিশে না পেয়ে অবশেষে তাকে বললাম,—কবে তোমরা যাচ্ছ, অন্তত তাই আমায় বলো!

শুনে সে কি যেন একটু ভাবলে,—মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। উত্তরে সে বললে,—একটি গল্প শোনাচ্ছি তোমায়।

একদিন এক নেকড়ে বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে এমন সময় দেখে এক

খরগোশ। খরগোশকে দেখেই সে বললে, আমি তোকে খাব,—এখনই। খরগোশ অনেক অনুনয়-বিনয় করে বললে, আমায় দয়া কর, বাঁচতে চাই আমি, বাসায় আমার বাচ্চারা আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে,—আমায় বাঁচতে দাও। নেকড়ে তার কথা কিছুতেই শুনতে চায় না। তখন খরগোশ বললে,—বেশ তা হলে অন্তত তিনটি দিন আমায় বাঁচতে দাও,—তাতে মৃত্যুটা আমার একটু সহজ হবে। এই কথা শুনে নেকড়ে তিনটে দিন তাকে বাঁচতে দিলে,—একটু শুধু চোখে চোখে রাখলে। এক দিন কেটে গেল,—দুই দিন,—তারপর তৃতীয় দিন এল। নেকড়ে খরগোশকে বললে,—এইবার প্রস্তুত হ,—এইবার আমি তোকে খেতে যাচ্ছি। খরগোশ তখন করুণ সুরে কান্না জুড়ে দিলে, তুমি আমায় তিন দিন বাঁচতে দিলে কেন? আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই খেয়ে ফেললে না কেন আমায়? এই তিনদিন মৃত্যুর চেয়েও কষ্টে কেটেছে আমার। খরগোশ ঠিক কথাই বলেছিল, তাই না?

আসন্ন বিদায়ের চিন্তায় আমি তখন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম,—ওলেস্যার কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। ওলেস্যা হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা ভান্যা, আমার সঙ্গে যতটা সময় কাটিয়েছ, সুখী হয়েছ তুমি? বল, উত্তর দাও।

এ কি তোমার জিজ্ঞাসা করবার কোন প্রয়োজন ছিল, ওলেস্যা?

রসো, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে কোনদিন অনুতাপ করতে হয়েছে তোমার? আমার কাছে থাকবার সময় অন্য কোন নারীর কথা ভেবেছ তুমি মনে?

এক সেকেণ্ডের জন্যও নয়। শুধু তোমার কাছে থাকবার সময় নয়, আমি একা একা থাকবার সময়ও তোমাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়ের কথা আমার মনে আসেনি।

কোনদিন ঈর্ষার কারণ ঘটেছে তোমার মনে? কোনদিন অসন্তুষ্ট হয়েছ তুমি আমার ব্যবহারে? আমার কাছে থাকবার সময় কোনরকম বিরক্তির কারণ ঘটেছে?

না, ওলেস্যা, কোনদিন না।

ওলেস্যা তার দুটো হাত আমার কাঁধের উপর রেখে গভীর প্রেমের দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, সোনা, তা হলে আমার কথা ভেবে কোনদিন তুমি দুঃখ পাবে না। কথাগুলি সে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে লাগল যে, মনে হয় সে আমার চোখ দেখে আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করছে ঃ আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার পর প্রথম প্রথম কিছুদিন তুমি অসুখী বোধ করবে,—খুবই অসুখী,—তুমি অবিরত চোখের জল ফেলবে, একটুও শান্তি পাবে না মনে। তারপর ধীরে ধীরে এ অবস্থা কেটে যাবে, আমার কথা ভাবতে গেলে আর দুঃখ থাকবে না মনে, হৃদয় ভরে উঠবে শুধু সহজ আনন্দে।

এই বলে সে তার মাথাটা আবার বালিশে রাখলে। ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, এইবার তুমি বাড়ি যাও, সোনা, আমি একটু ক্লান্ত বোধ করছি। দাঁড়াও,—একটি

চুমু দিয়ে যাও আমায়,—দিদিমাকে দেখে সঙ্কোচের কারণ নেই—কিছু মনে করবেন না উনি।...তুমি এতে কিছু মনে করো না, দিদিমা,—করবে?

ম্যানুইলিখা একটু যেন অসন্তোষের সঙ্গে বললে,—ঠিক আছে, ঠিক আছে,—যথারীতি বিদায় নাও তোমরা। আমার কাছে লুকোবার কি আছে? আমি এ অনেকদিন থেকেই জানি।

ওলেস্যা আঙুল দিয়ে তার চোখ, গাল আর মুখ দেখিয়ে বললে, এই এই-খানে চুমু দাও।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, ওলেস্যা তুমি আমার কাছ থেকে এমন করে বিদায় নিচ্ছ যেন আর আমাদের দেখা হবে না!

কি জানি সোনা, কিছুই জানি না আমি।...এবার শান্ত মনে বাড়ি যাও। না, আর এক সেকেণ্ড দাঁড়াও।...কানটা এগিয়ে আনো আমার কাছে।...আমার দুঃখ কোথায় জানো?—ঠোঁট দুটো আমার গালে ছুঁইয়ে সে বললে, দুঃখ আমার, তোমার কোন খোকন পেলাম না আমি, পেলে কি সুখীই যে আমি হতাম!

আমি ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ম্যানুইলিখা আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। একখানা বড় কালো মেঘ প্রায় অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, ওর চতুর্প্রান্ত যেন স্পষ্ট কুঞ্চিত ঝালর; সূর্য অস্তাচলে যাবার আগে তখনও কিরণ দিচ্ছে। এই আলো আর আগতপ্রায় অন্ধকারের সংমিশ্রণ যেন কি এক অশুভের ইঙ্গিত বহন করছে। ম্যানুইলিখা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে একবার উপরের দিকে তাকালে তারপর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মাথা দুলিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, আজ পেরিব্রোদের ওদিকে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হবে,—কি জানি—ভগবান না করুন, হয়ত শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।

১৪

আমি পেরিব্রোদে প্রায় পৌঁছে গেছি এমন সময় হঠাৎ এক ঘূর্ণি হাওয়া রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে রাস্তার উপর পাক-খাইয়ে দিলে। বড় বড় ভারী ভারী কয়েক ফোঁটা জলও মাটিতে পড়ল।

ম্যানুইলিখা ঠিকই বলেছিল। সারাদিন অসহ্য গরম পড়ে যে ঝড়ো মেঘ জমাট বাঁধছিল আকাশে, এবার পেরিব্রোদের উপর তা যেন মহা বিক্রমে ভেঙে পড়ল। প্রতি মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, বজ্রনাদে আমার ঘরের জানলার কাঁচ কম্পিত, প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রাত্রি আটটার কাছাকাছি ঝড়টা কয়েক

মিনিটের জন্য থেমে আবার নবোদ্যমে তান্ডবলীলা শুরু করলে। হঠাৎ ছাদের উপর এবং জীর্ণ বাড়িটার দেয়ালের গায়ে কানে তালা-লাগানো বাজনা শুরু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি আখরোটের মত বড় বড় শিলের ঢেলা আকাশ থেকে ক্ষিপ্রগতিতে নেমে মাটিতে পড়ে ছিটকে যাচ্ছে। বাড়ির কছেই একটা তুঁত গাছ ছিল তার দিকে তাকিয়ে দেখি—শিলে এর মাঝেই তার পাতাগুলি ছিন্ন করে ন্যাড়া করে দিয়েছে। জানলার নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে য়ারমোলা; সে তার কোট দিয়ে মাথা আর কাঁধ ঢেকে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছে খড়খড়ি বন্ধ করবার আগেই মস্ত বড় এক চাংড়া শিল জানলার কাঁচে এমন জোরে এসে লাগল যে, কাঁচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল.—ভাঙা টুকরোর কিছু কিছু আমার ঘরের মেঝেতে এসেও ছিটকে পড়ল।

ক্লান্ত হয়ে, জামাকাপড় না খুলেই সেদিন বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মনে হয়েছিল. ওদিন রাত্রে আর আমার ঘুম আসবে না, সকাল অবধি উদ্বেগে শুধু এপাশ ওপাশ করতে হবে. জামাকাপড় না খুললে তবু ঘরময় পায়চারি করে বেড়িয়ে নিজেকে কিছুটা ক্লান্ত করতে পারব। কিন্তু অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটে গেল সেদিন। মনে হল এইমাত্র আমি চোখ বুজেছি. কিন্তু যখন চোখ মেললাম, দেখি খড়খড়ির ভিতর দিয়ে বাঁকা হয়ে সূর্যের কিরণ ঢুকেছে ঘরে, আর সেই আলোতে চিক্‌চিক্ করছে যেন অসংখ্য স্বর্ণরেণু।

য়ারমোলা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে. মুখে তার দারুণ উদ্বেগ আর অধৈর্যের ছায়া। দেখে মনে হল আমার ঘুম ভাঙার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে সে।

সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে. কত্তা.- আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আমি তখনই বিছানা থেকে পা নামিয়ে তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম,—চলে যেতে হবে? কোথায়? কেন? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়!

য়ারমোলা যেন খেঁকিয়ে উঠল ঃ না. কত্তা. মাথা আমার খারাপ হয়নি। কাল রাত্রের শিলাবৃষ্টিতে কি ক্ষতি হয়েছে জানেন? অর্ধেক ফসল একেবারে থেঁৎলে শেষ করে দিয়েছে। কানা ম্যাকসিম. কেজিওল মাত. প্রোকোপচুক, গর্দিওলফার—এদের সবার ফসল…। ঐ শয়তানী ডাইনীর এ কাজ। গোল্লায় যাবে ও!

তখনই আগের দিনের সকল ব্যাপার আমার মনে পড়ে গেল ঃ গির্জের কাছে ওলেস্যা যে সব কথা বলে শাসিয়ে এসেছে. তারপরই কেমন ভয় পেয়েছে সে.—সব।

যারমোলা বলতে লাগল এখন গাঁয়ের চাষীরা সব ক্ষেপে উঠেছে। সকাল থেকে তারা সবাই মদ খাচ্ছে. এখন সব চিল্লাতে শুরু করেছে। আপনার সম্বন্ধেও যা তা কথা বলে তারা চিৎকার করছে। আর আমাদের এখানকার লোক সব

কেমন—তা তো জানেন? ঐ ডাইনী দুটোর ওরা যদি কিছু করে ত, সে ভালই,—ঠিক কাজই করবে তারা। কিন্তু আপনাকে কত্তা,—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই, যত শীঘ্র পারেন আপনি এখান থেকে চলে যান।

তা হলে ওলেস্যা যা ভয় করেছিল তাই ঘটল। আমি এখনই গিয়ে তাদের এই আসন্ন বিপদের কথা বলে সাবধান করে দেব,—ভাবলাম আমি। আমি তখনই জামা কাপড় পরে মুখে খানিকটা জল ঢেলে দিলাম। আধ ঘণ্টা পরে আমি দ্রুত কদমে ঘোড়া ছুটালাম শয়তানের ঘুঁজির দিকে।

ডাইনীর কুটীরের যত কাছে আসতে লাগলাম উদ্বেগের যন্ত্রণা তত বেড়ে যেতে লাগল আমার। নিজের মনেই বলতে লাগলাম,—নতুন এক অপ্রত্যাশিত দুঃখ পেতে চলেছি আমি।

বালুঢাকা আঁকাবাঁকা ঢালু পথটা দিয়ে কিছুটা উপরে উঠতেই দেখলাম ওদের ঘরের জানলাগুলি খোলা, দরজাটা হাঁ করে রয়েছে।

নিজের মনেই অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠলাম,—হায় ভগবান,—কি হল এখানে? ভিতরে ঢুকে বুকটা আমার একেবারে দমে গেল।

ঘরটা একেবারে খালি। তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে কেউ পালিয়ে গেলে ঘরের যে দশা হয়, সেই দশাই হয়েছে এখানে। মেঝের উপর জড়ো হয়ে রয়েছে জঞ্জাল আর ছেঁড়া ন্যাকড়ার স্তূপ,—এক কোণে হাঁ করে রয়েছে—খাটের খালি ফ্রেম।

বুকটা আমার কেমন করে এল,—দুই চোখ ভরে এল জল। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে যাব এমন সময় নজরে পড়ল জানলার ফ্রেমের এক কোণে একটা জিনিস চক্‌চক্‌ করছে। বুঝলাম এ জিনিস ইচ্ছা করেই রেখে যাওয়া। জিনিসটা হচ্ছে এক ছড়া শস্তা লাল কাঁচের মালা,—পলিস্যিতে একে বলা হয় প্রবালের মালা। ওলেস্যা আমার জন্য তার গভীর প্রেমের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে গেছে এ মালা।

১৮৯৮

রাত্রির পাহারা

আট নম্বর সেনাদলের ব্যারাকে সন্ধ্যার হাজরে ডাকা অনেক আগেই হয়ে গেছে, স্তোত্র পাঠও হয়ে গেছে। রাত্রি দশটা বেজে গেছে, তবু কারো জামা-কাপড় খুলবার তাড়া নেই, কারণ কাল রবিবার। ঐ দিনে যারা ডিউটি দিচ্ছে তাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তারা ছাড়া আর সবই অন্য দিনের চেয়ে ঘণ্টাখানেক দেরী করেই ঘুম থেকে ওঠে।

লুকা মার্কুলোভ একজন সাধারণ সৈনিক, সে এইমাত্র ডিউটি দিতে গেল। রাত্রি দুটো অবধি তাকে পাহারা দিতে হবে, ওভারকোট আর টুপি পরে বন্দুক কাঁধে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে ব্যারাকের চারিধারে, দেখতে হবে কিছু চুরি না যায়, সৈন্যদের কেউ কেবল অন্তর্বাস পরে বাইরে না যায়, বাইরের কোন লোক ব্যারাকে না ঢোকে,—এক কথায়, তাকে দেখতে হবে—সব ঠিক আছে। যদি কোন উপরওয়ালা রোঁদে বেরোন তাঁর কাছে শিবিরের অবস্থার কথা এবং তাঁর পাহারার সময় যা কিছু ঘটেছে সব বলতে হবে।

মার্কুলোভের এখন ডিউটির পালা নয়, তবু ডিউটি দিতে হচ্ছে তার,—এ তার শাস্তি। গত সোমবার যখন সৈন্যদের বন্দুক ছোঁড়া শেখানো হচ্ছিল তখন দেখা গেল তার জড়ানো ওভার কোটটা বাঁধা রয়েছে একটা দড়ি দিয়ে, নিয়ম-মত এটা বাঁধবার কথা বিভাগদত্ত চামড়ার পেটি দিয়ে, মার্কুলোভ তা হারিয়ে ফেলেছে। পাঁচ দিনের মধ্যে এইবার নিয়ে তিনবার অতিরিক্ত ডিউটি দিতে হল মার্কুলোভকে এবং প্রতিবারেই রাত্রে,—সেটাই হল সবচেয়ে কষ্টের।

বেচারা মার্কুলোভ এখনও পাকা সৈনিক হয়ে উঠতে পারেনি, বন্দুক নিয়ে প্যারেড শিখছে সে। সে যে কুঁড়ে বা অসাবধান তা কেউ বলতে পারবে না। শুধু বন্দুক নিয়ে ড্রিলটা তার বড় কঠিন লাগে। এইটা সে কিছুতে আয়ত্ত করতে পারছে না। মার্চ করবার সময় ঐ যে পায়ের আঙুল নিচু করে সারা শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে দেওয়া, আর যথা সময়ে বন্দুকের ঘোড়াকল টেপা—এ আর কিছুতেই পেরে উঠছে না সে। এ ছাড়া অন্য দিক দিয়ে সে যথার্থই সৈনিক, অর্থাৎ সৈনিকের ধর্ম সে পালন করে : সে তার পোশাক পরিপাটি রাখে, অশ্লীল কথা খুব কম বলে, বড় রকমের নামকরা ছুটির দিন তাকে যে ভদকা দেওয়া হয় তা ছাড়া সে ভদকা খায় না, তা ছাড়া অবসর সময়ে সে বসে বসে বুট তৈরি করে, উঁচু বুট। মাসে অবশ্য এক জোড়ার বেশি সে তৈরি করতে

পারে না,—কিন্তু সে কি বুট! লোকে তার নামই দিয়েছে মার্কুলোভ বুট,—যেমনি বড়, তেমনি ভারী, তেমনি টেঁকসই।

তার রুক্ষ ধূসর মুখখানা যেন তার ওভার কোটের রঙের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে গেছে, এ ছাড়া সেনানিবাস, কারাগার বা হাসপাতালে থাকবার সময় চাষী ধরনের লোকদের মুখে যেমন এক রকম মলিন পাণ্ডুরতার ছায়া পড়ে, সে ছায়াও রয়েছে তার মুখে। তার চোখদুটি কিন্তু তার মুখের সঙ্গে একটু বেমানান, দেখে বিস্ময় লাগে ঃ চোখ দুটি তার একটু ড্যাবডেবে, অতিশয় কোমল, বিশুদ্ধ বর্ণ, শিশুদের মত সারল্যে ভরা, তা ছাড়া এত স্বচ্ছ যে, দেখে মনে হয় চক্‌চক্ করছে। সরল লোকদের ঠোঁটের মত এর ঠোঁট দুটি মোটা, বিশেষ করে উপরের ঠোঁটটা, সেই ঠোঁটের উপর বাদামী রঙের ছোপ এমন লেপটে রয়েছে যে, দেখে মনে হয় যেন ওগুলি ভিজে গেছে।

সেনানিবাসে ভীষণ হৈচৈ চলেছে। প্রত্যেক পল্টনের ডেরায় দেয়ালে হুক দিয়ে আঁটা যে চারটে করে টিনের ল্যাম্প জ্বালা হয়েছে তার ধোঁয়াটে লালচে আলোয় পাশাপাশি চারটে ঘরের অন্ধকার পুরোপুরি দূর হচ্ছে না। ঘরের মাঝ দিয়ে লম্বা দুই সার কাঠের তক্তপোষ, তার উপর খড়ের গদী। ঘরের দেওয়ালগুলি চূণকাম করা,—নিচের দিকে আবার তার বাদামী রঙ করা। দেয়ালের গায়ে আঁটা লম্বা কাঠের র‍্যাকে সুন্দরভাবে সারি সারি সব বন্দুক সাজানো, তার উপরে টাঙ্গানো সৈনিক জীবনের জ্ঞাতব্য নানা বিষয়ের ফ্রেমে আঁটা ছবি,—কিছু তার হাতে আঁকা, কিছু ছাপানো।

মার্কুলোভ সৈন্যদেব এক দল থেকে অন্য দলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বড় নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছিল তার, বড্ড ঘুম পাচ্ছিল। ব্যারাকের গভীর আঁধারের মাঝে যারা হৈ-চৈ করছে হাসছে,—তাদের দেখে হিংসা হচ্ছিল মার্কুলোভের। ঘুমোবার কত সময় রয়েছে তাদের, তাই দু চার মিনিট জেগে গল্পগাছা করতে তাদের বাধছে না। কিন্তু তার মেজাজ বেশি খারাপ হচ্ছে এই ভেবে যে আর আধ ঘণ্টা পরে এরা সবাই ঘুমে ঢলে পড়বে,—জঘন্য মেজাজ নিয়ে সর্বজনবিস্মৃত হয়ে সেই একা থাকবে জেগে, শ খানেক লোকের মধ্যে মাত্র সে একা। কোন এক অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি সবাইকে এক অজানা দেশে নিয়ে যাবে আর সে থাকবে এখানে একা একা পড়ে।

দু-নম্বর পল্টনের জনাবারো সৈন্য ঠাসাঠাসি করে বসেছে। তারা তাদের তক্তপোশের উপর হাত পা ছড়িয়ে এত এলোমেলোভাবে আর এত কাছাকাছি বসেছে যে, কোন মাথা বা পিঠের সঙ্গে কোন হাত পা-র সম্বন্ধ হঠাৎ দেখে বলা কঠিন। অন্ধকারে মাঝে মাঝে হাতে পাকানো সিগারেটের আগুন চোখে পড়ছে। দলের মাঝখানে পা দুটো আড়াআড়ি করে বসে রয়েছেন জামোশনিকোভ, সাধারণ সৈনিক ইনি,—দলের সবাই ডাকে এঁকে জামোশনিকোভ কাকা বলে। দেখতে একটু বেঁটে-সেটে; বয়স হয়েছে, তবু ফূর্তিবাজ, গানের বেলায় সবার আগে যায় এঁর গলা।

তা ছাড়া লোকের চিত্তবিনোদন করতে ইনি সব সময়ই তৈরি হয়ে বসে আছেন। দুই হাতের তালু হাঁটু দুটোয় বুলাতে বুলাতে আর সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দুলতে ইনি এখন একটা গল্প ফাঁদছিলেন; শ্রোতাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করতে গল্প বলবার সময় ইনি ইচ্ছে করেই একটু আস্তে আস্তে কথা বলেন। শ্রোতারা সব চুপ করে বসে তন্ময় হয়ে গল্প শুনছিল,—গল্পের বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে নিজের উচ্ছ্বাস আর চেপে রাখতে না পেরে মাঝে মাঝে কেউ উচ্চকণ্ঠে শপথ করে বাহবা দিচ্ছিল।

মার্কুলোভ চলতে চলতে এদের কাছে একটু থেমে নিস্পৃহভাবে গল্পের দিকে একটু কান পাতলে। জামোশনিকোভ কাকা তখন বলে চলেছেন—

তুরস্কের সুলতান তখন তাঁর কাছে মস্তবড় এক পিপে ভরতি 'পপী'র বীজ পাঠালেন, আর তার সঙ্গে দিলেন এক চিঠি। চিঠিতে লিখেছেন,—মহামান্য, বীর সেনাপতি স্কোবেলেভ,—তিনদিন তিনরাত্রি সময় দিলাম আপনাকে এই পিপের বীজগুলি গুনতে; আর জেনে রাখবেন, এই পিপের বীজের সংখ্যা যত, ঠিক তত সংখ্যক সৈন্য আছে আমার সেনাদলে। আচ্ছা, সেনাপতি স্কোবেলেভ ত তুরস্কের সুলতানের চিঠিটা পড়লেন! তোমরা কি ভাবছ তিনি চিঠি পড়ে ভয় পেয়ে গেলেন? না, মোটেই না। তিনি সুলতানকে এক মুঠো মরিচের ছাল পাঠিয়ে লিখলেন, আপনার যত সৈন্য আছে তার অর্ধেক সৈন্যও নেই আমার. আমি যা পাঠালাম, সংখ্যা তাদের এরই মত, কিন্তু এগুলি একবার চিবিয়ে দেখবেন। জামোশনিকোভের পিছন দিক থেকে অমনি কে বলে উঠল, বাহবা.. ঠিক জবাব হয়েছে, চমৎকার!

শুনে আর সবাই হাসতে লাগল।

জামোশনিকোভ তাঁর পছন্দসই কথাগুলির মায়া আর ছাড়তে না পেরে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করে বলতে লাগলেন, হাঁ, এগুলি একবার চিবিয়ে দেখবেন। সুলতান পাঠালেন এক পিপে পপীর বীজ, আর আমাদের সেনাপতি পাঠালেন একমুঠো মরিচের ছাল।...হাঁ, এগুলি একবার চিবিয়ে ঠেলা বোঝ, আমাদের সেনাপতি বললেন সুলতানকে, সৈন্যের সংখ্যা আমার এমনি এক মুঠোই, কিন্তু চেষ্টা করে দেখ তুমি তাদের চিবুতে পার কি না!

একজন শ্রোতা অধীর হয়ে বলে উঠল,—জামোশনিকোভ কাকা, গল্প কি শেষ হয়ে গেল?

জামোশনিকোভ তাকে ধমক দিয়ে বললেন,—রসো বাপু, অত অধীর হলে চলে? মনে কর না কিছু, সময় আমার লাগবেই। গল্প বলা মাছি ধরা নয়,—বুঝলে? আত্মস্থ হবার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, তারপর আবার শুরু করলেন, হাঁ, যা বলছিলাম, আমাদের সেনাপতি বললেন,—আমার সৈন্য একমুঠো বটে, কিন্তু একবার চিবিয়ে দেখ তাদের। আচ্ছা, তারপর তুরস্কের সুলতান তাঁর এই চিঠি পড়ে আর একখানা চিঠি লিখলেন। তাতে লিখলেন,

আপনার এই বীর সৈন্যদলকে আমার তুরস্কের মাটি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন, যদি না নেন, তা হলে আমি আমার সৈন্যদের প্রত্যেককে এক এক গ্লাস ভদকা খাইয়ে দেব, আর তা হলে তারা রেগে আপনার সৈন্যদলকে তিনদিনের মধ্যে তুরস্ক ছাড়া করবে।

কিন্তু এর উত্তর স্কোবেলেভের একরকম তৈরিই ছিল, তিনি লিখলেন, হে মহামহিমান্বিত তুরস্কের সুলতান, হে কিম্ভুতকিমাকার তুর্কী, আপনি কোন্ সাহসে আমায় এমন কথা লেখেন? আপনি ভেবেছেন আপনার ঐ কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে যাব? আমি প্রত্যেককে এক গ্লাস করে ভদকা দেব, এ্যাঁ? বেশ, আমি আমার সৈন্যদের তিন দিন কোন কিছু খেতে দেব না, তা হলে তারা আপনার সৈন্যদল সমেত বন্দুকের বাচ্চা আপনাকে শুদ্ধ জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। আপনাকে খাইয়ে পরিয়ে ধরেও আনবে না তারা, বলবে আপনার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না,—হে সারমেয়, হে বরাহকর্ণ পশু, আপনার এই দশা হবে!.. এই চিঠি পড়বার পর তুরস্কের সুলতানের দুই হাঁটু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, তিনি তখনই সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। বলে পাঠালেন, যাক গিয়ে, আপনি আপনার সৈন্যদল সরিয়ে নিন এখান থেকে, আমি এই দশ লক্ষ রুবল নগদ পাঠাচ্ছি আপনাকে, দয়া করে এটা গ্রহণ করুন, আমাকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দিন।

জামোশনিকোভ এইবার থামলেন, তারপর বিনা আড়ম্বরেই বললেন, এইবার আমার গল্প শেষ হল।

শ্রোতারা এইবার ধাতস্থ হল, চাঞ্চল্য শুরু হল তাদের মাঝে। চারিদিক থেকে অশিক্ষিত রুচির মন্তব্য আর তারিফ শোনা যেতে লাগল।

ঠিকই করেছিলেন আমাদের সেনাপতি,—তাই না?

খুব জব্দ।

জব্দ বলে জব্দ!—কি? না,—আমাদের সেনাপতি বললেন, আমি আমার সৈন্যদের তিন দিন কিছু খেতে দেব না, তা হলে,—ওরে নোংরা কুকুর, তোকে ওরা জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে! কেমন এই ত তিনি বলেছিলেন, জামোশনিকোভ কাকা,—এ্যাঁ—জামোশনিকোভ কাকা?

জামোশনিকোভ তাঁর পূর্বের কথাগুলি আবার হুবহু উচ্চারণ করে গেলেন।

একজন সগর্বে বলে উঠল,—ওরা আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

আর একজন বললে, রুশদের সঙ্গে পারা অমনি সোজা কথা?

আমাদের সঙ্গে লাগবার আগে ভাল করে ভেবে দেখা তাদের উচিত।

হাঁ,—বেশ ভাল করে—এ রকম কিছু করবার আগে তাদের ভগবানের নাম স্মরণ করে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত।

জামোশনিকোভের পাশেই কার মুখে সিগারেট জ্বলছিল,—আগুন দেখে

তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, দেখি, ভাই, একটা টান দিয়ে দিই, অনেকক্ষণ তামাক না খেয়ে প্রাণটা যেন কেমন করছে।

সিগারেটটা হাতে পেয়ে বেদম কষে পর পর কয়েকটা টান দিলেন তাতে, দুই নাকের ছেঁদা দিয়ে ভলকে ভলকে ধোঁয়া বের করতে লাগলেন। সিগারেটের আগুনে তাঁর মুখ, বিশেষ করে তাঁর থুতনি আর ঠোঁট মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে আবার আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একজন হাত বাড়িয়ে তার মুখের সিগারেটটা ধরে মিনতির সুরে বললে, জামোশনিকোভ কাকা, সবটুকু শেষ কোর না, আমার জন্যও কিছু রাখ।

জামোশনিকোভ তখনই জবাব দিয়ে দিলেন,—কাজটি ভাগাভাগি করে নিতে হবে,—কেউ ধূমপান করবে, আর কেউ তার হয়ে থুথু ফেলবে।

সবাই হেসে উঠলে ঃ

এঁর নাম জামোশনিকোভ, কিছু ভেবে বলতে হয় না এঁর।

জামোশনিকোভ এতে উৎসাহ পেয়ে আরও কৌতুকপ্রদ কথা সব বলতে লাগলেন।

আজকাল লোকে তামাক খেতে ডাকে কেমন করে, জানো ত? বলে, তুমি কাগজ দাও, আর তোমার তামাকের থলেটা আমার হাতে দাও,—এস তারপর আমরা ধূমপান করি। ধূমপানের আমন্ত্রণটা হচ্ছে এইরকম।

মুখে এ সব কথা বললেও সিগারেট নিতে যে হাত বাড়িয়েছিল তার হাতে সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু দিয়ে জামোশনিকোভ আর একজনের পিঠের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে থুথু ফেললেন। তারপর বললেন, আর একটা গল্প শুনবে তোমরা? হয়ত শুনেছ তোমরা গল্পটা ঃ সেই যে এক সৈনিক—লোহার নখ পরে কেল্লায় উঠেছিল এক রাজকুমারীকে দেখতে,—সেই গল্পটা, শুনে থাক ত না-ই বললাম এটা!

না, শুনিনি আমরা,—বলে ফেলুন,—কেউ শুনিনি।

বেশ, তা হলে শোন। গল্পটা হচ্ছে এই—একটা লোক ছিল, নাম ছিল তার য়াশকা,—সবাই তাকে সৈনিক বলে জানত।

মার্কুলোভ সরে গেল সেখান থেকে, ভাল লাগল না তার এসব। অন্য সময় হলে জামোশনিকোভের গল্প সে বেশ মন দিয়েই শুনত, কিন্তু এখন তার মনে হল, এরা সব কি—এমন হাঁ করে এইসব ছাই-পাঁশ শুনছে? এ ত জানা কথা—জামোশনিকোভ এ সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে—তবুও যদি মজার হত?

রেগে নিজের মনেই সে বলতে লাগল, এই বে-জন্মাগুলো ঘুমানর কথা ভুলেই গেছে একেবারে। হবেই তো, এরপর নাক ডাকাতে সারা রাতই তো পড়ে রয়েছে এদের।

ধীরে ধীরে সে একটা জানলার কাছে এগিয়ে গেল, জানলার কাঁচগুলির

ভেতরের দিকটা কুয়াশায় ভিজে গেছে,—মাঝে মাঝে তা থেকে দু এক ফোঁটা জলও গড়াচ্ছে। সে তার কোটের আস্তিন দিয়ে কাঁচটা মুছে, নিজের কপালটা তাতে একবার লাগাল। কাঁচের উপর আলোর প্রতিবিম্ব এসে পড়ছে, তার ঝলকানি সইতে না পেরে চোখ দুটো দুই হাতে একবার ঢাকল। শরৎকালের রাত্রি,—বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল, অন্ধকার। জানলা থেকে আলো এক দীর্ঘ আয়তক্ষেত্রের আকারে মাটিতে গিয়ে পড়ছিল। তার মাঝে দেখা যাচ্ছিল একটা ডোবা, বৃষ্টিতে এলোমেলো তরঙ্গ তুলছিল তাতে। সামনে অনেক দূরে এবং নিচুতে ছোট্ট শহরের আলোগুলি টিম টিম করে জ্বলছিল, দেখে মনে হচ্ছিল ওরা যেন এখানকার আলো নয়, পৃথিবীর শেষ প্রান্তের আলো। বৃষ্টির অস্পষ্টতায় আর কিছুই চোখে পড়ছিল না মার্কুলোভের।

জানলার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে,—চার-নম্বরের পল্টনের চারিধারে সে একবার চক্কর দিয়ে এল তারপর অন্যধারের জানলার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। দু-সার তক্তপোষের একেবারে শেষের দিকে এক কোণে বসে পা দোলাচ্ছে দুজন সৈনিক—পাণ্ডুক আর কোভাল। দুজনের মাঝে রয়েছে তালা আর চাবির রিং-ঝুলানো একটা কাঠের সিন্দুক। তার উপরে বড় বড় করে কাটা রাইয়ের রুটি, পাঁচটা পেঁয়াজ, নুনদেওয়া বেশ খানিকটা শূকরের মাংস, আর একটা পরিষ্কার কাপড়ে খানিকটা মেটে রঙের মোটা দানা লবণ। এক অসাধারণ ভোজনপ্রিয়তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে পাণ্ডুক আর কোভালের এই অদ্ভুত নীরব বন্ধুত্ব। ওরা প্রত্যেকে তিন পাউন্ড করে রসদের রুটি পায়, কিন্তু তাতে ওদের কুলোয় না, তাই অন্যান্য সৈনিকদের কাছ থেকে আলাদা রুটি কিনে ওরা একসঙ্গে বসে খায়। এই খাওয়াটা চলে সাধারণত সন্ধ্যাকালে. খাওয়ার সময় কেউই কোন কথা বলে না। ওরা দুজনেই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে. এবং বাড়ি থেকে দুজনেই এক রুবল করে হাতখরচা পায়।

শান দিয়ে দিয়ে ধারের দিকটা কাস্তের মত বাঁকা হয়ে গেছে এমন একখানা ছুরি দিয়ে ওরা এক এক জন করে শূকরের মাংস সিগারেটের কাগজের মত পাতলা করে কাটে, তার দুই দিকে বেশ করে নুন মাখায়. তারপর দুই ফালি রুটির মাঝে তা বসিয়ে বড় বড় স্যাণ্ডউইচ্ তৈরি করে আরামে বসে তা চিবোয় আর সঙ্গে সঙ্গে পা দোলায়।

মার্কুলোভ চলতে চলতে ওদের সামনে এসে হঠাৎ থেমে ওদের খাওয়া দেখতে লাগল। শূকরের মাংস দেখে ওর জিভে জল এসে গেল, কিন্তু খেতে চাইল না, কারণ সে জানে. চাইলে ওরা শুধু টিটকিরি দেবে। তবু একটু প্রত্যাশার ভঙ্গিতেই সে নরম সুরে বললে.—খাও. বেশ মজা করে খাও।

কোভাল উত্তর দিলে,—আমার নিজের জিনিস খাচ্ছি আমি,—ইচ্ছা হলে দাঁড়িয়ে দেখতে পার। কণ্ঠে তার বিন্দুমাত্র ঘৃণার আভাষ নেই। মার্কুলোভের দিকে না তাকিয়েই সে ছুরি দিয়ে একটা পেঁয়াজের উপরের খোশা ছাড়িয়ে,

তাকে চার খণ্ডে কাটলে, তারপর তার এক খণ্ড নুনে ডুবিয়ে আরামে চিবুতে লাগল।

পাণ্ডুক কোন কথা না বলে মার্কুলোভের দিকে—তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে বোকার মত তাকিয়ে রইল। মুখ দিয়ে তার তখন কচমচ শব্দ বেরুচ্ছে,—বেশ জোর শব্দ; টানপড়া চামড়ার নিচে ভারি চোয়ালের পেশীগ্রন্থিগুলি নড়ছে, পাক খাচ্ছে।

কয়েক মিনিট তিনজনের একজনও কোন কথা বললে না। শেষে পাণ্ডুক মস্ত বড় একখানা স্যাণ্ডউইচ্ গিলে নিতান্ত উদাসীনের মত মার্কুলোভকে বললে, ডিউটি দিচ্ছ বুঝি?

মার্কুলোভ যে ডিউটি দিচ্ছে একথা তার বেশ ভালভাবেই জানা, সুতরাং এ কথা জিজ্ঞাসা করবার কোন বিশেষ কারণ নেই,—কেন ডিউটি দিচ্ছে তার কারণ জানবার কোন কৌতূহলও নেই, কথাটা শুধু এমনিই বলেছে সে। মার্কুলোভও এর জবাবে শুধু পর পর কতকগুলি অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে গেল। যে সব সৈন্য তাদের নিজের খরচে পেট ভরে রুটি আর শূকরের মাংস খেতে পারে,—আর যে অফিসার তাকে এই বাড়তি ডিউটি দিতে বাধ্য করেছে তাদের উদ্দেশ্যেই মার্কুলোভের মুখ থেকে এই সব বাণী উচ্চারিত হতে পারে।

ঐ সব বলেই সে ঐ দুজনের কাছ থেকে সরে গেল, ওরা দুজন নীরবে ধীরে ধীরে তাদের খাবার খেতে লাগল। ব্যারাকের স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলি মনুষ্য-নিঃশ্বাসে যেন দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ওভারকোটের নিচে মার্কুলোভের নিজেরই যেন গরম বোধ হতে লাগল। সব পল্টনগুলির চারিদিকে সে কয়েকবার করে চক্কর দিলে,—বিরক্তি লাগছিল তার ওখানকার কথাবার্তা, উচ্চহাসি, গালাগালি আর গান শুনে,—এ সব যেন আর থামবার নয়। এ সব কোনকিছু শুনেই তার হাসিও পাচ্ছিল না, আমোদও লাগছিল না,—তবুও মনের গহনতলে সে কামনা করছিল এ সব হৈ-চৈ চলতে থাক, অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলুক, রাত্রি ভোর না হওয়া পর্যন্ত চলুক,—তা হলে ঘুমন্ত সেনানিবাসের নিস্তব্ধ অন্ধকারে সে আর নিঃসঙ্গ বোধ করবে না।

এক নম্বর পল্টনের একেবারে শেষের দিকে একটা আলাদা তক্তপোষে বিছানা পাতা, এটা হচ্ছে মার্কুলোভের ঠিক অব্যবহিত উপরওয়ালা—'ওয়ারেণ্ট অফিসার' নোগার বিছানা। নোগা যেমনি পয়সাওয়ালা লোক, তেমনি বাবু, তেমনি বাচাল, মেয়েদের পিছনে ছুটতেও তেমনি ওস্তাদ। তাঁর তক্তপোষে যে খড়ের গদীটা রয়েছে, সেটা একটা নরম কম্বলে ঢাকা, কম্বলের গায়ে আবার রঙিন চতুর্ভুজ আর ত্রিভুজের নক্সা। বিছানার পিছন দিকের কাঠে আঁটা রয়েছে ছোট্ট গোল একখানা আয়না, মাঝখানটা তার একটু ফাটা আর রয়েছে একখানা রুটি।

সৈনিকের সাজপোশাক আর বুট খুলে নোগা শুয়ে পড়েছেন তাঁর সেই চমৎকার কম্বলটির উপর, দুই হাত তাঁর মাথার নিচে, পা দুটি তুলেছেন উপরের দিকে,—একটা পা আবার দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে, আর একটা রেখেছেন

আড়াআড়ি। মুখের একটি কোণে লেগে রয়েছে 'রীড্-হোল্ডারে' একটা জ্বলন্ত সিগারেট। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই পল্টনের একজন সাধারণ সৈনিক, নাম তার কামাফুৎদিনোভ। মনমরা বিরাট এক বানরের মত চেহারা তার। লোকটি তাতার, যেমনি ফ্যাকাশে তার গায়ের রঙ, তেমনি নোংরা, তেমনি বোকার মত চেহারা। তিন বৎসর হল সামরিক বিভাগে কাজ নিয়েছে সে। এর মাঝে একটা রুশীয় কথা শিখতে পারলে না,—দলের সবাই ওকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে,—ইন্সপেক্শান প্যারেডের সময় ওকে নিয়েই তাদের ভয় আর লজ্জা।

নোগার ঘুম পাচ্ছিল না, তাই এই সময়টা তিনি কামাফুৎদিনোভকে একটু কিছু শেখাবার চেষ্টা করছিলেন। মানসিক পরিশ্রম করতে যাওয়ায় কামাফুৎদিনোভের কপালে আর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে পকেট থেকে একখানা নোংরা ছেঁড়া ন্যাকড়া বার করে সে তার অসুস্থ ফুলো ফুলো চোখ থেকে পুঁজ মুছে নিচ্ছিল।

আরে, এই তুর্কী ভূতটা, তোমায় আমি কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—মাছমুখো? —গর্দভ, তোমায় আমি কি জিজ্ঞাসা করেছি? বল।

কামাফুৎদিনোভ কোন উত্তর দিলে না।

নোংরা বানর, তোমার বন্দুকটাকে কি বলা হয়? বল না, তাতার—জানোয়ার, তোমার বন্দুককে কি বলা হয়?

কামাফুৎদিনোভ এ পা ছেড়ে ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল, চোখের ক্ষতস্থানটায় একবার হাত বুলালে, কিন্তু কোন উত্তর দিলে না।

কেন, তুমি—! তোমাকে নিয়ে আমি কি করি বল তো!...আচ্ছা, আমি যা বলছি,—তাই বল।

নোগা প্রত্যেকটা শব্দ যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে বললেন,—বল—'স্মল-বোর',—'কুইক্-ফায়ারিং'—।

কামাফুৎদিনোভ ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ইস্মল-বুর, কিক্-ফাই'।

অত তাড়াহুড়ো কর না, আবার বল দেখি 'স্মল-বোর'—'কুইক্-ফায়ারিং'—।

সিমোল-বর, কিয়িক-ফায়ারি—।

আরে, তাতার বানরটা,—ইস্, নোগা চোখ পাকিয়ে বললেন,—বেশ,—যেতে দাও ওটা,—বল ত, 'ইনফ্যাণ্ট্রি রাইফেল'—

'ইনফ্যাট রাইফিল'—

'উইথ্ স্লাইডিং বোল্ট্'—

'বিস্‌সিলিডিন্ বুল্ট'

'বার্ডান্‌স্ টাইপ, নাম্বার টু'

'বির্ডান সিপি, নাম্বা টু'

বেশ, এবার আবার গোড়া থেকে শুরু কর দেখি।

কামাফুৎদিনোভ একটু চঞ্চল হয়ে উঠে আবার পকেট থেকে তার ময়লা ন্যাকড়াটা বের করলে।

ধুত্তোরি,—বল না আবার!

কামাফুৎদিনোভ না ভেবে চিন্তেই যা মনে এল ফট্ করে বলে বসলে,—ইস্মোলবুর ভিসিলিডিন্।

ভিসিলিডিন!—নোগা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, ভিসিলিডিন তুমি নিজে। সকালে উঠতে পারি না যে আমি, পারলে তোমার মগ আমি নিজে হাতে পরিষ্কার করে দিতাম। আমার পল্টনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট করে দিচ্ছ তুমি। জানো তুমি—তোমার জন্য এ পল্টন ছাড়িয়ে অন্য পল্টনে পাঠানোর কথা হয় আমার? তাই হয়,—বুঝলে?—নাও, এখন বল দেখি আবার,—স্মল বোর, কুইক্ ফায়ারিং—

এক নম্বর পল্টনের শেষের দিকে লোহার স্টোভটার পাশে তিনজন পুরানো সৈনিক তাদের মাথা কাছাকাছি এনে হাত পা ছড়িয়ে তাদের তক্তপোষে শুয়ে গান ধরেছে। গান তারা খুব নিচু গলায় গাইছে বটে,—কিন্তু গাইছে খুব দরদ দিয়ে,—হাবভাব দেখে মনে হয় এতে আনন্দও পাচ্ছে তারা রীতিমত। গানটা হচ্ছে চাষীদের গান,—পল্লীগীতি, 'ঘরে-ফেরা'র গান। প্রথমে যে গাইছে সে সুরটাকে করুণ কোমল করতে একটু চেপে চেপে গাইছে, মীড় সৃষ্টি করতে অনেক কথা অনুচ্চারিত বা অর্ধোচ্চারিত রেখে স্বরবর্ণে টান দিচ্ছে। আর একজন একটু ভাঙা ভাঙা অথচ বেশ কোমল মধুর চড়া গলায় তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, যদিও তার কণ্ঠস্বরে একটু নাকি নাকি সুর মেশানো আছে। তৃতীয় জন গাইছে প্রথম গাইয়ের এক পর্দা নিচে, কণ্ঠে তার লালিত্য নেই। মাঝে মাঝে সে চুপ করে যাচ্ছে, দুই একটা তাল ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ আবার দোয়ার্কির মত করে তার সঙ্গীদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে।

বিদায় আমার প্রিয়তমা, বিদায় আমার জীবন,
ক্ষণতরে রবে না হায় শুষ্ক আমার নয়ন।
আমার প্রিয়া আমায় ছেড়ে যায় যে দূরে চলে
দেখা যে তার পাব না, হায়, আর সে কোন কালে॥

প্রথম দুজনার কণ্ঠস্বর সুরে তালে দিব্যি মিলে যাচ্ছিল, তৃতীয়জন একটু থেমে আবার ওদের সঙ্গে ধরলে,—আমার প্রিয়া আমায় ছেড়ে যায় যে দূরে চলে। তারপর তিনজন আবার একসঙ্গে ধরলে—

প্রিয়ার ঘরে ফিরে আসা হবে না আর দেখা,
গোপন মিলন পথে ভ্রমণ নাই রে ভাগ্যে লেখা।

গানের প্রথম অন্তরা শেষ করে প্রথমে যে গান ধরেছিল সে অসম্ভব উঁচু গলায় একটা তান ধরলে,—তানটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত টেনে রাখলে সে, ফলে মুখটা ফাঁক হয়ে রইল, চোখ দুটি বুজে গেল, নাকটা গেল তার কুঁকড়ে। তারপর হঠাৎ এক সময় তানটা সে ছেড়ে দিয়ে একেবারে চুপ করে গেল,—এ অন্তরার কাজ

তার শেষ হয়ে গেছে, ভাবটা যেন অনেকটা এই রকম। তারপর খাঁকর দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে দিয়ে সে আবার আরম্ভ করলে—

সারা রাতি ধরে আমার আঁখি যে রয় ভিজে,
বারেক তরে নয়ন আমার নিদ জানে না যে
ভুলতে পারিনে গো তারে ভুলতে পারিনে যে।

এবার তৃতীয়জন হঠাৎ যেন নিজের মনের গোপন কথা বলছে এমনভাবে আবৃত্তির মতন করে বললে,—না, স্যার, আমি ভুলতে পারি না। তারপর তিনজনই আবার একসঙ্গে গাইতে লাগল—

আমি ভুলব না, কভু ভুলব না তা জানি,
তোমার প্রেমে ভরা আঁখি, তোমার কোমল চাহনি;
তোমার মনোলোভা ভঙ্গি, তোমার আনন্দময় বাণী।

মার্কুলোভ তার নিজের দেশে-গাঁয়ে এ গান শুনেছে, তাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল এ গান, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হতে লাগল সে যদি এখন তার সব জামা-কাপড় খুলে কান পর্যন্ত ওভারকোটে ঢেকে তার গাঁ আর তার বাসিন্দাদের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে পারত, তা হলে কি সুন্দরই না হত।

ওরা তিনজনই গান থামিয়ে দিলে এবার। আবার যদি ওরা গান আরম্ভ করে তারই জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল মার্কুলোভ; করুণ সুর শুনলেই তার বুকের মাঝে কেমন যেন এক অস্পষ্ট বেদনা আর মনের মাঝে নিজের প্রতি এক অনুকম্পার ভাব জাগে, বড় ভাল লাগে তার। কিন্তু তিনজন গাইয়েই মাথায় মাথা লাগিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে এবার,—একটুও নড়ছে না, গানের করুণ সুর তাদের মনেও ঐ একই নীরব বিষাদের ভাব এনে দিয়েছে নিশ্চয়। মার্কুলোভ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে,—বুকটার ওখানে চুলকোচ্ছিল তার, মুখে যন্ত্রণার ভাব নিয়ে সেখানটা আচ্ছা করে আঁচড়ালে, তারপরে গাইয়েদের পাশ থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল।

ধীরে ধীরে সেনানিবাস নিস্তব্ধ হয়ে এল। দুই নম্বর পল্টন থেকে শুধু মাঝে মাঝে প্রবল হাস্যধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। জামোশনিকোভ সেই লোহার নখ-পরা সৈনিকের গল্প শেষ করে এবার কৌতুক অভিনয় করছিলেন। কাহিনীটা মুখে মুখে বলা এবং অভিনয় করা—দুই-ই একসঙ্গে চালাচ্ছিলেন তিনি। অভিনয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে—দুর্দান্ত সেনাপতি জামোশনিকোভের সৈন্যদল পরিদর্শন। এই অভিনয়ের বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি একা নিজেই অবতীর্ণ হচ্ছিলেন: হাঁপানী রোগগ্রস্ত স্থূলকায় সেনাপতি, রেজিমেণ্ট্যাল কম্যাণ্ডার, জুনিয়র ক্যাপ্টেন গ্লাসুনোভ, সার্জেণ্ট-মেজর তারাস গ্যাভ্রিলোভিচ্, শহরে নবাগত উক্রেইনের এক

পল্লীনারী,—আঠারো বছর যেকোন মোসকাল* দেখেনি, ধনুক-পেয়ে টেরা সৈনিক ভারদোখেন্নব, ক্রন্দনরত এক শিশু, ল্যাপডগ্ কোলে ক্রুদ্ধা এক মহিলা, তাতার কামাফুৎদিনোভ, একটা পুরো সৈন্যদল, ব্রাস-ব্যাণ্ড এবং রেজিমেণ্টাল-সার্জন,—এ সব কিছুই হচ্ছিলেন তিনি নিজে। শ্রোতাদের সবাই জামোশনিকোভের এ অভিনয় অন্তত দশ-বারো বার শুনেছে, তবু শোনবার আগ্রহ তাদের একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে, কারণ জামোশনিকোভ প্রতিবারেই এতে নতুন নতুন ছড়া, নতুন নতুন কৌতুকের কথা যোগ করেন এবং প্রতিবারের কৌতুকই আগের কৌতুকের চেয়ে বেশি চমকপ্রদ এবং অশ্লীল হয়।

তক্তপোষের বিছানা আর জানলার মাঝে যাতায়াতের যে পথটুকু আছে, জামোশনিকোভ অভিনয় করছিলেন সেইখানে, শ্রোতারা নিজের নিজের বিছানায়, কেউ বা শুয়ে কেউ বা বসে।

মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে মুখটা অনাবশ্যকভাবে অনেকখানি হাঁ করে, ইচ্ছাকৃত চাপা গলায় কর্কশকণ্ঠে তিনি হুকুম দিলেন,—বাজিয়ের দল, এগিয়ে এস। চেঁচাতে ভয় পাচ্ছিলেন তিনি,—ভয় পাবারই কথা, তাই রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের কর্ণবধিরকারী চিৎকারের ভঙ্গিটা শুধু অনুকরণ করেছিলেন।

রেজিমেণ্ট,—'শান্, প্রেজেণ্ট আর্মস,—ব্যাণ্ড,—ষ্ট্রাইক আপ্। ট্রাম্-পা-পিম্-টা-টি-রা-রাম!

জামোশনিকোভ গাল ফুলিয়ে নিজের মুখেই যুদ্ধের বাজনা শুরু করলেন তারপর সেই ফুলো গালের উপর নিজের হাতেই চাঁটি দিতে লাগলেন, যেন ড্রাম বাজাচ্ছেন। তারপর অতি দ্রুত চঞ্চল কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—

এইবার বীর সেনাপতি জামোশনিকোভ আসছেন,—আসছেন তিনি সাদা ঘোড়ায় চড়ে। চোখ দুটি তাঁর ঈগলের মত, মাথাটা তাঁর খাড়া, তাঁর সাজপোশাক এমন জমকালো যে, দেখলেই লোকে নিজের মনে বিড় বিড় করে তার তারিফ করে ওঠে।

নমস্কার,—বীর সৈন্যের দল।

নমস্কার,—হুজুর!

চমৎকার কাজ করেছ তোমরা!

আমাদের সাধ্যমত ভাল করবার চেষ্টা করেছি, হুজুর!

এইবার রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার আসছেন রিপোর্ট করতে ঃ

মহামান্য বীর সেনাপতি জামোশনিকোভের কাছে আমি যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করছি—আমার অধীনে যে এক হাজার সৈন্য আছে, তার মধ্যে একশতজন অসুস্থ হয়ে শয্যাগ্রহণ করেছে, শ খানেক টান টান হয়ে পড়ে আছে, তারা সব অর্ধমৃত অবস্থায়, জনা পঞ্চাশেক পালিয়েছে, পঞ্চাশজন পাহারা দিচ্ছে,

*উক্রেইনে রুশীয়কে মোসকাল বলা হয়।

পঞ্চাশজনকে অপরাধের জন্য বন্দী করা হয়েছে,—আরও পঞ্চাশজন মাতাল হয়ে পড়ে আছে,—একেবারে সঠিক কথা বলছি। দু শ ভিক্ষায় বেরিয়েছে, বাকি সব অকেজো। দাড়ি কামায় না তারা,—চুল দাড়ি গোঁফে একেবারে জবরজং, মুখে সব আঘাত আর ক্ষতের চিহ্ন। পুরো এক বছর তারা কোন খাবার না খেয়ে কেবল মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমাদের দলের চেয়ে বেশি ফুর্তিবাজ সৈন্যদল আর জগতে নেই।

এই ত আসল জিনিস,—ধন্যবাদ, বীরপুরুষের দল।

আমরা আমাদের সাধ্যমত করছি,—হুজুর।

কোন অভিযোগ আছে?

না, হুজুর, কোন অভিযোগ নেই।

ঠিকমত খাবারদাবার পাচ্ছ ত?

হাঁ, হুজুর, যথেষ্ট খাবার পাচ্ছি; এতে আমাদের জিভ একেবারে চক্‌চক্ করছে,—পেট করছে আইঢাই।

তোমাদের একেবারে ভড়কে দেবার মত। এই ত চাই। যাক, তোমরা গান ধর, যত জোরে পার গান ধর, মুখটা সব সময় উঁচু করে রাখবে,—কোন খাবার চাইবে না। তোমাদের প্রত্যেককে এক এক টিন ভরতি ভদকা দেওয়া হবে, এক পাউণ্ড করে সিগারেটের তামাক এবং তার সঙ্গে আধ রুবল করে জলপানি।

অসংখ্য ধন্যবাদ, হুজুর!

রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার এবার ঘোড়ায় চড়লেন। 'রেজিমেণ্ট দুই পল্টনের দূরত্ব পর্যন্ত দলে দলে মার্চ করে যাবে। এক নম্বরের সৈন্যদল মার্চ করে সামনে এগিয়ে চল।' বাজনা বাজল—টা-রা-রাম-টা-রাম। এই চলেছে তারা,—লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট! তারপর হঠাৎ—

হল্ট ব্যাক্। য়্যাজ ইউ ওয়্যার!

কি, ব্যাপার কি?

কর্নেল, এ কোন্ সৈন্যদল?

মাতাল অষ্টম দল,—হুজুর।

ঐ গোমড়ামুখো দাঁড়কাকটা কে?

হুজুর, ও হচ্ছে সাধারণ সৈনিক ভার্দোখোব।

প্যারেড থেকে সরাও ওকে, তারপর আচ্ছা করে পঞ্চাশ ঘা লাগাও।

শুনে সৈন্যেরা সব অট্টহাস্য করে উঠল, ভার্দোখোবও সবদিক থেকে কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে সবার চেয়ে জোরে হাসতে লাগল।

এর পরের গল্প হচ্ছে সেনাপতি জামোশনিকোভ তাঁর পরিদর্শন শেষ করবার পর রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কেমন লাঞ্চ খেলেন।

হুজুর,—বাঁধাকপির, না আলুর ঝোল খাবেন?

দুটোই দাও আমায়, অনেকখানি করে দিও।

হুজুর, একটু ভদকা হবে কি?

হুঁ, নিশ্চয়, একটা বড় গেলাস ভরতি করে দাও আমায়।

এর পর কর্নেলের মেয়ের সঙ্গে একটু দিব্য আলাপ হচ্ছে—

লক্ষ্মী মেয়ে,—ছোট্ট একটা চুমু দাও আমায়।

সে কি করে হবে, স্যার, বাবা রয়েছেন যে এখানে?—তিনি দেখে ফেলতে পারেন।

তা হলে পারবে না তুমি,—এ্যাঁ?

একেবারে অসম্ভব।

তা হলে অন্তত তোমার হাতখানা আমায় ধরতে দাও।

হাঁ,—তা ধরতে পারেন আপনি।

কিন্তু জামোশনিকোভ তার কৌতুক-অভিনয় আর শেষ করতে পারলেন না: দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, এবং তারপর দেখা গেল দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেবলমাত্র অন্তর্বাস-পরা সার্জেণ্ট-মেজর তারাস গ্যাবরিলোভিচ্। পায়ে তাঁর শুধু স্লিপার্স, আর নাকের উপর একজোড়া চশমা।

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, আস্তাবলের ঘোড়ার মত এমন হ্রেষারব করবার কারণ কি? এ চেঁচামিচি থামবে কখন? তোমাদের মুখে এক এক ঘা দেব নাকি আমি? যাও, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে পড়।

সৈনিকেরা এবার ধীরে ধীরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছত্রভঙ্গ হল। শীগগিরই প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত সেনানিবাস একেবারে নিস্তব্ধ। কেউ বা অতি দ্রুত চুপে চুপে তার রাত্রির প্রার্থনাটা সেরে নিলে,—হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র যীশুখৃষ্ট, আমাদের দয়া করুন, হে পিতা, পুত্র এবং ঐশ আত্মা, আমাদের দয়া করুন। কে যেন আলকাতরা দেওয়া মেঝের উপর একটা একটা করে তার বুট খুলে রাখল,—থপ থপ শব্দ হল তার। আর একজন কে কাশলে, ভীষণ কাশি—অনেকটা ভেড়ার কাশির মত। এর পর জীবনের আর কোন সাড়া রইল না সেখানে।

মার্কুলোভ সেনানিবাসে আবার চক্কর দিতে শুরু করলে। দেয়ালের পাশ দিয়ে চলবার সময় সে যন্ত্রচালিতের মত বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে দেয়াল থেকে রঙের কুচি তুলে নিতে লাগল। সৈনিকেরা তখন তাদের ওভারকোটের নিচে একত্রে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আছে। নৈশপ্রদীপের ধোঁয়াটে আলোয় ঘুমন্ত সৈন্যদের দেহের কোন কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না,—এরা যে সব মানুষ শুয়ে আছে তা আর বোঝা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন একঘেঁয়ে কতকগুলি ধূসর জামার স্তূপ।

বিশেষ কিছু করবার না থাকায় সে লোকগুলির দিকেই উঁকি মেরে দেখতে লাগল। একজন তার হাঁটু দুটো উঁচু করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, বেশ সমতালে টানা টানা নিঃশ্বাস পড়ছে তার, অর্ধেক খোলা শান্ত মুখটা যেন কেমন বোকার মত দেখাচ্ছে। আর একজন মুখ নিচু করে ঘুমাচ্ছে, মাথাটা তার ভাঁজ করা বাঁ

হাতের ঘুঁজিতে, ডান হাতটা সটান দেহের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল করে রাখা, হাতের তালুটা উপরের দিকে মেলা। তার খালি পা দুটো খাটো ওভারকোটের ভেতর দিকে বেরিয়ে পড়েছে, পায়ের ডিম টানটান, আঙুলগুলি কুঁচকে যেন খিল ধরে গেছে। সামনেই সাধারণ সৈনিক য়েস্টিফয়েব কুঁকড়িমুকড়ি হয়ে শুয়ে রয়েছে,—লোকটা মার্কুলোভেরই গ্রামের লোক, তা ছাড়া একই দলের সৈনিক। শোয়ার ভঙ্গিটা বিশ্রী রকমের অস্বাভাবিক ঃ মাথাটা তার তেল-চিটচিটে লাল ক্যালিকোর বালিশের মধ্যে গোঁজা, হাঁটু দুটো এসে গেছে তার একেবারে থুঁথনির কাছে। মাথায় নিশ্চয়ই রক্ত উঠে গেছে তার, কারণ বালিশের নিচে থেকে তার কাতরানি শোনা যাচ্ছে।

মার্কুলোভের কেমন যেন অস্বস্তিকর দম-আটকানো ভাব জাগছে মনে। এই কয়েক মিনিট আগে প্রায় শখানেক লোক চলাফেরা করছিল এখানে, গল্প করছিল, কথা কাটাকাটি করছিল, আর এখন তারা সবাই নিশ্চল হয়ে শুয়ে, কেউ বা কাতরাচ্ছে, কেউ বা নাক ডাকাচ্ছে, তাদের সবাইকে যেন এমন এক রহস্য-লোকে নিয়ে আসা হয়েছে, যেটা যেন অন্য এক জীবন, যার হদিস কেউ দিতে পারে না। এখন আর ওরা কেউ সামরিক বিভাগে চাকরি করছে না, সৈনিক জীবনের কঠোরতা, সেনানিবাসের অন্ধকার ভাণ করা ফুর্তি, ওরা এখন এ সব কোন কিছুরই ধার ধারে না। ঘুমন্ত সৈনিকেরা এখন অস্থির হয়ে এ ওর বুকে মাথা নাড়াচাড়া করছে। মার্কুলোভ নিজের মনের দুঃখ নিয়েই চক্কর দিতে লাগল। কি এক নিদারুণ ভয়ে মার্কুলোভের মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল, শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল।

তিন-নম্বর পল্টনে নৈশপ্রদীপের নিচে যে ঘড়িটা ঝোলানো রয়েছে তার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল মার্কুলোভ, একদৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ ঘড়িটার দিকে। ঘড়ি দেখতে জানে না সে,—কিন্তু জানে, এর আগে যে ডিউটি দিচ্ছিল, সে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে গেছে যে, ঘড়ির বড় কাঁটাটা যখন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে আর ছোটটা তার সঙ্গে সমকোণ তৈরি করবে তখন তার ডিউটি শেষ হবে। এ ঘড়িটা অবশ্য একটা শস্তা ঘড়ি, দুই রুবল মাত্র দাম এর, ডায়ালটা চৌকো, কোণে কোণে তার ছোট ছোট গোলাপ ফুল আঁকা। পেতলের দুটো ভার লাগানো আছে এতে, তার একটার সঙ্গে তারে বাঁধা একটু পাথরের নুড়ি আর একটা লোহার বল্টু, আর একটা হচ্ছে পেতলের একটা পেণ্ডুলাম, এটা এত পুরনো যে, দেখলে মনে হয় কে যেন সেটা চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে।

রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে পেণ্ডুলাম টিক্-টক, টিক্‌টক করে চলতে লাগল আর মার্কুলোভ তাই কান পেতে শুনতে থাকল। প্রথম টিকটা একটু কম জোরালো হলেও স্পষ্ট, দ্বিতীয়টা যেন একটু অস্পষ্ট, কিসে যেন শব্দটাকে চেপে ধরেছে ভিতর থেকে। দুটো টিকের ভিতরে ঘড়ির মাঝে কি রকম যেন একটা আঁচড়ানোর শব্দ। টিক্-টক, টিক্-টক।

ঘড়ির টিক্-টকের তালে তাল মিলিয়ে মার্কুলোভ অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল,—দুর্-ভাগ্,—দুর্-ভাগ্। রাত্রির পাহারায় নিযুক্ত মার্কুলোভ আর ঘড়ির মধ্যে কি যেন এক অদ্ভুত মিল আছে ঃ কোন এক নিষ্ঠুর বিধাতা দুজনকেই একা একা রেখে সেকেণ্ড গোনাচ্ছে। পেণ্ডুলামও একঘেঁয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে যেন বলে চলেছে,—দুর্-ভাগ্,—দুর্-ভাগ্। সেনানিবাসের সর্বত্রই যেন একটা নিরানন্দ গা-ছমছমে ভাব, প্রদীপগুলির তেমন আলো নেই,—কোণে কোণে যেন কিসের ছায়া, ভাল লাগে না কিছু, মার্কুলোভ পেণ্ডুলামের সঙ্গে এক তালে বলতে লাগল,—দুর্-ভাগ্,—অর্থাৎ দুর্ভাগ্য।

এরপর সে এক নম্বর পল্টনের পাশে দূরের এক কোণে গিয়ে স্টোভ আর বন্দুকের গাদার মাঝখানে উঁচু একটা টুলের উপর পাতা বহুদিনের পুরোনো ময়লা অথচ চক্‌চকে এক আসনে বসে পড়ল। স্টোভ থেকে কয়লার গ্যাসের গন্ধ মেশানো একটু তাপ বেরিয়ে আসছিল। মার্কুলোভ তার জামার আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে ভাবতে বসল।

সম্প্রতি যে চিঠিখানা এসেছে তার বাড়ি থেকে, তার কথা মনে পড়ল তার। চিঠিখানা বেশ জোরে জোরে পড়ে শোনান হয়েছে তাকে। প্রথমে পড়ে শুনিয়েছেন পল্টনের ওয়ারেণ্ট অফিসার, তারপর আর্দালী-ঘরের কেরানী, তারপর তার গ্রামের যারা চিঠি পড়তে পারে তারা সবাই। এতবার শুনে শুনে চিঠিটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে,—এখন অন্য কেউ পড়তে গেলে যদি কোন কথায় গিয়ে আটকায় তা হলে নিজেই সে—সে কথাটা বলে দিতে পারে।

'একজন পদাতিক সৈন্যের চিঠি এটা—খুব জরুরী। এই বৎসরের ২০শে সেপ্টেম্বর মোক্রিয়িভার্কি গ্রামের পোস্টাফিস থেকে ছাড়া হয়েছে। তোমার বাবা লিখছেন চিঠি।'

'প্রিয় পুত্র, লুকা মইসিয়িভিচ্, তুমি তোমার পিতামাতার আশীর্বাদ জানিবে, আমরা দুজনেই ঈশ্বরের নামে তোমার কাজে সাফল্য কামনা করি, ভগবানের কৃপায় তোমার মা লুকেরিয়াত্রোফিমোভনা ও আমি কুশলে আছি, তোমারও কুশল কামনা করি। আর তোমার সাধ্বী স্ত্রী তাতিয়ানা আইভানোভ্না এই পত্রে তোমাকে সতী-সাধ্বীজনোচিত শ্রদ্ধা জানাইতেছে, সেও ভগবানের নামে তোমার স্বাস্থ্য ও সুখ শান্তি কামনা করে। আর তোমার শ্বশুর আইভ্যান ফেদোসিয়েভিচ্, তোমার শাশুড়ী এবং তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এই পত্রে তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইতেছেন, তাঁহারাও তোমার কাজে সাফল্য কামনা করেন। আর তোমার ভাই নিকোলাই মইসিয়িভিচ্ তার স্ত্রী এবং তাহাদের ছেলেপিলে তাহাদের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানায় এবং ভগবানের নামে তোমার মঙ্গল কামনা করে।

ঈশ্বরের কৃপায় এখানে সকলেই কুশলে আছেন, আমরা তোমারও কুশল কামনা করি। গ্রামের খবর পূর্বেকারই মত। 'নারীদিবসে' নিকোলাই আইভানোভের বড় রাস্তার উপরকার ঘরটা পুড়িয়া গিয়াছে,—মাতুশকাই উহাতে

অগ্নিসংযোগ করিয়াছে,—পুলিশও ঐ কথা বলে। প্রিয় লুকা, তোমার চিঠিটা তুমি একটু স্পষ্ট করিয়া লিখিও, উহাতে যে কি লেখা আছে তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেহই উহা পড়িতে পারিল না। ও চিঠি কে লিখিয়া দিয়াছিল, ঠিকানাই বা কে লিখিয়াছিল—জানাইবে; হাতের লেখা কাহার কেহই বুঝিতে পারিল না, মাথামুণ্ড কি যে লিখিয়াছে তাহাও বুঝা গেল না। ইতি—তোমার স্নেহশীল পিতা, এম্, মার্কুলোভ। তোমার পিতা লেখাপড়া জানে না বলিয়া পত্রখানা আনানী ক্লিমোভের দ্বারা লিখাইয়া লওয়া হইল।'

মার্কুলোভ মাথাটা নেড়ে মনের দুঃখে জিভ দিয়ে চক্ চক্ শব্দ করে আপন মনেই বলে উঠল,—দুর্ভাগ্য, বড়ই মন্দ কপাল। ভাবতে লাগল সে—দেশের প্রতি এই যে কর্তব্য করছে সে—এ শেষ হতে লাগবে আরও দু বৎসরেরও বেশি; বাড়ি থেকে এতদিন দূরে থাকা কি কষ্ট! নিজের স্ত্রীর কথাও ভাবছিল সে। সে মনে মনে বলছিল, আমার স্ত্রী যুবতী, ফুর্তিবাজ, আদরের দুলালী, চার বৎসর স্বামী ছেড়ে থাকা—তার পক্ষে সহজ নয়। সৈনিকের স্ত্রী। এই সৈন্যদের স্ত্রীরা যে কি বস্তু তা আমি জানি। লেফ্‌টেন্যাণ্ট জ্যাবিয়াকিন্ এই নিয়ে আমায় প্রায়ই ঠাট্টা করেন। বলেন,—তুমি বিয়ে করেছ ত?

হাঁ স্যার, করেছি।

রসো, এখান থেকে বাড়ি যাও আগে, দেখবে গিয়ে তোমার বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

হুঃ,—উনি ত হাসবেনই। দিব্যি নাদুসনুদুস চক্‌চকে চেহারা, সকালে উঠলেই অমনি চা আর রুটি। তারপর আর্দালি এনে দেবে তাঁকে পালিশ করা চক্‌চকে বুট। ড্রিলের সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া ছাড়া আর কাজ নেই। আর মার্কুলোভ, তুমি? সারা রাত জেগে কেবল পাহারা দাও।... মার্কুলোভ নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে লাগল,—দুর্ভাগ্য,—বড়ই দুর্ভাগ্য! শেষের কথাটা বলবার সময় একটা লম্বা হাই তুললে সে, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল এসে গেল।

মার্কুলোভের এত খারাপ আর কোনদিন লাগেনি,—কেউ যেন নেই তার—একেবারে নিঃসঙ্গ। তার কেবলি মনে হতে লাগল—পেত সে একটা নীরব দরদী শ্রোতা তা হলে তাঁর কাছে সে নিজের যত দঃুখের কথা সব বলত, তিনি মন দিয়ে তার কথা সব শুনতেন, বুঝতেন, সহানভূতি দেখাতেন, তাতেই শান্তি পেত সে একটু। কিন্তু কোথায় এমন লোক। সবাই নিজের দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ নিয়ে ব্যস্ত। আরে ভাই, কি জীবন! মার্কুলোভ মাথাটা একটু নেড়ে জোরে গানের মত সুর করে বলে উঠল,—ও-ও-ও- কি জীবন রে আমার!

ক্রমে সে অনুচ্চ স্বরে গান গাইতেই শুরু করে দিল। প্রথমে কোন কথা আসছিল না গানে,—শুধু একটি বিষাদের সুর,, পরস্পর সঙ্গতিহীন সব ভাব। কিন্তু এতেই মনটা তার যেন একটু কোমল হয়ে এল, প্রেরণা জাগল মনে, পূর্ব কথারই

পুনরাবৃত্তি করলে সে,—আরে—ও-ও-ও, কি জীবন রে আমার! পরে আরও হৃদয়স্পর্শী কথা আসতে লাগল :

ও গো আমার মা জননী
ও গো আমার স্নেহময়ী—

বেচারা সৈনিক লুকা মার্কুলোভের জন্য নিজের মনেই তার এক গভীর সহানুভূতি জাগল,—তার কথা কেউ ভাবে না। তাকে এমন খাবার দেওয়া হয় যে, তাতে তার পেট ভরে না, তাকে অতিরিক্ত ডিউটি করতে দেওয়া হয়, পল্টনের কমাণ্ডার তার দাম ঠিক করে ফেলেছেন, তার বিভাগের নেতাও তাই করেছেন,—তিনি আবার মাঝে মাঝে তার মুখে ঘুষি লাগান, এ ছাড়া ড্রিলের কষ্ট ত আছেই। যখন তখন তার অসুখ করতে পারে, হাত ভাঙতে পারে, পা ভাঙতে পারে, চোখের অসুখে সে অন্ধ হয়ে যেতে পারে! চোখের অসুখ ত আছেই—দলের প্রায় অর্ধেক লোক চোখের অসুখে ভুগছে। বাড়ি থেকে দূরে—বিদেশ-বিভূঁয়ে সে মারাও যেতে পারে। মার্কুলোভের বুকের মাঝে কি যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল, চোখ দুটি জ্বালা করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে একটা অলস মধুর সুর বুকের মধ্যে আঁকুপাকু করতে লাগল। মুখে মুখে গান বাঁধবার আগ্রহটা তার ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, এবং ঐ গানের যে সুর আসছিল তার মনে ত-ও যেন বড় কোমল মধুর বোধ হতে লাগল।

আমার সোনা মা-জননী, আমার প্রিয় মা রে!
শুইয়ে দিও আমায় শবাধারে,
পাইন কিংবা এস্‌পেন শবাধারে
মাটির মাঝে শুইয়ো আমারে।

সেনানিবাসের বাতাস যেন ভারি হয়ে এল, অসম্ভব ভারি ভারি বোধ হতে লাগল মার্কুলোভের কাছে। ঝুলে কালো নৈশপ্রদীপের আলো যেন স্নানাগারের বাষ্পায়মান আবহাওয়ার মত অস্পষ্ট হয়ে এল। মার্কুলোভ একটু কুঁজো হয়ে টুলের উপর পা আড়াআড়ি করে বসলে, হাত দুটি বেশ খানিকটা করে ঢুকিয়ে দিলে কোটের আস্তিনের ভিতর। কোটের ভিতর দেহটা আটকে গিয়ে বেশ একটু গরম বোধ হতে লাগল তার, কাঁধটায় কলারের ঘষা লাগতে লাগল, হুকগুলি গলায় বসে যেতে লাগল, একটু পরেই ভীষণ ঘুম পেতে লাগল তার। তার চোখের পাতা দুটো যেন ফুলো ফুলো লাগতে লাগল, চুলকাতে লাগল সেখানটা, কানের ভিতর কেমন যেন এক অস্বস্তিকর শব্দ ভেসে আসছে, ভিতরে, বুক কিংবা পেটের মাঝখানটা যেন ফাঁকা ফাঁকা, আঠা আঠা। সে যাতে ঘুমিয়ে পড়ে তার জন্য চেষ্টা করতে লাগল খুব,—তবু কোমল অথচ দুর্বার শক্তিসম্পন্ন কি যেন একটা তার মাথাটাকে মাঝে মাঝে চেপে চেপে ধরতে লাগল, চোখের পাতা দুটি তার মিটমিট করে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল, ভেতরের সেই ফাঁকা ফাঁকা ভাব, সেনানিবাস, দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের ক্লেশ—সব কিছু যেন ধুয়ে মুছে যেতে লাগল।

তার মন থেকে। সব যেন শান্তির আর স্বস্তির। তার মাথাটা যেন ছোট ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে নুয়ে নুয়ে পড়ছে, ক্রমেই নিচুতে নেমে যাচ্ছে—তা সে বুঝতেই পারছিল না, তারপর হঠাৎ এক সময় চমকে উঠে ভয় পেয়ে চোখ মেলছিল, পিঠ আর মুখটা তখন সিধে, খাড়া রাখবার চেষ্টা করছিল, সঙ্গে সঙ্গে অনিদ্রার অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ফিরে আসছিল আবার দেহে।

এই তন্দ্রাচ্ছন্ন সংক্ষিপ্ত মুহূর্তগুলিতে মনে পড়ছিল তার নিজের গ্রামের কথা,—ওখানকার কিসের কিসের কথা মনে পড়ছিল তার, সেটা বড় কথা নয়, তার কাছে সবচেয়ে বড় এবং আনন্দের কথা হচ্ছে ওগুলি বাস্তবের চেয়েও অধিকতর স্পষ্ট এবং সুন্দর হয়ে ফুটে উঠছিল তার চোখের সামনে। মার্কুলোভ তার সাদা ঘোড়াটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, সারা গায়ে তার ছিটেছিটে দাগ, কে যেন গম ছিটিয়ে দিয়েছে। গরুঘোড়া চরবার মাঠটায় সামনের পা দুটো একটু বাঁকা করে দাঁড়িয়ে ছিল সে, পিছনের আর পাঁজরার হাড়গুলি বেরিয়ে পড়েছে তার। মাথাটা নিচু করে মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। সামান্য কয়েকগাছা লম্বা চুল সমেত নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে তার, সাদা ভুরুওয়ালা হালকা নীল রঙের চোখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে মার্কুলোভের দিকে।

মাঠটার ওধারে দেখা যাচ্ছে চাষীদের গাড়ি চলবার চওড়া রাস্তাটা। মার্কুলোভের মনে হল সময়টা যেন তখন সুখোষ্ণ বসন্তের একটি সন্ধ্যা, রাস্তাটা তাই কাদায় কালো হয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে তার ঘোড়ার ক্ষুরের গর্ত, তার মাঝে যে জল জমে রয়েছে,—সূর্যাস্তের আলো পড়ে তা গোলাপী আর হলদে দেখাচ্ছে। গ্রামের ছোট্ট একটি রাস্তার আড়াআড়ি এসে কাঠের ছোট সেতুটার নিচে দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে, জল তার যেমন স্বচ্ছ তেমনি স্থির,—যেন একখানা আয়না,—দূরে নদীটাকে তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, সব কিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছে কে যেন একে পান্নার মত সবুজ খাড়া পাড়ের নিচে এনে সযত্নে বসিয়ে দিয়েছে। তীরের নরম হলদে-সবুজ পাতাওয়ালা উইলো গাছগুলির গোল মাথার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পড়েছে এর জলে,—এমন কি ওখানে তীরেরও ছায়া পড়েছে, সে ছায়া যেন সত্যিকার তীরের চেয়েও বেশি সবুজ, গাঢ় রঙের পান্নার মত তার রঙ। দূরে নির্মেঘ স্বচ্ছ আকাশে গির্জের লম্বা সরু ঘণ্টা-বুরুজটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বুরুজটা কাঠ দিয়ে তৈরি, গায়ে তার গোলাপী ডোরাকাটা, মাথায় শক্ত সবুজ ছাদ। এর পরেই মার্কুলোভদের সব্জী বাগান, পাখিতাড়ানোর জন্য তৈরি মানুষের মূর্তি বেশ দেখা যাচ্ছে, মাথায় তার মার্কুলোভের বাপের পুরনো টুপি, মূর্তিটা এমন হেলে রয়েছে যে, দেখলে মনে হয় এখনই পড়ে যাবে,—শতছিন্ন আস্তিনপরা হাত দুটো যেন পাখিতাড়ানোর জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে প্রসারিত।

মার্কুলোভ দেখলে, সে যেন ঘোড়ায় চড়ে কাদায়-ভরা কালো পথটা দিয়ে বাড়ি ফিরছে। সে তার সাদা ঘোড়াটার এক পাশে পা ঝুলিয়ে বসেছে, ঘোড়ার প্রতি-

পদক্ষেপে তার পা দুলছে,—ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে পিছলে যাচ্ছে তার দেহটা। ঘোড়া কাদার ভিতর থেকে পা তোলার সময় বেশ জোরে ফচ্ ফচ্ শব্দ হচ্ছে। মৃদু বাতাস এসে মার্কুলোভের চোখে মুখে লাগছে, তার সঙ্গে নাকে আসছে বরফগলা মাটির গন্ধ, বড় ভাল লাগছে মার্কুলোভের। সারাদিন ভীষণ পরিশ্রম করেছে মার্কুলোভ, প্রায় তিন একর জমির ফসল কেটেছে সে, সারা গা তার ব্যথা হয়ে গেছে, হাতটা প্রায় জখম হয়ে গিয়েছে, পিঠটা নাড়তে পারছে না, তবু ঘোড়ার পিঠে পা দুলাতে দুলাতে মনের আনন্দে সে গান ধরেছেঃ

'ওরে আমার ফলের বাগান,—ফলের বাগান রে!'

ঠাণ্ডা খামার-বাড়িতে গিয়ে খড়ের গাদার উপর হাত পা ছড়িয়ে যখন সে শুতে পারবে, তখন কি আরামই না হবে!

ঝিমুনিতে মাথাটা তার নুয়ে পড়ল আবার, হাঁটুতে গিয়ে লাগল, বুকের মাঝে অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে অমনি জেগে উঠল সে। আশ্চর্য হয়ে নিজের মনেই সে বিড়বিড় করে বলে উঠল,—আরে, ঘুমুচ্ছিলাম আমি! বড্ড দুঃখ লাগতে লাগল তার ঃ বসন্তের সেই কাদায় কালো গ্রামের রাস্তা, নদীর স্বচ্ছ জলে উইলোর ছায়া আর সে এখন দেখতে পাবে না, বরফধোয়া টাটকা মাটির ঘ্রাণও সে আর পাবে না। আবার ঘুমিয়ে পড়বে ভয়ে, উঠে সে সেনানিবাসের চারিদিকে আবার চক্কোর দিতে শুরু করলে। অনেকক্ষণ বসে থাকায় পা দুটো তার অবশ হয়ে গিয়েছিল, প্রথম প্রথম পা যে তার আছে তাই সে বুঝছিল না।

ঘড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ডায়ালটার দিকে নজর পড়ল তার। বড় কাঁটাটা এবার ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর ছোট কাঁটা তার সামান্য একটু ডাইনে। দুপুর রাত পার হয়ে গেছে এবার,—ভাবলে মার্কুলোভ। মস্ত বড় একটা হাই তুলে মুখের উপর কয়েকবার ক্রুশ চিহ্নের ভঙ্গি করে সে দ্রুত প্রার্থনার মত করে আউড়ে গেল, "হে ঈশ্বর, মহিয়সী জননী,—এখনও আড়াই ঘণ্টার মত বাকি আছে—হে আমাদের পিতৃতুল্য ভ্রাতৃতুল্য ঋষি পিয়তর, আলেক্সি, য়োনা, ফিলিপ—"

এদিকে বাতির প্যারাফিন সব ফুরিয়ে এসেছে, সেনানিবাস প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। যারা ঘুমচ্ছে তারা স্বস্তি পাচ্ছেনা দেহে ঃ শক্ত গদিতে শুয়ে তাদের হাত মাথা সব অবশ হয়ে গিয়েছে। কেউ বা কাতরাচ্ছে, কেউ বা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কেউ বা বিকট শব্দে নাক ডাকাচ্ছে। বিষণ্ণ অন্ধকারে একঘেয়ে ধূসর স্তূপের ভেতর থেকে যে শব্দ আসছে সে যেন মানুষের নয়, কোন রহস্যালোকের,—এই অশুভসূচক শব্দগুলি মনটাকে একেবারে দমিয়ে দেয়।

মার্কুলোভ নিজের মনেই বেশ জোরে জোরে বলে উঠল, একটু বাইরে গেলে কেমন হয়?—তারপর সে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরে একেবারে ঘুটঘুটে আঁধার, তা ছাড়া গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে,—অতি ছোট ছোট গুঁড়ি। উঠানের অপর পাশের জানলাগুলি দিয়ে মিটমিটে

আলো দেখা যাচ্ছে,—ওগুলি ষষ্ঠ আর সপ্তম সৈন্যদলের ডেরা। ছাদ আর জানলার কাঁচে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ার মৃদু শব্দ হচ্ছে, মার্কুলোভের টুপিতেও। কাছেই কোথাও নর্দমার পাইপ দিয়ে বৃষ্টির জল বেশ তোড়ে বেরিয়ে একটা পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে। এ সকল শব্দ ছাপিয়ে আর একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসছে মার্কুলোভের ঃ কে যেন সেনানিবাসের দেয়াল ঘেঁষে জলের মাঝে ছপ ছপ করে পা ফেলতে ফেলতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মার্কুলোভ ভাল করে দেখবার জন্য ফিরে দাঁড়াল,—শব্দ অমনি থেমে গেল। কিন্তু অন্য দিকে মুখ ফিরালেই আবার সেই ভারি ছপ ছপ শব্দ কানে আসতে লাগল। মার্কুলোভের মনে হল—এ সব তার কল্পনা, আসলে কেউ আসছে না। এবার চটপট শব্দে বৃষ্টি দেখবে বলে উপরের দিকে তাকালে সে। আকাশে একটিও তারা নেই।

হঠাৎ তার কাছেই পঞ্চম সেনাদলের ঘরে ঢুকবার দরজাটা খুলে গেল,—দরজার কপিকলটা যেন একটা আর্তনাদ করে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে যে স্বল্প আলো আসছিল তাতে দেখা গেল মার্কুলোভের সামনে দাঁড়িয়ে কোট আর টুপি-পরা একজন সৈনিক। কপিকলে বিকট শব্দ তুলে দরজাটা আবার তখনই বন্ধ হয়ে গেল। আবার সেই অন্ধকার। বুঝাই যায় না এ কোন জায়গা। যে সৈনিকটা বেরিয়ে এল,—মার্কুলোভ বুঝলে সে এখন বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, হাত দুটোও বেশ জোরে জোরে রগড়াচ্ছে।

মার্কুলোভ ভাবলে এ-ও বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে। এই জ্যান্ত জাগ্রত লোকটির কাছে ছুটে গিয়ে তার মুখের দিকে একবার তাকাতে, তার কথা একবার শুনতে প্রবল ইচ্ছা জাগছিল মার্কুলোভের মনে।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না সৈনিকটিকে, তবু মার্কুলোভ তার উদ্দেশ্যে বললে, একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিতে পার, ভাই?

সিঁড়ির ওখান থেকে ভাঙা নিচু গলায় উত্তর এল, পারি, একটু সবুর কর।

মার্কুলোভ শুনতে পেল লোকটা বেশ শব্দ করে তার পকেট হাতড়াচ্ছে,—হাঁ, এইবার সে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটাও হাতে পেয়েছে, খস খস শব্দ হচ্ছে।

দুই ছাউনির মাঝখানে পাতকুয়োটার কাছে এসে দাঁড়াল দুইজন, ভিজে পিছল কাদার মধ্যে তাদের জুতোর ছপছপানি শুনে শুধু তারা বুঝছে যে তারা এবার কাছে এসেছে।

সৈনিক দিয়াশলাই দিতে গিয়ে বললে, এই যে! কিন্তু মার্কুলোভ তার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা দেখতে না পেয়ে নিজের বাক্সটাই শুধু একটু নাড়লে।

আসলে মার্কুলোভের দিয়াশলাইয়ের কাঠির কোন দরকার ছিল না, কারণ সে ধূমপান করে না,—জেগে আছে, অতি প্রাকৃত শক্তি ঘুমের কবলে পড়েনি—এমন একটি লোকের সান্নিধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য সে শুধু আসতে চায়।

সে বললে,—ধন্যবাদ, দুটো কাঠি হলেই চলবে, ঘরে আমার একটা বাক্স আছে, কিন্তু কাঠি নেই।

কুয়োটার উপরে যে উঁচু ছাদ দেওয়া আছে, তারই নিচে এসে ওরা দুজন দাঁড়ালে। মার্কুলোভ হাতলওয়ালা মস্ত বড় যে কাঠের চাকাটা আছে তাতে আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে তা নাড়তে লাগল,—চাকাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে করুণ আর্তনাদ তুলে ঘুরতে লাগল। দুজন সৈনিক কুয়োর কিনারায় ভর দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

মার্কুলোভ বললে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার,—বলেই বেশ জোরে হাই তুললে। অপর সৈনিকও সঙ্গে সঙ্গে হাই তুললে। গভীর কূপের জলে তাদের কথা এবং হাইতোলার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

পাঁচ নম্বর দলের সৈন্যটি একরকম উদাস কণ্ঠেই বললে, দুপুর রাত্রি নিশ্চয়ই পার হয়ে গেছে।...সেনাবিভাগে কতদিন কাজ করছ তুমি?

সৈনিকের কণ্ঠস্বর শুনেই মার্কুলোভ বুঝলে সে এবার তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। মার্কুলোভও ফিরে দাঁড়াল তার দিকে, কিন্তু অন্ধকারে তার মুখের কিছুই দেখতে পেল না সে।

আঠার শো নব্বই থেকে।...আর তুমি?

আমিও তখন থেকে।...তুমিও ওরেল অঞ্চল থেকে এসেছ?

মার্কুলোভ বললে,—না, আমি এসেছি ক্রোমি অঞ্চল থেকে, আমার গ্রামের নাম হচ্ছে মোক্রিয় ভার্রখি,—এ গ্রামের নাম শুনেছ কোন দিন?

না, আমি এসেছি অনেক দূর থেকে,—য়িলেতসের কাছাকাছি। কিচ্ছু ভাল লাগে না এখানে।—কথাগুলি যখন বললে তখন সে হাই তুলছে আর ঢোক গিলছে,—তাই শোনাল যেন,—'আহমুহে ইস্‌সদুল্লোর'।

কিছুক্ষণ তারা দুজনেই চুপ করে রইল, তারপর যে য়িলেতস্ থেকে এসেছে সে কুয়োর ভিতর পিচ্ করে থুথু ফেললে। প্রায় দশ সেকেণ্ড কেটে গেল। মার্কুলোভ মাথাটা কাৎ করে—বিশেষ কৌতূহল নিয়ে শুনতে লাগল ওর কথা। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে ঠন্ করে কিসের যেন স্পষ্ট শব্দ হল,—দুটো নুড়ির ঠোকাঠুকি হওয়ার মত শব্দ।

য়িলেতসের লোকটি বললে,—কুয়োটার জল বেশ গভীর।—বলেই আবার থুথু ফেললে সেখানে।

মার্কুলোভ তাকে তিরস্কারের সুরে বললে, জলে এমনি করে থুথু ফেলা পাপ,—এ আর করোনা বলে নিজেই আবার সেখানে থুথু ফেললে।

থুথু ফেলা এবং কুয়োর জলে সেই থুথু পড়ার শব্দ শোনার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান,—এতে বড় মজা লাগছিল দুজনের।

য়েলেতসের সৈনিক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলে, আচ্ছা, ধরো, কেউ যদি এই কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ত কি হয়? আমার মনে হয় জলে পড়বার আগেই তার মাথাটা দুম করে একবার কুয়োর দেয়ালে ঠুকে যায়?

মার্কুলোভ তার কথায় সায় দিয়ে বললে, হাঁ,—তাই হয়। সে বেশ একটু মুস্কিলে পড়ে যায়।

ও উত্তর দিলে, হাঁ, বিপদেই পড়ে বটে! মার্কুলোভ ভাবে বুঝলে—কথা বলবার সময় ও মাথাটা নাড়লে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপে কেটে গেল, তারপর আবার দুজনেই কুয়োর মধ্যে থুথু ফেললে। হঠাৎ মার্কুলোভ বলে উঠল ঃ

জান, কি মজার ব্যাপার হয়েছে?—ব্যারাকে বসে আছি আমি—বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এমন সময় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

একটা কবিতার মত করে স্বপ্নের পুঙখানুপুঙখ বিবরণ দিতে চেয়েছিল মার্কুলোভ ঃ তার গ্রামের মাটির সুবাস, সুদূরের সেই চিরাভ্যস্ত মধুর জীবন-যাত্রার সব কিছু। কিন্তু তাই দিতে গিয়ে সে যা বললে, সে অতি সাধারণ কথা, বর্ণহীন সুষমাহীন সে কথা শুনে কারো মন গলে না।

মার্কুলোভ বললে,—স্বপ্নে দেখলাম আমি যেন আমার গ্রামে রয়েছি—সন্ধ্যাকাল। সব যেন দেখতে পাচ্ছি আমি। এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, স্বপ্নের মতই মনে হচ্ছে না আমার।

অপর সৈনিক নিজের গাল আঁচড়াতে আঁচড়াতে উদাস সুরে উত্তর দিলে,—হাঁ, এই রকমই হয়।

আর আমি যেন আমার ঘোড়ায় চড়ে চলেছি,—আমার দামড়া ঘোড়ায়। আমাদের একটা সাদা দামড়া ঘোড়া আছে,—বছর বিশেক তার বয়েস। কে জানে হয়ত এত দিন সে মারাই গেছে।

অপর সৈনিক উত্তর দিলে,—ঘোড়ার স্বপ্ন দেখার মানে খারাপ কিছু ঘটবে,—কেউ হয়ত শীগগিরই তোমায় প্রতারণা করবে।

আমি আমার দামড়া ঘোড়ায় চড়ে চলেছি,—সব কিছু দেখতে পাচ্ছি আমি, —ঠিক যেন সব আগেকার মত। এমন অদ্ভুত স্বপ্ন আমার যে—

অপর সৈনিক শ্লথ কণ্ঠে বললে,—হাঁ, লোকে স্বপ্নে অনেক কিছুই দেখে থাকে।...কিছু মনে করো না, আমাদের সার্জেণ্ট আবার এদিকে রাত্রে রোঁদে বেরোন, নমস্কার।

নমস্কার, বন্ধু।...কি রাত্রি রে বাপু,—যেন নরকের অন্ধকার!

বাইরের মুক্ত বায়ুতে থাকবার পর সেনানিবাসের বাতাস যেন অসহ্য লাগছিল মার্কুলোভের। মানুষের গায়ের গন্ধ, কড়া তামাকের গন্ধ, কোটের কাপড়ের বোটকা গন্ধ, আর যা-তা করে সেঁকা রুটির তীব্র গন্ধ এখানকার বাতাস একেবারে কলুষিত করে রেখেছে। লোকগুলি সব ঘুমচ্ছে বটে তবে অস্থিরতা নিয়ে ঘুমচ্ছে ঃ কেউ বা ছটফট করছে, কেউ কাতরাচ্ছে, কেউ এমনভাবে নাক ডাকাচ্ছে যে, শুনলে মনে হয় প্রত্যেকবার শ্বাস নিতে তাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তিন নম্বর পল্টনের ওখানে পদচারণা করবার দময় মার্কুলোভ দেখলে একজন সৈনিক হঠাৎ

উঠে বসলে তার বিছানায়। কয়েক সেকেণ্ড সে এদিক ওদিক পাগলের মত তাকালে, যেন কিছুই বুঝে উঠছে না, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দিয়ে কি রকম এক শব্দ করতে লাগল। তারপর ভীষণভাবে নিজেকে সে আঁচড়াতে লাগল,—প্রথমে মাথা, তারপর বুক। এরপর আবার ঘুমে কাত হয়ে পড়ল সে বিছানার উপর। আর একটা লোক দ্রুত কর্কশ কণ্ঠে বিড়বিড় করে অনেক কিছু বলে গেল। মার্কুলোভের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। লোকটার উচ্চারিত কথার কিছু কিছু সে বুঝতেও পারলে। সে যেন বললে,—পৃথক করো না, পৃথক করো না, একটা গেরো দিয়ে বেঁধে ফেল, একটা গেরো দাও—বলছি। গভীর রাত্রে এই রকম সব প্রলাপ বড় ভয়ঙ্কর লাগে মার্কুলোভের কাছে। মার্কুলোভের মনে হয় ঐ সব প্রলাপ কোন লোকের নিজের কথা নয়, অদৃশ্য একটা কিছু এসে ভর করে ওর আত্মায়,—এ সব তারই কথা।

ঘড়িটা টিক্‌টিক্‌ করে চলেছে বটে,—কিন্তু সব টিক্‌ যেন সমান তালে নয়, প্রথম টিকের পর দ্বিতীয় টিকের বেলায় যেন বেশি দেরি করছে, আর ওর কাঁটা দুটো যেন একেবারে নড়ছেই না। হঠাৎ মার্কুলোভের মনে এক অদ্ভুত চিন্তার উদয় হল। তার মনে হল মহাকালের রথ একেবারে থেমে গেছে, এ রাত্রি আর শেষ হবে না, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর,—অনন্তকাল ধরে এই রাত্রি চলবে, লোকগুলি এমনি করে গভীর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঘুমাবে, ঘুমের মধ্যে এমনি প্রলাপ বকবে, নৈশ প্রদীপগুলি এমনি মিটমিট করে জ্বলবে, ঘড়ির দোলক এমনি নিস্পৃহ মন্থর গতিতে চলবে,—চলতে থাকবে এ চিরকাল। এই অদ্ভুত অস্পষ্ট অনুভূতির কারণ কি, মার্কুলোভ তা কিছু বুঝলে না,—কিন্তু ভীষণ রাগ হল তার মনে। অন্ধকারে মুষ্টি আস্ফালন করে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠল, —শয়তান সব, একবার তোমাদের কছে পেলে মজা দেখাচ্ছি।

আবার সে সেই আগেকার জায়গায় এসে বসে পড়ল,—সেই স্টোভ আর বন্দুকের গাদার মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা এসে তার কপালের দু পাশে স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগল। মার্কুলোভ নিজের মনেই চুপি চুপি বলতে লাগল,—এখন,—এখন—কি চাই আমি? পরিচিত মধুর কোন কিছুর স্বপ্ন দেখা এখন যেন তার আয়ত্তের ভিতর এসে গেছে এই বিশ্বাস নিয়ে সে বলতে লাগল,—হাঁ, এবার এস আমার গ্রাম, এস আমাদের নদী,—এস তোমরা স্বপ্নে দেখা দাও।

আবার সেই ছোট্ট নদীটি সবুজ ঘাসের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে কখনও মখমলে ঢাকা পাহাড়ের আড়ালে পড়ছে, কখনও দেখা দিচ্ছে তার কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলের ধারা, চোখের সামনে আবার সেই চওড়া ফিতের মত বিছানো গাড়ির চাকার দাগকাটা কালো রাস্তা, নাকে আসছে বরফগলা মাটির গন্ধ, মাঠের বুকে গোলাপী জল করছে চিক্‌চিক্‌,—মুখে লাগছে সুখোষ্ণ বাতাসের মধুর স্পর্শ,—মার্কুলোভ তার গাঁটওলা ঘোড়ার পিঠে চড়ে হেলে দুলে চলেছে, আর তার পিছনে ফালটা উঁচু করে লাঙ্গল নিয়ে কে যেন আসছে।

ওরে আমার ফলের বাগান,—ফলের বাগান রে!

মার্কুলোভ গলা ছেড়ে গান ধরেছে—এরপর বাড়ি গিয়ে টাটকা খড়ের গাদার উপর হাত পা ছড়িয়ে শুতে কি আরামই হবে! রাস্তার দুধারে সব চষা ক্ষেত, চক্‌চকে নীল-কালো মেশানো রঙের দাঁড়কাক সব পা ফেলে ফেলে চলছে সেখানে, জলা ডোবায় ব্যাঙেরা সব কর্ণবধিরকারী ঐকতান ধরছে। সঞ্চারিত উইলোর দিব্য গন্ধে বাতাস ভরপুর।

'ওরে আমার ফলের বাগান, ফলের বাগান রে!

সাদা দামড়া ঘোড়াটা শুধু ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে অসমতালে চলেছিল—এইটা বিশ্রী লাগছিল মার্কুলোভের। এই যে আবার সেই রকম করছে সে। মার্কুলোভ উল্টে পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে গেল। জিনে একটু ভালো করে এঁটে বসতে হচ্ছে এবার। এক ঝাঁকি দিয়ে ডান পাটা অন্য দিকে নেবার চেষ্টা করলে সে, কিন্তু পাটা কিছুতেই নড়ল না, ভীষণ ভারি, কে যেন ভারি একটা বোঝা বেঁধে দিয়েছে পায়ে। ঘোড়াটা আবার কেবলি ঝাঁকানি আর দোলানি দিচ্ছে।

আরে এই, ওঠো,—ঘুমিয়ে পড়েছ?

মার্কুলোভ ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল,—তখনই চোখ মেললে সে।

উপর থেকে তখনই কে যেন বলে উঠলেন, ঘুমুচ্ছে,—বদমাসটা।

মার্কুলোভ এক লাফে টুল থেকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে মাথার টুপিটায় হাত দিলে। সার্জেণ্ট মেজর তারাস গ্যাবরিলোভিচ্ তার সামনে দাঁড়িয়ে, পরনে কেবল তার অন্তর্বাস, মাথার চুল এলোমেলো। মার্কুলোভের চোয়ালে ঘুষি মেরে ঘুম থেকে জাগিয়েছেন তিনি।

সার্জেণ্ট মেজর বেশ ক্রুদ্ধ স্বরেই আবার বললেন,—ঘুমানো হচ্ছে—শুয়োরের বাচ্চা,—ডিউটি দিতে এসে ঘুমানো হচ্ছে,—ঘুমানো বের করছি আমি তোমার।

হঠাৎ মার্কুলোভের চোয়ালের হাড়ে বেদম এক ঘুষি পড়ল,—সারা শরীরটা তার কেঁপে উঠল, মাথাটা একটু নেড়ে ভাঙাগলায় বিড়বিড় করে সে বললে,—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, সার্জেণ্ট।

এঁ্যা,—বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে তুমি?—তাই বুঝি? বেশ, তোমার পালা ছাড়া আরও দুবার বেশি ডিউটি দিতে হবে তোমার,—তা হলে আর ক্লান্ত হবে না। তোমার ছুটি হবার কথা কখন?

দুটোয়, সার্জেণ্ট।

ধুত্তোরি,—সে সময় কখন পার হয়ে গেছে। এবার ফুর্তি করে পরের লোককে উঠিয়ে দাও,—যাও, চটপট তুলে দাও।

সার্জেণ্ট চলে গেলেন। এরপর য়্যার ডিউটি দেবার কথা, সেই বুড়ো সৈনিক র‍্যাবোশাপকা যে তক্তপোষে ঘুমুচ্ছে তার কাছে ছুটে গেল মার্কুলোভ। নিজের মনের মধ্যেই কে যেন মহোল্লাসে বলে উঠছিল,—ঘুম, ঘুম, ঘুম—দুটো বেশি

ডিউটি দিতে হবে,—হবে ত হবে,—গ্রাহ্য করি না আমি, সে ত পরের কথা, এখন ত আমি ঘুমতে যাচ্ছি।

ঘুমন্ত র‍্যাবোশাপকার পায়ে ঠেলা দিতে দিতে ভয়ে ভয়ে তার কানে মুখ দিয়ে মার্কুলোভ ডাকলে, র‍্যাবোশাপকা কাকা,—শুনছ, ও র‍্যাবোশাপকা কাকা—

ধুত্তোরি,—ভাগো—

উঠে পড়,—র‍্যাবোশাপকা কাকা,—ডিউটি বদলের সময় হয়েছে,—উঠে পড়।

আঃ রে!

এতক্ষণ পাহারা দিয়ে মার্কুলোভ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, র‍্যাবোশাপকাকে জাগাবার তর আর তার সইল না, সে ছুটে নিজের তক্তপোষে গিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের জামাকাপড় খুলে দুটি ঘুমন্ত সৈনিকের মাঝে নিজেকে ঢুকিয়ে দিল, ওরা আবার মার্কুলোভকে দু দিক থেকে চেপে অসাড় হয়ে পড়ে রইল, যেন দুটি মরা মানুষ।

এক সেকেণ্ডের জন্য মার্কুলোভের মনে পড়ল—ঐ কুয়ো,—ঘুটঘুটে আঁধার রাত্রি, নর্দমার পাইপের ভিতর দিয়ে সেই তোড়ে জল বেরুনো, আর অদৃশ্য লোকটার সেই জলকাদার ভিতর দিয়ে ছপছপ করে চলার কথা। ওঃ সেখানটা এখন কেমন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা,—ভাবতে গেলেও গা ছমছম করে। এক জৈবিক আনন্দে মার্কুলোভের মনটা এখন ভরে গেল। দুটো কনুই দিয়ে দু পাশ আচ্ছা করে চেপে ধরে, হাঁটু দুটো উপরে তুলে নিয়ে, মাথাটা সে বালিশের অনেকটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, তারপর নিজের মনেই চুপে চুপে বললে,—এবার এস, রাস্তা এস,—শীগগির—

আর একবার সেই গাড়ির চাকার দাগকাটা আঁকাবাঁকা কালো রাস্তাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, নদীর স্বচ্ছ বুকে উইলো গাছের সবুজ কোমল প্রতিবিম্ব আবার জ্বলজ্বল করতে লাগল...তারপরই হঠাৎ এক সময় ভয়ঙ্কর অথচ মনোজ্ঞ গতিতে সে নিজেকে সুপ্তি-গভীর কোমল অন্ধকারে ঠেলে দিলে।

১৮৯৯

সাদা পুড্‌ল্‌

১

ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলের সংকীর্ণ পার্বত্য পথ দিয়ে চলে এক গ্রীষ্মাবাস থেকে অন্য গ্রীষ্মাবাসে ঘুরে ঘুরে তারা খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। সাদা পুড্‌ল্‌টার নাম আর্তো, দেখতে সে অনেকটা সিংহের মত, গোলাপী রঙের লম্বা জিভটা এক পাশে বের করে কদম চালে ছুটতে থাকে সে আগে আগে, তার পিছনে থাকে ওরা দুজন। প্রায়ই এমনিভাবে চলে ওরা। যেখানে দুটো পথ এসে আড়াআড়ি মিশে গেছে, আর্তো সেখানে এসে থেমে গিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ওদের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চায়। ওদের কাছ থেকে কি ইঙ্গিত সে পায় তা সেই জানে,—কিন্তু ইঙ্গিত পাবার পরই আনন্দে কান দুটি নাড়তে নাড়তে আবার সে দৌড়াতে থাকে, ভুল পথে কখনই সে চলে না। আর্তোর পিছনে পিছনে চলে বারো বছরের একটি ছেলে, নাম তার সার্জি। বাঁ বগলে তার কম্বলে জড়ানো দড়াবাজির সরঞ্জাম, আর ডান হাতে ঝুলানো নোংরা ছোট্ট একটা খাঁচা, সে খাঁচায় থাকে একটা গোল্ডফিঞ্চ পাখি। পাখিটাকে ভবিষ্যৎ গণনার জন্য একটা বাক্স থেকে রঙিন কাগজের টুকরো টেনে বের করতে শিখানো হয়েছে। বাঁকা পিঠের উপর একটা হার্ডিগার্ডি নিয়ে সবার শেষে নেঙচে নেঙচে চলে বুড়ো মার্তিন লোদিঝকিন।

হার্ডিগার্ডিটা বড্ড পুরানো, অসংখ্য মেরামত করতে হয়েছে তাকে, এখন যা শব্দ বেরোয় তা শুনে মনে হয় যেন ব্যাঙ ডাকছে বা কেউ কাসছে। দুটো মাত্র সুর বাজে এতে,—লনারের রচিত একটা বিষণ্ণ জার্মান ওয়াল্‌জের সুর, আর 'চীন যাত্রা' থেকে একটা জলদ সুর। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে এ দুটো সুরেরই খুব প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন ভুলেও কেউ এদের নাম করে না। যন্ত্রটার দুটো পাইপ আছে, যেগুলো সব কিছু পণ্ড করে দেয়। পাইপ দুটোর যেটি সবচেয়ে উঁচু সুরে বাজে সেটা বাজতেই চায় না, ওটার বাজার সময় হলে সুরটা কখনও তো—তো করতে থাকে, কখনও খুঁড়িয়ে চলে, কখনও হোঁচট খায়। আর একটা পাইপ, যেটা নিচু সুরে বাজে তার ঢাকনিটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হতে জানে না, সুতরাং একবার গম্ভীর রবে বাজাতে শুরু করলে আর থামতে জানে না, অন্য সুরকে ডুবিয়ে বিশৃঙ্খল করে শুধুই বাজতে থাকে,—শেষে একসময় নিজের খেয়ালেই থেমে যায়। বুড়ো তার যন্ত্রের এসব দোষত্রুটির কথা জানে, তাই মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাব নিয়েই তামাসা করে বলে ঃ

কি করা যায় বলো,—উপায় নেই। একে পুরানো যন্ত্র, তাতে সর্দি লেগেছে। যখন আমি একে বাজাতে শুরু করি, লোকে বলে, আরে, কি বিশ্রী বাজনা। কিন্তু যে সুরগুলি এতে বাজে, সেগুলি একদিন খুব ভাল সুরই ছিল,—ঐ সুর শোনাই সেকালের ফ্যাশন ছিল, এখনকার ভদ্রলোকেরা আমার যন্ত্রের সঙ্গীতের তারিফ করেনা। তারা চায় 'গিশা', 'আণ্ডার দি ডবল হেডেড্ ঈগল', 'বার্ড-সেলার' থেকে ওয়াল্জ। আর ধরো আমার এই পাইপগুলি। আমার যন্ত্রটা একটা মেরামতের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা এটা মেরামত করতেই চায় না, বলে, নতুন পাইপ বসিয়ে নাও,—তার চেয়েও ভাল হয় যন্ত্রটা যদি তুমি পুরানো জিনিসের স্মারক হিসাবে কোন মিউজিয়মে বিক্রি করে দাও। আচ্ছা সার্জি, যন্ত্রটা ত এতদিন তোমায় আমায় খাইয়েছে,—খাওয়ায়নি? আশা করা যাক আরও কিছুদিন খাওয়াবে এ।

লোকে জীবন্ত প্রাণী বা আত্মীয়স্বজনকে যেমন ভালবাসে বুড়ো ঠিক তেমনি করে ভালবাসে তার যন্ত্রটিকে। ওর কঠিন ভবঘুরে জীবনের বহু বৎসর কেটেছে এই যন্ত্রটিকে নিয়ে, ফলে ক্রমে এ তার কাছে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এক জীবন্ত প্রাণী হয়ে উঠেছে। হার্ডিগার্ডিটা বুড়ো সাধারণত তার পাশে রেখেই শোয়, একবার এক নোংরা সরাইখানাতে রাত্রি কাটাবার সময় হার্ডিগার্ডিটা পাশ থেকে বুড়ো মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত কেঁপে কেঁপে ক্ষীণ বিষণ্ণ সুরে বেজে উঠেছিল, বুড়ো তখন যন্ত্রটার বাঁকা পাশটা চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছিল,—বন্ধু, জীবনটা ত সহজ নয়,—এমন দমে গেলে চলবে কেন?

বুড়ো যেমনি ভালবাসে তার হার্ডিগার্ডিকে তেমনি ভালবাসে তার ভবঘুরে জীবনের চিরসঙ্গী ঐ পুড্ল্ আর ঐ ছেলেটিকে,—ছেলেটিকে হয়ত বা একটু বেশি-ই ভালবাসে। পাঁচ বৎসর আগে ছেলেটিকে এক বিপত্নীক পাঁড়মাতাল মুচির কাছ থেকে বুড়ো মাসিক দুই রুবল হারে ভাড়া করে নিয়েছিল। কিছু-দিনের মধ্যেই মুচি মারা গেল, ছেলেটি অকৃত্রিম স্নেহ আর দৈনন্দিন প্রয়োজনের বন্ধনে বুড়োর কাছে বাঁধা পড়ল।

২

খাড়া উঁচু সমুদ্রতীরের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ,—দুই পাশে তার পুরনো জলপাইগাছের ছায়া। গাছগুলির মাঝ দিয়ে কখনও কখনও যখন সমুদ্র দেখা যায় তখন ঐ সুদূর বিস্তৃত জলরাশিকে দেখে মনে হয় যেন একটা প্রশান্ত মহাশক্তিশালী প্রাচীর উঠছে। জলপাইগাছের রুপালি সবুজ পাতার ভিতর দিয়ে

দেখবার সময় সমুদ্রকে দেখায় যেন আরও গভীর নীল। ঘাস, কর্নেলের ঝোপ, বুনো ব্রায়ার, আঙুরক্ষেত এবং গাছ—সর্বত্র সিকাডা ফড়িঙের কিচিরমিচির, এদের শব্দের প্রতিধ্বনিতে যে একঘেয়ে ঐকতান উঠছে তাতে বাতাস যেন কাঁপছে। ভীষণ গরম, বাতাসের নাম গন্ধ নেই,—মাটি এত তেতে গেছে যে, পা পুড়িয়ে দেয়।

সার্জি পূর্বাভ্যাসমত বুড়োর আগে আগেই চলছিল, হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে গিয়ে বুড়োর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কি হল সার্জি, বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে।

বড় গরম, লোদিঝকিন দাদু,—আর সহ্য করতে পারছি না। একটা ডুব দিয়ে নিলে কেমন হয়?

বুড়ো পূর্বাভ্যাসমত একটা ঝাঁকি দিয়ে হার্ডিগার্ডিটা পিঠের উপর ঠিক করে নিলে, জামার আস্তিন দিয়ে মুখের ঘামটা মুছলে। তারপর স্নিগ্ধ নীল সমুদ্রের দিকে একবার সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, ভাল ত খুবই হয়, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, এর পরে আমাদের আরও খারাপ লাগবে। আমার জানা এক ডাক্তারের সহকারী আমায় বলেছে, সমুদ্রের লবণ শরীর বড় কোমল করে দেয়।

সার্জি কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে না, বললে,—হয়ত সত্যি কথা বলেনি।

না, না, সে মিথ্যে বলতে যাবে কেন? বেশ গুরুগম্ভীর লোক, মদ খায় না, সিবাস্তাপোলে তার ছোট্ট একটা বাড়ি আছে। তা ছাড়া সমুদ্রে নামবার পথও নেই এখানে। একটু সবুর কর, মিসখোরে যাই আমরা আগে, সেখানে গিয়ে আমাদের পাপ-দেহটাকে একটু স্নান করিয়ে নেব। খাবার আগে স্নান করা খুব ভাল, তারপর দিব্যি একটু ঘুম,—চমৎকার!

পিছনে ওদের কথাবার্তা হচ্ছে শুনে আর্তো ফিরে দৌড়ে এল ওদের কাছে। প্রচণ্ড রোদে ওর ফিকে নীল চোখ দুটি পিট্‌পিট্‌ করতে লাগল, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ায় ওর বাইরে বেরিয়ে আসা জিভটা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

কি হয়েছে, ডগী, বড্ড গরম, না?—বুড়ো তার উদ্দেশ্যে বললে।

টানা হাই তুলে জিভটা বাঁকা করে কাঁপতে কাঁপতে সে নাকি সুরে আবদার করতে লাগল।

বন্ধু, তোমার করবার কিছু নেই, এমন কি লোকে যে বলে ভুরু থেকে ঘাম বের করে, তেমনি করেও তুমি কিছু করে দিতে পার না। লোদিঝকিন গুরু-গম্ভীর চালে বলে চলল, ভুরু অবশ্য তোমার নেই। যাই হক, এগিয়ে যাও তুমি, এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না।...জানো সার্জি, এই রকম গরম আমার বেশ ভালই লাগে। যন্ত্রটা আমার একটু ভারি বটে, এটা টানতে না হলে গাছের ছায়ার নিচে ঘাসের উপর পেটটা উপরের দিক করে আমি কোথাও শুয়ে থাকতাম। বুড়ো হাড়ের পক্ষে রোদ্র অতি উপাদেয়।

পথটা এখানে নেমে গিয়ে নিচের এক চওড়া ঝক্‌ঝকে সাদা পথের সঙ্গে

মিশেছে, পাথরের মত শক্ত সে পথ। এক কাউণ্টের পুরনো পার্ক শুরু হয়েছে এখান থেকে, সবুজ গাছপালার মাঝে মাঝে রয়েছে বাগান-বাড়ি, ফুলের কেয়ারি, কাঁচঘর আর ঝরণা। লোদিঝকিনের এ সব জায়গা বেশ ভাল ভাবেই চেনা, প্রতি বৎসর আঙুর তুলবার সময় সে এখানে একবার চক্কোর দিয়ে যায়, এই সময় ভাল জামাকাপড়-পরা সৌখীন ধনী লোকে ক্রিমিয়া একেবারে গমগম করতে থাকে।

দক্ষিণ অঞ্চলের রঙবেরঙের গাছপালার জৌলুস বুড়োর মনকে একটুও দোলা দেয় না, কিন্তু সার্জি এখানকার অনেক কিছু দেখেই একেবারে আনন্দে আত্মহারা। সে এদিকে কোনদিন আসেনি। ম্যাগনোলিয়া গাছের শক্ত চক্‌চকে পাতাগুলি দেখে মনে হয় যেন ওগুলি বার্নিশ করা, ফুলগুলি ওর যেন বড় বড় প্লেটের মত; আঙুরের মাচায় ঝুলে রয়েছে থোপা থোপা আঙুর; পাতলা বাকল আর জমকালো চুড়া-ওয়ালা বহুশত বৎসরের পুরনো বিরাটাকার সব প্লটান; তামাকের ক্ষেত, নদী, জলপ্রপাত; ফুলের কেয়ারি, বেড়া, বাগান-বাড়ির দেয়াল সর্বত্র চমৎকার সুগন্ধি গোলাপের সমারোহ,—এ সব দেখে বালকের সরল মন একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তে সে বুড়োর আস্তিন ধরে টানছে।

লোদিঝকিন দাদু, দেখ, দেখ,—ফোয়ারার জলে মাছগুলির দিকে একবার চেয়ে দেখ, ওগুলি সোনা দিয়ে তৈরি নিশ্চয়। সত্যি তাই, দাদু, না যদি হয় ত আমায় তুমি মেরে ফেল। মস্ত বড় একটা ফোয়ারা-ওয়ালা একটা বাগানের লোহার বেড়ার গায়ে মুখ লাগিয়ে ছেলেটি বেশ জোরে জোরে বললে এই কথাগুলি : আর দেখ, দাদু, ঐ পীচগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, মাত্র একটা গাছে কতগুলি তাই দেখ।

বুড়ো সকৌতুকে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে,—চল, চলরে বোকাটা, অমনি হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। আগে আমরা নোবোরোসীস্ক শহর এবং তারও দক্ষিণে যাই, তখন দেখবি। দেখবার মত জিনিস আছে বটে সেখানে। তারপর ধর— সোচি আছে, সোচি, য়্যাদলার, তুয়াপসি, সুখুম,—আরও দক্ষিণে আছে বাতুম। ওখানকার সব দেখলে তোর চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে যাবে। এই ধর না কেন, ওখানকার যে পাম্‌-গাছ, সে এক তাজ্জব ব্যাপার, গুঁড়িটা হচ্ছে তার খস্‌খসে, অনেকটা ফেল্টের মত বলতে পারিস আর তার এক একটা পাতা এত বড় যে, তার একটা দিয়ে আমাদের দুজনকে ঢাকা যায়।

সার্জি বিস্ময়ানন্দে বলে উঠে,—ঈশ্বরের নামে, সত্যি বলছ তুমি?

একটু সবুর কর না কেন, নিজের চোখেই দেখবি! আরও অনেক জিনিস আছে, এই ধর না কেন, কমলা, তারপর লেবু। দোকানে ত এসব দেখেছিস তুই—দেখিসনি?

আচ্ছা?

আচ্ছা, আমাদের ওদিকে যেমন আপেল আর পীয়ার গাছে ধরে,—ওসব জায়গায় ওগুলি ধরে থাকে তেমনি আকাশে। আর ওসব জায়গার লোকজন

সবও অদ্ভুত : তুর্কী, পার্শী, সরকেসিয়ান, সবার পরনে লম্বা ঢিলে জামা, আর কোমরে ছোরা। বড় শক্ত লোক ওরা। মাঝে মাঝে ইথিওপিয়ানদেরও দেখা যায় ওখানে,—বাতুমে দেখেছি ওদের।

ইথিওপিয়ান!—হাঁ, হাঁ জানি,—যাদের মাথায় শিং থাকে,—বলে উঠল সার্জি, যেন চিনে ফেলে ওদের।

শিং টিং ওসব বাজে কথা, অত খারাপ ওরা নয়। গায়ের রঙ অবশ্য তাদের বুটজুতোর মত কালো, এমন কি ওর মতই চক্‌চকে। ঠোঁটগুলি ওদের মোটা আর লাল চোখগুলি বড় বড় সাদা, মাথার চুল কালো ভেড়ার লোমের মত।

আমার মনে হয় ওরা বড় ভয়ঙ্কর,—এই ইথিওপিয়ানরা?

অবশ্য ওদের সঙ্গে চলাফেরার অভ্যাস না থাকলে প্রথমে একটু ভয় পাবারই কথা বটে, কিন্তু যখন দেখবি আর কেউ ভয় পাচ্ছে না, তখন তোরও সাহস বেড়ে যাবে। অনেক জিনিসই সেখানে দেখবার আছে রে,—গেলে নিজেই দেখতে পাবি। একমাত্র মুস্কিল হচ্ছে ওখানকার জ্বর। জায়গাটার চারিদিকে সব পচা জলা, তা ছাড়া ওখানে ভীষণ গরম। ওখানকার বাসিন্দাদের এ সবে কিছু যায় আসে না, কারণ এ সবে ওদের কিছু ক্ষতি করে না, কিন্তু নবাগতদের দুঃখের সীমা থাকে না। যাক গিয়ে, অনেক বকা হল, সার্জি, এবার আয়, এই ছোট্ট গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া যাক। এই বাগান-বাড়িটায় যে ভদ্রপরিবার থাকে, তারা বড় ভাল লোক,—আমার কাছে শুধু শুনে নিবি,—বাস্‌।

কিন্তু সেদিন তাদের বরাতটা মোটেই সুবিধার গেল না। কয়েকটা জায়গায় তাদের আসতে দেখেই লোকে তাড়িয়ে দিল, আর কয়েকটা জায়গায় হার্ডিগার্ডি থেকে সাঁ সাঁ আর নাকি সুর বেরুতে শুরু করলেই অমনি বারান্দা থেকে বাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়ে হাত ইসারায় তাদের চলে যেতে বললে,—আর কয়েকটা জায়গায় চাকরেরা জানিয়ে দিলে, মনিব এখনও ঘরে ফেরেননি। দুটো বাড়িতে তারা রঙতামাসা দেখানোর জন্য টাকা পেয়েছে বটে, কিন্তু সে বড়ই কম। বকশিশ যতই কম হক, বুড়ো নাক সিঁটকায় না তাতে। বড় রাস্তায় ফিরে আসবার সময় সেই সামান্য তামার জিনিস কয়টিই ঝন ঝন করে বাজাতে বাজাতে এল সে।

বেশ খুশি মেজাজেই সে বলতে লাগল,—জানিস সার্জি, দুই আর পাঁচে হল সাত কোপেক, এতেও নাক সিঁটকাবার কিছু নেই। সাতকে সাত দিয়ে গুণ দিলে হল আধ রুবলের মত,—তা দিয়ে হয় আমাদের তিনজনের পুরোপুরি খাওয়া,—রাত্রে একটু শোবার জায়গা, তা ছাড়া বুড়ো লোদিঝকিনের জন্য প্রাণভরা এক চুমুক ভদকা,—অনেক অসুখ-বিসুখে ভুগছে সে ত! কিন্তু এসব ভদ্রলোকদের কিছু বোধশোধ নেই : কিপটেমির দরুন কুড়ি কোপেকও তাদের হাত থেকে খসবে না, আবার পাঁচ কোপেক দিতেও তাদের সম্মানে বাধে, সুতরাং তারা আমাদের বেরিয়ে যেতেই বলে। একেবারে শুধু হাতে না ফিরিয়ে অন্তত তিনটি

কোপেকও দে না কেন রে বাপু! এতে আমি কিছু দোষ দেখি না, কিছু মনে করি না, করব কেন?

লোদিঝকিন বড় শান্তশিষ্ট লোক, এমন কি তাড়িয়ে দিলেও তা নিয়ে কিছু মন খারাপ করেনা। কিন্তু সেদিন তার মনের স্থৈর্য নষ্ট করে দিলেন একজন মহিলা। মহিলাটি এমনি দেখতে সুন্দর, বেশ মোটাসোটা, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বেশ দয়ালুও বটে, চারিদিকে ফুলের বাগানওয়ালা একটা বাড়ির মালিক তিনি। বুড়োর হার্ডিগার্ডির বাজনা বেশ মন দিয়েই শুনলেন তিনি, সার্জির দড়াবাজি এবং আর্তোর খেলা আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে দেখলেন। অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটার কাছে তার নাম, বয়স, খেলা সে কোথায় শিখেছে, বুড়ো তার কোন আত্মীয় কি না, তার বাপ-মার পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর তাদের অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন তিনি।

দশ মিনিট, কি তারও বেশি, প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল, তার আর দেখা নেই,—যতই এরা তার জন্যে অপেক্ষা করে রইল ততই এদের প্রত্যাশার মাত্রা বেড়ে চলল। বুড়ো হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ছেলেটির কানে কানে বললে, আজ আমাদের বরাত ভাল রে সার্জি, দেখিস তুই, আমি বলছি। উনি আমাদের জামা কি জুতো—ঐরকম কিছু একটা দেবেন নিশ্চয়।

অবশেষে মহিলাটি এলেন, এসে সার্জি যে টুপি উঁচু করে ধরেছিল তার মধ্যে ছোট্ট সাদা একটা রেজগি ফেলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন। দেখা গেল ওটা দশ কোপেকের এক রেজগি, দুদিকে ঘষা, মাঝখানে এক ছেঁদা। বুড়ো অবাক হয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে চেয়ে রইল। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুড়ো ওটা হাতের তালুতে করে রেখেছিল, যেন ওজন করে দেখছে সে। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে সে বলে উঠল, আমাদের আচ্ছা ঠকানো ঠকালে, আর আমরাও তেমনি বোকা, ওকে খুশি করতে কি না করলাম আমরা! ও আমাদের একটা বোতাম বা ঐ রকম কিছু একটা দিলেও ত পারত, কোন কিছুতে লাগানো যেত সেটা,—এই অচল রেজগিটা দিয়ে আমি কি করব? মহিলাটি হয়ত ভেবেছে, বুড়ো রাত্রে চালাকি করে এটা কাউকে দিয়ে দেবে। না, ম্যাডাম, তা নয়, তুমি ভুল করেছ বড়। বুড়ো লোদিঝকিন এসব কাজ করে না। এমন কাজ করে না সে। এই—এই যে তোমার দশ কোপেক,—ধরো।

ক্রোধে অভিমানে বুড়ো তাম্র মুদ্রাটা ছুড়ে ফেলে দিলে,—একটুখানি ঝন করে পড়ল গিয়ে সেটা পথের সাদা ধুলোর মধ্যে।

এমনি করে বুড়ো, ছেলে আর কুকুরটিকে নিয়ে সমস্ত বাড়িগুলি চক্কোর দিয়ে এল, এবার সমুদ্রতীরে যাচ্ছিল তারা। আর একটি বাড়ি বাকি আছে, সর্বশেষ বাড়ি, বাঁয়ের দিকে। বাড়ির চারিদিকে সাদা উঁচু একটা পাঁচিল থাকায় বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না, পাঁচিলের অপর দিকে সারিবাঁধা ধুলোমাখা লম্বা সরু

সাইপ্রেস গাছগুলো ধূসর কৃষ্ণ কীলকের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। লেসের মত জটিল নক্সায় তৈরি ঢালাই লোহার চওড়া গেটটার ভিতর দিয়ে শুধু সতেজ রেশমীসবুজ লন, গোলগোল ফুলের কেয়ারি, আর অনেক পিছনে ঘন দ্রাক্ষালতায় ঢাকা ছাদ দেওয়া পথের কিছু কিছু দেখা যায়। লনের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে মালী এক লম্বা হোজ দিয়ে গোলাপ গাছে জল দিচ্ছে। হোজের আগাটা একটা আঙুল দিয়ে একটু আটকে ধরেছে সে, ফলে ফোয়ারার মত জল বেরুচ্ছে সেখান থেকে, তার উপর সূর্যকিরণ পড়ায় রামধনুর রঙ দেখা যাচ্ছে।

বুড়ো বাড়িটা ছাড়িয়ে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু গেটের ভিতর দিয়ে একবার উঁকি মেরে থমকে দাঁড়াল। ছেলেটাকে ডেকে বললে,—দাঁড়া, সার্জি,—একটু দাঁড়া, বাড়িটায় লোক দেখতে পাচ্ছি যেন! আশ্চর্য ব্যাপার! কতবার এ পথ দিয়ে গেছি আমি,—কিন্তু একটি জনপ্রাণীর দেখা পাইনি। দেখ ত, কি লেখা আছে এখানে?

বন্ধুত্ব-কুটীর। অনধিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ। সার্জি পড়ে শুনালে, গেটের একটা স্তম্ভে খোদাই-করা আছে কথাগুলি।

বুড়ো পড়তে জানে না, সার্জির কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে অমনি বলে উঠল, বন্ধুত্ব,—এ্যাঁ? ঠিক কথা, বড় সত্যি কথা, বন্ধুত্ব। সারাদিন আমাদের বরাতটা বড় মন্দ গেছে, এবার সুদে আসলে উসুল হয়ে যাবে, দেখিস তুই, আমি শিকারি কুকুরের মত গন্ধেই টের পাই। আরে এই, আর্তো, বাচ্চা,—আয়, চল ভিতরে চল, সার্জি, সব সময়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিবি, আমি জানি সব।

৩

বাগান-বাড়ির পথগুলিতে বেশ সুন্দর করে নুড়ি ছড়ানো, বেশ বড় বড় নুড়ি, হাঁটতে গেলে মচ্‌মচ্‌ করে, পথের দু কিনারে বেশ বড় বড় গোলাপী রঙের ঝিনুক সাজানো। নানান রঙের ঘাসের গালিচার মাঝে সব ফুলের কেয়ারি, তাতে সব নানা জমকালো রঙের ফুল, গন্ধে তার বাতাস মসগুল হয়ে উঠেছে। ফোয়ারাগুলি থেকে পরিষ্কার স্বচ্ছ জল তোড়ে বেরিয়ে এসে চারিদিকে ছিটকে পড়ছে। গাছের মাঝে মাঝে বাটিতে রাখা লতাগুলি মালার মত ঝুলছে। বাড়ির সামনের মর্মর স্তম্ভে লাগানো বলের মত দুটি চক্‌চকে আয়না,—তার সামনে এসে দাঁড়ালে, বুড়ো সার্জি এবং আর্তো—তিনজনেরই প্রতিবিম্ব পড়ল তাতে, কিন্তু তিনজনেরই মাথা পড়ল নিচু দিকে, পা উঁচুতে, অদ্ভুত, দেখলে হাসি পায়।

বারান্দার সামনে সমান-করা জায়গাটায় সার্জি তার কম্বলটা বিছিয়ে নিল, বুড়োও তার হার্ডিগার্ডি ঠিক করে পেতে নিয়ে সবে হাতলটা ঘুরাতে যাবে এমন সময় এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন দেখা দিল।

আট থেকে দশ—এইরকম বয়সের একটি ছেলে হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে ভীষণ জোরে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল বারান্দায়। পরনে তার একটা ফিকে রঙের সেলার সুট, বাহু আর জানু অনাবৃত। কুঞ্চিত অবিন্যস্ত কেশদাম দুই কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ছয়টি লোক ছুটে এল তার পিছু পিছু, দুজন বহির্বাস-আঁটা স্ত্রীলোক, টেইলকোট পরা মোটাসোটা শ্মশ্রুগুম্ফহীন গাল-পাট্টাওয়ালা বৃদ্ধ একটি পরিচারক, নীল চেকের ফ্রক-পরা রক্তনাসা, রক্তকেশী ক্ষীণাঙ্গী একটি বালিকা, ফিকে নীল লেস দেওয়া ড্রেসিংগাউন-পরা রোগা—কিন্তু খুব সুন্দরী এক তরুণী এবং সর্বশেষে সোনার ফ্রেমের চশমা আঁটা টাকপড়া তসরের সুট-পরা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। ওরা সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাত নাড়ছে, জোরে কি সব বলাবলি করছে, আর ঠেলাঠেলি করছে। বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, সেলার সুট-পরা যে ছেলেটা তীরের মত ছুটে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে—সে-ই এদের এ উত্তেজনার মূল কারণ।

এদিকে ছেলেটির চিৎকার কিছুতেই থামছে না, পাথরের মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তখনই আবার গড়িয়ে চিৎ হয়ে রাগের চোটে সে হাত পা ছুড়তে লাগল। বড়রা সব তার চারিদিকে হৈ-চৈ শুরু করলে। বুড়ো চাকরটা দুই হাতে তার মাড় দেওয়া শার্টের উপরটা ধরে বিশেষ মিনতি করে করুণ সুরে বলতে লাগল, মাস্টার নিকোলাই এ্যাপোলোনোভিচ্, মাকে বিরক্ত করবেন না, স্যার উঠুন, দয়া করে ওষুধটুকু খান, সত্যি বলছি, এ মিষ্টি জিনিস, সিরাপ, উঠুন দয়া করে।

বহির্বাস-পরা স্ত্রীলোক দুটি হাত মুচড়াতে মুচড়াতে দাসীজনসুলভ ভীত-কণ্ঠে হড়বড় করতে লাগল। রক্তনাসা মেয়েটি করুণ অঙ্গভঙ্গি করে জোর গলায় সম্পূর্ণ অবোধ্য বিদেশী ভাষায় মর্মস্পর্শী কি যেন সব বলতে লাগল। সোনার চশমা-পরা ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে হাত তুলে মাথা নাড়তে নাড়তে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে উপদেশছলে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। আর এদিকে ঐ রুগ্না সুন্দরী তরুণীটি ক্ষীণকণ্ঠে কেবল কাঁদছেন আর মিহি লেসদেওয়া রুমালে চোখ মুছছেন:

ও ট্রিল্লি, আমার গোপাল, আমি মিনতি করছি তোমায়, আমার সোনা। তোমার মা তোমায় মিনতি করছে, ওষুধটা খেয়ে ফেল, লক্ষ্মীটি, এক্ষুনি ভাল বোধ করবে তুমি। তোমার পেট মাথা দুইই ঠিক হয়ে যাবে। আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি ওষুধটা খাও। ট্রিল্লি, তুমি কি চাও তোমার মা তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে? এই আমি জানু পাতছি তোমার কাছে। একটা স্বর্ণমুদ্রা নেবে তুমি আমার কাছ থেকে? দুটা? পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা? ট্রিল্লি, একটা সত্যিকার

ছোট গাধা নেবে তুমি? একটা ছোট্ট বাচ্চা ঘোড়া?...ডাক্তার, আপনি কিছু বলুন ওকে।

সোনার চশমা-পরা মোটা ভদ্রলোক তখন গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন,—ত্রিল্লি, আমি বলছি,—তুমি একটু মানুষের মত হও দেখি!

ছেলেটি এবার আ-আ-আ বলে দারুণ চিৎকার করে উঠে মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগল আর পাগলের মত পা ছুড়তে লাগল।

মনে এত বেশি উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও চারিদিকে যারা হৈ-চৈ করছিল তাদের পেটে আর পায়ে সে গোড়ালি দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করছিল, আর তারা বেশ কৌশলে সে-সব লাথি এড়িয়ে যাচ্ছিল।

সার্জি বহুক্ষণ ধরে বিশেষ কৌতূহল নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে এই সব তাকিয়ে দেখছিল, এইবার সে বুড়োর পাঁজরে মৃদু ধাক্কা দিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, লোদিঝকিন দাদু, ছেলেটার কি হয়েছে? ওরা কি তাকে চাবুক মারতে যাচ্ছে?

ওকে চাবুক মারবে, বটে! ও নিজেই ওদের যে কোনটাকে চাবুক মারতে পারে। আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে,—সম্ভবত ছেলেটি অসুস্থও বটে!

সার্জি বললে, কি অসুখ? মাথা খারাপ নাকি?

কি করে জানব আমি? চুপ কর।

আ-আ-আ!—ছেলেটি আরও তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল এবার। শুয়োরের বাচ্চা সব, মুর্খের দল!

হঠাৎ লোদিঝকিন হুকুমের সুরে বলে উঠল, সার্জি, এই হচ্ছে সময়, এবার আরম্ভ করা যাক, সঙ্গে সঙ্গে বীরদর্পে সে হার্ডিগার্ডি বাজাতে শুরু করে দিলে।

বাগানের ভেতর পুরনো ঘোড়দৌড়ের সেই সাঁ সাঁ শব্দ আর নাকি সুর বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার লোকগুলি সব চমকে উঠল, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ছেলেটারও চিৎকার থেমে গেল।

নীল ড্রেসিংগাউন-পরা মহিলাটি উচ্চ বিলাপের সুরে বলে উঠলেন,—হায় ভগবান, এরা বেচারা ত্রিল্লিকে আরও পাগল করে দেবে, তাড়িয়ে দাও ওদের, এক্ষুণি তাড়িয়ে দাও। আর ঐ নোংরা কুকুরটা। কুকুরগুলির এমন বিশ্রী সব অসুখ থাকে। আরে, আইভ্যান, পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে থেক না তুমি।

ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে রুমাল নেড়ে তিনি ওদের তিনজনকে চলে যেতে ইশারা করলেন, রক্তনাসা মেয়েটি চোখ পাকাতে লাগল, আর একজন হিস্‌হিস্ করে ভয় দেখাতে লাগল। টেইলকোট-পরা লোকটি শব্দ না করে অতি দ্রুত পদে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল, চোখে মুখে তার ভয়ের চিহ্ন, বাহু দুটি প্রসারিত করে বুড়োর কাছে এসে চাপা কর্কশ কণ্ঠে সে ধমকে উঠল, এর অর্থ কি, কে তোমাকে এসব করতে অনুমতি দিয়েছে, কার অনুমতি নিয়ে তুমি ভিতরে

ঢুকেছ? বেরিয়ে যাও, চলে যাও এখান থেকে। বলার ভঙ্গি শুনে মনে হয় সে একসঙ্গে ভীত, ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত।

হার্ডিগার্ডিটা একটা ভীত কোঁ-কোঁ নাদ করে বন্ধ হয়ে গেল। বুড়ো লোদিঝকিন বিনীতভাবে বললে, আমার কথাটা আগে শুনুন, স্যার।

টেইলকোট-পরা লোকটা গলার ভিতর থেকে একটা গভীর হিস্‌হিস্ শব্দ তোলার মত করে বললে, কোন কথা শুনতে চাইনে তোমার, তুমি চলে যাও এখান থেকে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার ফুলো ফুলো মুখখানা একেবারে লাল হয়ে উঠল, চোখ দুটি অসম্ভব বড় হয়ে ঘূর্ণিত হতে লাগল, যেন এখনই কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বুড়ো এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে পেছিয়ে এল।

তাড়াতাড়ি হার্ডিগার্ডিটা কাঁধে নিয়ে সে বলে উঠল,—আয়, সার্জি, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কিন্তু ওরা কয়েক গজ যেতে না যেতেই আবার বারান্দা থেকে নতুন করে সেই কানে তালালাগানো চিৎকার শুরু হল।

আ-আ-আ! আমি ও শুনব,—শুনব,—আ-আ! ওদের ডাক এখানে,—ডাক, —আমি দেখব।

কিন্তু, ত্রিল্লি! আ ভগবান,—ত্রিল্লি! ছেলেটির মা ভড়কে গিয়ে কাত্‌রে কাত্‌রে বলতে লাগলেন, তারপরই তিনি তার লোকজনদের ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, ডেকে আন ওদের, তোমাদের সবার মাথায়ই গোবর পোরা। আইভ্যান, কি বললাম আমি—শুনলে? ঐ ভিখারীদের ডেকে আনো—এক্ষুনি।

বারান্দা থেকে কয়েকজন একেবারে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলে,—আরে এই, এই অরগান বাজিয়ের দল,—ফিরে এস, ফিরে এস তোমরা।

মোটা চাকরটা তার লম্বা গালপাট্টা উড়িয়ে একটা রবারের বলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটল ওদের পিছনে।

হাত নেড়ে হাঁসফাঁস করতে করতে সে চেঁচাতে লাগল, আরে, এই বাজিয়ের দল, শোন,...ফিরে এস তোমরা। শেষে বুড়োর কাছে গিয়ে তার জামার আস্তিন ধরে সে বললে, ওগো ভালমানুষের ছেলে, ফিরে এস, ভদ্রঘরের লোকজন সব তোমার খেলা দেখতে চাইছেন। শীগগির এস।

বুড়ো মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, না, আমি যাব না—বলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার কাছে এগিয়ে এল, তারপর সেখানে তার হার্ডিগার্ডিটা নামিয়ে আগে যেখানটা অবধি বাজিয়েছিল, তারপর থেকে শুরু করলে।

বারান্দার হৈ-চৈ থেমে গেল। ছেলেটিকে নিয়ে তার মা এবং সোনার চশমা-পরা ভদ্রলোক রেলিং-এর কাছে এসে দাঁড়ালেন, অন্য সকলে সসম্মানে পেছিয়ে দাঁড়াল। এ্যাপ্রণ-পরা বাগানের মালী বুড়োর কাছাকাছি দাঁড়ালে। দারোয়ানটা

এতক্ষণ কোথায় ছিল—কে জানে, সে এসে মালীর পিছনে দাঁড়াল। লম্বা-চওড়া চেহারা তার, গোমরা মুখে ব্রণের দাগ আর দাড়ি, কপালটা একটু ছোট। গায়ে তার এক কালো ফুটকির তেরছা লাইনটানা নতুন গোলাপী শার্ট।

হার্ডিগার্ডি থেকে ঘোড়দৌড়ের মত সাঁ সাঁ, তো-তো শব্দ বেরুচ্ছিল, তারই তালে তালে সার্জি তার কম্বলটা মাটিতে বিছিয়ে ফেললে, খুলে ফেললে তার ক্যাম্বিশের পেন্টুলুন (পুরনো বস্তা দিয়ে তৈরি এটা, পিছনে তার কোম্পানীর নামের চৌকো ছাপ), খুলে ফেললে তার পুরনো জ্যাকেট; পরা রইল কেবল তার জীর্ণ আঁটসাঁট পোশাকটা, এটার অনেক জায়গাই অবশ্য রিপু করা তবু সার্জির নমনীয় সবল দেহে সেটা মানিয়েছিল ভাল। বড়দের দেখাদেখি সে-ও পাকা দড়াবাজিকরের চাল সব শিখে নিয়েছে। কম্বলের উপর দৌড়ে যাবার সময় সে তার দুটো হাত রাখলে ঠোঁটের উপর, তারপর থিয়েটারী ভঙ্গিতে দুই বাহু এমন দ্রুত প্রসারিত করল যে, দেখে মনে হয় যে, দর্শকদের দিকে দুটি চুম্বন ছুড়ে দিচ্ছে সে।

বুড়ো এক হাতে হার্ডিগার্ডি থেকে কোঁ কোঁ আর কাসির শব্দের মত সুর বের করতে লাগল, আর এক হাতে নানা রকমের সব জিনিস ছুঁড়ে দিতে লাগল সার্জির দিকে,—সার্জি সেগুলি মাটিতে পড়তে না দিয়ে উপর থেকেই লুফে নিতে লাগল। সার্জির খেলার বিষয় খুব কম, কিন্তু যেগুলি দেখায় সে, দেখায় তা একেবারে দড়াবাজিকরদের ভাষায় বলা যেতে পারে নিখুঁত সুন্দর করে। সে একটা খালি বিয়ারের বোতল উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে, বোতলটা উপরের দিকে কয়েকটা ঘুরপাক দিয়ে যখন নিচে নেমে এল, সার্জি তার মুখের দিকটা ধরলে একটা প্লেটের কিনারে,—বোতলের তলদেশ রইল উপরে, এমনি করেই সেটা ধরে রাখলে কয়েক সেকেণ্ড; হাতীর দাঁতে তৈরি চারটে বল আর দুটি বাতি দিয়ে চমৎকার খেলা দেখালে সে, ওগুলি ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে পড়তে না দিয়ে একই সঙ্গে ধরতে লাগল সে দুটো বাতিদানে। তারপর একখানা পাখা, একটা কাঠের চুরুট এবং একটা ছাতা, এই তিনটে জিনিস নিয়ে সে একসঙ্গে খেলা দেখালে। এগুলি একবারও মাটিতে না পড়ে প্রথমে আকাশে উঠা-নামা করল তারপর ছাতা এসে দাঁড়াল তার মাথার উপর, চুরুটটা লাগল এসে মুখে, আর পাখাটা যেন আদর করে মুখে বাতাস দিয়ে গেল। শেষের দিকে সার্জি কম্বলের উপর কয়েকবার ডিগবাজি খেলে, ব্যাঙের মত লাফালে আর একটা মার্কিন খেলা দেখালে, তা ছাড়া পা দুটো উঁচু করে হাতে ভর দিয়ে হেঁটে বেড়ালে। যেসব খেলা তার জানা ছিল সব দেখানো হয়ে গেলে দর্শকদের দিকে আরও দুটি চুমু ছুড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বুড়োর কাছে ফিরে এসে হার্ডিগার্ডির পাশে বসে পড়ল।

এবার আর্তোর পালা। কুকুরটার তা জানাই ছিল। নিজের গা-টা ঝাঁকি দিয়ে ডাকতে ডাকতে সে বুড়োর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল,—চালাক পুড্‌লটা

তার এই সব ভাবভঙ্গি দ্বারা হয়ত বলতে চায়, তাপমাত্রা যখন ছায়াতেই একশো ডিগ্রির উপর, তখন এসব খেলা দেখাতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। বুড়ো লোদিঝাকিন দাদু-ও কম চালাক নয়, পিছন দিক থেকে 'করনেল'-ডালের চাবুকটা বের করলে। আর্তো ঘেউ ঘেউ করে জানালে, এ আমি আগে থেকেই জানতাম। তারপর তার প্রভুর দিকে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে চেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বে পিছনের পায়ের উপর দাঁড়ালে।

পুড্‌লটার মাথার উপর চাবুক ধরে বুড়ো বললে, ভিক্ষা চাও, আর্তো,—বেশ! ডিগবাজি খাও, বেশ, ডিগবাজি খাও, আবার,—আর একবার। এবার নাচো তো, লক্ষ্মী, নাচো। উঁচু হয়ে বসো। কি, বসতে ইচ্ছা নেই? আমি বলছি, বসো। হাঁ,—এই ত ঠিক হয়েছে। আমি শিখিয়ে দেব তোমায়, এবার ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের বল,—ভাল আছেন ত? কুকুরটাকে ভয় দেখাতে চাবুক তুলে বুড়ো বলে উঠলে এবার,—বটে!

আর্তো বিরক্ত হয়ে ডাকলে,—ভো-ও, তারপর বিষণ্ণনেত্রে প্রভুর দিকে মিট্‌-মিট্‌ করে চেয়ে আরও দুবার ভো-ও, ভো-ও করলে। অসন্তুষ্ট আর্তো এই ডাকের দ্বারা যেন বলতে চায়,—বুড়ো আমার দুঃখ একেবারে বোঝে না।

হাঁ,—এই ত হয়েছে। প্রথমেই চাই বিনয়। এস, এবার একটু লাফানো যাক, বুড়ো চাবুকটা মাটির একটু উপরে ধরে বলতে লাগল ঃ আলেজ, জিভটা অমন বের করে রাখবে না। আলেজ,—হুপ্‌! চমৎকার। আর একবার লাফাও,—নচ্‌ ইন্‌মাল, আলেজ! হুপ্‌! আলেজ! হুপ্‌!—চমৎকার, লক্ষ্মী কুকুর তুমি। বাড়ি গিয়ে তোমায় একটা গাজর খেতে দেব। কি, গাজর খেতে চাও না তুমি?... তাই ত ভুলে গিয়েছিলাম আমি।...তা হলে আমার এই 'টপ হ্যাট'-টা নিয়ে ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের কাছে গিয়ে কিছু ভিক্ষা চাও,—ওঁরা হয়ত তোমার পছন্দমত কিছু দিতে পারেন।

বুড়ো কুকুরটাকে তার পিছনের পায়ে দাঁড় করিয়ে একটা পুরনো তেল-চিটচিটে টুপি তার মুখে গুঁজে দিলে। বুড়ো রহস্য করে এই টুপিটাকেই 'টপ্‌-হ্যাট্‌' বলে। টুপিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আর্তো ভঙ্গি করে হেলে দুলে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। রুগ্না মহিলার হাতে ছোট্ট একটা ঝিনুক-বসানো পার্স চক্‌চকে করে উঠল। তার চারিদিকে সবাই মহিলার কাজে সায় দিয়ে হাসতে লাগল।

বুড়ো খুশি হয়ে সার্জির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে,—কি বলেছিলাম তোকে, মনে নেই? সব জানি আমি,—না বুঝলে জিজ্ঞাসা করে নিবি আমায়। এক রুবলের কম হবে না কিছুতেই, দেখিস তুই।

ঠিক এই সময় বারান্দা থেকে এক অমানুষিক চিৎকার শোনা গেল; সে চিৎকার এত ভয়ঙ্কর যে, তা শুনে আর্তো টুপিটা ফেলে ভয়ে ভয়ে পিছনের

দিকে তাকিয়ে লেজটা দুই পায়ের নিচে দিয়ে লাফাতে লাফাতে তার প্রভুর কাছে ছুটে এল।

ওদিকে কোঁকড়া-চুল ছেলেটা মেঝেতে পা আছড়ে চেঁচাতে লাগল,—আমি ওটা চাই, ঐ কুকুরটা চাই আমি। ত্রিল্লি ঐ কুকুরটা চায়।

বারান্দায় আবার হৈ-চৈ শুরু হল ঃ হায় ভগবান! ও নিকোলাই—এ্যাপোলা-নোভিচ্—ত্রিল্লি, একটু শান্ত হও লক্ষ্মী, মিনতি করি তোমায়।

ঐ কুকুরটা,—কুকুরটা নিয়ে এসো, আমি ওটা চাই!—জানোয়ার সব,—মূর্খের দল,—গর্জে উঠল ছেলেটা।

নীল ড্রেসিংগাউন-পরা মহিলা ভড়কে গিয়ে বললেন, অত অস্থির হয় না, সোনা। কুকুরটাকে আদর করতে চাও ত তুমি? বেশ, ঠিক আছে,—একটুখানি সবুর কর, লক্ষ্মীটি।...ডাক্তার,—ত্রিল্লি কি কুকুরটাকে একটু আদর করতে পারে?

ডাক্তার ভয় পেয়ে হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,—সাধারণত এমন পরামর্শ আমি দিতে পারি না,—তবে,—হাঁ,—একে যদি বরিক এসিড্ বা কম জোরের কার্বলিক সলিউশান দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বীজাণুমুক্ত করা হয়, তা হলে আমার মনে হয়—

কুকুরটা নিয়ে এস!

এক সেকেন্ড, সোনা, আর এক সেকেন্ড অপেক্ষা কর।...হাঁ, ডাক্তার, আপনার কথামতই কাজ হবে, আমরা প্রথমে একে বরিক এসিড্ দিয়ে ধুইয়ে নেব, এবং তারপর—কিন্তু ত্রিল্লি, তুমি এত অস্থির হয়ো না! ওগো বুড়ো মানুষের ছেলে, তোমার কুকুরটা এদিকে নিয়ে এস ত, বাপু। ভয় নেই, এর দাম পাবে তুমি।... এখন বল ত,—এর কোন অসুখ নেই ত,—আমি বলতে চাই,—মানে,—পাগলা কুকুর নয় ত এ? কিংবা এর কোন ক্রিমি ট্রিমি নেই তো?

ত্রিল্লি নাকে মুখে বুড়বুড়ি ছেড়ে চিৎকার করতে লাগল,—না, গা চাপড়ে আদর করতে চাই না আমি, কুকুরটাই আমি চাই,—আহাম্মক সব, জানোয়ার, বোঝে না, কুকুরটাই আমি চিরকালের মত চাই, এর সঙ্গে খেলা করব আমি,—সব সময় খেলা করব।

ছেলের চিৎকার ছাপিয়ে যাতে নিজের কথা শুনানো যায় এমন জোরে মহিলাটি বুড়োকে ডেকে বললেন, ওহে, শোন ত তুমি, এদিকে এস একবার। ...ও ত্রিল্লি, তুমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোমার মাকে মেরে ফেলবে।...এই সব বাজিয়ে বাজিকরদের কেন যে ঢুকতে দেওয়া হয় এখানে, বুঝি না।...এগিয়ে এস তুমি, আমি বলছি, আরও এগিয়ে এস। হাঁ এইবার হয়েছে।...তুমি কেঁদো না,—ত্রিল্লি, তুমি যা করতে বল তাই করবে তোমার মা। মিনতি করি তোমায়, নার্স, ডাক্তার, আপনারা একটু দেখুন।...কত চাও হে তুমি?

বুড়ো টুপি খুলে ফেললে তার মাথা থেকে, মুখে তার এক সশ্রদ্ধ বিষাদের চিহ্ন ঃ

হুজুর দয়া করে যা দেন,—যা দেন রানীমা। গরীব লোক আমি। দয়া করে যা দেন, তাই আমার মহালাভ। জানি, গরিব বুড়োকে ঠকাবেন না আপনি।

আরে,—কি বোকা ছেলে রে,—গলায় যে তোর ঘা হয়ে যাবে, ত্রিল্লি, বুঝছ না কেন, কুকুর হবে তোমার, আমার নয়।...কত চাও হে তুমি, বলো এবার? দশ, পনের, কুড়ি?

ছেলেটি আবার আর্তনাদ করে উঠল ঃ আ-আ কুকুর চাই,—দাও আমায় কুকুর,—কুকুর! সঙ্গে সঙ্গে সে চাকরটার গোল পেটে লাথি ঝাড়তে লাগল।

লোদিঝকিন ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা করে বললে,—আপনি বললেন, কি বললেন, রানীমা ঠিক বুঝলাম না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, তাতে বোকা, সব ঠিক বুঝে উঠি না তা ছাড়া কানে একটু কম শুনি। দয়া করে আবার বলুন—কি বললেন আপনি? আমার কুকুরের জন্য কি দেবেন বললেন?

মহিলাটি এবার রেগে উঠলেন ঃ হায় আমার কপাল!...বোকা সাজছ তুমি?... নার্স ত্রিল্লিকে শীগগির এক গ্লাস জল দাও,—জলদি।...আমি তোমায় অতি সহজ কথা জিজ্ঞাসা করছি। জিজ্ঞাসা করছি,—তোমার এই কুকুরের দাম কত চাও তুমি, তোমার এই কুকুরের দাম,—বুঝলে এবার?

ছেলেটা আরও জোরে আরও কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ঃ ওরে, কুকুর, কুকুর চাই আমি।

এদিকে মহিলার কথা শুনে লোদিঝকিনের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে, সে টুপিটা মাথায় দিয়ে বললে,—হুজুর, কুকুরের ব্যবসা করি না আমি। আমার এই যে কুকুর দেখছেন, এ আমাদের এই দুজনকে খাওয়ায় পরায়। দুজনকে বলবার সময় সে নিজের কাঁধের উপর দিয়ে বুড়ো আঙুলটা নিয়ে সার্জিকে দেখালে।...এটা আমার বিক্রি করা অসম্ভব।

ত্রিল্লি তখন রেলগাড়ির বাঁশীর মত জোরে চিৎকার করছিল, তার জন্য এক গ্লাস জল আনা হোল বটে, কিন্তু সে জল সে রেগে তার গভর্নেসের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মহিলাটি দুহাতে তার কপালের দু পাশ চেপে ধরে বেশ জোরের সঙ্গে বলতে লাগলেন, শোনো বুড়ো, তোমার মাথা খারাপ। জগতে এমন কোন জিনিস নেই যা কেনা-বেচা যায় না।...নার্স, তোমার মুখটা মুছে ফেল, জলদি যাও, আমার স্মেলিং সল্টটা নিয়ে এস।...কত দাম হবে তোমার কুকুরের,—ধরো একশো রুবল? দুশো? তিনশো? উত্তর দাও আমার কথার!...ডাক্তার,—আপনি বলুন ত কিছু ওকে!

লোদিঝকিন রেগে উঠল এবার, মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার ঃ ওঠ্ সার্জি, চল্, কুকুর নিতে চান ওঁরা? আর্তো আয়!

সোনার চশমা-পরা মোটা ভদ্রলোক বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার ভাব নিয়ে টেনে টেনে বলতে লাগলেন,—শোনো ভাল মানুষের বেটা, তোমার ও-সব ভড়ং ছাড়ো,

আমার কথা শোন। তোমার ঐ কুকুরের দাম আমি হলে দশ রুবলের বেশি দিতাম না,—আর তার সঙ্গে তোমাকে দিতাম ফাউ। বোকাটা, একবার বুঝে দেখ কি সম্পদ তুমি পেতে যাচ্ছ!

একটা ছোট্ট আর্তনাদ করে হার্ডিগার্ডিটা কাঁধে তুলে নিয়ে বুড়ো বললে,—বহু বিনয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে, স্যার, আমার বক্তব্য শুধু এই যে, একাজ আমি করতে পারব না,—মানে, কুকুরটা আমি বেচতে পারব না। আপনারা অন্য কোথাও থেকে কুকুর কিনবেন। নমস্কার।...সার্জি এগিয়ে চল।

ডাক্তার তখন গর্জে উঠে বললে. পাসপোর্ট আছে তোমার?...তোমার মত ইতর লোকের গোষ্ঠীকে আমি চিনি!

এদিকে মহিলাটির মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠেছে,—দারোয়ান সেমিয়নকে তিনি হুকুম দিলেন,—বের করে দাও ওদের বাড়ি থেকে।

গোলাপী শার্ট-পরা গোমরামুখো দারোয়ান কটমট করে চেয়ে সামনে এগিয়ে গেল। এদিকে বারান্দায় উঠল ভয়ঙ্কর হৈ-চৈ ঃ ত্রিল্লি প্রাণপনে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে. তার মা কাঁদছেন, ছোট নার্স বড় নার্স নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে তড়বড় করে কি সব বলছে, আর ডাক্তার সাহেব ত রাগে বৃহদাকার ক্রুদ্ধ এক ভ্রমরের মত গোঁ গোঁ করছেন। বুড়ো আর সার্জি এর শেষ দেখে আসবার আর সুযোগ পেল না, পুড্‌লটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে,—তাকে সামনে নিয়ে ওরা দুজন ছুটে চলল গেটের দিকে। দারোয়ান ওদের পিছু পিছু ছুটে ধাক্কা দিতে লাগল ওদের পিছন থেকে।

সে তাদের ভয়ঙ্কর ধমক দিয়ে বলতে লাগল,—ভবঘুরে বেদে, টো টো করতে এখানে এসে মরেছ কেন? হতভাগা বুড়ো? ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, গায়ের চামড়া আস্ত রেখে যেতে পারলে এখান থেকে। ফের এখানে দেখলে ছাল ছাড়িয়ে নেব তোমার ঠিক। মাথায় গাঁট্টা লাগিয়ে উর‍্যাদনিকের কাছে নিয়ে যাব তোমায়,—ছোটলোক কোথাকার !

বুড়ো আর সার্জি অনেক দূর এগিয়ে গেল, কেউ কোন কথা বললে না. তারপর হঠাৎ এক সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একই কথা মনে করে দুজন হেসে উঠল; প্রথমে সার্জি হো হো করে হেসে ফেটে পড়ল, তারপর বুড়ো সার্জির দিকে চেয়ে ওর মনের কথায় সায় দিয়ে সেও হাসতে লাগল।

সার্জি বুড়োকে উত্যক্ত করবার জন্য দুষ্টামি করে বললে, ও লোদিঝকিন দাদু, তুমি ত সবই আগে থেকে জানতে পার, তাই না?

হাঁ রে, বড় ফ্যাসাদেই পড়া গেছলো, বুড়ো মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, কি বদখত ছেলে রে,—বাবা। ওরা কি করে মানুষ করছে ওকে তাই ভাবি। একটি ছেলে পঁচিশটি লোককে উঠবোস করাচ্ছে নাচাচ্ছে। আমি হলে আচ্ছা করে দুঘা লাগাতাম ছেলেটাকে। বলে কি না—আমায় কুকুর দাও। এর পরে বলবে, আকাশ থেকে আমায় চাঁদ পেড়ে দাও, তারপর কি চাইবে কে জানে।...

আয় আর্তো, আয়,—আমার লক্ষ্মী কুকুর আয়।...ভগবান, কি দিনটা গেল আজ, ভাবলে অবাক লাগে।

সার্জি ব্যঙ্গ করে বললে,—এর চেয়ে ভাল দিন আর কি হতে পারে? একজন মহিলা আমাদের কাপড় দিলেন, আর একজন দিলেন এক রুবল। তুমি ত সবই আগে থেকে জানতে পার লোদিঝকিন দাদু!

বুড়ো খোশমেজাজেই ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললে, খুব ত কামড় দিয়ে কথা বলা শিখেছিস, এখন চুপ কর।...ভাব ত দারোয়ানের হাত থেকে কেমন ছুটে পালিয়েছিস তুই আজ! আমি ত ভেবেছিলাম আমি আর তোকে ধরতেই পারব না। দারোয়ানের সঙ্গে পেরে ওঠা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়,—কেমন কি না?

কথা বলতে বলতে প্যার্ক থেকে বেরিয়ে এসে ওরা তিনজনে একটা খাড়া ভাঙাচোরা ক্ষয়ে যাওয়া পথে এসে পড়ল, পথটা সোজা সমুদ্রতীরে নেমে গেছে। পাহাড়গুলি একটু পিছন থেকে ঝুলে পড়েছে সমুদ্রের উপর, মাঝখানে একফালি সমান জায়গা, তা আবার নুড়িতে ঢাকা, ছোট ছোট তরঙ্গ তুলে সমুদ্র সেই নুড়ির উপর লুটিয়ে পড়ছে। সমুদ্রের এই তীর থেকে প্রায় পাঁচশ গজ দূরে শুশুকেরা সব ডিগবাজি খাচ্ছে, তাদের চক্‌চকে গোল পিঠ মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে আবার ডুবে যাচ্ছে। দূর চক্রবাল রেখায় নীল সাটিনের মত সমুদ্রে যেখানে গাঢ় নীল মখমলের মত পাড় বসেছে, সেখানে মাছধরা নৌকার পালগুলি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, সূর্যকিরণে ওগুলি একটু গোলাপী দেখাচ্ছে।

লোদিঝকিন দাদু, আমরা এইখানেই স্নান করব,—সার্জি এমনভাবে কথাগুলি বললে যে, এর আর নড়চড় করতে সে রাজী নয়। পরিকল্পনা আগেই করা হয়ে গিয়েছে তার, তাই এইখানে চলবার সময়ই প্যাণ্টুলনটা খুলে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে চলেছে।...দাও, দাদু, তোমার যন্ত্রটা নামিয়ে দিচ্ছি আমি।

এরপর সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় খুলে, রোদে 'ট্যান' করা চকলেট রঙের নগ্ন দেহটায় দুটো থাপ্‌পড় লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, যেখানটায় পড়ল সেখানকার জল সফেন তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

বুড়ো আস্তে আস্তে তার জামাকাপড় খুলতে লাগল। হাত দিয়ে চোখ দুটো একটু আড়াল করে সার্জির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার তাকালে সে, তার মনে হতে লাগল, বেশ হচ্ছে ছেলেটা,—একটু হাড় বের করা চেহারা,—সে কথা ঠিক, পাঁজরাগুলি বেরিয়ে পড়েছে, তবে পরে বেশ শক্ত সমর্থ দেহ হবে ওর, এ কথাও ঠিক।

ওরে সার্জি, বেশি দূর যাসনি, শুশুক রয়েছে, সাবধান।

সার্জি পিছন ফিরে চিৎকার করে বললে, একটাকে পেলে আমি লেজ ধরে টেনে দেব।

বুড়ো বহুক্ষণ রোদে বসে তার বগল দুটোয় হাত বুলালে, তারপর ভয়ে ভয়ে বিশেষ সাবধানে পা টিপে টিপে জলে নামল, ডুব দেবার আগে বেশ করে

তার টাকপড়া চাঁদিতে, শুকনো দুটো গালে জল বুলিয়ে নিলে। তার ঈষৎ তামাটে দেহটা বড় নরম, বড় দুর্বল, পা দুটি অসম্ভব শীর্ণ, এতদিন হার্ডিগার্ডি বয়ে বয়ে পিঠটা হয়ে গেছে কুঁজো, কাঁধের হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে।

লোদিঝকিন দাদু—একবার তাকিয়ে দেখ!

—বলেই জলের মধ্যে ডিগবাজি খেল একবার সার্জি। বুড়ো কোমর পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে নাক দিয়ে ফুঁস ফুঁস শব্দ করে ডুব দিচ্ছিল,—সার্জির কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল,—ও-সব ভাঁড়ামি রাখ, বদমাস্, কি সাহসে তুই করছিস ও-সব, দেখাচ্ছি মজা আমি।

আর্তো এদিকে পাগলের মত সমুদ্রতীরে এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে আর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। সার্জি সাঁতরে সমুদ্রের অত দূরে চলে গেছে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। সে যেন বলতে চাইছে, এত সব কৃতিত্ব দেখাতে যাওয়া কেন? এই যে শুকনো ডাঙ্গা রয়েছে, এইখানে থাকাই ত ভাল, কোন বিপদ ঘটবার আশঙ্কা নেই এখানে।

সে একবার তার পেট অবধি জলে নেমে পড়ে জলটা চেখে দেখল, বিস্বাদ লাগল জল, তা ছাড়া সমুদ্রের ঢেউ নুড়ির উপর আছড়ে কেমন শব্দ করছে দেখে ভয় পেয়ে তাড়াহুড়া করে সে উঠে এল,—তারপর সার্জির দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে সে ডাকতে লাগল ঃ ঐ সব ভাঁড়ামি দেখে কে ভুলবে শুনি? ওর চেয়ে তীরে এসে বুড়োর পাশে বসেনা কেন ও? ছেলেটা একেবারে যা তা!

ওরে, ও সার্জি, তুই এবার উঠে আসবি কি না বল। অনেক সাঁতরানো হয়েছে, বুড়ো চেঁচিয়ে বলে উঠল।

ছেলেটা উত্তর দিলে, আর এক মিনিট, লোদিঝকিন দাদু, দেখ আমি কেমন হাঁসের মত সাঁতার দিতে পারি,—হু-উ-উপ্।

অবশেষে সে সাঁতরে তীরে উঠে এল কিন্তু জামাকাপড় পরবার আগে আর্তোকে ধরে জলে নেমে অনেক দূরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর্তো বিরক্ত হয়ে নাক দিয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ করে জল ছিটাতে ছিটাতে নাক আর কান দুটো শুধু জলের উপরে রেখে সাঁতরে তীরে আসতে লাগল। তীরে এসে গা ঝাড়া দিতে লাগল সে, আর গা থেকে ছিটকে আসা জলের কণাগুলি লাগতে লাগল গিয়ে সার্জি আর বুড়োর গায়ে।

বুড়ো উপরের দিকে তাকিয়ে বললে,—চেয়ে দেখ সার্জি, ঐ লোকটা বোধ হয় আমাদের এদিকে আসছে।

দেখা গেল এলোমেলো হাবিজাবি কি সব বলে হাত-পা নাড়তে নাড়তে একটা লোক দ্রুত ছুটে আসছে নিচের দিকে। মিনিট পনের আগে কালো ডোরা-কাটা গোলাপী শার্ট-পরা গোমরামুখো যে দারোয়ানটা তাদের সেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এ সেই।

বুড়ো ভড়কে গিয়ে বলে উঠল,—এ আবার কি চায়?

৪

দারোয়ানটা আনাড়ির মত থপ থপ করে দৌড়াচ্ছিল, জামার আস্তিন উড়ছিল তার বাতাসে, শার্টের বুকের দিকটা পালের মত ফুলে উঠছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করছিল,—আরে—এই,—একটু দাঁড়াও তোমরা।

লোদিঝকিন বিরক্ত হয়ে বলে উঠল,—মর না! গোল্লায় যাও!—আবার ঐ আর্তোর জন্যে আসছে।

সার্জির বড় সাহস, সে বলে উঠল, এবার ওকে ধরে চাবকানো যাক,—দাদু।

পাগল না কি? বাপরে বাপ, কি লোক ওরা!

দারোয়ান ওদের কাছে এসে পেঁছবার আগে থেকেই বলতে শুরু করলে, কুকুরটা বেচো না, আমাদের বাচ্চা মনিবকে আর আমরা সামলাতে পারছি না। কুকুর নেব, কুকুর নেব বলে সে কেবলি চিৎকার করে কাঁদছে। আমার মনিব ঠাকরুণ পাঠালেন—ওটা কিনে নিয়ে যেতে,—যে দাম লাগে লাগুক।

ওদের বাড়িতে যেভাবে কথা বলার তার সাহস ছিল না, এখানে এই সমুদ্র-তীরে সেভাবে কথা বলতে তার আটকালো না,—বুড়ো ওর কথার জবাবে বললে, এ তোমার মনিব ঠাকুরাণীর পাগলামি। তা ছাড়া তিনি ত আমার মনিব নন। তিনি তোমার মনিব হতে পারেন, কিন্তু আমি তাকে থোড়াই কেয়ার করি। খৃস্টের দোহাই, আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও,—তুমি পালাও।

কিন্তু দারোয়ান হাল ছাড়বার পাত্র নয়, বুড়োর পাশেই নুড়ির উপর বসে পড়লে সে, বসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বুড়োর সামনে আঙুল নেড়ে সে বললে, মূর্খ, বুঝছ না কেন?

বুড়ো তখনই শান্তকণ্ঠে তার প্রত্যুত্তর দিলে, মূর্খ তুমি নিজে।

একটু সবুর। কথাটা ওভাবে বলিনি আমি, কি দারুণ অভিমান তোমার, বাপ রে!...একবার ভেবে দেখ দেখি একটা কুকুরের মূল্য কি তোমার কাছে হতে পারে! আর একটা বাচ্চা যোগাড় করে তাকেও তুমি দাঁড়াতে শিখাতে পারো,—তা হলেই ত তোমার হল। কি,—মিছে বলেছি আমি? এ্যাঁ!

বুড়ো তখন তার প্যান্টুলনের বেল্ট বাঁধতেই ব্যস্ত, দারোয়ানের বিরামহীন প্রশ্নের উত্তরে নিতান্ত ঔদাসীন্য ভরে সে বললে,—কি বক্‌বক্‌ করছ, যা বলবার আছে তোমার বলে যাও, আমি এক কথায় তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব।

দারোয়ান উত্তেজিত হয়ে বলে চললো,—এঁরা তোমায় কত দিতে চাইছেন তাই একবার দেখ, একসঙ্গে একেবারে দুই তিনশ রুবল,—অবশ্য এর মধ্যে

আমি যে কষ্টটুকু করছি তার জন্য আমারও কিছু প্রাপ্য আছে। সে কথা যাক, একবার ভেবে দেখ,—তিনশ রুবল,—কেন, এ দিয়ে তুমি একটা মুদীর দোকানই খুলে বসতে পার।

এই সব বলতে বলতে দারোয়ান হঠাৎ তার পকেট থেকে এক টুকরো মাংসের কাবাব বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কুকুরটার দিকে। আর্তো মাটিতে পড়ার আগেই সেটা লুফে নিয়ে এক ঢোকে গিলে আহ্লাদে লেজ নাড়তে লাগল।

লোদিঝকিন সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে—হয়ে গেল সব বলা?

বলবার বেশি কিছু নেই, কুকুরটা আমায় দাও, তোমার আমার দুজনেরই এতে লাভ।

বুড়ো একটু টিটকিরি দিয়ে বললে,—বুঝলাম, তা হলে তুমি আমায় কুকুরটা বিক্রি করতে বলো?—

হাঁ, নিশ্চয়ই। কেন বলব না? আমাদের মুস্কিল হচ্ছে যে, বাচ্চা মনিবের আমাদের এমনই গোঁ যে মাথার ভিতর কোন এক জিনিস নেবার রোখ চাপলে সে একেবারে সবাইকে পাগল করে ছাড়বে। কোন জিনিস চাই ত চাই-ই। ওর বাবা যখন দূরে থাকেন তখন ও বেশি কিছু করে না, কিন্তু তিনি এখানে এলেই—বাপ রে বাপ,—সবাইকে পাগলের মত ছুটতে হবে। ওর বাবা একজন ইঞ্জিনীয়ার— হয়ত তাঁর নাম শুনে থাকবে, মিস্টার ওবোল্যানিনোভ? রাশিয়ার সব জায়গায় রেলপথ তৈরি করছেন তিনি। বহুলক্ষপতি! আর এ হচ্ছে তাঁর একমাত্র ছেলে। সুতরাং নষ্টামি এর লেগেই আছে। বাচ্চা ঘোড়া চাই, অমনি বাচ্চা ঘোড়া এল, নৌকো চাই অমনি এল নৌকো, একেবারে সত্যিকার নৌকো। ও পায় না এমন কোন জিনিসই নেই।

চাঁদের বেলায়?

কি বলছ তুমি বুঝছি না।

বলছি, আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলেনি সে কোনদিন?

দারোয়ান অবাক হয়ে গিয়ে বললে, বাপ রে বাপ, কি কথা। ভাল মানুষের বেটা, কি বলছ তুমি সব? এই কি ব্যবসার চুক্তির কথা?

বহু বৎসর ব্যবহারের ফলে বুড়োর বাদামী রঙের জ্যাকেটটার জোড়ের জায়গা সব সবুজ হয়ে গেছে,—এই সব বলবার সময়ই সেটা পরা হয়ে গেছে তার, এবার সে তার কুঁজো পিঠ যতটা সিধে করতে পারে ততটা করে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে,—শোন হে তুমি, আমি তোমায় শুধু এইটুকু বলতে চাই ঃ ধরো তোমার একটা ভাই আছে, কিংবা বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে ভাব।...থাম,—কুকুরটাকে আর মাংসের কাবাব দিও না, ওতে লাভ হবে না কিছু, বরং নিজে ওটা খেয়ে নাও।...হাঁ, যা বলছিলাম, ধরো তোমার এক বিশ্বাসী বন্ধু আছে, একেবারে ছেলেবেলা থেকে ভাব তার সঙ্গে—তুমি কত হলে বিক্রি করতে পার তাকে বলো?

একি একটা তুলনা হল?

তুমিই এ উপমা দিতে বাধ্য করেছ আমায়। তোমার মনিবকে বলো,—মনিব ত তোমার রেলপথ তৈরি করেন, তাঁকে বলো, যা কেনা যায় তার সব বেচা যায় না।

...কুকুরটা অমন আদর করে চাপড়াতে হবে না তোমার, ওতে লাভ হবে না কিছু।...আর্তো,—কুকুরের বেটা, আয়, এদিকে আয়, তোকে সব শিখিয়ে দেব আমি।...সার্জি, এবার প্রস্তুত হ।

দারোয়ান মেজাজ আর ঠিক রাখতে না পেরে শেষে বলে উঠল, বুড়ো,—তুমি একটা নিরেট বোকা!

লোদিঝকিন পাল্টা জবাবে বললে,—হতে পারি আমি বোকা, কিন্তু তুমি হচ্ছ একটা ইতর, নীচ, বিশ্বাসঘাতক, তোমার মনিব ঠাকুরানীর সঙ্গে দেখা হলে বলো, তাঁকে আমি আমার প্রীতি আর সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। সার্জি, কম্বলটা গুটিয়েনে,...আরে, আমার পিঠ,—পিঠটা গেল আমার।...চল্।

দারোয়ান নিতান্ত অসহায় বোধ করে বললে,—শেষে তা হলে এই গিয়ে দাঁড়াল?

হাঁ, তাই দাঁড়ালো—উত্তর দিলে বুড়ো।

সমুদ্রতীরের পথটা ধরে চললে ওরা তিনজন প্রাণী। সার্জি হঠাৎ একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে,—দারোয়ান ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তিরিক্ষে মেজাজে কি যেন ভাবছে সে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাতের পাঁচটা আঙুল দিয়েই মোক্ষম জোরে টুপির নিচে লাল চুলওয়ালা ঘাড়ের গাঁট চুলকাচ্ছে, টুপিটা নেমে এসেছে চোখের উপর।

৫

মিসখোর আর আলুপকা—এই দুটি পাহাড় যেখানে এসে মিশে দিব্যি এক নিরালা কোণের সৃষ্টি করেছে সেখানে বসে বেশ আরামে খাওয়া যায়,—বুড়ো লোদিঝকিনও খাবার জন্য এই জায়গাটাই বেছে রেখেছিল, এর ঠিক উপরেই পড়ে অপেক্ষাকৃত নিচের বড় রাস্তাটা। বুড়ো তার সঙ্গী দুটি নিয়ে এইখানে এসে হাজির হল। আঁকাবাঁকা ওক আর হেজেল ঝোপের ছায়া, তারই নিচের মাটির ভিতর দিয়ে বুড়বুড়ি তুলে একটা ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে,—কাছেই ঘোলাটে জলওয়ালা বেগবতী একটা পাহাড়ে নদী, তার উপরে একটা সেতু। ফোয়ারাটার উৎস স্থানটা একটা অগভীর বাটির মত, বাটির জল উপচে একটা সরু

আঁকাবাঁকা ধারার আকারে বয়ে গিয়ে পড়ছে ঐ পাহাড়ে নদীটায়, ঘাসের গায়ে লেগে ফোয়ারার জল চিক্‌চিক্‌ করছে, দেখে মনে হয় যেন পারা। সকালে বিকালে দেখা যায় ধার্মিক তুর্কীরা এসে এই ফোয়ারায় পূতস্নান করছে, অথবা এর জল পান করছে।

হেজেল ঝোপের ছায়ায় বসে পড়ে বুড়ো লোদিঝকিন বলে উঠল, পাপের ওজন হল আমাদের ভারি, তাই খাবারের ওজন হল হালকা। সার্জি,—আয়, আমাদের খাবারটুকুর উপর দেবতার আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়া যাক।

—বলেই ক্যাম্বিশের ব্যাগের ভিতর থেকে বের করলে সে একখানা রুটি, এক ডজন টমেটো, খানিকটা বেসারাবিয়ার পনির, আর এক বোতল জলপাই তেল। একটা আধময়লা নেকড়ায় খানিকটা লবণ বাঁধা। খাওয়া শুরু করবার আগে নিজের বুকের উপর ক্রুশের মত করে হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কি সব আওড়ালে, তারপর রুটিটা তিনটি অসমান ভাগে সে ভাগ করলে। সবার বড় ভাগটা সে সার্জির হাতে তুলে দিলে ঃ ছেলেটির উঠন্ত বয়স, ঠিক মত খাওয়ানো দরকার তাকে,—মাঝারি ভাগটা দিলে সে কুকুরটাকে,—আর সবার শেষ—ছোট ভাগটা রাখলে সে নিজের জন্যে।

স্বর্গীয় পিতা এবং তাঁর পুত্রের নাম স্মরণ করে। হে প্রভু, তোমার দিকেই চেয়ে আছে সবাই,—বিড়বিড় করে এই সব বলতে বলতে বুড়ো তাড়াহুড়া করে খাবারটা বে'টে দিয়ে তার উপর জলপাইয়ের তেল ঢেলে দিলে।—খা,—সার্জি,—খা।

তিনজনেই তাদের সামান্য খাবার চুপ করে বসে ধীরে ধীরে খেতে লাগল—সত্যিকার কর্মী লোকেরা এমনি করেই খায়। তিন জোড়া মাড়ি খাবার চিবিয়ে যাচ্ছে, তারই শব্দ শুধু শোনা যাচ্ছে, আর কোন শব্দ নেই। আর্তো একটু দূরে পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে সামনের পা দুটো দিয়ে রুটির টুকরো ধরে খেয়ে যাচ্ছিল। বুড়ো আর সার্জি পালা করে একজনের পর আর একজন নুনের মধ্যে পাকা টমাটো ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিচ্ছিল,—ওতে কামড় দেবার সময় রক্তের মত রাঙা ওর রস তাদের হাতে মুখে জড়িয়ে যাচ্ছিল, এক কামড় টমাটোর পরেই চলছিল রুটি আর পনির। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তারা মগে করে ফোয়ারার জল ধরে পান করলে। জলটা যেমনি কাঁচের মত টলটলে তেমনি সুস্বাদু, আর এমনি ঠান্ডা যে ধরবার সময় মগের বাইরের গা ঝাপসা হয়ে উঠছিল। অতি ভোরে উঠে অনেক পথ হে'টেছে তারা, তা ছাড়া দিনটাও তেমনি গরম, বুড়ো ঘুমের জ্বালায় চোখের পাতা দুটি আর মেলে রাখতে পারছিল না। সার্জিও হাই তুলে সটান শুয়ে পড়ল।

হাঁ-রে,—একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক, কি বলিস?—বুড়ো বলে উঠল ছেলেটার উদ্দেশ্যে, আর একবার একটু জল খেয়ে নিই,—কি মিষ্টি জল! বুড়ো একটা হাঁফ ছেড়ে মগটাকে মুখ থেকে সরাল, বেশ কয়েক ফোঁটা জল তার দাড়ি-গোঁফে গড়িয়ে পড়ল ঃ আমি যদি রাজা হতাম ত সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি এখানকার

এই জল খেতাম।...আরে এই আর্তো, তুই এদিকে আয়।...যাক ভগবান আজ আমাদের খাবার দিয়েছেন, এ আর কেউ চুরি করতে পারবে না। খাবার খেলাম শুধু এই নয়,—খাবারটা ভালও ছিল খুব আজ।

বুড়ো আর সার্জি তাদের নিজের নিজের পুরনো জ্যাকেট বালিশের মত করে মাথার নিচে দিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। উপরে গ্রন্থিল বিস্তৃত ওকের ঘন সবুজ পত্রাবলী, তার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে প্রশান্ত নীল আকাশ। পার্বত্য নদীটা পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে প্রাণ জুড়ানো একটানা কুল কুল নাদে বয়ে চলেছে. শুনে মনে হয় কাকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে মিষ্টি সুরে গান গাইছে সে। বুড়ো শুয়ে একটু এপাশ ওপাশ করলে, একটু কাতরালে, তারপর অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কত কি বলতে লাগল, কিন্তু সার্জির মনে হতে লাগল, সুদূর কোন ঘুমের দেশ থেকে কার কোমল কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসছে, কথাগুলি যেন রূপকথায় শোনা কথার মত রহস্যময় ঃ

প্রথমে তোকে আমি কি সব সাজপোশাক কিনে দেব,—তাই শোন ঃ কিনে দেব সোনার কাজকরা গোলাপী রঙের আঁট জামা, সার্টিনের জুতো, সে-ও আবার গোলাপী রঙের। কিভ, খারকোভ,—তারপর ধর না ওদেশ্শা শহর, সত্যিকার সার্কাস আছে এই সব জায়গায়,—তারার মত সব আলো, সব বিজলী। প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসে সেখানে, হয়ত তার বেশি,—সঠিক বলতে পারব না আমি। একটা ইতালীয় নাম ভেবে রাখতে হবে তোর জন্যে। য়েস্তিফিয়ের, লোদিঝকিন, এ আবার একটা নাম না কি? যত সব বাজে নাম. কোন কল্পনাশক্তির পরিচয় নেই এতে। প্রাচীরপত্রে তোর নাম লেখা হবে আন্তোনিও, অথবা এনরিকো বা আলফোনসো নামও মন্দ হবে না।

ছেলেটি আর শুনতে পেল না কিছু। এক মিষ্টিমধুর ঘুম তাহার দেহকে শিথিল অবশ করে তার সর্বচৈতন্য হরণ করে নিল। খাবার পরে সার্জির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে বুড়ো মনে মনে যে মধুর স্বপ্নজাল বোনে তার সুতো হঠাৎ কেটে গিয়ে বুড়োও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মাঝে একবার মনে হল তার আর্তো যেন কাকে দেখে রেগে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। তন্দ্রার মাঝে গোলাপী শার্ট-পরা সেই দারোয়ানটার কথা যেন একবার একটু মনে হচ্ছিল. কিন্তু গরমে, ক্লান্তি আর ঘুমে তাকে একেবারে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে উঠতে পারলে না সে। চোখ না খুলেই শিথিল কণ্ঠে সে শুধু বলে উঠল,—ফিরে আয় আর্তো,—বলছি। পথো কুকুর, তোকে শিখিয়ে দেব আমি।

কিন্তু তখনই তার চিন্তাগুলিতে কেমন জট পাকিয়ে গেল. স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার সর্বচৈতন্য।

সার্জির চিৎকারে বুড়োর ঘুম ভেঙে গেল। ছেলেটি নদীর অপর পারে—উপরে, নিচে, ভয়ে উদ্বেগে জোরে শিটি দিয়ে কেবল ডাকছে,—আর্তো আয়, ফিরে আয়,—হু-ই-ই, হু-ই-ই,—আর্তো আয়, ফিরে আয়।

বুড়ো তার অবশ হাতটা অতি কষ্টে সোজা করে রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, চেঁচাচ্ছিস কেন, সার্জি? কি হল?

সার্জিও তিরিক্ষে মেজাজে বললে,—কুকুর হারিয়েছে আমাদের—হল—এ-ই।... কুকুরটা গেল।

আর একবার জোরে শিটি দিয়ে ডাকলে সে,—আর্তো—ও-ও।

বুড়ো বলে উঠল,—যত সব বাজে, এক্ষুণি আসবে সে। বললে বটে, কিন্তু তখনই হামা দিয়ে উঠে দাঁড়ালে সে, তারপর কম্পিত ক্রুদ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার শুরু করল,—আর্তো আয়,—আয় কুকুরের বেটা—আয়!

কুকুরকে বার বার ডাকতে ডাকতে—টলতে টলতে সে সেতুটার উপর গেল,—বড় রাস্তায় উঠে গেল। চক্‌চকে সাদা সমান বড় রাস্তার প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত চোখে পড়ল তার, কিন্তু তার মাঝে কোন জনপ্রাণীর নামগন্ধ নেই।

এবার বুড়োর স্বর করুণ হয়ে উঠল,—করুণ সুরে বিলাপের মত করে ডাকলে,—আর্তো, আমার লক্ষ্মী কুকুর ফিরে আয়! তারপর হঠাৎ তার দেহটা নুয়ে পড়ল,—সে থাবড়ে বসে পড়ল মাটিতে।

তখন বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠল,—ও, তাই বটে!... সার্জি, আয় ত এদিকে।

কি হল আবার?—লোদিঝকিনের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে সার্জি,—হারিয়ে যায়নি, খুঁজে পেলে বুঝি?

এটা কি, সার্জি, দেখ ত এটা কি? বুঝছিস আমার কথা?—বুড়ো প্রায় কনে কানে বলার মত করে জিজ্ঞাসা করলে সার্জিকে। কথাটা বলবার সময় বুড়ো বিষণ্ণ বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ছেলেটির মুখের দিকে,—সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হস্তের দ্বারা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল মাটির দিকে।

বেশখানিকটা কামড়ে খাওয়া মাংসের কাবাবের টুকরো পড়ে আছে সাদা ধুলোর মাঝে, চারিদিকে তার কুকুরের পায়ের দাগ।

মাটিতে বসে সে ভীতজড়িত অনুচ্চকণ্ঠে বললে, সেই পাজিটা আমাদের কুকুরটাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। সে-ই যে নিয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সমুদ্রতীরে কুকুরটাকে সে মাংসের কাবাব খাইয়েছে—মনে আছে না তোর?

সার্জিও ক্রোধোদ্ধত কণ্ঠে বললে, তারই কাজ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চাইল—পরক্ষণেই চোখ দুটি তার জলে ভরে এল, অশ্রু রোধ করতে চোখ দুটি সে পিট পিট করতে লাগল এবং তারপর দু হাতে তা ঢেকে ফেললে।

বুড়ো দুলে দুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল,—আর অসহায়ের মত বলতে লাগল,—ওরে সার্জি,—আমরা এখন কি করি? কি করব এখন আমরা?

সার্জি রেগে গিয়ে তাকে ভেংচে বলে উঠল,—আমরা—এখন কি করি,—আমরা এখন কি করি?...ওঠ, না,—ছাই,—চলো।

মনমরা বুড়ো নিরীহের মত তখনই রাজী হয়ে উঠে দাঁড়াল,—হাঁ রে সার্জি, চল,—যাওয়া যাক।

মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে না সার্জি, বড়রা যেমন ছোটদের উপর করে, বুড়োর উপর তেমনি চোপা করে সে বলে উঠল,—ও নাল ফেলা থামাও। অপরের কুকুর নেওয়ার তাদের কোন অধিকার নেই। আমার দিকে অমন হাঁ করে দেখছ কি? মিছে বলছি আমি? সোজা তাদের কাছে গিয়ে আমরা বলব, ফিরিয়ে দাও আমাদের কুকুর। তা যদি না দেয় তা হলে সোজা পুলিশের কাছে যাব আমরা। এ ছাড়া আর করবার কিছু নেই।

পুলিশের কাছে? ঠিক। ঠিকই বলেছিস তুই, পুলিশের কাছে,—নির্বোধের মত কেমন এক দুঃখের হাসি হেসে বুড়ো বলে উঠল এই কথাগুলি, বললে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হতভম্বের মত চাইতে লাগল এদিকে ওদিকে : পুলিশের কাছে যাওয়াই উচিত, কিন্তু পুলিশের কাছে যাওয়ার যে আমাদের কোনই উপায় নেই!

কেন থাকবে না উপায়? আইন সবার জন্যেই এক। আমাদের ভয় পাবার কি আছে?—বুড়োর কথায় বাধা দিয়ে অধীরভাবে বলে উঠল সার্জি।

সার্জি, তুই রাগ করিস নে আমার উপর। ওরা আমাদের কুকুর কিছুতেই ফিরিয়ে দেবে না,—বুড়ো কিসে যেন ভয় পেয়ে গলার স্বরটা হঠাৎ নিচু করে বললে, পাসপোর্টের জন্যই আমার যত ভয়। ঐ ভদ্রলোকটা তখন কি বললে, মনে আছে তোর? বললে, পাসপোর্ট আছে তোমার? দেখি পাসপোর্ট! পাসপোর্ট আমার আছে—

বুড়োর চোখে মুখে হঠাৎ ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল,—অন্য কেউ শুনতে না পায় এমন চুপে চুপে কানে কানে বলার মত করে সে বললে,—কিন্তু সে পাসপোর্ট আমার নিজের নয়, সার্জি।

তোমার নয়, মানে?

তাই রে,—আমার নয়। আমার খানা ট্যাগানরোগে হারিয়ে ফেলি আমি, কে জানে কেউ হয়ত চুরিই করেছিল। তারপর দুই বৎসর ধরে আমি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। কত ঘুষ দিতে হল আমায়, কত দরখাস্ত লিখলাম। শেষে দেখলাম খরগোশের মত সবার ভয়ে এমন পালিয়ে বেড়ানো আর চলে না। মনে শান্তি পাই না। শেষে একদিন ওদেস্সাতে অল্প পয়সায় রাত্রে ঘুমুবার এক ঘরে এক গ্রীকের সঙ্গে দেখা। সে সব শুনে বললে, এ ত অতি সহজ ব্যাপার, পঁচিশটে রুবল বের কর তুমি, আমি তোমায় এমন পাসপোর্ট দেব যে, সারা জীবন চলে যাবে তোমার। এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ

ভাবলাম। তারপর মনে হল, যাক গিয়ে যা হয় হবে, এইটাই নিয়ে নিই। সেই থেকে আমি অপরের পাসপোর্ট ব্যবহার করে আসছি।

ও দাদু!—সার্জি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে—ও দাদু বড়ই দুঃখের কথা আমাদের কুকুরটা হারালাম আমরা। কি সুন্দর কুকুর ছিল!

বুড়ো তার কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, সার্জি, সোনা আমার, ঠিকমত পাসপোর্ট থাকত যদি আমার, তুই কি ভাবিস, তা হলে ওদের আমি ভয় করে চলতাম? ওরা সেনাপতি হলেই বা কি? গলা চেপে ধরতাম না আমি? বলতাম, এ কি, কুকুর চুরি করবার তোমাদের কি অধিকার আছে? আইনে ত এমন অধিকার দেয় না! কিন্তু সার্জি, এখন যে আমরা একেবারে গেছি। পুলিশের কাছে গেলেই তারা প্রথমেই বলবে,—তোমার পাসপোর্ট দেখাও। তুমি কি সামারার মার্তিন লোদিঝকিন?—হাঁ, স্যার, কিন্তু আমি লোদিঝকিন নই,—আমার নাম আইভ্যান দুদকিন,—কৃষক আমি। ভগবানই জানেন—ঐ লোদি-ঝকিন কে। সে যে কোন চোর বা পলাতক আসামী নয় তাই বা আমি কি করে জানব? অথবা খুনীও হতে পারে! সার্জি, আমাদের কিছুই করবার উপায় নেই, কোন উপায় নেই। চেষ্টা করা বৃথা।

বলতে গিয়ে কান্নায় বুড়োর গলাটা ধরে এল, নতুন করে চোখ থেকে জল বেরিয়ে বলিকুঞ্চিত রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। সার্জি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বিবর্ণমুখে এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল বুড়োর কথা,—এইবার সে হঠাৎ বুড়োর বগলের নিচে হাত দিয়ে তুলে ধরলে তাকে।

সে দৃপ্ত অথচ গভীর দরদ-ভরা কণ্ঠে বুড়োকে ডেকে বললে,—এস দাদু, মরুক গিয়ে তোমার পাসপোর্ট, তুমি এসো এখানে, এই রাস্তায় ত আমাদের রাত কাটানো চলবে না।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল বুড়োর, সঙ্গে সঙ্গে সে খেদ করে বলতে লাগল, ওরে সার্জি,—সার্জি রে,—বেচারা আর্তো আমাদের কি চালাক কুকুরই ছিল! এমন ভাল কুকুর আমরা আর পাব না।

সার্জি ধমকে উঠলে,—হয়েছে,—হয়েছে, এখন ওঠো, এসো দেখি একটু ব্রাশ করে দি তোমায়, মুখটা একটু তুলে ধরো।

সেদিন আর তারা খেলা দেখালে না। সার্জির বয়স অল্প হলেও কি সাংঘাতিক জিনিস যে এই পাসপোর্ট সে তা বোঝে। তাই আর্তোর খোঁজ করা, ধর্মাধিকরণের শরণ লওয়া বা অন্য কোন কঠোর পন্থা অবলম্বন করার জন্য সে জিদ্ ধরলে না। কিন্তু বুড়োর সঙ্গে রাত্রির আস্তানায় যাবার সময় তার চোখে-মুখে এমন এক নতুন একগুঁয়েমির ভাব ফুটে উঠল যে, দেখলেই মনে হবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বড় রকমের কিছু একটা করবার জন্য সে মতলব আঁটছে। আগে থেকে যে কোন যুক্তি করে—তা নয়, হয়ত দুজনের মনের মাঝে গোপনে একই

ইচ্ছা কাজ করছিল, তাই তারা সোজা পথে রাতের আস্তানায় না গিয়ে একটু ঘুরো পথে 'বন্ধুত্ব-কুটীরে'র পাশ দিয়ে চলল। আর্তোকে যদি একবার দেখা যায়, অন্তত তার ডাকও যদি একবার শোনা যায় এই আশায় ঐ বাড়ির গেটের সামনে একটু দেরিও তারা করল।

কিন্তু ঐ জাঁকালো বাড়ির মরিচাহীন লোহার গেটটা এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, লম্বা সরু বিষণ্ণ সাইপ্রেসের তলাকার ছায়াভরা উদ্যান নীরব নিস্তব্ধ।

মনের তিক্ততা মনে চেপে রাখতে না পেরে বুড়ো বলে উঠল,—ভদ্রলোকই বটে!

সার্জি রুঢ়ভাবে তাকে ধমক দিয়ে বললে, হয়েছে,—হয়েছে,—এখন এসো। সঙ্গে সঙ্গে তার জামার আস্তিন ধরে টানতে লাগল।

বুড়ো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে, সার্জি রে,—আর্তো বোধ হয় এদের কাছ থেকে পালিয়ে আসবে আমাদের কাছে,—তোর কি মনে হয়?

সার্জি কোন উত্তর দিলে না, লম্বা লম্বা পা ফেলে—সে শুধু সামনে এগিয়ে চলল। নজর তার কেবল রাস্তার উপর, ক্রোধে পাতলা ভ্রূদুটি তার তখন কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

৬

পথে আর কোন কথা না বলে তারা আলুপকায় এসে হাজির হল। সারা পথ বুড়ো কেবল কাতরেছে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে. সার্জির চোখে-মুখে ক্রোধ আর দৃঢ়সংকল্পের ছাপ। একটা নোংরা তুর্কী কফিখানায় তারা রাত্রির আস্তানা নিলে,—কফিখানার নামটা বড় জমকালো. 'ইল্দিজ' বা 'স্টার'। এখানে আসে যত পাথরকাটা মিস্ত্রী, খাল, পথ, রেলরাস্তা তৈরি করবার মজুর, টুকিটাকি কাজ করে দিনগুজরান করে এমন কতকগুলি রুশীয় মজুর,—আর দক্ষিণ রাশিয়ায় ছিঁচকে চোর শ্রেণীর বিরাট ভবঘুরে গোষ্ঠীর কেউ কেউ। যথা সময়ে কফিখানা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই শুয়ে পড়ল. কেউ শুলো দেয়ালের গা ঘেষা বেঞ্চিতে, কেউ মেঝেয়, যারা বেশি পাকা লোক তারা তাদের দামি জিনিসপত্র আর জামা-কাপড় মাথার নিচে রাখলে।

সার্জি বুড়োর পাশে মেঝেতেই শুয়ে ছিল, দুপুর রাত্রি পার হতেই সে চুপি চুপি উঠে জামাকাপড় পরতে শুরু করলে। জানলা দিয়ে তেরছাভাবে ফিকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মেঝেতে. সেই আলোতে আলুথালু শোয়া লোক-গুলির মুখ দেখাচ্ছে বেদনাক্লিষ্ট,—মৃত।

কফিখানার মালিক তরুণ তুর্কী ইব্রাহিম সার্জিকে দেখতে পেয়ে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল,—এত আত্রে কুথা যাইছ তুমি,—বাচ্চা?

পাকা ঝানু লোকের মত সার্জি উত্তর দিলে, বিশেষ দরকারে বাইরে যেতে হবে আমার,—না গিয়ে উপায় নেই,—নাও, উঠে দরজা খুলে দাও আমায়।

ইব্রাহিম উঠে হাই তুললে, গাটা একটু চুলকে নিলে, তারপরে সার্জিকে তিরস্কার জানাতে জিভ দিয়ে একরকম টিক টিক শব্দ করতে করতে দরজা খুলে দিলে। তাতার পাড়ার সংকীর্ণ গলিগুলিতে ঘন নীল ছায়া, ছায়ায় রাস্তা ঢেকে গেছে ওর খাঁজকাটা কিনারা গিয়ে পড়েছে উল্টো দিকের বাড়ির ভিতে, আর ঐ সব বাড়ির নিচু দেয়ালগুলি জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে। শহরের বাইরের দিকে অনেক দূরে কুকুর ডাকছে। উপরের বড় রাস্তা থেকে কদমে চলা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

নীরব ঘনশ্যাম সাইপ্রেসকুঞ্জ-বেষ্টিত সবুজ রঙের পেঁয়াজের মত গম্বুজ তোলা সাদা মসজিদটা পার হয়ে গেল ছেলেটা, সরু আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে পড়ল গিয়ে নিচেকার বড় রাস্তায়। সহজে চলাফেরা করতে পারবে বলে পরে এসেছে সে শুধু তার আঁট জামাটা। পিঠের উপর তার চাঁদের আলো পড়ে সামনে সামনে চলা নিজের ছায়াটা দেখাচ্ছে যেন তার বেটেসেটে অদ্ভুত সিলুয়েটের মত। রাস্তার দুধারে যে ঘনকুঞ্চিত ঝোপ এসে পড়েছে—তার মাঝ থেকে একটা পাখি নির্দিষ্ট সময় অন্তর একঘেয়ে মিহি গলায় ডাকছে,—ঘুম,—ঘুম! নীরব নিস্তব্ধ রাত্রে নিতান্ত বিশ্বস্তের মত কি এক বেদনার গোপন জিনিস যেন পাহারা দিচ্ছে সে,—তন্দ্রা আর ক্লান্তি জয় করবার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে তাই খেদ করে সে বলছে,—ঘুম, ঘুম! এই সব ঝোপঝাপ আর সুদূর অরণ্যের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে আই পেত্রির সূক্ষ্মাগ্র দুই চূড়া,—দিব্য সুন্দর এমন পরিচ্ছন্ন এর রূপ যে দেখে মনে হয় বিরাট একখণ্ড রূপালি কার্ডবোর্ড কেটে কে যেন এ দুটি তৈরি করেছে।

চারিদিকের গভীর নিস্তব্ধতা তাকে মুগ্ধ করল, শঙ্কিত করল, এই নিস্তব্ধতাই যেন তার পায়ের শব্দকে স্পষ্ট এমন কি উদ্ধত করে তুলছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে এক ধরনের কৌতুক জাগিয়ে বোধশক্তি কেড়ে নিয়ে সাহসী করেও তুলছে। বাঁকা রাস্তায় পড়তেই সমুদ্র চোখে পড়ল। বিশাল প্রশান্ত বারিধি যেন গুরুগম্ভীর তালে উঠানামা করছে। একটা সরু রূপালি ঝিক্‌ঝিকে পথ চক্রবাল রেখা থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছেছে; মাঝে মাঝে এখানে ওখানে কিছুটা ঝক্‌মক্ করে সমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে—সমুদ্রে এমনি অবলুপ্তি ছাড়া সমগ্রভাবে ওটাকে দেখে মনে হয় সমগ্র সমুদ্রকূল জুড়ে যেন একটা ঝক্‌ঝকে তরল ধাতুর পাত বসানো রয়েছে।

কাঠের ছোট্ট দরজাটা দিয়ে সার্জি নিঃশব্দে বাগানে ঢুকল। গাছের নিচে ওখানে বেশ অন্ধকার। একটু দূরে চঞ্চল পাহাড়ী নদী কুলকুলু স্বরে বয়ে

চলেছে, ওখানকার ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে এসে লাগল তার। ওর পায়ের নিচে সেতুর কাঠের পাটাতন বেশ জোরে থপ্ থপ্ শব্দ করে উঠল। নিচের জল যেমনি কালো তেমনি ভয়ঙ্কর। এখানেই সেই লেসের মত কাজ-করা উঁচু লোহার গেট, উইস্টেরিয়া লতায় জড়ানো তার গা। গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ছিটকে আসা চাঁদের আলো গেটের জাফরির উপর পড়ে চিক্‌চিক্ করছে, যেন ছিটে ছিটে মৃদু ফসফরাস জ্বলছে। এর পরেই অন্ধকার, আর নিস্তব্ধতা--ভীরু সজাগ নীরবতা।

কয়েক সেকেন্ড সার্জি একটু ইতস্তত করলে, একটু ভয় ভয় করল তার, কিন্তু তখনই সে ভাবটা কেটে গেল তার, নিজের মনেই চুপি চুপি বলে উঠলে সে,—যা থাকে কপালে, ভিতরে ঢুকবই আমি। একই কথা!

গেট বেয়ে ওঠা তেমন কঠিন হল না। নক্সী গেটের ঢালাই লোহার পাকানো অংশগুলিতে তার পোক্ত হাত আর ছোট্ট পা রেখে রেখে উঠে গেল সে। গেটের উপরে অনেক উঁচুতে রয়েছে একটা পাথরের খিলান। সার্জি হাতড়ে হাতড়ে সেটা ধরে তার উপরে উঠলে, তারপর পেটের উপর শুয়ে পা দুটো নামিয়ে দিলে অপর দিকে, এবার সারা দেহটা নামিয়ে দিতে চেষ্টা করলে সে, সঙ্গে সঙ্গে পা দিয়ে কোন একটা অবলম্বন খুঁজতে লাগল। শেষে শুধু আঙুল দিয়ে খিলানের প্রান্তদেশ ধরে ঝুলে পড়লে সে,—তখনও পা রাখবার কোন জায়গা মিলল না। এ কথা সে আগে ভেবে দেখেনি যে, গেটের উপরকার খিলানের প্রান্ত সামনের চেয়ে ভিতরের দিকে বেশি বেরিয়ে থাকে। ভয়ে বুকটা তার ধুক্ ধুক্ করতে লাগল, হাত দুটো অবশ হয়ে গেল, গায়ের জোর কমে গিয়ে দেহটা হয়ে উঠল ভারী।

অবশেষে সেখানে ও আর ঝুলে থাকতে পারলে না, খিলানের ছুঁচোলো প্রান্ত-দেশ থেকে আঙুল ফসকে প্রচণ্ডবেগে ও মাটিতে পড়ে গেল।

সে শুনতে পেল তার দেহের চাপে নিচের শক্ত নুড়িগুলি কচ্‌মচ্ করে উঠল। হাঁটুদুটো ভীষণ ব্যথা করতে লাগল তার। পড়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড জড়ের মত পড়ে রইল সে। তার মনে হতে লাগল বাড়ির লোকজন সব এখনই জেগে উঠবে, ডোরাকাটা গোলাপী জামা গায়ে গোমরা মুখো দারোয়ানটা এখনই ছুটে আসবে, সারা বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কিন্তু বাগানের সেই গভীর নিস্তব্ধতা পূর্ববৎই রয়ে গেল, একটুও ভগ্ন হল না। ওখানে শুধু অতি মৃদু গুঞ্জনের মত যেন কিসের ধ্বনি হচ্ছে।

কিন্তু তখনই সে বুঝে ফেললে—এ শুধু তার নিজেরই কানের ঝাঁ-ঝাঁ। উঠে দাঁড়ালে সে নিজের পায়ের উপর। বাগানটা ফুলের সৌরভে ভরা যেন একটা স্বপ্ন রূপকথার উদ্যানের মত এ সুন্দর, রহস্যময়, ভয়ঙ্কর। আঁধারে ফুলগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কেয়ারিতে থেকেই এরা ওকে দেখছে, আর দুলে দুলে গভীর উদ্বেগে এ ওর কানে কানে কি যেন সব বলাবলি করছে। লম্বা সরু

সুগন্ধি সাইপ্রেসগুলি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে। পাহাড়ী নদীর অপর পারে ঘন ঝোপের মাঝে সেই ক্লান্ত ছোট্ট পাখিটা তার ঘুম কাটানোর চেষ্টায় মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে ডেকে উঠছে,—ঘুম! ঘুম! ঘুম!

পথের মাঝে এলোমেলো ছায়ায় ঠিক জায়গাটা চিনে উঠছিল না সে। অনেকক্ষণ ধরে নুড়ির উপর দিয়ে খচ্‌মচ্‌ করে হেঁটে অবশেষে সে বাড়িটায় এসে হাজির হল।

জীবনে এমন নিঃসহায় নিঃসঙ্গ বোধ কোনদিন করেনি, ও—এর বেদনা যে কি তা-ও এমন করে কোনদিন বোঝেনি। সার্জির মনে হতে লাগল, এ বাড়িটা কেবল তার শত্রুতে ভরা, ওরা সব ওৎ পেতে বসে আঁধার জানলার ভিতর দিয়ে এই ছোট্ট দুর্বল ছেলেটির গতিবিধি সব লক্ষ্য করছে, বিদ্বেষের হাসি হাসছে, আর অপেক্ষা করছে বজ্রকণ্ঠে কেউ হুকুম দিলেই লাফিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ের উপর।

ছেলেটি নিদ্রার ঘোরে কথা বলবার মত করে নিজের মনেই বলে উঠল,—এ বাড়িতে নয়,—এ বাড়িতে থাকতে পারে না সে,—থাকলে সে চিৎকার করে আর সবাইকে উত্ত্যক্ত করে তুলত।

সার্জি বাড়িটার চারিদিকে একবার চক্কোর দিতে গিয়ে দেখলে পিছনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কতকগুলি ছোট ছোট ঘর আছে, এগুলি আসল বাড়িটার মত এত সুন্দর নয়, বোধহয় চাকরবাকরদের ঘর এগুলি। বড় বাড়িটার মতই এসব ঘরের জানলা দিয়ে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না, জানলার কাঁচের উপর শুধু জ্যোৎস্নার অসমান আলো পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে, দেখলে গা ছমছম করে। সার্জি দারুণ ভয় পেয়ে গেল ঃ এখান থেকে আর আমি বেরুতে পারব না, কখনই না। লোদিঝকিন, সেই পুরনো হার্ডিগার্ডি, কফিখানায় কাটানো রাত্রিগুলি, ঠাণ্ডা ফোয়ারার ধারে বসে সেই খাবার-খাওয়া—সব কিছুর কথা তখনই মনে পড়ে গেল তার। কাতর হয়ে নিজের মনেই সে বলতে লাগল,—এ সবকিছুই শেষ হয়ে গেল আমার জীবনে। ভাবতে ভাবতে ভয়ের জায়গায় এক নিদারুণ বিষাদময় নৈরাশ্যে ছেয়ে গেল তার মন।

হঠাৎ কাতরানির মত মৃদু কেঁউ কেঁউ শব্দ কানে এল তার। দেহের পেশীগুলি শক্ত করে শ্বাস রুদ্ধ করে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে সে। আবার সেই শব্দ এল কানে, শব্দটা যেন সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছেরই নিচু একটা পাথরের ঘর থেকে আসছে। একটা ফুলের কেয়ারি মাড়িয়ে সে ঘরটার দেয়ালের উপর উঠলে। দেয়ালটার উপরের দিকে কাঁচ না দেওয়া কয়েকটা লম্বা চারকোণা ছেঁদা আছে, তারই একটায় মুখ লাগিয়ে সে একটা শিস্‌ দিলে। নিচে কোথায় যেন একটু শব্দ হল, কিন্তু সে শব্দ তখনই মিলিয়ে গেল।

সার্জি মৃদুকম্পিত কণ্ঠে ডাকলে,—আর্তো, আর্তো।

সঙ্গে সঙ্গে সারা বাগানটা কুকুরের উন্মত্ত রবে মুখরিত হয়ে উঠল। সে রবের

মধ্যে ক্রোধ, অভিযোগ, শারীরিক কষ্টের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে প্রিয় সম্ভাষণের আনন্দ। সেই অন্ধকার পাষাণ কক্ষে কিসে যেন কুকুরটাকে আবদ্ধ করে রেখেছে, সে বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে—শব্দ শুনে তা-ও বুঝতে পারলে সার্জি।

সার্জি কাঁদো কাঁদো হয়ে ডাকলে, আর্তো, সোনা লক্ষ্মী কুকুর আমার।

নিচে থেকে কে অমনি রূঢ় গম্ভীর কণ্ঠে ধমকে উঠলে,—চুপ কর,—শেষ করব তোকে.—হতভাগা পাজি।

পাষাণ কক্ষে থপ করে কিসের যেন একটা শব্দ হল, কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে একটানা ডাকতে শুরু করল।

সার্জি রাগে নখ দিয়ে পাথরের দেয়াল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পাগলের মত চিৎকার করে উঠল,—খবরদার মারবে না ওকে, কুকুরের গায়ে হাত তুলবে না,—জানোয়ার কোথাকার!

এর পরে যা ঘটেছিল সে যেন অনেকটা রোগীর বিকারের ঘোরে দেখা স্বপ্নের মত, সার্জি পরে অনেক কষ্টে তার কিছু কিছু শুধু স্মরণে আনতে পেরেছিল। পাষাণ কক্ষের দরজা সশব্দে খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান ছুটে বেরুল সে ঘর থেকে। খালি পা, অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু পরনে নেই, দাড়ি-ভরা মুখ জ্যোৎস্না পড়ে দেখাচ্ছে নীললোহিত,—দারোয়ানের এ মূর্তি দেখে সার্জির মনে হল—ও যেন একটা দৈত্য, একটা রাক্ষস।

বাগানের মাঝে দাঁড়িয়ে দারোয়ান বজ্রনাদে বলে উঠল,—কে তুই, গুলি করব তোকে।...সবাই ওঠ ওঠ,—চোর!

আর্তো তখন ডাকতে ডাকতে ছিটকে যাওয়া সাদা বলের মত ছুটে বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে। গলায় দুলছে তার এক টুকরো ছেঁড়া দড়ি।

সার্জির আর কুকুরের ভাবনা ভাববার সময় নেই। দারোয়ানের ঐ ভীমদর্শন চেহারার কথা ভেবেই সে ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে, পা যেন তার মাটিতে আটকে গেছে, ছোট সরু দেহটা হয়ে গেছে অবশ। এই অবস্থা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না তার। ভয়ে পাগলের মত একটা তীক্ষ্ম চিৎকার করে উঠে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঐ পাষাণ কক্ষের কাছ থেকে সে ছুট দিলে।

খরগোশের মত ছুটলে সে, পা দুটো তার যেন হঠাৎ দুটো ইস্পাতের স্প্রীং হয়ে গেছে। আর্তোও আনন্দে চিৎকার করতে করতে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। দারোয়ানও রেগে গালাগালি দিতে দিতে তাদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

সার্জি ছুটতে ছুটতে প্রথমে গেটটার কাছে এল, কিন্তু তখনই বুঝলে—বেরুবার কোন পথ পাবে না সে এখানে। সাদা পাথরের পাঁচিল আর তার পাশের সাইপ্রেস গাছগুলির মাঝে সরু একফালি পথের মত আছে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে আর কোন কিছু না ভেবে চিন্তে সে আত্মগোপন করবার জন্য এখানটায় ঢুকে পড়ল, তারপর দেয়ালের পাশ দিয়ে ছুটতে লাগল। রজনের গন্ধে-ভরা

সাইপ্রেসের সূঁচল কাঁটায় তার মুখ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে কয়েকবার তার হাত থেঁতলে গেল, কিন্তু তখনই উঠে আবার ছুটতে শুরু করলে, ব্যথায় ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের কান্নায় ভ্রূক্ষেপ নেই, দ্বিগুণ বেগে ছুটতে শুরু করলে সে। আর্তোও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল।

এমনি করে ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে এক অন্তহীন পাশে আবদ্ধ জীবের মত সে উঁচু পাঁচিল আর শ্রেণীবদ্ধ সাইপ্রেসের মাঝখানটার সেই সরু পথটার মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে মুখ তার শুকিয়ে এল, প্রত্যেকবার শ্বাস নেবার সময় যেন হাজার সূঁচ বিঁধতে লাগল তার বুকে। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, দারোয়ানের পায়ের শব্দ শুনতে পেতে লাগল সে। ফলে বুদ্ধিসুদ্ধি তার একেবারে লোপ পেয়ে গেল,—এই সামনে ছোটে,—এই আবার পিছিয়ে আসে,—গেটের সামনে এমনি করে কয়েকবার ছোটাছুটি করলে সে, তারপর আবার ছুটলে সেই পাঁচিল আর সাইপ্রেস গাছের মধ্যের সরু আঁধার পথটায়।

এরপর আর একটুও শক্তি রইল না তার। নিদারুণ ভয় থাকা সত্ত্বেও এক মারাত্মক বেদনাকর অনাসক্তি, সর্ব বিপদে এক স্ফূর্তিহীন উপেক্ষার ভাব তার মন জুড়ে বসল। একটা গাছের নিচে বসে ক্লান্ত দেহটা ওর গুঁড়িতে এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বসলে সে। পাথরের নুড়ির উপর খচমচ শব্দ তুলে শত্রুর গুরু পদধ্বনি ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। সার্জির হাঁটুর উপর নাক রেখে আর্তো নাকি সুরে কাঁদতে লাগল।

সার্জির কাছ থেকে দু গজ দূরে গাছের ডাল সরানোর খসখস আওয়াজ শোনা গেল। হঠাৎ কিসের দিকে নজর পড়তে সে আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলে। এর আগে লক্ষ্য করেনি সে যে, যে-জায়গাটায় সে বসে ছিল তার সামনের পাঁচিলটা সাড়ে তিন ফুটের বেশি উঁচু নয়। ওর উপরটায় বোতল ভাঙা কাঁচের টুকরো আঁটা বটে, কিন্তু তা দেখে কিছুমাত্র পিছ-পা হল না সার্জি। এক নিমেষে সে আর্তোকে ধরে তার সামনের পা দুটো পাঁচিলের মাথার উপর তুলে দিলে, চালাক কুকুরটা তখনই বুঝে নিলে কি করতে হবে তার,—চার পায়ে আঁচড়ে তখনই সে পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বিজয় গর্বে লেজ নেড়ে ডাকতে লাগল।

ফাঁক করা সাইপ্রেস ডালের ভেতর থেকে কালো প্রকাণ্ড এক মনুষ্যমূর্তি বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার্জিও আর্তোর অনুবর্তী হল। কুকুর আর মানুষের দুটি নমনীয় দেহ পাঁচিলের উপর থেকে যেন স্প্রীং-এর মত লাফিয়ে পড়ল গিয়ে রাস্তায়। পিছন থেকে বর্বরোচিত নোংরা গালাগালি আর অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগল তাদের উপর।

দারোয়ান এদের দুটির চেয়ে মন্থরগতি বলেই হোক, কিংবা বাগানে ছুটাছুটি করে সে ক্লান্ত হয়েছিল বলেই হোক, অথবা পলাতকদের ধরবার আর কোন আশা নেই মনে করেই হোক—সে আর এদের পিছু পিছু ছুটলে না। তবুও ওরা দুটি না থেমে বহুক্ষণ ছুটে চলল। দুজনেই সবল এবং চটপটে, মুক্তির আনন্দে

ওদের যেন পাখা গজিয়েছে—তারই উপর ভর দিয়ে উড়ে চলেছে যেন তারা। কুকুরটা শীগগিরই তার মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তির ভাব ফিরে পেল, সার্জি মাঝে মাঝে ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে দেখতে লাগল। আর্তো আনন্দে কান আর গলায় ঝুলানো দড়ির টুকরো নাড়তে নাড়তে ছেলেটার গায়ের উপর লাফিয়ে উঠে তার মুখটা চেটে দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

যে ঝরণাটার ধারে বসে তারা আগের দিন খাবার খেয়েছে তার কাছে না আসা পর্যন্ত সার্জি কিন্তু তার মনের স্থৈর্য ফিরে পেল না। কুকুর আর ছেলেটি ঝরণায় মুখ লাগিয়ে বহুক্ষণ ধরে প্রাণভরে টাটকা সুস্বাদু জল পান করলে। জল খাবার সময় ওরা এ ওকে ঠেলে দিতে লাগল, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে যখন মাথা তুলতে লাগল তখন দুজনের ঠোঁট থেকেই ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, তারপর লোভ না সামলাতে পেরে নতুন তৃষ্ণা নিয়ে আবার ঝরণার উপর নুয়ে পড়তে লাগল। অনেক কষ্টে ঝরণা ছেড়ে যখন তারা পথে চলতে শুরু করল, তখন তাদের ভরা পেটের মাঝে জল নড়ে গড়গড় ছলছল শব্দ হতে লাগল।

তারা এখন বিপন্মুক্ত, রাত্রের আতঙ্কের ব্যাপার সব চুকে গেছে, জোৎস্নালোকিত সাদা পথটার দুধারের ঝোপগুলি এখন আসন্ন প্রভাতের শিশিরে সিক্ত হতে শুরু করেছে,—শিশির ধোয়া পাতাগুলি থেকে আসছে একটা মিষ্টি গন্ধ, এখন এ পথে চলতে কি আনন্দ!

কফিখানায় ঢুকতেই ইব্রাহিম ছেলেটিকে মৃদুস্বরে তিরস্কার করে উঠল,—আরে, এমন ঘুরে বেড়ানোর অথ্থো কি,—বাচ্চা,—কি মানে এর?...বড়ো খারাব, বড়ো খারাব।

সার্জি আর বুড়োকে জাগাতে চাইলে না,—কিন্তু আর্তোই তার হয়ে এ কাজটি করে দিলে। বহু লোক ঠাসাঠাসি করে শুয়ে আছে,—তার মধ্যে বুড়োকে দেখেই সে চিনলে,—এবং লোদিঝকিন ব্যাপারটা বুঝবার আগেই সে আনন্দে কেঁউ কেঁউ করতে করতে তার সারা মুখটা চেটে দিলে। বুড়ো তখনই জেগে উঠে দেখলে কুকুরের গলায় দড়ি আর তার পাশেই শুয়ে ধুলোকাদামাখা সার্জি। ব্যাপারটা বুঝে ফেললে সে। সে সার্জিকে জিজ্ঞাসা করলে, কি করে এসব সম্ভব হল, কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না, সার্জি এর মধ্যেই হাত দুটো মেলে হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

১৯০৪

আমি অভিনেতা ছিলাম

এই করুণ অথচ হাস্যোদ্দীপক কাহিনীটা আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শোনা। কাহিনীটা অবশ্য হাসির চেয়ে করুণার উদ্রেকই বেশি করে। বন্ধু বিচিত্র জীবন যাপন করেছেন, ঐ যে কথায় বলে,—একসঙ্গে ঘোড়া এবং তার সওয়ার,—তাই ছিলেন তিনি। ভাগ্যের কাছ থেকে অনেক নির্মম আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর হৃদয়টা ছিল শোভন এবং মনটা ছিল নির্মল। এই কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাগুলি শুধু তাঁর মনের উপর এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল, কারণ এসব ঘটবার পর হাজার পীড়াপীড়ি করলেও তিনি আর থিয়েটারমুখো হননি।

আমি তাঁর কাহিনীটা এখানে বর্ণনা করবার চেষ্টা করব বটে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে—আমি হয়ত তেমন সহজ করে বলতে পারব না তাঁর কথা, অন্তত তাঁর বর্ণনার মধ্যে যে একটা করুণ ব্যজস্তুতি ছিল তা আমি কিছুতেই ফোটাতে পারব না।

১

আচ্ছা, কল্পনা করে নাও—দক্ষিণ অঞ্চলের এক ছোট্ট পুরানো শহর, পার কল্পনা করতে? মাঝখানে এক ঘুমসি নিচু আঁধার জায়গা—গ্রাম থেকে খোখোলরা* কোমর অবধি কাদা মেখে গাড়িতে করে শসা আর আলু নিয়ে আসে এখানে বিক্রি করতে। জায়গাটা হচ্ছে এখানকার বাজার। একদিকে এর এক বড় গির্জে, আর ঐ গির্জেরই নামে রাস্তা, আর একদিকে জনসাধারণের জন্য একটি পার্ক, তৃতীয় দিকে একসারি ছোট দোকান, দোকানঘরগুলির বালির পলস্তরা সব খসে খসে পড়ছে,—ছাদে আর কার্ণিসে পায়রা বসে রয়েছে,—চতুর্থ দিকে পড়ে শহরের বড় রাস্তা, রাস্তাটা বাজারে এসেই শেষ হয়েছে। এই রাস্তার ধারেই রয়েছে একটা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিস, পোস্টাফিস, একজন নোটারির অফিস, আর মস্কোর নরসুন্দর থিওদোরের এক সেলুন। শহরের বাইরের দিকে

* উক্রেইন-বাসী।

জেসেল্যোস, জ্যামোস্টেস এবং জ্যারেছ্যেসে‡ আছে পদাতিক সৈন্যদল, আর শহরের মধ্যিখানে আছে এক অশ্বারোহী সৈন্যদল। পার্কটায় আছে এক থিয়েটার। বাস্,—হয়ে গেল।

বলে রাখা দরকার যে, এস্ নামে এই শহরটা,—এর দুমা*, এর স্কুল, পার্ক, থিয়েটার, আর নুড়িঢালা বড় রাস্তা এ সবকিছুই করে দিয়েছেন এখানকার বহুলক্ষপতি শর্করা-উৎপাদক খারিতোনেকো।

২

আমি কি করে এই শহরে এসে বসবাস শুরু করলাম তা পুরোপুরি বলতে অনেক সময় লাগবে, তাই সংক্ষেপেই বলি। এখানে আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম,—একেবারে সত্যিকার বন্ধু—শান্তিতে বিশ্রাম করুক তার আত্মা;—বিয়ে হয়েছিল তার, কিন্তু তার স্ত্রী আমাকে বরদাস্ত করতে পারতেন না ঃ এমনই হয়—আমাদের প্রকৃত বন্ধুদের স্ত্রীদের কেউই আমাদের দেখতে পারে না। এই বন্ধু আর আমি দুজনেই আমরা কঠিন পরিশ্রম করে কয়েকহাজার রুবল রোজগার করেছিলাম। বন্ধু বহু বৎসর ধরে শিক্ষকতা করেছিল,—তা ছাড়া ইনসিওরের কাজও সে করত,—আর আমি এক বৎসর ধরে তাসের জুয়ায় বহু টাকা জিতেছিলাম। দক্ষিণ অঞ্চলের একটা লাভজনক ব্যবসার ফন্দি মাথায় এসে গেল আমাদের, সঙ্গে সঙ্গে এর ঝুঁকি নেব আমরা তা-ও সাব্যস্ত হয়ে গেল। প্রথমে রওনা হলাম আমি, কথা হল ও দু তিন দিন পরে আসবে। আমার বড় ভুলো মন তাই আমার টাকা-পয়সা সব ওর কাছেই থাকত,—দুটো তোড়ায় রাখত ও আমাদের দুজনের টাকা—এ বিষয়ে ও একেবারে জার্মানদের মত ওস্তাদ।

এরপর পর পর অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটে গেল জীবনে। খারকোভ রেলওয়ে স্টেশনে বসে আমি সেখানকার চাটনী সহযোগে 'স্টার্জন' খাচ্ছি এমন সময় আমার টাকার থলি চুরি হয়ে গেল। যে এস্ শহরের কথা বলছি, সেখানে এসে হাজির হলাম যখন আমি তখন আমার মানিব্যাগে থাকছে শুধু সামান্য কিছু রেজগি, আর হাতে একটা লালচে হলুদ রঙের ইংলণ্ডে তৈরি সুটকেস, ভেতরে তার জিনিসপত্র অতি সামান্যই। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম আমি,

‡ এলাকার নামঃ গ্রাম ছাড়িয়ে, সেতু ছাড়িয়ে, নদী ছাড়িয়ে।

* টাউন-হল।

হোটেলটার নাম অবশ্য বেশ জমকালো ঃ সেন্তাপিতর্সবার্গ; সেখান থেকে তারের উপর তার করতে লাগলাম আমি। উত্তরে পেলাম শুধু মৃত্যুর নীরবতা, হাঁ, কথাটা এমনি করে বলাই ঠিক, কারণ রেলওয়ে স্টেশনে চোরে যখন আমার টাকার থলি চুরি করলে ঠিক সেই সময়—ভেবে দেখ একবার ভাগ্যের কারসাজি,—ঠিক সেই সময় আমার বন্ধু এবং ব্যবসায়ের অংশীদার একটা ঘোড়াগাড়িতে চড়ে আসতে আসতে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল। তার যত গাঁটরি, টাকা-পয়সা সব শীল করে দেওয়া হল এবং কি সব বাজে কারণে—বিচারের ছিঁচ্‌কেমি চলল ছ-হপ্তা ধরে, আটকা পড়ে রইল সবকিছু। বন্ধুর শোকসন্তপ্তা বিধবা স্ত্রী আমার টাকার কথা কিছু জানতেন কি না জানি না। তবে আমার প্রত্যেকটি তার তিনি পেয়েছেন, এবং এ কথা ঠিক, শুধু তাঁর নীচ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য, ইচ্ছা করেই তিনি তার একখানিরও উত্তর দেননি। আর একথাও ঠিক আমার পাঠানো তারবার্তাই শেষে আমার অনেক উপকার করেছে। যে ব্যারিস্টার বন্ধুর উত্তরাধিকার ঠিক করে দিচ্ছিলেন, শীলমোহর ভাঙবার সময় তারবার্তাগুলি তাঁর চোখে পড়ে যায়। তিনি বন্ধুর স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে নিজের দায়িত্বে থিয়েটারের ঠিকানায় পাঁচশ রুবল আমায় পাঠিয়ে দেন। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ ঐসব তারবার্তা ত তারবার্তা নয়, আমার হৃদয়ের ক্রন্দনবার্তা,—বিশ থেকে ত্রিশটি কথায় নিবদ্ধ আমার আত্মার করুণ বিলাপ।

৩

সেন্তাপিতার্সবার্গ হোটেলে থাকবার সেটা আমার দশম দিন। আত্মার করুণ বিলাপ পাঠাতে গিয়ে পকেট আমার এদিকে একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। হোটেলের মালিক খোখোলটার চোখ সব সময়ই যেন ঘুমে ঢুল-ঢুল,—বিকট কদাকার খুনীর মত তার মুখ। সে আমার একটা কথাও আর বিশ্বাস করতে চায় না। আমি তাকে কতকগুলি চিঠি, কাগজপত্র ইত্যাদি দেখিয়ে বললাম,—এই দেখেই ত বুঝতে পারবেন যে..., এই রকম অনেক কিছু বললাম তাকে, কিন্তু সে আমার সে-সব কথায় বিশ্বাস না করে ঘৃণার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। শেষে হোটেলের পরিচারক আমার খাবার এনে দিয়ে বললে, মালিক বললেন,—এই শেষ।

তারপর এমন দিন এল যখন এক ছাতাপড়া দশ কোপেক ছাড়া আমার পকেটে আর কিছু রইল না। সেদিন সকালে হোটেলের মালিক আমায় জানিয়ে দিলে

আর আমায় খাবার দেওয়া চলবে না, হোটেলে রাখাও চলবে না। এবার পুলিশে খবর দেবে সে। তার কথার সুরেই বুঝলাম, যা সে বললে তাই এবার সে করবে, এর আর নড়চড় নেই।

সারা দিনটা আমি শহরে ঘুরে ঘুরে কাটালাম। বেশ মনে আছে আমি একটা পরিবহন আফিসে গেলাম, এবং আরও কয়েকটা জায়গায় কাজের জন্য গেলাম, কিন্তু সব জায়গাতেই আমার মুখ খুলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান। মাঝে মাঝে বড় রাস্তার ধারে লম্বার্ডি পপলারের মধ্যে যেসব সবুজ বেঞ্চি পাতা আছে তাতে গিয়ে বসতে লাগলাম। খিদেয় নাড়ি জ্বলতে লাগল, মাথা ঘুরাতে লাগল, কিন্তু এক সেকেণ্ডের জন্যও আত্মহত্যা করার কথা মনে হয়নি আমার। নানা দুর্ভাগ্যে ভরা আমার জটিল জীবনে বহুবার এ ইচ্ছা জেগেছে আমার মনে, কিন্তু, বৎসর, মাস, এমন কি অনেক সময় দশমিনিট যেতে না যেতেই আবার সব ঠিক হয়ে গেছে ঃ সুখের মুখ দেখেছি আবার, মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। উত্তপ্ত নিরানন্দ শহরটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সেদিন আমি নিজের মনকে ডেকে বার বার বলেছি ঃ প্যাভেল এ্যাব্রিয়িভিচ্,—বড় প্যাঁচেই পড়লে তুমি এবার।

খিদে পেয়েছিল খুব,—কি ভেবে জানি না আমার শেষ সম্বল ঐ কুড়ি কোপেক আর আমি খরচ করলাম না। সন্ধ্যার কাছাকাছি দেখি, একটা বেড়ার গায়ে একটা পোস্টার আঁটা। কোনই কাজ ছিল না হাতে, সুতরাং যন্ত্রচালিতের মত সেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পড়লাম—তাতে লেখা আছে,—সেদিন সাধারণ পার্কে থিয়েটার হবে, বইটার নাম উরিয়েল এ্যাকোস্টা, গাট্‌জকোর লেখা বিয়োগান্ত নাটক এখানা, ভূমিকায় থাকবেন অমুকে,—অমুকে। দুজন অভি-নেতার নাম বেশ বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা হয়েছে, তার একজন হচ্ছেন পিতার্সবার্গ নাট্যমঞ্চের অভিনেত্রী ম্যাদমোয়াজেল এ্যান্দ্রোসোভা, আর একজন হচ্ছেন খারকোভের বিখ্যাত অভিনেতা মিঃ লারা-লারস্কী; এর পরের স্তরের তারকারা হচ্ছেন,—মেয়েদের মধ্যে ভোলোগদ্‌স্‌কায়া, মের্দাভদেভাতা স্ত্রনিনা-দলস্‌কায়া, আর পুরুষদের মধ্যে তিমোফিয়েভ-সুমোস্কই, আকিমেঙ্কা, স্যামুই-লেঙ্কো, নেল্যুবোভ-ওলগিন এবং দুখোভস্কোই। ছোট ছোট অক্ষরে যাদের নাম লেখা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন পেত্রোভ, সার্জিয়েভ, সিদোরোভ, গ্রিগর্যেভ, নিকোলায়েভ এবং আরও অনেকে। স্টেজ ডিরেক্টার হচ্ছেন মিঃ স্যামুইলেঙ্কো, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভ্যালেরিয়ানোভ।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার যথাকর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। তখনই রাস্তাটা পার হয়ে ছুটলাম আমি মস্কোর নরসুন্দর থিওদোরের সেলুনে, সেখানে গিয়ে আমার শেষ সম্বল বিশ কোপেক খরচ করে আমার গোঁফ এবং থুতনিতে যে সূঁচলো ছোট্ট দাড়ি ছিল তা কামিয়ে ফেললাম। কিন্তু হায় ভগবান! আয়নায় তাকিয়ে দেখি কি সে চেহারা হয়েছে আমার মুখের ঃ শমশ্রুগুম্ফ বর্জিত কি বদখত সে মুখ। নিজের চোখকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। তিরিশ

হোটেলটার নাম অবশ্য বেশ জমকালো ঃ সেন্তপিতর্সবার্গ; সেখান থেকে তারের উপর তার করতে লাগলাম আমি। উত্তরে পেলাম শুধু মৃত্যুর নীরবতা, হাঁ, কথাটা এমনি করে বলাই ঠিক, কারণ রেলওয়ে স্টেশনে চোরে যখন আমার টাকার থলি চুরি করলে ঠিক সেই সময়—ভেবে দেখ একবার ভাগ্যের কারসাজি,—ঠিক সেই সময় আমার বন্ধু এবং ব্যবসায়ের অংশীদার একটা ঘোড়াগাড়িতে চড়ে আসতে আসতে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল। তার যত গাঁটরি, টাকা-পয়সা সব শীল করে দেওয়া হল এবং কি সব বাজে কারণে—বিচারের ছিঁচ্‌কেমি চলল ছ-হপ্তা ধরে, আটকা পড়ে রইল সবকিছু। বন্ধুর শোকসন্তপ্তা বিধবা স্ত্রী আমার টাকার কথা কিছু জানতেন কি না জানি না। তবে আমার প্রত্যেকটি তার তিনি পেয়েছেন, এবং এ কথা ঠিক, শুধু তাঁর নীচ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য, ইচ্ছা করেই তিনি তার একখানিরও উত্তর দেননি। আর একথাও ঠিক আমার পাঠানো তারবার্তাই শেষে আমার অনেক উপকার করেছে। যে ব্যারিস্টার বন্ধুর উত্তরাধিকার ঠিক করে দিচ্ছিলেন, শীলমোহর ভাঙবার সময় তারবার্তাগুলি তাঁর চোখে পড়ে যায়। তিনি বন্ধুর স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে নিজের দায়িত্বে থিয়েটারের ঠিকানায় পাঁচশ রুবল আমায় পাঠিয়ে দেন। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ ঐসব তারবার্তা ত তারবার্তা নয়, আমার হৃদয়ের ক্রন্দনবার্তা,—বিশ থেকে ত্রিশটি কথায় নিবদ্ধ আমার আত্মার করুণ বিলাপ।

৩

সেন্তপিতার্সবার্গ হোটেলে থাকবার সেটা আমার দশম দিন। আত্মার করুণ বিলাপ পাঠাতে গিয়ে পকেট আমার এদিকে একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। হোটেলের মালিক খোখোলটার চোখ সব সময়ই যেন ঘুমে ঢুল-ঢুল,—বিকট কদাকার খুনীর মত তার মুখ। সে আমার একটা কথাও আর বিশ্বাস করতে চায় না। আমি তাকে কতকগুলি চিঠি, কাগজপত্র ইত্যাদি দেখিয়ে বললাম,—এই দেখেই ত বুঝতে পারবেন যে..., এই রকম অনেক কিছু বললাম তাকে, কিন্তু সে আমার সে-সব কথায় বিশ্বাস না করে ঘৃণার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। শেষে হোটেলের পরিচারক আমার খাবার এনে দিয়ে বললে, মালিক বললেন,—এই শেষ।

তারপর এমন দিন এল যখন এক ছাতাপড়া দশ কোপেক ছাড়া আমার পকেটে আর কিছু রইল না। সেদিন সকালে হোটেলের মালিক আমায় জানিয়ে দিলে

আর আমায় খাবার দেওয়া চলবে না, হোটেলে রাখাও চলবে না। এবার পুলিশে খবর দেবে সে। তার কথার সুরেই বুঝলাম, যা সে বললে তাই এবার সে করবে, এর আর নড়চড় নেই।

সারা দিনটা আমি শহরে ঘুরে ঘুরে কাটালাম। বেশ মনে আছে আমি একটা পরিবহন আফিসে গেলাম, এবং আরও কয়েকটা জায়গায় কাজের জন্য গেলাম, কিন্তু সব জায়গাতেই আমার মুখ খুলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান। মাঝে মাঝে বড় রাস্তার ধারে লম্বার্ডি পপলারের মধ্যে যেসব সবুজ বেঞ্চি পাতা আছে তাতে গিয়ে বসতে লাগলাম। খিদেয় নাড়ি জ্বলতে লাগল, মাথা ঘুরাতে লাগল, কিন্তু এক সেকেণ্ডের জন্যও আত্মহত্যা করার কথা মনে হয়নি আমার। নানা দুর্ভাগ্যে ভরা আমার জটিল জীবনে বহুবার এ ইচ্ছা জেগেছে আমার মনে, কিন্তু, বৎসর, মাস, এমন কি অনেক সময় দশমিনিট যেতে না যেতেই আবার সব ঠিক হয়ে গেছে ঃ সুখের মুখ দেখেছি আবার, মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। উত্তপ্ত নিরানন্দ শহরটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সেদিন আমি নিজের মনকে ডেকে বার বার বলেছি ঃ প্যাভেল এ্যান্ড্রিয়িভিচ্,—বড় প্যাঁচেই পড়লে তুমি এবার।

খিদে পেয়েছিল খুব,—কি ভেবে জানি না আমার শেষ সম্বল ঐ কুড়ি কোপেক আর আমি খরচ করলাম না। সন্ধ্যার কাছাকাছি দেখি, একটা বেড়ার গায়ে একটা পোস্টার আঁটা। কোনই কাজ ছিল না হাতে, সুতরাং যন্ত্রচালিতের মত সেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পড়লাম—তাতে লেখা আছে,—সেদিন সাধারণ পার্কে থিয়েটার হবে, বইটার নাম উরিয়েল এ্যাকোস্টা, গাট্জকোর লেখা বিয়োগান্ত নাটক এখানা, ভূমিকায় থাকবেন অমুকে,—অমুকে। দুজন অভি-নেতার নাম বেশ বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা হয়েছে, তার একজন হচ্ছেন পিতার্সবার্গ নাট্যমঞ্চের অভিনেত্রী ম্যাদমোয়াজেল এ্যান্দ্রোসোভা, আর একজন হচ্ছেন খারকোভের বিখ্যাত অভিনেতা মিঃ লারা-লারস্কী; এর পরের স্তরের তারকারা হচ্ছেন,—মেয়েদের মধ্যে ভোলোগদ্স্কায়া, মেদভিদেভাতা স্ত্রানিনা-দলস্কায়া, আর পুরুষদের মধ্যে তিমোফিয়েভ-সুমোস্কই, আকিমেঙ্কা, স্যামুই-লেঙ্কো, নেল্যুবোভ-ওলগিন এবং দুখোভস্কোই। ছোট ছোট অক্ষরে যাদের নাম লেখা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন পেত্রোভ, সার্জিয়েভ, সিদোরোভ, গ্রিগরোভ, নিকোলায়েভ এবং আরও অনেকে। স্টেজ ডিরেক্টার হচ্ছেন মিঃ স্যামুইলেঙ্কো, ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভ্যালেরিয়ানোভ।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার যথাকর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। তখনই রাস্তাটা পার হয়ে ছুটলাম আমি মস্কোর নরসুন্দর থিওদোরের সেলুনে, সেখানে গিয়ে আমার শেষ সম্বল বিশ কোপেক খরচ করে আমার গোঁফ এবং থুতনিতে যে সূঁচলো ছোট্ট দাড়ি ছিল তা কামিয়ে ফেললাম। কিন্তু হায় ভগবান! আয়নায় তাকিয়ে দেখি কি সে চেহারা হয়েছে আমার মুখের ঃ শ্মশ্রুগুম্ফ বর্জিত কি বদখত সে মুখ। নিজের চোখকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারি না। তিরিশ

বৎসরের যুবক আমি, সুদর্শন না হলেও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলের মত চেহারা আমার, কিন্তু আয়নার মধ্যে দেখলাম বসে রয়েছে গলা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা এক অসভ্য বৃদ্ধ মিলনান্ত নাটকের অভিনেতা, মুখে যেন তার—রাজ্যে যত পাপ আছে তার ছোপ, বিশেষ করে মাতলামির।

নরসুন্দরের সহকারী গা-ঢাকা কাপড়টা ঝাড়তে ঝাড়তে আমায় জিজ্ঞাসা করলে,—থিয়েটারে অভিনয় করতে যাচ্ছেন বুঝি?

আমি সগর্বে উত্তর দিলাম,—হাঁ, এই নাও তোমার পয়সা!

৪

পার্কে যেতে যেতে আমি ভাবতে লাগলাম ঃ বরাত মন্দ থাকলে ভাল কিছু হতে চায় না। আমায় দেখেই ওরা বুঝে ফেলবে কেমন পাকা দুঁদে লোক আমি। এই গ্রীষ্মের ছোট থিয়েটারগুলির কিন্তু অদ্ভুত লোকেরই দরকার হয় বেশি। বেশি চাইব না আমি প্রথমে। ধরো—পঞ্চাশ রুবল?—না—মাসে চল্লিশ রুবলই চাইব আমি। পরে দেখা যাবে। প্রথমে বিশ রুবলের মত আগাম চাইব আমি—না,—সে বড় বেশি হয়ে যায়—দশ রুবল বা ঐ রকম কিছু চাইব আমি। প্রথমে আমি কড়া একটা টেলিগ্রাম পাঠাব; পাঁচ পাঁচে হল পঁচিশ, তাতে শূন্য হল দুশো পঞ্চাশ আর ওটা ডেলিভারির জন্য ধরো পনের,—হল দুশো পঁয়ষট্টি,—বাকি যা রইল, তাই দিয়ে লিয়ার আসা পর্যন্ত কোন রকমে চালিয়ে নেব আমি। যদি ওরা আমায় পরীক্ষা করে নিতে চায় ত—পিমেনের স্বগতোক্তিটা* না হয় আবৃত্তি করেই শুনিয়ে দেব।

তখনই রুদ্ধশ্বাসে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আমি শুরু করলাম—

অন্য গাথার হব আমি লিপিকার—

পাশ দিয়ে কেউ যেন একজন যাচ্ছিল, আমার আবৃত্তি শুনে ভয় পেয়ে সে ছুটে পালিয়ে গেল। কি করব বুঝতে না পেরে আমি একটু কেশে নিলাম। আমি তখন প্রায় পার্কটার কাছে এসে গেছি। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজছে সেখানে, স্থানীয় তন্বঙ্গী কুমারী মেয়েরা গোলাপী কিংবা নীল রঙের জামা-পরে খালি মাথায় পার্কের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্থানীয় কেরানী ছোকরারা আর টেলিগ্রাম, আবগারি বিভাগের তরুণের দল, জামার বুকের খাঁজে এক হাত রেখে সাদা সার্ভিস ক্যাপ খাড়া করে পরে ওদের অশেপাশে ঘুরছে আর কোনরকম সঙ্কোচের বালাই না রেখে হাসছে।

*পুশকিনে রচিত বোরিস্ গদুনভ থেকে।—অনুবাদক

গেটটা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকলাম আমি। টিকেট কিনবার জায়গা দিয়ে যাবার সময় একজন আমায় টিকেট কিনতে বললেন, আমি তার সে কথায় কান না দিয়ে বললাম, ম্যানেজার ,মিঃ ভ্যালেরিয়ানোভের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি, তাঁকে কোথায় পাব? প্রবেশ দ্বারের কাছেই একখানা বেঞ্চে দাড়িগোঁফ-কামানো দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁদের দেখিয়ে দিলেন তিনি। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের কয়েক পা সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নিজেদের ভিতরে কি সব কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা,—আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। ফলে আমি তাঁদের বেশ ভাল করে দেখে নেবার সুযোগ পেলাম। তাঁদের একজনের গায়ে নীল ডোরাকাটা ফ্লানেলের জামা, মাথায় হালকা পানামা হ্যাট, মুখে সম্ভ্রান্ত ঘরের ঠাট, পাশ থেকে মুখ দেখলে মনে হবে তরুণ বয়সেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ইনি, এমনি গর্বিত তাঁর দৃষ্টি, হেলাফেলা করে একটা সরু বেতের লাঠি নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি। আর একজন পরেছেন ধূসর জামাকাপড়, হাত পা তাঁর অসম্ভব লম্বা। দেখলে মনে হবে পা দুটো যেন তাঁর বুক থেকেই বেরিয়ে এসেছে, আর হাত দুটো ঝুলে পড়েছে হাঁটুর নিচে। সবদিক মিলিয়ে দেখলে মনে হবে উনি যেন অদ্ভুত অপরূপ একটি অষ্টাবক্র, যেন কব্জা আঁটা গজকাঠি দিয়েই ওঁর একটা জুড়ি তৈরি করতে পারা যায়। মাথাটা তাঁর অতি ছোট, মুখে ছুলির দাগ, চোখ দুটি যেমনি কালো তেমনি চঞ্চল।

কোন কিছু কথা না বলে আমি একটু গলায় খাঁকর দিতেই ওঁরা দুজনেই আমার দিকে তাকালেন।

কণ্ঠ যথাসাধ্য মোলায়েম করে আমি বললাম, মিঃ ভ্যালেরিয়ানোভের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।

ছুলির দাগওয়ালা লোকটা বললেন, আমিই ভ্যালেরিয়ানোভ, বলুন, কি দরকার।

দেখুন,—আমি,—আ—, গলাটা ধরে এল আমার, আমি মানে—আপনার এখানে কিছু কাজ চাই আমি,—কোন মিলনান্ত নাটকের অভিনেতা, বা কোন আহাম্মকের পার্ট অভিনয় করতে চাই আমি। নাটকের চরিত্রাংশেও অভিনয় করতে পারি আমি।

তরুণ প্রধানমন্ত্রী উঠে পড়লেন ওখান থেকে,—শিস দিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি কোথায় চলে গেলেন।

ভ্যালেরিয়ানোভ জিজ্ঞাসা করলেন, এর আগে কোথায় কাজ করেছেন আপনি?

অবশ্য জীবনে আমি একবার মাত্র অভিনয় করেছি, সে-ও এক শখের থিয়েটারে এক কমিক পার্ট। তাই বেশ খানিকটা মাথা খাটিয়ে আমি উত্তর দিলামঃ

সত্যি বলতে কি, আপনার এর মত কোন নাম করা প্রতিষ্ঠানে কাজ করিনি আমি,—দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটা ছোট ছোট দলে অভিনয় করেছি আমি। দলগুলি অবশ্য গড়ে উঠতে উঠতেই আবার ভেঙে গিয়েছে—যেমন ধরুন ম্যারিঙ্কের দল, সোকোলোভস্কীর দল,—এই সব আর কি!

হঠাৎ ভ্যালেরিয়ানোভ জিজ্ঞাসা করে বসলেন,—আচ্ছা, মদটদ খাওয়া অভ্যাস আছে আপনার?

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম আমি,—না, তবে ডিনারের আগে, কিংবা পার্টি-টার্টি হলে,—একটু আধটু, সে-ও দুই এক ফোঁটার বেশি নয়।

ভ্যালেরিয়ানোভ তার কালো চোখ দুটি কুঁচকে কিছুক্ষণ নিচের বালির দিকে চেয়ে রইলেন। কি যেন একটু ভেবে নিলেন তিনি, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন,—বেশ, আপনাকে নিয়ে নিচ্ছি আমি,—মাসে প্রথম প্রথম পঁচিশ রুবল করে পাবেন আপনি. তারপরে দেখা যাবে। আজ রাত্রেই হয়ত আপনার পার্ট করবার দরকার হতে পারে। স্টেজে গিয়ে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেজ-ডিরেক্টার দুখো-ভস্কোইর কাছে বলুন গিয়ে সব, তিনিই আপনাকে ডিরেক্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

তখনই স্টেজে চললাম আমি। যাবার সময় ভাবতে ভাবতে গেলাম ঃ উনি আমার মঞ্চ-নাম জিজ্ঞাসা করলেন না ত? ভুলে গেছেন নিশ্চয়। কিন্তু মঞ্চ-নাম ত আমার সত্যিই নেই! না থাক, যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম আমি,—না থাক, জিজ্ঞাসা করলে একটা নাম বলে দিলেই হবে। ওসেনিন—এ নামটা মন্দ হয় না. খুব জাঁকালোও নয়. সহজ অথচ বেশ শুনতে ভাল।

৫

দুখোভস্কোইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম. দেখলাম ও একটি অল্পবয়সী ছটফটে ছোকরা, মুখখানা ফ্যাকাশে, চোরের মত. সিনের পিছনে কাজ করছিল ও। ডিরেক্টার স্যামুইলেঙ্কোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে সে। স্যামুইলেঙ্কো সে রাত্রে একটা বীরের ভূমিকায় নামতে যাচ্ছেন, তাই সোনালি বর্ম তিনি গায়ে এঁটেছেন, হাঁটু অবধি ঢাকা জুতো পরেছেন, রূপসজ্জা তরুণের। বাইরে তরুণের মত সাজলেও বুঝতে অসুবিধা হল না লোকটা মোটা, মুখের আকৃতি তার গোল, চোখের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, তা ছাড়া মুখে সব সময়ই এক বোকা হাসি লেগে আছে। আমাকে যে সম্ভাষণ করলেন তিনি তাকে বলা যেতে পারে উদ্ধত সম্ভাষণ, আমার সঙ্গে করমর্দন করতে তাঁর সম্মানে বাধল। আমি তাঁর সামনে থেকে চলে যাব এমন সময় তিনি বলে উঠলেন, দাঁড়ান। কি নাম বললেন যেন আপনার? নামটা ঠিক ধরতে পারিনি আমি।

দুখোভস্কোই অমনি দাসোচিত তৎপরতার সঙ্গে বলে উঠল, ভাসিল্যোভ!

শুনে আমি ত অবাক, ভুলটা সংশোধন করে দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তখন আর সময় নেই।

হাঁ, দেখুন ভাসিল্যোভ আপনি থেকে যান এখানে। দুখোভস্কোই, তুমি দর্জিকে ভাসিল্যোভের একটা কোট দিতে বল।

এমনি করে ওসিনিন হতে গিয়ে আমি ভাসিল্যোভ হয়ে গেলাম, এবং আমার মঞ্চজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই নামই আমার রয়ে গেল, তখনকার অন্যান্যের মঞ্চ-নাম হচ্ছে পেত্রোভ, আইভ্যানোভ, নিকোলায়েভ, গ্রিগোরোভ, সিদোরোভ— এই রকম সব। দিন সাতেক যাবার পর মঞ্চজীবনের কিছুটা অভিজ্ঞতা যখন আমি লাভ করলাম তখন বুঝলাম প্রাচীরপত্রে আর যেসব নাম বেরুচ্ছে তার মধ্যে আমার নামটাই তবুও যা হোক---একটা সত্যিকার নামের মত নাম। নামটার ভেতরকার ধ্বনিসাম্যই এর কারণ।

এর পর দর্জি এল,—একে রোগা লিক্‌লিকে তাতে আবার খোঁড়া সে,—সে এসে আস্তিনওয়ালা কালো লম্বা এক ক্যালিকোর শবাচ্ছাদন বস্ত্র দিয়ে আমাকে ঢেকে আগাগোড়া লম্বা লম্বা ফোঁড় দিয়ে সেলাই করে দিলে। এরপর এল নরসুন্দর, দেখেই চিনলামঃ একটু আগে থিয়োদোরের যে সহকারী আমার দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে—এ সে। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলাম। কান অবধি থোপা থোপা ঝুলে পড়া কালো পরচুলো পরিয়ে দিল সে আমার মাথায়। দুখোভস্কোই এই সময় হঠাৎ ড্রেসিং রুমে ছুটে এসে বললে, ভাসিল্যোভ তোমার মেক-আপটা সেরে ফেল এবার। আমি একটা রঙের মধ্যে আঙুল ডোবাতেই আমার বাঁ পাশে যে গম্ভীর-ললাট উগ্রমূর্তি লোকটা দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অমনি ধমকে উঠলেন,—অপরের বাক্সে হাত ডোবাবেন না। এই ত সাধারণ রঙের বাক্স রয়েছে এখানে।

তাকিয়ে দেখি একটা বড় বাক্সের খোপে খোপে মেশানো সব রঙ,—সব নোংরা। দেখে মাথা আমার ঝিমঝিম করতে লাগল। দুখোভস্কোই ত দিব্যি তাড়া দিয়ে গেল ঃ মেক্‌-আপটা সেরে ফেল; কিন্তু কি করে কি করি! যাই হোক, যা থাকে কপালে বলে তখনই নাকের নিচে একটা সাদা লাইন টেনে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের চেহারা একেবারে পালটে গেল, মুখখানা হল যেন একটা ভাঁড়ের মুখ। এর পর বেশ কড়া করে দুটো ভ্রূ আঁকলাম আমি,—চোখের নিচে ছায়ার মত দুটি হালকা নীল পোঁচ টেনে দিলাম; তারপর ভাবতে লাগলাম, আর কি করা যায়? ভ্রূ কুঁচকে, দুই ভ্রূর মধ্যে দুটো খাড়া বলি রেখা টেনে দিয়ে আমার মেক্‌-আপ শেষ করলাম। এবার দেখাতে লাগল আমায় ঠিক এক কোমাণ্ড সর্দারের মত।

এদিকে উপর থেকে কে তাড়া দিচ্ছে,—ভাসিল্যোভ, প্রস্তুত হও।

সাজঘর থেকে বেরিয়ে কালো দেওয়ালের মধ্যে কাপড়ের যে পর্দাটা আছে

তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম আমি। দুখোভস্কোই সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই সে বললে,—

এবার তোমার পালা। বাপরে বাপ,—কি মুখ হয়েছে তোমার! যাক, যেই শুনবে তুমি, 'হাঁ তিনি ফিরে আসবেন,'—অমনি ঢুকে পড়বে তুমি, ঢুকে—, এইখানে দুখোভস্কোই একটা লোকের নাম উল্লেখ করে বললে,—ঢুকে বলবে অমুকে দেখা করতে এসেছেন।...বুঝলে ত কি বললাম?

হাঁ।

তখনই শুনতে পেলাম স্টেজের উপর কে যেন বলছেন,—হাঁ, তিনি ফিরে আসবেন। দুখোভস্কোই আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, তাকে ঠেলে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি স্টেজে। কিন্তু এই যা! সে লোকটার নাম ত আমি ভুলে গেছি! দু এক সেকেণ্ড কথা বেরুল না আমার মুখ দিয়ে। দর্শকদের দিকে নজর পড়তে মনে হল যেন উদ্বেলিত কৃষ্ণসমুদ্র। প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে চোখে পড়ল ঠিক সামনেই আমার বর্বরের মত রঙমাখা কয়েকটা অপরিচিত মুখ। সবাই আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দুখোভস্কোই পিছন থেকে চুপি চুপি কি যেন বলে দিল আমায়,—কিন্তু তার একবর্ণও আমি বুঝলাম না। কি করব বুঝতে না পেরে না ভেবে চিন্তে—শেষে আমি গম্ভীর তিরস্কারের কণ্ঠে ফট করে বলে বসলাম,—হাঁ,—তিনি ফিরে এসেছেন।

সোনালি বর্ম পরা স্যামোইলেঙ্কো—ঝড়ের মত আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি সিনের পিছনে সরে পড়তে পেরেছিলাম।

এই বইখানায় আরও দুটো জায়গায় আমাকে কিছু কিছু কাজে লাগান হয়েছিল। যে সিনটায় এ্যাকোস্টা ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন সেখানে তাকে কোলে তুলে বাইরে নিয়ে আসতে হয়েছিল আমায়। আমারই মত কালো শবাচ্ছাদনবস্ত্র পরা 'ফায়ারম্যান' অবশ্য আমায় এ কাজে সাহায্য করেছিল। (দর্শকদের কাছে তিনি বোধহয় 'সিদোরোভ' নামে পরিচিত ছিলেন।) উরিয়েল এ্যাকোস্টার পার্ট যিনি করলেন, পরে দেখলাম, ভ্যালেরিয়ানোভের সঙ্গে এক বেঞ্চে যিনি বসেছিলেন, ইনি তিনিই, ইনিই খারকোভের বিখ্যাত অভিনেতা লারা-লারস্কী। ভারী পেশল দেহটা তাঁর আমরা কোন রকমে টেনে বাইরে এনেছিলাম, যাই হোক ফেলে দিইনি মাটিতে। তিনি চাপা কণ্ঠে শুধু আমাদের গালাগালি দিতে লাগলেন,—মর তোমরা দুজনেই,—মূর্খ কোথাকার! সংকীর্ণ দরজার মধ্যে দিয়ে কোন রকমে আমরা তাঁকে টেনে বার করলাম,—ফলে পুরনো দেবালয়ের দেয়ালগুলি নড়ে উঠল, এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কাঁপন থামেনি।

তৃতীয়বার যখন মঞ্চে আসতে হয়েছিল আমার তখন কোন কথা বলতে হয়নি আমায় ঃ এ্যাকোস্টার বিচারের আমি নীরব দর্শক মাত্র। কিন্তু তার মাঝেও একটু ছোট্ট ব্যাপার ঘটে গেল ঃ যখন বেন আকিবা মঞ্চে আবির্ভূত হলেন, তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য সবাই তখন উঠে দাঁড়াল, কেবল আমি ছাড়া,—আমি অন্য-

মনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কে একজন আমার কনুইয়ের উপর জোর চিমটি কেটে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে,—আরে করছ কি,—পাগল না কি তুমি,—বেন্‌ আকিবা এসেছেন যে, উঠে দাঁড়াও।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম।কিন্তু সত্যি বলছি আমি বুঝতেই পারিনি যে, ইনি বেন আকিবা,—আমার মনে হয়েছিল ইনি সাধারণ একজন বৃদ্ধ লোক।

অভিনয় শেষ হয়ে গেলে স্যামুইলেঙ্কো আমাকে ডেকে বললেন, ভাসিল্যেভ্‌, কাল এগারটায় রিহার্সেলে হাজির থেক তুমি।

এর পর আমি হোটেলে ফিরে এলাম, কিন্তু হোটেলের মালিক আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই দরজা বন্ধ করে দিলে। পপলার গাছের মধ্যে যে সব সবুজ বেঞ্চ পাতা আছে তারই একটায় রাত কাটালাম আমি। বেশ গরম পড়েছিল সেদিন,—শুয়ে শুয়ে আমি আমার ভবিষ্যৎ খ্যাতির স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া এবং ক্ষুধার জ্বালায় আমার একটু সকাল সকালই ঘুম ভেঙে গেল।

৬

বেলা ঠিক এগারটার সময় আমি থিয়েটারে গিয়ে হাজির হলাম। তখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। নিদাঘ-ভোজনাগারের পরিচারকেরা শ্বেত বহির্বাসে গা ঢেকে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা সবুজ জাফরিতে ঢাকা একটা কুঞ্জে বুনো আঙুরগাছ জড়িয়ে উঠেছে,—তার মধ্যে কাকে যেন প্রাতরাশ বা কফি পরিবেষণ করা হচ্ছে।

পরে জানলাম থিয়েটারের ম্যানেজার ভ্যালেরিয়ানোভ এবং বুলাতোভ চার্নোগোর্স্কায়া রোজ সকালে এই খোলা জায়গায় বসে তাঁদের প্রাতরাশ খান। বুলাতোভা চার্নোগোর্স্কায়া আগে অভিনয় করতেন,—এখন বয়স হয়েছে তাঁর পঁয়ষট্টি,—ম্যানেজারের মাইনে সমেত থিয়েটারের যাবতীয় ব্যয় তিনিই বহন করেন।

টেবিলের উপর সাদা ধবধবে একখানা কাপড় পাতা হয়েছে,—তার উপর দুটো ঢাকনী, আর একটা প্লেটের উপর দুই থাকে বেশ উঁচু করে সাজানো পাতলা ফালি করে কাটা রুটি।

এর পরে যা ঘটল তা বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার ঃ চুরি করলাম আমি,—জীবনে এই প্রথম এবং এই শেষ। তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে অতি দ্রুত কুঞ্জটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম আমি, তারপর ঝট করে

কয়েক চাকলা রুটি উঠিয়ে নিলাম। আঃ কি সুন্দর নরম সে রুটি! কিন্তু ওখান থেকে পালিয়ে আসতে গিয়েই একজন পরিচারকের সামনে পড়ে গেলাম। ও একটা চাটনির পাত্রে রাই, মরিচ আর ভিনিগার আনছিল। ও আমার হাতের রুটি এবং মুখের দিকে চেয়ে বেশ নরম গলায়ই বললে,—এর মানে কি?

অন্তর্দাহী আত্মাভিমানে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সোজা ওর চোখের দিকে চেয়ে আমিও ঠিক ওর মত নরম গলায় উত্তর দিলাম,—এর মানে হচ্ছে, পরশু চারটে থেকে এ পর্যন্ত আমার পেটে কিছু পড়েনি।

কোন কথা না বলে একটা ঘুরপাক দিয়ে সে সেখান থেকে দ্রুত চলে গেল। রুটির ফালি পকেটে পুরে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভয় পেয়ে গেলাম খুব, সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার চাঙাও হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল, চমৎকার! এখনই মালিক ছুটে আসবে, চাকরবাকরগুলি এসে সব হাজির হবে, ওরা সব শিটি দিয়ে পুলিশ ডাকবে, তারপর হৈ-চৈ, গালাগালি, মারামারি। আমি ঐ প্লেটগুলি আর চাটনির পাত্রটা ছুঁড়ে মারব ওদের মাথায়,—কামড়ে ওদের রক্ত বের করে দেব।

কিন্তু এ সব কিছুই ঘটল না,—পরিচারকটা একাই ফিরে এল। ছুটে এসেছে সে, একটু হাঁপাচ্ছে। আমার মুখের দিকে না চেয়ে আড় হয়ে দাঁড়াল সে আমার পাশে, আমিও অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। হঠাৎ তার বহির্বাসের ভিতর থেকে বেশ করে নুন-লাগানো গত রাত্রের বাসি মস্ত বড় চাক্‌লা বীফ্ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে মিনতির সুরে চুপি চুপি বললে, এটা খেয়ে নিন!

বীফ্‌টা হাতে নিয়ে আমি সিনের পিছনে একটা নিরালা জায়গায় চলে গেলাম, জায়গাটা বেশ, খানিকটা আঁধারও বটে। চারিদিকে সব জবড়ঝং পুরনো ঠেকনা,—তার মধ্যে বসে আমি লোভাতুরের মত মাংসে কামড় দিতে লাগলাম, তৃপ্তির আনন্দে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল আমার।

এর পর প্রায় প্রতিদিনই লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হত। লোকটার নাম সার্জি। রেস্তরাঁয় যখন লোকজন থাকত না, তখন দূর থেকে সে পরম বন্ধুর মত মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে আমায় আমন্ত্রণ জানাত, কিন্তু আমার উপর তার পূর্বের ভাল ধারণাটা পাছে নষ্ট হয়,—এই ভয়ে,—অনেক সময় শীতের নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও আমি এতে রাজি হতাম না,—এতে একদিক দিয়ে তার ও আমার—দুজনেরই লাভ।

বেঁটে মোটাসোটা চেহারা সার্জির, মাথায় টাক, আরসোলার শুঁড়ের মত দুটো কালো গোঁফ, অর্ধবৃত্তাকার ছোট ছোট দুটি উজ্জ্বল চোখ দিয়ে যেন দয়া ঝরে পড়ত। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সব সময় ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলাফেরা করত সে। শেষে একদিন যখন আমি আমার টাকা ফিরে পেলাম, দুঃস্বপ্নের মত আমার মঞ্চের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করলাম, হীনচেতা নীচাশয় লোকেরা যখন

আমার শ্যাম্পেনের বোতল লেহন করে আমার স্তুতি গান রচনা করতে লাগল, তখন মনটা আমার অসময়ের বন্ধু দরদী সার্জির জন্য বড়ই কেমন করত। অবশ্য টাকা দিয়ে আমি তার প্রতিদান দিতে কোন দিনই চাইতাম না; কারণ দরদ আর ভালবাসার প্রতিদান টাকা দিয়ে হয় না। হয়ত স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সামান্য একটা অলঙ্কার দিতাম তাকে অথবা তার স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু উপহার। অনেকগুলি ছেলেপেলে ছিল তার, মধ্যে মধ্যে সকালে এক ঝাঁক চড়ুই পাখির মত কিচির মিচির করে ছুটে আসত তারা তাদের বাপের কাছে।

আমার অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তির এক হপ্তা আগে তার চাকরি যায়,—কেন যায়, তা-ও জানি। ক্যাপ্টেন ভন ব্রাডকে-কে রেস্তরাঁয় যে মাংস পরিবেষণ করা হয় তা তাঁর পছন্দ হয়নি।

তিনি গর্জে উঠে বলেছিলেন,—তবে রে পাজি, এই তোমার মাংস? জানো না, আমি একটু কম সিদ্ধ খাই?

সার্জি সাহস করে বলেছিল, দোষ তার নয়, দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে ত পাচকের, তারপর অতি নিরীহের মত সে বলেছিল—আমায় ক্ষমা করুন, স্যার।

এমনি করে ক্ষমা চাওয়াতে অফিসারটি আরও ক্ষেপে গিয়েছিলেন। গরম মাংসখণ্ড দিয়ে সার্জির গালে আচ্ছা এক ঘা লাগিয়ে রাগে চোখমুখ লাল করে তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন ঃ

কি? আমাকে সার বলতে এসেছে,—এ্যাঁ? আমাকে—সার বলা? রাজ-কর্মচারী অশ্বারোহী সৈন্য দলের অধ্যক্ষকে কেউ সার বলতে পারে না।—মালিক! বলতে হবে তাঁকে মালিক!...আইভান লুকিয়ানিচ্, এই মূর্খটাকে আজই এখান থেকে ছাড়িয়ে দাও তুমি। ওকে আর এখানে রাখতে দেব না আমি। ওকে ঘাড় ধরে বের করে দাও এখান থেকে,—নইলে আমি আর তোমার রেস্তরাঁয় আসব না কোন দিন।

ক্যাপ্টেন ভন ব্রাডকে অনেক টাকা খরচ করে ফুর্তি করতেন এই রেস্তরাঁয়, সুতরাং তাঁর কথা মত সার্জিকে তখনই তাড়িয়ে দেওয়া হল। রেস্তরাঁর মালিককে সেদিন সারা সন্ধ্যায়ই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল ক্যাপ্টেনের রাগ কমাবার জন্যে। ইণ্টারভ্যালে যখনই আমি একটু হাওয়া খেতে বাগানে বেরিয়েছি, তখনই কুঞ্জের ভিতরকার ঐ রেস্তরাঁ থেকে ক্যাপ্টেনের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কানে এসেছে আমার ঃ বেজন্মাটার কথা শোন একবার, আমাকে বলে 'সার'। মেয়েরা পাশে না থাকলে ওর 'সার' বলা ঘুচিয়ে দিতাম আমি।

এর পর অভিনেতারা একে একে আসতে শুরু করলেন, রিহার্সেল শুরু হল সেই সাড়ে বারোটায়। যে বইখানার মহড়া হচ্ছে, নাম তার 'নতুন জগৎ,' সীয়েনকিউইয়িজের বিখ্যাত উপন্যাস 'কো ভ্যাদিসে'র অংশ বিশেষের নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এতে, কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হয়নি। দুখোভস্কোই আমার পার্ট লিখো করা একটা কাগজ দিল আমার হাতে। দেখলাম, মহাবীর মার্কাসের শত সেনানায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে আমায়। পার্টটায় অনেক গুরুগম্ভীর ভাল ভাল সব কথা আছে,—যেমন, বলতে হবে, হে মহানুভব মার্কাস, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে, অথবা, হে মহানুভব মার্কাস, সেই মহিলা পম্পের মূর্তির পাদদেশে আপনার প্রতীক্ষায় থাকবেন।

পার্টটা বড় ভাল লেগে গেল আমার, এবং আমি তখনই নিজেকে এক দীর্ঘকায় নিপুণ কঠোর বিশ্বস্ত যোদ্ধারূপে কল্পনা করে নিয়ে বীরোচিত কণ্ঠে পার্টটা মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম।

কিন্তু মহড়া এগুবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার ভাগ্যে সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে লাগল ঃ যত সব ছোট ছোট পার্ট করবার ভার পড়তে লাগল আমার উপর। যেমন—স্যামুইলেঙ্কো বইখানা খুলে বসে ছিলেন,—মেট্রন ভেরোনিকার বলা শেষ হলেই তিনি করতালি দিয়ে বলে উঠলেন, এইবার গোলামের প্রবেশ।

কেউ এগিয়ে এল না।

গোলামের পার্ট কে করছে এখানে?...দুখোভস্কোই, দেখ ত, গোলামের পার্ট কার আছে?

দুখোভস্কোই ব্যস্তসমস্ত হয়ে কতকগুলি কাগজপত্র নাড়াচাড়া করলে, কিন্তু গোলাম খুঁজে পেলে না।

বোয়েভ অলস কণ্ঠে বলে উঠলেন,—আরে,—কেটে দাও এ পার্ট,—বাদ দাও, শুধু শুধু সময় নষ্ট করা কেন? এ'রই রঙের বাক্সে প্রথম দিন আমি আঙুল ডুবিয়ে ফেলেছিলাম।

কিন্তু মারকাস (লারা-লারস্কী) ওঁর কথায় হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, না, না, তা হতে পারে না, এ দৃশ্যে দেখাবার মত অনেক জিনিস আছে আমার, গোলাম ছাড়া প্লে করা চলবে না আমার এখানে।

স্যামুইলেঙ্কো শ্যেন দৃষ্টিতে স্টেজের চারিদিকে চাইতে লাগলেন, হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি বলে উঠলেন,—রসো, ভাসিল্যেভ, এ অঙ্কে তোমার কোন পার্ট আছে?

আমার হাতের কাগজটার দিকে ভাল করে দেখলাম আমি ঃ

হাঁ, আছে—শেষের দিকে।

বেশ, তা হলে আর একটা পার্টও করতে হবে তোমার,—ভেরোনিকার গোলামের পার্ট। বই থেকে পড়ে নাও। হাতে তালি দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, ভদ্রমহিলা,—ভদ্রমহোদয়গণ,—আপনারা চুপ করুন সবাই! গোলামের প্রবেশ।— 'মাননীয়া দেবি,'—আর একটু জোরে,—প্রথম সারিতে যাঁরা বসবেন তাঁরাই শুনতে পাবেন না তোমার কথা।

কয়েক মিনিট পরে মার্সিয়া দেবীর (সীন্‌কিউয়িকজের লিজিয়া) গোলামও খুঁজে পেলেন না ওঁরা, সুতরাং আমায় দিয়েই সে পার্টটাও সেরে নেওয়া হল। এর পর বাড়ির ম্যানেজারের পার্টটা করবার জন্যও একজন লোকের দরকার হল, সে পার্ট করবার ভারও পড়ল আমার উপর। সুতরাং মহড়া শেষ হবার পর হিসাব করে দেখলাম শতসেনানায়কের যে পার্টটা প্রথমে আমায় দেওয়া হয়েছিল তা ছাড়া আরও পাঁচটা পার্ট বেশি করতে হবে আমায়।

প্রথম প্রথম ঠিক হচ্ছিল না আমার পার্ট,—যেই আমি শুরু করলাম,—'হে মহানুভব মার্কাস্‌—' স্যামুইলেঙ্কো—পা দুটো ফাঁক করে, সামনে নুয়ে কানে হাত লাগিয়ে বলে উঠলেন, এ কি হল,—কি বিড়বিড় করছ তুমি,—কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমি।

হে মহানুভব মার্কাস্‌—

মাপ করো. কিছুই শোনা যাচ্ছে না,—আরও জোরে, বলেই তিনি এগিয়ে এলেন আমার কাছে, এসে বললেন, শোনো এমনি করে বলবে তুমি। এর পর সুর করে ছাগলের মত চাপা গলায় এত জোরে বলে উঠলেন তিনি,—'হে মহানুভব মার্কাস্‌, আপনার আদেশ...' ইত্যাদি যে, সারা পার্কটায় সে গলা শোনা যায়। বললেন এমনি করে পার্ট করতে হয়, অল্প বয়স তোমার, যা বলছি মনে রেখ, এ সম্বন্ধে আমাদের রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কি বলেছেন শোন। তিনি বলেছেন, স্টেজে অভিনেতাকে কথা বলতে হয় না, বক্তৃতা দিতে হয়, হাঁটতে হয় না, সদর্প পদক্ষেপে চলতে হয়।

কথাগুলি বলবার পর একটা আত্মতৃপ্তির ভাব নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, নাও আবার আরম্ভ কর।

আমি আবার বললাম বটে আমার পার্ট, কিন্তু তা আগের চেয়ে আরও খারাপ হল। এর পর তাঁরা পালা করে আমায় পার্ট বলা শেখাতে শুরু করলেন, রিহার্সেলের শেষ পর্যন্ত চলল এই। সবাই আমায় শেখাতে লাগলেন ঃ ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি আর খুঁতখুঁতে মন নিয়ে শেখালেন আত্মাভিমানী লারা-লারস্কী; বৃদ্ধ

গোনচারোভ, লাল শিরা বেরুনো থলথলে গাল দুটো ঝুলে পড়েছে তাঁর থুতনির নিচে,—তিনিও শেখালেন ; তেল-রঙের মালিক বোয়েভ শেখালেন ; শেখালেন বোকা আইভানের মত ভাণ করা নির্বোধ চেহারার এ্যাকিমেঙ্কো। স্বেদবিগলিত বিপন্ন ঘোড়ার চারিদিকে পথের লোক জড়ো হয়ে যখন তাকে সামলায়, তখন তার যে দশা হয়, অথবা বাড়ির শান্তির পরিবেশ থেকে যখন কোন নতুন ছাত্র স্কুলের পাকা ঝানু নিষ্ঠুর ধূর্ত ছাত্র গোষ্ঠীর ভিতর গিয়ে পড়ে তখন তার যে দশা হয়, সেই দশা হল আমার।

এই রিহার্সেলের ব্যাপার নিয়েই একজন আমার নিষ্ঠুর শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন, এর পর প্রতিদিনকার জীবন আমার বিষময় করে তুলেছেন তিনি। ব্যাপারটা ঘটল কি করে বলছি ঃ

একবার যখন আমার সেই বহু উচ্চারিত লাইনটা,—'হে মহানুভব মার্কাস্' আবার নতুন করে শুরু করেছি, তখন স্যামুইলেঙ্কো আমার কাছে ছুটে এসে বললেন,—হাঁ, বলো,—আবার বলো,—দাঁড়াও,—ঠিক হচ্ছে না তোমার। কাকে বলছ তুমি এ সব কথা? মহাবীর মার্কাসের উদ্দেশ্যে,—নয় কি? এখন ব্যাপার হচ্ছে প্রাচীন রোমে নিম্নতন সেনানায়কেরা তাদের সর্বাধিনায়কের সঙ্গে কথা বলবার সময় কি ভঙ্গিতে কথা বলত সে সম্বন্ধে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। দেখ, তাকিয়ে দেখ, ঠিক ভঙ্গি হচ্ছে এই।

এই বলে ডান পাটা একটুখানি এগিয়ে দেহটাকে সমকোণে বাঁকিয়ে হাতের তালুটা নৌকোর জল তোলা কেঠোর মত করে দক্ষিণ বাহুটা ঝুলিয়ে দিলেনঃ

দেখ, এই ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে সামনে গিয়ে,—নাও,—করো—এবার।

ঐ রকমই করলাম আমি, কিন্তু দেখাল তা এমন অর্থহীন কদাকার যে, মোলায়েমভাবে একটু প্রতিবাদ না করে আমি পারলাম না। বললাম,—

ধৃষ্টতা মাপ করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় সামরিক রীতিই হচ্ছে কোন-রকমে একটু মাথা নিচু করা, আর এদিকে বইয়ে রয়েছে, লোকটা বর্ম পরে এসেছে, এখন আপনি ত এ কথা স্বীকার করবেন যে, একজন বর্ম-পরা লোকের পক্ষে—

স্যামুইলেঙ্কো এইটুকু শুনেই রেগে মুখ লাল করে বলে উঠলেন, হয়েছে, এখন দয়া করে থাম ত তুমি। স্টেজ ডিরেক্টার যদি বলেন, জিভ বের করে এক পায়ে দাঁড়াও তুমি,—কোন কথাটি না বলে তা-ই করতে হবে তোমার।... এখন দয়া করে যা বলছি তাই কর ত আবার।

আমি আবার তাই করলাম,—কিন্তু দেখাল তা আগের চেয়ে আরও কুৎসিত। কিন্তু এই সময় লারা-লারস্কী এসে আমায় একটু বাঁচালেন। দেখলাম একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেই তিনি স্যামুইলেঙ্কোকে বললেন, বোরিস, তুমি একটু থাম ত! দেখছ ও করতে পারছে না—এ ভঙ্গি আবার কেন? তা ছাড়া তুমি ত নিজেই জানো এই ভঙ্গিটা যে কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ইতিহাস থেকেও আমরা স্পষ্ট কিছু পাই না। আসল কথা, এ বিষয়ে নির্ভুল কিছু বলা সম্ভব নয়।

স্যামুইলেঙ্কো আর আমায় প্রাচীন সামরিক অভিবাদনের ভঙ্গি শেখাতে এলেন না বটে, কিন্তু সেই থেকে আমায় জব্দ, বিদ্রূপ বা আঘাত করবার সুযোগ পেলে আর ছাড়তেন না। তিনি ওঁৎ পেতে বসে থাকতেন কখন কোথায় আমি ভুল করি। তিনি আমায় এমন ঘৃণা করতে শুরু করলেন যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিদিন রাত্রে তিনি আমায় স্বপ্ন দেখতেন। আর আমার নিজের কথা বলতে,—সেই থেকে দশ বছর কেটে গেছে বটে, তবুও লোকটার কথা মনে পড়লেই রাগে আমার দম আটকে আসে। অবশ্য ওখান থেকে ছেড়ে আসবার আগে—যাক গিয়ে, পরে বলব সে সব কথা, এখন থাক, নইলে কাহিনীর গতি ব্যাহত হবে আমার।

রিহার্সেল শেষ হবার ঠিক আগে দীর্ঘনাসা লম্বা রোগা গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক এক বোলার হ্যাট পরে স্টেজে এসে হাজির হলেন, টলতে টলতে তিনি উইংসের গায়ে এসে ধাক্কা লাগালেন, চোখ দুটি তাঁর দুটো টিনের বোতামের মত। সবাই দেখলাম বিরক্তির সঙ্গে তাকালেন তার দিকে,—কিন্তু মুখে কেউই কিছু বললেন না।

দুখোভস্কোইকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম,—কে, এ লোকটা?

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ও একটা মাতাল। নাম হচ্ছে নেল্যুবোভ ওর্লাগিন, আমাদের সিন আঁকে। লোকটার ক্ষমতা আছে,—যখন প্রকৃতিস্থ থাকে তখন আমাদের দু একটা পার্টও করে দেয়, কিন্তু ও প্রকৃতিস্থ থাকে বড় কম, আর এ দোষ ওর সারানোও অসম্ভব। ওর কাজ করে দেবার মত লোকও আমাদের নেই, তাছাড়া ওকে রাখতে খরচ কম, তাছাড়া সিনগুলি আঁকেও ও খুব জলদি।

৮

রিহার্সেল শেষ হয়ে গেল। আমরা যে যার মত সরে পড়তে লাগলাম। অভিনেতারা মার্সিয়ার নাম নিয়ে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে লাগলেন। লারা-লারস্কী বোয়েভকে—চলো 'সেখানে' যাওয়া যাক বলে কি যেন ইশারা করলেন। পার্কের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ গাছের পাশ দিয়ে যে সব রাস্তা গিয়েছে তারই একটায় লম্বা লম্বা পা ফেলে ভ্যালেরিয়ানোভ চলেছিলেন, আমি কোন রকমে তাঁকে ধরে ফেলে বললাম, ভিক্টর ভিক্টরোভিচ্, কিছু আগাম পেতে পারি আমি? অতি সামান্য হলেই চলবে।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেনঃ

কি? কিসের টাকা? কেন? কার জন্যে?

আমি আমার অবস্থা তাঁর কাছে সমস্ত খুলে বলতে শুরু করলাম, কিন্তু তিনি আমায় শেষ করতে সুযোগ না দিয়ে অধীর হয়ে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ থেমে হাত ইশারায় আমায় ডাকলেন :

শোন,—কি যেন তোমার নাম? ভাসিল্যেভ না,—কি যেন!...তুমি একবার ঐ লোকটার কাছে যাও, তোমার ঐ হোটেলওলার কাছে, গিয়ে বল সে যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে। আরও আধ ঘণ্টার মত আমি 'বক্স অফিসে' থাকব। আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

তখনই হোটেলের দিকে ছুটলাম আমি। খোখোল মুখখানা গোমড়া করে আমার কথা শুনল, দেখে মনে হল, বিশ্বাস করছে না সে আমার কথা। যাই হোক, এর পর সে তার বাদামী জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে ধীরে ধীরে থিয়েটারের দিকে রওনা হল। আমি তার জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে সে ফিরে এল, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল যেন একখানা ঝড়ো মেঘ,—হাতে রয়েছে তার এক গোছা লাল রঙের থিয়েটারের পাস। ওগুলি আমার নাকের ডগায় ঠেলে দিয়ে সে বললে,—দেখছেন? আমি ভেবেছিলাম টাকা দেবেন উনি, তার বদলে এই কাগজ, এ দিয়ে কি করব আমি?

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যাই হোক এই কাগজেও আমার কিছু কাজ হল। এর পর অনেক অনুনয় বিনয় করবার পর ও আমার সেই সুন্দর হলদে চামড়ার বিলেতী সুটকেসটা বাঁধা রাখতে রাজি হল, ওর ভেতরকার কাপড়চোপড়, পাসপোর্ট, আর আমার যা সবচেয়ে দরকারী সেই নোটবুকগুলি আমি আমার নিজের কাছেই রাখলাম। ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে ও জিজ্ঞাসা করলে, আবার ঐখানেই ভেরেণ্ডা ভাজতে যাচ্ছেন তো?

হাঁ, তাই যাচ্ছি, বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বললাম আমি।

বেশ, তবে মাঝে মাঝে একটু বাইরের দিকেও চাইবেন, আপনাকে দেখলেই আমি চেঁচিয়ে উঠব, এই যে, আমার সে কুড়ি রুবলের কি হল?

তিনদিন আমি আর ভালেরিয়ানোভকে বিরক্ত করতে সাহস পাইনি, জামা-কাপড় মাথায় দিয়ে সবুজ বেঞ্চের উপরই রাত কাটিয়েছি আমি। বরাত ভাল, দুই রাত্রি বেশ গরমই ছিল, বেঞ্চের উপর শুয়ে থাকবার সময় নিচের ফুটপাথের টালিগুলি থেকেও বেশ গরমের ভাপ উঠছিল, দিনের বেলায় গরম হয়ে ছিল ওগুলি। কিন্তু তৃতীয় দিন রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে থাকায় কোন দরজার নিচে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে হয়েছিল আমার, ফলে সকালের আগে আর ঘুমুতে পারিনি। বেলা আটটার সময় পার্কের দরজা খোলা হলে আমি হামাগুড়ি দিয়ে সিনগুলির নিচে গিয়ে একটা পুরানো পর্দার উপরে শুয়ে দিব্যি দু ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম। কিন্তু স্যামুইলেভ্‌স্কো দেখে ফেললেন এ সব,—এর পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে তিক্ত কণ্ঠে আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে, থিয়েটার

লোকজনের শয়নকক্ষও নয়, মেয়েদের সাজঘরও নয়, শস্তা ভাড়ায় রাত্রে ঘুমোবার জায়গাও নয়, এ হচ্ছে শিল্পের মন্দির। পার্কের মধ্যকার পথে বেড়াবার সময় আর একদিন ম্যানেজারকে ধরে বসলাম আমি, বললাম, ঘুমুবার জায়গা নেই আমার, সামান্য কিছু পেলে—

তিনি বললেন,—দুঃখিত আমি, আর এ সব দেখা আমার কাজও নয়। তুমি এখন আর নাবালক নও, তোমার নার্সও নই আমি।

আমি চুপ করেই রইলাম। রাস্তার বালুর উপর সূর্যকিরণ পড়ে চিক্‌চিক্ করছিল, চোখ কুঁচকে সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর বললেন, কি করবে তুমি বলে দিচ্ছি।...থিয়েটারে ঘুমুতে চাও তুমি? বেশ, আমি পাহারাওয়ালাকে বলে দেব,—হতভাগাটা আবার ভয় পায়,—একটা ভূত!

আমি ধন্যবাদ জানালাম ম্যানেজারকে।

তিনি আবার বললেন,—শুধু এই কথা মনে রেখ, থিয়েটারের মধ্যে ধূমপান করা চলবে না, ধূমপান করতে হলে বাইরে পার্কে বেরিয়ে যাবে।

সেইদিন থেকে উপরে ছাদ আঁটা জায়গায় রাত্রে শুতে পেলাম আমি। দিনের বেলা অনেক দিন আমি দুই মাইল দূরের এক নদীতে চলে যেতাম, সেখানকার একটা নিরালা কোণে গিয়ে আমি কাপড়-চোপড় ধুতাম, তারপর নদীর ধারে ধারে যে সব উইলো গাছ ছিল তার ডালে সেগুলি মেলে শুকিয়ে নিতাম। মাঝে মাঝে ওখানকার বাজারেও গিয়েছি আমি, গিয়ে আমার কোন শার্ট বা অন্য কিছু বিক্রি করেছি, বিশ ত্রিশ কোপেক যা পেয়েছি তাই দিয়ে আমার দুদিনকার খাওয়া চলে গেছে। ক্রমেই যেন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল ঃ একদিন কি শুভক্ষণে মিষ্টি কথায় ভ্যালেরিয়ানোভের মন ভুলিয়ে এক রুবল আদায় করে নিলাম তাঁর কাছ থেকে। তখনই আমি ইলিয়াকে তার করলাম ঃ

অনাহারে মারা যাচ্ছি টেলিগ্রাফে টাকা পাঠাও.—লিওনতোভিচ্ এস্ থিয়েটার।

৯

দ্বিতীয় রিহার্সেলই ড্রেস্ রিহার্সেল। এই সময় আরও দুটি নতুন পার্ট দেওয়া হল আমায় ঃ আদ্যিকালের এক বয়স্ক খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোক আর চেজোলনাস্।

এই রিহার্সেলে আমাদের নাটকের বিয়োগান্ত অংশের অভিনেতা তিমোফিয়েব সুমস্কোই-ও এসেছিলেন। মধ্যবয়সী বৃষস্কন্ধ লোক তিনি,—মাথায় প্রায় ছ ফুটের মত উঁচু, কোঁকড়া লাল চুল, মুখে ছুলির দাগ, চোখের মণি দুটি যেন

ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে,—দেখে মনে হয়—হয় তিনি কসাই, নয় জহ্লাদ। তাঁর কণ্ঠস্বর আবার তাঁর চেহারাকেও ছাড়িয়ে যায়,—সেই সাবেক কালের গলায় গর্জনের স্বরে তিনি আবৃত্তি করে গেলেন—

হিংস্রাহত পশুপ্রায়
অভিনেতা করে গরজন।

নিজের পার্টটা ভাল করে তৈরিও করেননি তিনি। নেরোর পার্ট ছিল তাঁর, বুড়ো মানুষের মত বেশি পাওয়ারের চশমা পরে অতি কষ্টে বই দেখে দেখে তিনি তাঁর পার্ট বললেন। তাঁর পার্টটা একটু ভাল করে পড়ে নিতে বললে তিনি বলেন,—আরে, রেখে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে, প্রম্পটারের কাছ থেকে শুনেই চালিয়ে দেব আমি। এই ত প্রথম পার্ট করছি না, আর ঐ দর্শকের দল,—ওরা কি কিছু বোঝে না কি,—যত সব মূর্খের দল।

আমার নামটা নিয়েও বেশ একটু মুস্কিলে পড়ে গেলেন তিনি,—টিজেলিনাস কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারেন না, হয় বলেন টিজেলিনিয়াস্, না হয় টিনেজিলাস। ওঁরা কেউ তাঁকে শুধরে দিতে গেলে তিনি অমনি গর্জে ওঠেন, আরে রেখে দাও, বাজে বকো না। যত বাজে জিনিস আমার মাথায় ঢুকিয়ে লাভ কি?

কোথাও কঠিন কোন বাক্যালঙ্কার থাকলে অথবা এক সারিতে অনেকগুলি বিদেশী শব্দ থাকলে তিনি তাঁর খাতার সেখানটায় একটা 'জেড' লিখে রেখে বলতেন,—কেটে দিলাম এগুলি।

শুধু তিনিই নন, আর সবাইও ঐ করতেন। আমাদের নাটক শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় তো একটা যা-তায়। টিজেলিনাসের অত বড় বক্তৃতাটা কেটে এক লাইন করে দেওয়া হয়েছে।

নেরো জিজ্ঞাসা করলেন,—টিজেলিনাস, সিংহগুলি কি অবস্থায় আছে?

আমি তখন তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললাম,—মহানুভব সম্রাট, রোমে এমন সিংহ আর দেখা যায়নি, ওরা যেমনি ক্ষুধার্ত, তেমনি হিংস্র।

বাস,—হয়ে গেল।

এর পর অভিনয়ের দিন এসে গেল। উন্মুক্ত আকাশতলে দর্শকদের আসনগুলির একটিও খালি নেই। টিকেট না কিনেই যারা দেখতে এসেছে, তারা ঘেরা পাঁচিলের বাইরে চারিধারে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আমি কেমন অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

হায় ভগবান, কি জঘন্য অভিনয়ই ওঁরা সব করলেন! তিমোফিয়েবের সঙ্গে এককণ্ঠ হয়ে ওঁদের বলা উচিত ছিল,—'আরে রেখে দাও, মূর্খ দর্শকের দল কিছু বুঝবে না।' ওঁদের প্রতিটি কথার উচ্চারণ, আর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি দেখে আমার মনে হতে লাগল, বহু যুগ আগেই লোকের এ সব দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। মনে হতে লাগল, শিল্পের এই পূজারীর দল গোটাবিশেক উচ্চারণের সুর শিখে

রেখে দিয়েছেন, আর তার সঙ্গে সামোইলেঙ্কো আমাকে যেমন অঙ্গভঙ্গি শেখাতে বৃথা চেষ্টা করেছিলেন, সেই রকম গোটাত্রিশেক অঙ্গভঙ্গি। সেই সঙ্গে এ-ও মনে হতে লাগল কতখানি নৈতিক অবনতি এ'দের ঘটেছে যাতে লজ্জাবোধ পর্যন্ত এ'রা হারিয়ে ফেলেছেন।

তিমোফিয়েব সামস্কোই যা করলেন, সে একেবারে অপরূপ। সিংহাসনের ডান দিকে হেলান দিয়ে বাঁ পা-টা দিয়ে স্টেজের অর্ধেক জায়গা জুড়ে, ভাঁড়ের মত মুকুটটা বাঁকা করে প'রে অক্ষিগোলক আবর্তিত করতে করতে তিনি প্রম্পট-বক্সের দিকে চাইতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে এমন ভীষণ গর্জন হল যে, তা শুনে পাঁচিলের বাইরের ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠতে লাগল। আমার নামটা অবশ্য তাঁর মনে থাকবার কথা নয়। তিনি বাষ্পস্নানাগারের বণিকের মত চিৎকার করে আমায় বললেন,—তেল্যানতিন, আমার সিংহ ব্যাঘ্রগুলি এখানে নিয়ে এস।

নিতান্ত নিরীহের মত আমার বক্তব্য অংশটুকু না বলেই ওখান থেকে প্রস্থান করতে হল আমার। বীর সেনাপতি মার্কাসের পার্ট—লারা-লারস্কী যা করলেন তা বোধহয় সবচেয়ে জঘন্য। তাঁর নির্লজ্জতা, অসংযত এবং অমার্জিতভাব সকলকে ছাড়িয়ে গেল, অথচ তাঁর ধারণা—সবার চেয়ে ভাল অভিনয় করেন তিনি। চিৎকার করা তাঁর এক রোগ, আবার মিষ্টি কথাগুলি এত মিষ্টি করে বলতে যান তিনি যে, শুনে মনে হয় ছোটদের টফি খাওয়াচ্ছেন, তা ছাড়া যে ভাবে তিনি রোমক বীরদের উদ্ধত কথাগুলি আবৃত্তি করেন তা শুনে তিনি যে একজন খাশ রুশীয় এ কথা বুঝতে কারো বাকি থাকে না।

কিন্তু এ্যান্দ্রোসোভা সেদিন যা অভিনয় করলে তা একেবারে অপূর্ব, তার সব কিছুই অপূর্ব ঃ ভাবসমৃদ্ধ তার মুখ, সুন্দর দুটি হাত, কোমল মধুর তার কণ্ঠস্বর, দোলায়িত সুদীর্ঘ কুন্তল, সব কিছুই তার দিব্য সুন্দর। শেষ অঙ্কে মাথার চুলগুলি সে পিঠের উপর এলিয়ে দিয়েছিল। তার অভিনয় যেন পাখিদের গানের মত, যেমনি সহজ তেমনি সুন্দর।

পাশের সিনগুলির ক্যানভাসের ভিতরে যে ছোট ছোট ছ্যাঁদা আছে, তারই একটার ভিতর দিয়ে প্রকৃত শিল্পরসিকদের দৃষ্টি নিয়ে আমি ওর অভিনয় তাকিয়ে দেখছিলাম, মাঝে মাঝে চোখে জল এসে যাচ্ছিল আমার। কিন্তু তখন কি জানি যে মঞ্চের বাইরে সম্পূর্ণ অন্যভাবে সে আমার মনকে নাড়া দেবে?

এই নাটকে আমার এত বেশি লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে যে, ঘোষণাপত্রে পেত্রোভ, সিদোরোভ, গ্রিগোরোভ, আইভ্যানোভ, ভাসিল্যেভ—নামের সঙ্গে দিমিত্রিভ্, এ্যালেক্‌জ্যান্দ্রোভ করে আরও দুইটি নাম ওদের যোগ করে দেওয়া উচিত ছিল। প্রথম অঙ্কে প্রথমে এলাম আমি পাগড়ী আর ঢিলে জামা-পরা এক বুড়োর বেশে। সিনের পিছনে ছুটে গিয়ে ও জামা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে নতুন করে বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে খালি পায়ে এলাম শতসেনানায়ক হয়ে।

তার পরেই সে বেশ পাল্টে হয়ে এলাম আমি এক বয়ঃবৃদ্ধ খৃষ্টান। দ্বিতীয় অঙ্কে হলাম আমি শতসেনানায়ক এবং ক্রীতদাস। তৃতীয় অঙ্কে দুবার দুরকম ক্রীতদাস। চতুর্থ অঙ্কে শতসেনানায়ক এবং আরও দুরকম ক্রীতদাস। পঞ্চম অঙ্কে এক বাড়ির কর্মাধ্যক্ষ এবং এক ক্রীতদাস। শেষের দিকে হলাম টিজেলিনাস, এবং সর্বশেষে নীরব যোদ্ধা হয়ে মার্সিয়া এবং মার্কাস্‌কে ইঙ্গিতে রঙ্গভূমিতে সিংহের উদরে যাবার নির্দেশ দিলাম।

হাবাগোবা এ্যাকিমেঙ্কো পর্যন্ত আমার কাঁধ চাপড়ে বললে, বাপরে, কি তাড়াতাড়ি তুমি তোমার ভোল পাল্টাতে পার!

কিন্তু এ কৃতিত্ব দেখানোর খুব বেশি মূল্যই আমাকে দিতে হয়েছিল ঃ দাঁড়াতে পারছিলাম না আমি।

অভিনয় শেষ হয়ে যাওয়ায় চৌকিদার আলোগুলি সব একে একে নিভিয়ে দিচ্ছিল। সর্বশেষ অভিনেতা তাদের মুখের রঙচঙ মুছে কখন চলে যায় তারই অপেক্ষায় মঞ্চের উপরই আমি পায়চারি করছিলাম। ওরা চলে গেলেই থিয়েটারের জীর্ণ সোফাটায় আমি শুয়ে পড়তে পারি। তা ছাড়া ঠেকনাঘর আর সাধারণ ড্রেসিং-রুমের মাঝের কোণটায় রেস্তরাঁ থেকে কেনা যে ভাজা যকৃৎটা ঝুলছে সেটাও খেয়ে নিতে পারি। (আমার নুন দেওয়া শূকরের মাংসটা ইঁদুরে খেয়ে যাওয়ায় আমার সব খাবারই আমি একটা তারে ঝুলিয়ে রাখি।) হঠাৎ আমার পিছন থেকে কে বলে উঠল, নমস্কার, ভাসিল্যেভ।

তখনই ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি—এ্যান্দ্রেসোভা দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার সুন্দর মুখখানা বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, দলের মধ্যে একমাত্র এ্যান্দ্রোসোভা ছাড়া—হাঁ আরও আছে,—আর ঐ দুই বাচ্চু—দুখোভস্কোই আর নেল্যুবভ ওর্লাগিন ছাড়া আর কেউই আমার সঙ্গে করমর্দন করেননি। আর সবাই আমার হাতে হাত মিলাতে ঘৃণা বোধ করেছেন। এ্যান্দ্রোসোভার করমর্দনের কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি, এমন অকপট কোমল, জোরাল করমর্দন শুধু সত্যিকার নারী এবং বন্ধুর কাছ থেকেই আশা করা যায়।

আমি তার হাত ধরবার পর সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে আপনি একটু অসুস্থ, নয় কি? শরীরটা আপনার ভাল বোধ হচ্ছে না। তারপর একটু অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, পয়সাকড়ি একটু টানাটানি যাচ্ছে বোধ হয়, কিছু মনে না করেন ত আমি কিছু ধার দিতে পারি।

আমি গম্ভীরভাবে তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম, না, না, না, সে সব কিছু নয়,—ধন্যবাদ। তারপর একটু আগে তার অভিনয় দেখে যে আনন্দ পেয়েছি সেই কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম, আঃ, আজ রাত্রে আপনি কি অপূর্ব অভিনয় করেছেন!

প্রশংসা করতে গিয়ে আমি হয়ত বাড়াবাড়ি করে বসেছিলাম, লজ্জা পেয়ে

সে চোখ নিচু করল, তারপর হেসে বললে, আপনার ভাল লেগেছে শুনে খুশি হলাম।

সসম্ভ্রমে আমি তার হস্তচুম্বন করলাম। ঠিক সেই সময়ে নারী কণ্ঠে কে যেন নিচু থেকে বলে উঠল,—এ্যান্দ্রোসোভা, কোথায় তুমি? নেমে এস, ওঁরা তোমায় নৈশভোজনে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

নমস্কার ভাসিল্যেভ, বন্ধুর মত সহজ কণ্ঠে বলে উঠল এ্যান্দ্রোসোভা, তারপর যাবার সময় মাথাটা নেড়ে নিজের মনেই সে বিড়বিড় করে বলে গেল, আহা গরিব বেচারা!

সেই মুহূর্তটিতে নিজেকে গরিব মনে হল না আমার। ও বিদায় নেবার আগে ও যদি আমার ললাটে ওর ওষ্ঠাধর একবার স্পর্শ করে যেত তাহলে হয়ত আনন্দে মরেই যেতাম আমি।

১০

শীগগিরই দলের সকল লোকের সঙ্গেই পরিচয় হয়ে গেল আমার। আমায় অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেই অভিনেতা হতে হয়েছিল, কিন্তু সত্যি বলতে কি এর আগেও আমি প্রাদেশিক রঙ্গমঞ্চের উপর তেমন শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতাম না। তা সত্ত্বেও কিন্তু নাট্যকার ওস্ত্রভস্কী* আমার কল্পলোকে এমন কতকগুলি 'নেশ-চাস্তলিভ্‌ৎসেভ' এবং গেঁয়ো আর্কাশকা'র ছবি এঁকে রেখেছিলেন যারা বাহ্যত অমার্জিত কিন্তু অন্তরে কোমল ও সহৃদয় এবং যারা তাদের নিজের নিজের ভাবধারা অনুযায়ী শিল্প ও বন্ধুত্বকে ভালবাসে। কিন্তু এখন আমি দেখলাম—মঞ্চে কেবল নির্লজ্জ নরনারীর ভিড়।

এরা সবাই হৃদয়হীন, বিশ্বাসঘাতক এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, আত্মা এদের পশু চর্মে ঢাকা, এরা ইতর, সৌন্দর্য এবং শিল্পচেতনার প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই এদের। এ ছাড়াও এদের আরও গুণ আছে, এরা অসম্ভব রকমের বোকা, অপরের সুখ দুঃখে এদের কিছু আসে যায় না, এরা ভণ্ড, এরা ইচ্ছা করে মিছে কথা বলে, এদের চোখের জল, উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সব মিথ্যা অভিনয়, এরা গোলাম একেবারে নিম্নস্তরের গোলাম, উপরওলা এবং পৃষ্ঠপোষকদের পা চাটতে ওস্তাদ। চেকভ ঠিকই বলেছিলেন, 'মূর্ছারোগগ্রস্তের ন্যায় আচরণে অভিনেতাকে হার মানায় শুধু পুলিস অফিসার। জারের জন্মদিনে মদের দোকানে দাঁড়িয়ে ওরা দুজনেই কেমন কাঁদে আর বক্তৃতা দেয়, দেখ, তা হলেই বুঝতে পারবে।'

*রাশিয়ান ক্লাসিকাল নাট্যকার।

মঞ্চের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারগুলি সমানেই রয়ে গেছে। মিত্রোফানোভ কোজলো-ভস্কী নামে একজন অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করবার আগে নিজের বুকের উপর ক্রুশচিহ্ন আঁকতেন। এটা মঞ্চের একটা বদ্ধমূল অভ্যাস হয়েই দাঁড়াল। প্রধান প্রধান অভিনেতাদের প্রত্যেকেই শেষে ঐরকম করা শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আড়চোখে দেখে নিতেন, অপর কেউ তা লক্ষ্য করছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভাবতেন—এটা কুসংস্কার বটে তবে খুব মৌলিক কুসংস্কার।

আর একজন শিল্পজীবী, ছাগলের মত কণ্ঠস্বর তাঁর, ইয়া মোটা তাঁর উরু, তিনি একবার এক দর্জিকে আচ্ছা করে পেটালেন, তারপর পেটালেন নাপিতকে। এটাও একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মঞ্চের। অনেক সময় দেখেছি, লারা-লারস্কী রক্তচক্ষু হয়ে মুখ দিয়ে ফেনা ছিটকাতে ছিটকাতে মঞ্চের উপর চিৎকার করে বলছেন, নিয়ে এস দর্জিটাকে, আমি ওকে শেষ করব।

তারপর দর্জিকে কষে এক চড় লাগিয়ে দিয়ে, প্রতিদানে সে-ও এক ঘা লাগিয়ে বসতে পারে মনে মনে এই ভয় করে দুই বাহু পিছনে প্রসারিত করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি চিৎকার করছেন,—তোমরা কে আছ, এসে থামাও আমাকে, নইলে সত্যি সত্যি খুনী হলাম আমি!

এই নিয়ে ওঁরা 'পবিত্র শিল্প' আর মঞ্চের বড়াই করেন! জুন মাসের একটা সুন্দর দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। রিহার্সেল তখনও শুরু হয়নি। মঞ্চের ওখানটায় যেন একটু আঁধার আর ঠাণ্ডা। নাম-করা অভিনেতাদের মধ্যে লারা-লারস্কী এবং তাঁর স্ত্রী মেদভেদেবা শুধু আগে এসেছেন। কয়েকটি স্কুলের ছেলে এবং কয়েকজন তরুণী বসে রয়েছে স্টলে। লারা-লারস্কী চিন্তাক্লিষ্ট মুখে মঞ্চের উপর পায়চারি করছেন। কোন কঠিন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তিনি কি করে অভিনয় করবেন, হয়ত তাই চিন্তা করছেন। এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন—

সাশা, কাল রাত্রে 'প্যাগলিয়াচ্চি'তে যে নতুন সুরটা শুনলাম আমরা, ওটা একটু শিস্ দিয়ে শোনাও না আমায়!

লারা-লারস্কী তখনই দাঁড়িয়ে গিয়ে স্ত্রীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আড়-চোখে স্টলের দিকে তাকিয়ে বিশিষ্ট থিয়েটারী ভঙ্গিতে বললেন—

শিস? স্টেজের উপর শিস? হা-হা-হা! হাসিটা থিয়েটারের সেই উগ্র হাসি।. .সত্যিই তুমি আমায় শিস দিতে বলছ? তুমি কি জান না,—মঞ্চ হচ্ছে মন্দির, পুজার জায়গা,—বেদী, এখানে আমরা আমাদের হৃদয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ভাব-ধারা উদ্বোধন করি। শিস দেবই বটে,—হা-হা-হা!

এ সব সত্ত্বেও স্থানীয় অশ্বারোহী সৈন্যরা ধনী পরগাছার দল এবং জমিদারেরা ঠিক পতিতালয়ে যাবার মত করেই এই মন্দিরে অর্থাৎ লেডিজ ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করেন। এ নিয়ে আমরা উচ্চবাচ্য করি না। প্রায়ই দেখা যায়—দ্রাক্ষাকুঞ্জে আলো জলছে, সেখান থেকে ভেসে আসছে পেয়ালার ঠুন ঠুন, জুতোর কাঁটার ঠক্ ঠক্, আর তার সঙ্গে নারী কণ্ঠের হাসি, অভিনেতা স্বামী তখন অন্ধকারে

প্রহরীর ন্যায় বাইরে পথে পাদচারণ করছেন, আর ভাবছেন ওখান থেকে পানাহারের আমন্ত্রণ আসতেও পারে। পরিবেষণকারী ভৃত্য ট্রে হাতে সে পথ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজের যাবার পথ করে নিচ্ছে, নিতান্ত ভদ্রতা না দেখালে চলে না বলে শুষ্ক কণ্ঠে একবার শুধু বলে যাচ্ছে, মাপ করবেন, স্যার।

আর এই অভিনেতাকে যদি ভিতরে পানাহারের জন্য ডাকা হয়, তা হলে তিনি সেখানে গিয়ে শুধু চাল দেখিয়ে বিয়ার আর ভিনিগার মিশিয়ে ভদকা খাবেন, আর ইহুদীদের নিয়ে যত অশ্লীল রসিকতা করবেন।

এ'রা আবার উচ্চকণ্ঠে নাট্যকলার কথা আওড়ান। তিমোফিয়েভ-সামস্কোই একাধিকবার মঞ্চ থেকে প্রস্থানের প্রাচীন রীতি সম্বন্ধে বক্তৃতাই দিয়েছেন।

'প্রাচীন বিয়োগান্ত নাটক অভিনয়ের ধাঁচ আর নেই, একেবারে চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে গেছে', মুখখানা আঁধার করে এমনি সব কথা তিনি প্রায়ই বলতেনঃ 'সে কালের অভিনেতারা মঞ্চ থেকে কি করে প্রস্থান করতেন? এমনি করে।' বলেই ডান হাতটা উ'চুতে তুলে, তর্জনী ছাড়া অন্যান্য আঙুলগুলি দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করে, তর্জনীটা হুকের মত বাঁকা করে তিনি বলতেন, দেখেছ? তারপর অতি ধীরে লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে যেতেন। ফিরে এসে বলতেন, একেই বলে প্রাচীন রীতির প্রস্থান। আর এর জায়গায় এখন আমরা কি করি? হাত দুটি তুমি তোমার পেণ্টুলানের পকেটে পুরে, বাড়ি চললে, বাস্, হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে এ'রা এক নতুনত্বের স্বপ্ন দেখতেন, এটা আর কিছুই না, অপরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপার স্পষ্ট হবেঃ লারা-লারস্কী একবার খ্লেসতাকোভের* পার্ট কি করে অভিনয় করেছিলেন, সেই গল্প শোনালেন একদিন।

শোনো, গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তার দৃশ্যটা আমি কি করে করেছিলাম, শোনো। গভর্ণর বললেন, হোটেলের এ ঘরটা একটু আঁধার। আমি বললাম, হাঁ, আপনি কিছু পড়তে চান, যেমন ধরুন মাক্সিম গর্কির কোন বই—কিন্তু পড়তে পারেন না, ঘরটা এ-এ-ত আঁধার, এ-এ-ত।—বলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের কাছ থেকে করতালি।

অধিক বয়স্ক অভিনেতারা যখন অল্প একটু মাতাল হতেন, তখন তাঁদের কথা শুনতে বেশ মজা লাগত, যেমন তিমোফিয়েভ-সামস্কোই আর গনচারোভের কথাবার্তা।

হাঁ ভাই ফেদোতুশকা, আগের মত অভিনেতা আর নেই, সত্যিই নেই।

*গোগোলের মিলনান্ত নাটকে 'ইনস্পেক্টর-জেনারেলের' প্রধান চরিত্র।

ঠিক বলেছ, পেত্রুশা, সত্যিই নেই। চারস্কী, ল্যুবস্কী, এ'দের কথা মনে আছে তোমার? এ'রাই হচ্ছেন গিয়ে তোমার অভিনেতা!

লোকের দৃষ্টিভঙ্গিই পালটে গেছে এখন।

ঠিক বলেছ, পিতার্সবার্গ, দৃষ্টিভঙ্গি পালটে গেছে। নাট্যশিল্পের পবিত্রতাকে আর কেউ এখন মেনে চলে না, শ্রদ্ধা করে না। যাই হোক, পেত্রুশা, তুমি আর আমি ছিলাম শিল্পের পূজারী, আর এরা? এস আর এক গ্লাস খাওয়া যাক, পেক্কাতারিস।

থাম তুমি, পেত্রোগ্রাদ, বুকটা ভেঙে দিও না আমার। আর এক গ্লাস খাওয়া যাক। সে কালের অভিনেতা আর এ কালের অভিনেতাদের মধ্যে অনেক তফাত।

অনেক তফাত, ঠিক বলেছ তুমি।

হাঁ স্যার, অনেক তফাত

এই সব অসভ্য, অজ্ঞ, মূর্খ, ধূর্ত, দম্ভী, লম্পট ভন্ডদের মধ্যে এ্যান্দ্রোসোভার মত এমন পবিত্র কোমল গুণী লোকও ছিল, শিল্পের আরাধনা করা বলতে যা বোঝায় তাই সে করত।

এখন আমার বয়স হয়েছে, এখন বুঝি, পুষ্পের শ্বেত সুন্দর দলমন্ডল যেমন খোঁজ রাখে না কোন্ কৃষ্ণকর্দমাক্ত জলাভূমি থেকে তার মূলে জীবনরস সঞ্চার হচ্ছে, তেমনি সে-ও এ সব নোংরামির খবর রাখত না।

১১

এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দ্রুতগতিতে আমরা নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছিলাম। অপ্রধান এবং মিলনান্ত নাটকগুলি আমরা একটা মহড়ার পরই মঞ্চস্থ করতাম। 'দুর্দান্ত ইভানের মৃত্যু' এবং 'নতুন জগৎ' দুবার রিহার্সেলের পর অভিনয় করা হল; বুখারিনের একটা বই মঞ্চস্থ করতে শুধু তিনটে রিহার্সেলের দরকার হল, কারণ এটার অভিনয়ে অতিরিক্ত যে চল্লিশটি লোকের দরকার হল তা আনতে হল স্থানীয় দুর্গরক্ষী সৈন্যদল, দেশরক্ষী সৈন্যদল এবং দমকলবাহিনী থেকে।

'দুর্দান্ত ইভানের মৃত্যু' নাটক অভিনয়ের সময় একটা ভীষণ মজার ব্যাপার ঘটেছিল বলে এর কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। ইভানের পার্ট করছিলেন তিমোফিয়েভ-সামস্কোই। কিংখাবের এক লম্বা জামা আর কুকুরের চামড়ার এক সূচলো টুপি পরেছিলেন তিনি, দেখাচ্ছিল তাঁকে একটা চলন্ত চতুষ্কোণ স্তম্ভের মত। দুর্দান্ত জারকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে তুলবার জন্য নিচের চোয়াল বাড়িয়ে, মোটা ঠোঁটটা নামিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি এমন

চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন যে, তেমন করতে তাঁকে আর কোনদিন দেখা যায়নি।

পার্টটা অবশ্য তিনি একেবারেই মকশো করেননি, তাই এমন বিশ্রীভাবে তিনি তা আবৃত্তি করছিলেন যে, যেসব অভিনেতা চিরকাল বলে এসেছেন, দর্শকেরা মূর্খ, কিচ্ছু বোঝে না ওরা, তাঁরাও তা দেখে ভড়কে গেলেন। কিন্তু এই দৃশ্যেই যখন তিনি অনুতাপে দগ্ধ হয়ে হঠাৎ জানু পেতে অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে আত্মদোষ স্বীকার করে বললেন, মনটা আমার ক্লেদে ভরে গিয়েছে, তখন অভিনয় তাঁর এমন উচ্চাঙ্গের হয়ে উঠল, যা তিনি কোনদিনই করতে পারেননি।

এর পর তাঁকে বলতে হবে, 'একটা ঘেয়ো কুকুরের মত'। জোর গলায় বাক্যাংশের একটুখানি বলেই তিনি থেমে গিয়ে প্রম্পট্-বক্সের দিকে চেয়ে রইলেন, প্রম্পটার অনুচ্চকণ্ঠে আবার বলে দিলে, একটা ঘেয়ো কুকুরের মত।

তিমোফিয়েভ 'একটা ঘাগী কুকুরের মত' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

প্রম্পটার অনুচ্চকণ্ঠে আবার বলে দিলে, একটা ঘেয়ো কুকুরের মত।

এইবার কথাগুলি ঠিক ঠিক বলতে পারলেন তিনি। কিন্তু এই যে সব ঘটে গেল, এজন্য তাঁকে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা বিব্রত বোধ করতে দেখলাম না। এই সময় সিংহাসনের পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি, আমার কিন্তু এ সব দেখে ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। এইরকমই হয়, যখন তুমি বুঝেছ কিছুতেই তোমার হাসা উচিত নয়, তখনই তোমার হাসি চাপা দায় হয়ে উঠবে। তখনই মনে হল, সিংহাসনের পিছনের দিকটা বেশ উঁচু, ওর আড়ালে গিয়ে লুকোলে প্রাণ-খুলে হাসা যাবে। কোন রকমে হাসি চেপে অভিজাত বংশের লোকের মত সদম্ভ পদক্ষেপে আমি তখনই সিংহাসনের পিছনে গিয়ে হাজির হলাম, গিয়ে দেখি দুজন অভিনেত্রী, ভলকোভা আর বোগুচারস্কায়া আগেই সেখানে এসে সিংহাসনের পিছনে লেপ্টে পড়ে চাপা হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। এ দেখে আমি আর নিজেকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলাম না, তখনই স্টেজ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে, যে জীর্ণ সোফাটায় আমি রোজ রাত্রে শুই তার উপর হেসে গড়িয়ে পড়লাম। স্যামুইলেঙ্কো আমার দোষ ধরবার জন্য সর্বদা ওঁৎ পেতে বসে থাকতেন, তিনি আমায় এই অবস্থায় দেখে পাঁচ রুবল জরিমানা করলেন।

অভিনয়ে এই রকম নানা ঘটনা ঘটত। বলতে ভুলে গেছি যে আমাদের দলে রোমানোভ বলে একজন অভিনেতা ছিল, বেশ সুন্দর, লম্বা মোটাসোটা চেহারা তার, অপ্রধান জমকালো পার্টগুলি তাকে দিয়ে বেশ ভাল উতরাতো। দোষের মধ্যে ছিল, কাছের জিনিস সে বড় কম দেখত, এজন্য বেশ বেশি পাওয়ারের চশমা পরতে হত তাকে। পাঁশনে ছাড়া স্টেজে উঠে প্রায়ই সে হোঁচট খেত, থামগুলি হুড়মুড় করে ফেলে দিত, ফুলদানি চেয়ার ইত্যাদি উল্টে দিত, কম্বলে পা আটকে ছেঁছড়ে পড়ে যেত। আর এক দলে 'কুমারী কল্পনা' নাটকে সবুজ

পোশাক-পরা নাইটের পার্ট করে বেশ নাম করেছিল সে। টিনের বর্ম-পরা অবস্থায়ই সে পাদপ্রদীপের উপর পড়ে মস্ত বড় এক সামোভারের মত গড় গড় করে গড়াতে লাগল। কিন্তু 'ভয়ঙ্কর ইভানের মৃত্যু' নাটকে সে যা করলে তা সব ছাপিয়ে গেল। শুইস্কীর বাড়িতে ষড়যন্ত্রকারীর দল জমায়েৎ হয়েছিল, সে তাদের উপর এমন জোরে গিয়ে পড়ল যে, যে-বেঞ্চটায় অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক বয়াররা বসেছিলেন বেঞ্চসমেত তাঁরা সব উল্টে পড়লেন।

এই অভিজাত বয়াররাও দেখবার মত। স্থানীয় সিগারেটের কারখানায় যেসব তরুণ কারাইট ইহুদী কাজ করত তাদের ভেতর থেকে এদের বেছে আনা হয়েছিল। আমিই তাদের ষ্টেজে নিয়ে আসি। আমি নিজে বেঁটে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে ঢেঙা, সে-ও আমার কাঁধ ছাড়িয়ে ওঠে না। তা ছাড়া এই অভিজাত বয়ারদের অর্ধেককে পরানো হয়েছিল ককেশীয় পোশাক, বাকি অর্ধেককে স্থানীয় বিশপের গায়ক দলের কাফতান ধার করে নিয়ে এসে সাজান হয়েছিল। সবার বড় কথা, এদের সবার মুখই বালকের মত, তাতে কালো দাড়ি এঁটে দেওয়া হয়েছিল, কালো চোখগুলি করছিল জ্বল জ্বল, আনন্দে মুখব্যাদন করে লজ্জায় আনাড়ির মত হেলে দুলে এরা মঞ্চে প্রবেশ করলে। আমার সঙ্গে এদের এই মূর্তিতে এই ভাবে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখে দর্শকেরা সব হো হো করে হেসে উঠল।

প্রায় প্রত্যেক দিনই আমরা নতুন নতুন নাটক অভিনয় করতাম, থিয়েটারের খ্যাতিও ছিল মন্দ নয়। অফিসার এবং জমিদারেরাও দেখতে আসতেন, আসতেন অবশ্য তাঁরা আমাদের অভিনেত্রীদের জন্য। খারিতোনেঙ্কোর জন্য প্রতিদিনই একটা আসন রিজার্ভ করে রাখা হত, আসতেন তিনি কমই, যতদিন ধরে প্লে হত তার মাঝে দুবারের বেশি নয়, কিন্তু প্রতিবারেই দুশো রুবল করে তিনি আমাদের পাঠিয়ে দিতেন। মোট কথা, থিয়েটার মন্দ চলছিল না আমাদের, ছোট ছোট পার্ট যারা করত তাদের কোন মাইনে দেওয়া হত না, এ কথা ঠিক, কিন্তু এ হচ্ছে ভালেরিয়ানোভের চালাকি ঃ গাড়োয়ান যেমন তার ক্ষুধার্ত ঘোড়াকে দ্রুত ছুটাবার জন্যে তার মুখের সামনে এক গোছা করে খড় ঝুলিয়ে দেয়, তিনিও এই লোকগুলির ব্যাপারে ঠিক তাই করতেন।

১২

একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। কেন জানি না, সেদিন কোন অভিনয় হচ্ছিল না। বিশ্রী আবহাওয়া। রাত্রি দশটার সময়ই আমি আমার সোফায় শুয়ে পড়ে কাঠের ছাদে বৃষ্টির পটর পটর শব্দ শুনছিলাম। হঠাৎ সিনগুলির পিছনে

একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ হল, তখনই আবার কার পায়ের শব্দ এবং হুড়মুড় করে কতকগুলি চেয়ার পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছোট্ট একটু মোমবাতির টুকরো ছিল, তাই জেবলে তখনই আমি ব্যাপার কি দেখতে গেলাম। দেখলাম, নেল্যুবোভ ওলগিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পাশের সিন আর দেয়ালের মাঝ-খানটার পথটায় অসহায়ের মত টলছে। আমাকে দেখে সে কিছুমাত্র ভয় পেল না, কিন্তু একটু বিস্মিত হল।

এ—এখানে তু—তুমি মরতে এসেছ কেন?

আমি সব ব্যাপার তাকে খুলে বললাম। হাত দুটো পকেটে রেখে সে দাঁড়িয়েছিল, আপাদমস্তক টলছিল তার। একবার সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই দু-এক পা এগিয়ে সে সামলে নিয়ে বললে, তু—তুমি আমার ওখানে আ—আস না কেন?

আপনার সঙ্গে ভাল করে জানাশোনা নেই।

দুত্তোরি তোর জানাশোনা, এস আমার সঙ্গে।

সে আমার হাত ধরে তার বাসায় নিয়ে গেল। সেই থেকে যতদিন আমি এই থিয়েটারে কাজ করেছি, তার শেষ দিন পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে তার ছোট্ট ঘরটায় থেকেছি। ঘরটা সে এক অবসরপ্রাপ্ত ইস্‌প্রাভনিকের* কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল। সে মাতাল, ঝগড়াটে এবং দলের সকল লোকের ঘৃণার পাত্র হলেও সঙ্গী হিসাবে দেখলাম তার তুলনা হয় না, যেমনি শান্ত তেমনি দরদে ভরা তার মন। কিন্তু দেখলাম তার হৃদয়ে এক দারুণ ব্যথা ঃ এক নারী নিষ্ঠুর আঘাতে তার হৃদয়ে এমন এক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে যা আর কোনদিন সারবার নয়। তার এই নিরাশ প্রেমের কাহিনীর সবটুকু তার কাছ থেকে আর কিছুতেই বের করতে পারিনি আমি। মাতাল হলে সে তার মোটা ঝুড়ির ভিতর থেকে একটি স্ত্রীলোকের ছবি বের করত, স্ত্রীলোকটি তেমন সুন্দরীও নয়, আবার তেমন কুৎসিতও নয়, হয়ত বা একটু টেরা, নাকের ডগাটা একটু উঁচু, যাই হোক, সব কিছু মিলিয়ে একটি গ্রাম্য মেয়ের চেহারা। নেল্যুবোভ ছবিটা বের করে একবার সেটায় চুমু দিত, পরক্ষণেই সেটা আবার মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিত, একবার বুকে চেপে ধরত, পরক্ষণেই তাতে থুথু দিত, এই সেটা ঘরের কোণে দেবমূর্তির সামনে রাখলে, পরক্ষণেই তাতে মোমবাতির চর্বি ঢেলে দিলে। এদের কে কাকে ত্যাগ করেছে, ঠিক বুঝতে পারতাম না আমি, মাঝে মাঝে মাতাল অবস্থায় ছেলে-পেলের কথাও বলত, তারা যে কার ছেলেপেলে, তার না ওর, না অন্য কারো,—তা-ও বুঝতাম না আমি।

আমাদের দুজনের কারুরই টাকা-পয়সা ছিল না। ঐ স্ত্রীলোকটিকে পাঠানোর জন্য ও একবার ভ্যালেরিয়ানোভের কাছ থেকে মোটা টাকা কর্জ

* ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অফিসার।

করেছিল, তারপর থেকে ও একেবারে বাঁধা পড়ে গেছে এই দলের কাছে, একেবারে ক্রীতদাসের অবস্থা,—বড্ড ভাল মানুষ তাই পালাতেও পারছে না। মাঝে মাঝে স্থানীয় এক সাইনবোর্ড পেণ্টারের কিছু কিছু কাজ করে দিয়ে ও দুই এক কোপেক রোজগার করত, কথাটা দলের লোকের কাছে ও গোপন রেখেছিল। শুনলে লারা-লারস্কী শিল্পের এ অমর্যাদা কিছুতেই বরদাস্ত করতেন না।

আমাদের বাড়িওয়ালা লোকটি বড় ভাল, বড় ভাল স্বভাব তাঁর। চেহারা তাঁর একটু মোটাসোটা, লালচে গাল, থুতনিটা দু ভাগ করা, যেন দুটো থুতনি। প্রত্যেক দিন সকালে বিকালে তাঁর বাড়ির লোকজনের চা খাওয়া হয়ে গেলে তিনি তাঁর স্যামোভারটা নতুন করে ভর্তি করে তার সঙ্গে টি-পট্, চায়ের পাতা আর আমরা যতটা রুটি দুজনে খেতে পারি ততটা কালো রুটি দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন আমাদের কাছে। এ সব খেয়ে দুবেলাই আমাদের পেট ভর্তি থাকত।

বিকেলে একটু ঘুমিয়ে নেবার পর এই অবসরপ্রাপ্ত ইস্‌প্রাভনিক্ ড্রেসিং-গাউন পরে পাইপ মুখে বসতেন তাঁর বাড়ির সিঁড়ির উপর। থিয়েটারে যাবার আগে আমরাও তাঁর পাশে কিছুক্ষণ বসে যেতাম। আলোচনা হত আমাদের শুধু একটি বিষয় নিয়েঃ তাঁর চাকরি-জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা, তাঁর উপর-ওলাদের কাছ থেকে কি সব দুর্ব্যবহার পেয়েছেন তিনি, তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে কি রকম সব জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে—এই সব। তিনি প্রায়ই আমাদের পরামর্শ চাইতেন, কি করে জাতীয় সংবাদপত্রে এমন চিঠি লেখা যায়, যাতে তাঁর নির্দোষিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান ইস্‌প্রাভনিক ও তাঁর সর্ব-দুর্ভাগ্যের মূল দু নম্বর জেলার ভারপ্রাপ্ত পাজি গোমস্তা সমেত গভর্ণর ও ডেপুটীগভর্ণরকে গদীচ্যুত করা যায়। আমরা আমাদের সাধ্যমত তাঁকে পরামর্শ দিতাম বটে, কিন্তু তিনি তা শুনে কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন, আর মুখ কুঁচকে মাথা নাড়তে থাকতেন।

তিনি একগুঁয়ের মত বলতেন, না, না, এ চাই না আমি, এতে আমার চলবে না। কলমে খুব জোর আছে এমন একটা লোক পেতাম, কি নিজে আমি কলম ধরতে জানতাম, তা হলে আমি একবার দেখিয়ে দিতাম, কিছুতেই ছাড়তাম না আমি।

লোকটার কিন্তু বেশ টাকা-পয়সা ছিল। একবার কি কারণে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি তিনি কারবারের লভ্যাংশের রসিদ বই থেকে কুপন ছিঁড়ছেন; আমাকে দেখে যেন একটু হকচকিয়ে গেলেন, তখনই উঠে তিনি কুপনগুলি তাঁর পিছন দিকে ড্রেসিংগাউনের আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন। তিনি যে তাঁর উপরওলার উপর টেক্কা দিয়ে ঘুষ, জবরদস্তি এবং আরও নানা অসদুপায়ে বহু টাকা লুটেছেন সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাত্রে অভিনয় শেষ হয়ে গেলে নেল্যুবোভ আর আমি অনেক সময় বাগানে পায়চারি করতাম। সবুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সাদা টেবিল পাতা,

ঘণ্টাকৃতি কাঁচের ভিতর নিষ্কম্প মোমবাতির আলো জ্বলছে দেখলেই ইচ্ছা করে গিয়ে খেতে বসি। নরনারী সব পরস্পরের দিকে মন কেড়ে নেয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে এমনভাবে চাইছে ও মাথা নোয়াচ্ছে যেন কোন উৎসব লেগেছে। মেয়েদের হালকা পায়ের নীচে বালি কচমচ করতে থাকত।

নেল্যুবোভ অনেক সময় ধূর্তের মত আমার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে ভাঙা গলায় বলত, আমাদেরও এক মগ পেলে মন্দ হত না, কি বল?

প্রথম প্রথম বড় বিশ্রী লাগত ওর এ সব কথা শুনে। কারণ পার্কের অভিনেতাদের ঐ যে ডাকলেই ভদ্রবেশে গিয়ে অপরের অন্ন ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি, ঐ যে কুকুরের ন্যায় আনুগত্য আর ছলছল চোখে ক্ষুধাতুর চাউনি, খাবার টেবিলে বসে ঐ যে থিয়েটারী ঢঙে কথা, ভোজন ব্যাপারে ঐ যে সবজান্তা ভাব আর ব্যগ্রতা, পরিবেষক ভৃত্যের সঙ্গে ঐ যে অন্তরঙ্গতা এ আমি চিরকাল ঘৃণা করে এসেছি। কিন্তু নেল্যুবোভের সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হবার পর বুঝলাম, এ সব তার অন্তরের কথা নয়। সে একটু খামখেয়ালি হলেও আত্মসম্মানবোধ এবং রুচিবোধ তার অতি প্রবল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এমন এক ব্যাপার ঘটে গেল আমাদের জীবনে যা কিছুটা লজ্জার হলেও বেশ খানিকটা মজার বটে ঃ মগের জন্য আর হা-পিত্যেশ করতে হল না, মগ নিজেই এগিয়ে এল আমাদের মুখের কাছে। ব্যাপারটা কি করে ঘটল তাই বলছি ঃ

একদিন সন্ধ্যায় অভিনয়ের পর ড্রেসিং-রুম থেকে সকলের শেষে বেরুলাম আমরা দুজন, সবে বেরিয়েছি আমরা এমন সময় হঠাৎ সিনের পেছনকার কোন জায়গা থেকে এ্যাল্টস্‌শীলার নামে এক তরুণ ভদ্রলোক ছুটে বেরিয়ে এসে পড়লেন আমাদের সামনে। ওখানকার এক রথচাইল্ড তিনি, বয়সে তরুণ হলেও এর মধ্যেই বেশ মোটা হয়ে পড়েছেন। ইহুদী তিনি। মুখে গোলাপী আভা আর লাম্পট্যের ছোপ, চলন-চালনে জড়তার বালাই নেই, অনেকগুলি আংটি, হার আর কুণ্ডল পরে দেহ যেন তাঁর ঝকমক করছে। আমাদের দেখেই ছুটে এলেন তিনি।

বাপ রে! আধ ঘণ্টা ধরে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে আমি একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছি। ভলকোভা বা বোগুচারস্কায়াকে দেখেছেন আপনারা কেউ, কোথায় ওরা বলতে পারেন?

অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছি ঐ দুজন অভিনেত্রী অশ্বারোহী সৈন্যদলের কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে করে কোথায় গেল. এ্যাল্টস্‌শীলারকে বেশ বিনয়ের সঙ্গেই জানালাম আমরা সে কথা। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুহাতে মাথা ধরে মঞ্চের ওখানে ছুটে বেড়াতে লাগলেন।

কি ছোটলোক, দেখেছেন? আমি তাদের জন্য এদিকে 'সাপারে'র অর্ডার দিয়েছি। সত্যি বলছি, এ আর আমার বরদাস্ত হয় না। কথা দিয়েছিল ওরা,

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর দেখুন শেষে কি করলে!

আমরা কোন উত্তর দিলাম না।

স্টেজের কাছে আরও কয়েকটা চক্কর দিলেন তিনি, তারপর থেমে টলতে টলতে মাথার দুপাশ আঁচড়াতে লাগলেন; চিন্তিতভাবে ঠোঁট চাটতে চাটতে হঠাৎ তিনি দৃঢ়সংকল্প হয়ে বলে বসলেন, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাদের দুজনকে আমার সঙ্গে নৈশভোজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, বিশেষ অনুরোধ আমার।

আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম।

কিন্তু বৃথা আমাদের প্রত্যাখ্যান, তিনি একেবারে জোঁকের মত লেগে রইলেন। একবার আমার কাছে, একবার ওর কাছে ছুটে যান, আমাদের হাত ধরে টানেন, মিনতিভরা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, এবং উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে থাকেন যে, তিনি শিল্পের অনুরাগী ভক্ত। প্রথমে নেল্যুবোভের মন গলল:

যাক গিয়ে, চল যাওয়া যাক, না-যাওয়ার কোন মানে হয় না।

শিল্পের অনুরাগী ভক্তটি আমাদের প্রধান মণ্ডপে নিয়ে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে সব ঠিক করতে লাগলেন। সবচেয়ে ভাল জায়গাটা বেছে নিয়ে তিনি আমাদের সেইখানে বসালেন, তারপর পরিবেষক ভৃত্যকে ডাকবার জন্য বারবার লাফিয়ে উঠে হাত নাড়তে লাগলেন। এক গ্লাস দোপেল্‌তকুমেল খাবার পর দেখা গেল তিনি এক দারুণ লম্পট, একটু বেশি করে ফিটফাট দেখানর জন্যে তাঁর বোলার হ্যাটটা তিনি ঠিক খাড়া করে পরে নিলেন।

আচার? রুশীয় ভাষায় কি বলেন আপনারা একে? আচার ছাড়া কোন খাবারই গলা দিয়ে নামে না, ঠিক? একটু ভদকা খেলে কেমন হয়? খান, মশায়, খান, আমি মিনতি করছি আপনাদের, আপনারা এ সব কিছু খান। একটু বোইফ্‌ স্ট্রোগানোফ খেয়ে দেখবেন ত? এখানকার রান্না বড় ভাল, মশায়। আরে, এই ওয়েটার!

মস্ত বড় এক খণ্ড মাংস খেয়েই আমার মদের মত নেশা ধরে গিয়েছিল। দুই চোখ বুজে আসছিল আমার। বারান্দায় যে আলো জ্বলছে, সিগারেটের নীল ধোঁয়া উঠছে, কলরব উঠছে, এ সব কিছু যেন আমার চেতনা থেকে সরে সরে যাচ্ছে এবং তারই মধ্যে স্বপ্নে শোনার মত কানে আসছে, আঃ লজ্জা করবেন না মশায়, লজ্জা করবেন না,—আরও কিছু খান। শিল্পের প্রতি প্রবল অনুরাগ যদি আমার থাকেই, ত আমি রুখবো কি করে?

চরম মুহূর্ত ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল। খাবারের মধ্যে ঐ কালো রুটি আর চা, শুধু ঐ খেয়ে খেয়ে মেজাজ সব সময় তিরিক্ষে হয়েই থাকত, মেজাজ ঠাণ্ডা করতে মধ্যে মধ্যে পার্কের এক কোণে ছুটে যেতাম। জামা কাপড় যা ছিল, সব বেচে শেষ করে দিয়েছিলাম।

এদিকে সামুইলেঙ্কো সব সময় আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে চলছেন। কোন ছাত্র হীনবল হলে বোর্ডিংস্কুলের মাস্টার তাকে কেমন ঘৃণা করে চলেন, এ কথা সবারই জানা, ঘৃণার কারণ হয়ত ছাত্রের মুখটা ফ্যাকাশে, কানটা লম্বা কিংবা কাঁধটা মধ্যে মধ্যে সে একটু ঝাঁকি দিয়ে চলে। সামুইলেঙ্কো আমাকেও ঠিক ঐ চক্ষে দেখেন। এর মধ্যেই তিনি আমাকে একে একে পনের রুবল জরিমানা করে বসেছেন। রিহার্সেলের সময় তিনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেন, খুব কমিয়ে বললেও বলতে হয় তা বন্দীর প্রতি গভর্ণরের ব্যবহারের মত। মাঝে মাঝে তাঁর রূঢ় মন্তব্য শুনে আমি যখন চোখ নত করতাম তখন চোখের সামনে যেন আগুনের চাকা দেখতাম। ভালেরিয়ানোভ আমার সঙ্গে আর কথা বলতেন না, আমাকে দেখলেই তাড়াতাড়ি উটপাখির মত লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে পড়তেন। ছয় হপ্তার মত কাজ হয়ে গেল আমার এখানে, কিন্তু এ পর্যন্ত পেয়েছি মাত্র এক রুবল।

একদিন সকালে মাথাধরা নিয়েই ঘুম থেকে উঠলাম, মুখে কি রকম এক ধাতব স্বাদ, মেজাজ তিরিক্ষে। সেই অবস্থাতেই রিহার্সেলে গেলাম।

সেদিন কি বইয়ের রিহার্সেল হচ্ছিল মনে নেই আমার, শুধু এইটুকু মনে আছে হাতে আমার একখানা গোলপাকানো খাতা ছিল। পার্টটা আমি অন্যান্য দিনের মত মুখস্থ করেই রেখেছিলাম। ভাগ্যচক্রে আমার পার্টের ভিতর এক জায়গায় ছিল, 'এই আমার প্রাপ্য।'

মহড়ার সময় যথাসময়ে আমি বললাম, 'এই আমার প্রাপ্য।' সঙ্গে সঙ্গে সামুইলেঙ্কো আমার কাছে ছুটে এসে ধমকে উঠলেন,—এই কি রুশ ভাষা হল না কি? এমন রুশ ভাষা কে বলে শুনি? 'এই আমার প্রাপ্য,' বটে! বলতে হবে এই আমার পক্ষে প্রাপ্য। মূর্খ কোথাকার!

বিবর্ণ মুখে আমার খাতাখানা তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরলাম ঃ এতে কি লেখা আছে দেখুন!

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি ঃ রেখে দাও তোমার খাতা, আমি যা বলব, তাই তোমার খাতা, পছন্দ না হয়, যেখানে খুশি যাও মর গিয়ে!

সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর মুখের দিকে এমন করে তাকালাম যে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন; ভয়ে মুখখানা তাঁর একেবারে আমারই মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তখনই দু পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তখন আর তাতে কি লাভ হবে, প্রচণ্ড বেগে তাঁর উপর পড়ে মোক্ষম জোরে তাঁর বাঁ গালে মারলাম এক চড়, তারপর ডান গালে, তারপর আবার বাঁ গালে, আবার ডান গালে, এমনি চলতে থাকল। বাধা দিলেন না তিনি একটু, আঘাত এড়াতে মুখ সরিয়েও নিলেন না, প্রত্যেক আঘাতের পর মাথাটা তার শুধু ডাইনে বাঁয়ে একটু একটু সরে যেতে লাগল, দেখে মনে হতে লাগল কোন এক ভাঁড় যেন বিস্ময়ের ভান করে মাথা নাড়ছে। শেষে খাতাখানা তাঁর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বাইরে পার্কে বেরিয়ে পড়লাম। কেউই আমাকে বাধা দিল না।

তারপর এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল আমার জীবনে। পার্কে গিয়ে প্রথমেই যার সঙ্গে দেখা হল আমার, সে হচ্ছে ভল্গা-কামা ব্যাঙ্কের এক পিওন, আমি লিওন্তিভিচ্ কি না জেনে নিয়ে সে পাঁচশো রুবলের এক নির্দেশনামা আমার হাতে দিল।

এর এক ঘণ্টা পরে নেল্যুবোভকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমি পার্কে ফিরে এলাম, এসে প্রচুর ভাল ভাল খাবারের অর্ডার দিলাম এবং আরও দু ঘণ্টা পরে থিয়েটারের দলের সবাই এসে আমার পয়সায় ঢক্ ঢক্ করে শ্যাম্পেন গিলতে গিলতে আমায় অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। কি করে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরাধিকারসূত্রে ষাটহাজার রুবলের মালিক হয়েছি আমি। কথাটা অবশ্য আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি, বেরিয়েছে নেব্যুলেভের মুখ দিয়ে, কিন্তু এতে কিছু প্রতিবাদও করিনি। পরে ভালেরিয়ানোভ যখনই আমায় শপথ করে বললেন যে, তাঁর কোম্পানী একেবারে উঠে যাবার যোগাড়, তখনই আমি তাঁকে একশো রুবল দিয়ে দিলাম।

বিকেলে পাঁচটার সময় আমি ট্রেন ধরতে চললাম। পকেটে তখন আমার মস্কোর একখানা টিকিট ছাড়া আর সত্তর রুবলের বেশি নেই, কিন্তু মনে মনে তখন আমি সীজার। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বার পর যখন আমি আমার কামরায় উঠতে যাচ্ছি তখন সামুইলেঙ্কো এগিয়ে এলেন আমার কাছে, এর আগে পর্যন্ত তিনি আমার কাছ থেকে দূরে দূরে ছিলেন।

কাছে এসে তিনি থিয়েটারি ভঙ্গিতে বললেন, মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি বলে মাপ চাইছি।

বলবার সময় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি, তাঁর প্রসারিত কর ধারণ করে তাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমি অমায়িকভাবে বললাম, ঐ রকম অন্যায় তো আমিও করে ফেলেছি, আপনিও ক্ষমা করবেন।

আমার বিদায় অভিনন্দনে ওঁরা সবাই তিনবার হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে নেলন্যবোভের সঙ্গে শেষ দৃষ্টি বিনিময় হল আমার। ট্রেন চলতে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চিরকালের মত সরে সরে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে জ্যারেচ্যের সর্ব শেষ কুটীরগুলির সবুজ চিহ্নও অন্তর্হিত হয়ে গেল ও তার স্থলে দেখা দিল রৌদ্র-দগ্ধ পীতবর্ণ নিরানন্দ স্তেপ, তখন কেন জানি না হৃদয় আমার এক অদ্ভুত বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। যেখানে দুঃখ. উদ্বেগ. ক্ষুধা আর অপমান ছাড়া আর কিছু পাইনি—সেইখানেই হয়ত হৃদয়ের কিছুটা অংশ আমার চিরকালের জন্য রয়ে গেল।

১৯০৬

গ্যাম্‌ব্রিনাস

দক্ষিণ রুশিয়ার একটা কোলাহলমুখর বন্দরের এক শুঁড়িখানার নাম হচ্ছে গ্যাম্‌ব্রিনাস। দোকানটা যে জায়গায় সেখানকার রাস্তার দুধারেই সব সময় লোকের ভিড়, তবু এটা খুঁজে বের করা কঠিন, কারণ এটা মাটির নিচে। গ্যাম্‌ব্রিনাসে রোজ যাওয়া যার অভ্যাস সে-ও অনেক সময় এটা ছাড়িয়ে দুতিনটা দোকান পার হয়ে যায়, ভুল ধরা পড়লে শেষে আবার ফিরে আসে।

উপরে এর কোন সাইনবোর্ডও নেই। ফুটপাথের ওখানেই ছোট্ট একটা দরজা আছে, খরিদ্দারেরা তারই ভিতর দিয়ে নিচে নেমে যায়। দরজাটা সব সময় খোলাই থাকে। নিচেই তার ছোট ছোট বিশখানা পাথরের সিঁড়ি, বহু লোকের ভারি পায়ের ঘা খেয়ে খেয়ে সেগুলি বেঁকেচুরে ক্ষয়ে গেছে। শেষ সিঁড়ির সামনের দেয়ালে রয়েছে শুঁড়িদের পৃষ্ঠপোষক গ্যাম্‌ব্রিনাসের দশফুট লম্বা উদ্গত সম্মুখার্ধ [illegible] মূর্তি চিত্রিত। দেখে মনে হয় মূর্তিটা প্রস্তরীভূত বিরাট এক-খণ্ড স্পঞ্জ খোদাই করে গড়া হয়েছে, আর এটা নিশ্চয়ই কোন অপেশাদার ভাস্করের প্রথম সৃষ্টি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির ঐ লাল আঁট জামা, আরমিন-লোমের ঐ ঢিলে অঙ্গরাখা, সোনালি মুকুট, আর ঐ ঊর্ধ্বে উত্তোলিত ফেনশীর্ষ বৃহৎ পানপাত্র দেখে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে সুরা-প্রস্তুকারকদের মহা পৃষ্ঠপোষক এখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

দুটো বেশ লম্বা লম্বা ঘর আছে এখানে, কিন্তু বড় নিচু, দুটোরই উপরে খিলান করা ছাদ। ঘরে জানলা নেই বলে দিনরাত্রিই এখানে গ্যাসের আলো জ্বলে, পাতালের আর্দ্রবাষ্প বিন্দু বিন্দু জল হয়ে পাথরের দেয়াল বেয়ে চুঁইয়ে পড়ে, গ্যাসের আলোতে চিক্‌চিক্ করে সেগুলো। অদ্ভুত সব প্রাচীরচিত্রের নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে এখানে। একখানা ছবিতে ছিল সবুজ রঙের শিকারীর জামা পরা জার্মান তরুণের দল, মাথায় তাদের ফেজাণ্ট-পালক লাগানো টুপি, কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে তারা ঘটা করে মদ খাচ্ছে। হলঘরের দিকে তাকালেই দেখবেন তারা তাদের বৃহৎ পানপাত্র উঁচুতে তুলে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, ওদের দুজন আবার মোটাসোটা গ্রাম্য দুটি মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরেছে, মেয়ে দুটি হয়ত গ্রামের সরাইখানার দুটি পরিবেশিকা অথবা সুদর্শন কোন কৃষকের কন্যা। আর একটা ছবি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কোন উচ্চাঙ্গ বনভোজনের। সবুজ মাঠে পাউডার দেওয়া পরচুলো-পরা ভাইকাউন্ট

আর কাউণ্টেস পত্নীরা মেষশাবক নিয়ে খেলা করছেন, কাছেই বিস্তৃত শাখা উইলো ঝোপের নিচে এক পুকুর, ভদ্রমহিলারা সেই পুকুরে সোনালি রঙের এক অদ্ভুত ভেলায় চড়ে রাজহংসদের খাওয়াচ্ছেন। পরের ছবিটা উক্রেইনের একটা কুটীরের অভ্যন্তর, হৃষ্টচিত্ত গ্রাম্যলোকেরা সেখানে 'হরিলকা'র বোতল হাতে করে 'হোপাক'-নাচ নাচছে। আর একটু দূরে ঝক্ঝকে চক্চকে মস্ত বড় একটা মদের পিপের ছবি, পিপের উপর বসে আছে দুটি নাদুসনুদুস কিউপিড্, মোটা মোটা ঠোঁট তাদের, মুখ দিয়ে যেন রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে, দ্রাক্ষা আর 'হপ' পাতায় সেজেছে তারা, তা ছাড়া শূন্যপ্রায় পানপাত্রে ঠোকাঠুকি করতে করতে অত্যুজ্জ্বল চোখে তারা নির্লজ্জের মত চেয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় হলটাকে একটা খিলান দিয়ে প্রথমটা থেকে তফাৎ করা হয়েছে। এ ঘরের দেয়ালে রয়েছে ভেক-জীবনের কতকগুলি ছবিঃ ব্যাঙেরা একটা সবুজ জলার ভিতরে বিয়ার খাচ্ছে, ঝোপের ভিতরে কতকগুলি গঙ্গাফড়িঙকে তাড়া করছে; একটা তারের যন্ত্রে চৌতাল বাজাচ্ছে, অসিক্রীড়া করছে, ইত্যাদি। দেখলেই বুঝা যায় এ ছবি কোন বিদেশী চিত্রকরের আঁকা।

মেঝেতে টেবিল নেই, তার জায়গায় রয়েছে বড়বড় সব ওক কাঠের পিপে, তার উপর ঘন করে করাতের গুঁড়ো ছড়ানো, এতেই টেবিলের কাজ চলে যায়। চেয়ারের কাজ চালানর জন্য ওগুলিরই পাশে পাশে বসান রয়েছে সব ছোট ছোট মদের পিপে। এখানে ঢুকতে গেলেই ডাইনে পড়ে একটা নিচু মঞ্চ, তার উপর রয়েছে একটা পিয়ানো। সাশ্কা নামে এক নিরীহ ইহুদী, মাথা জোড়া তার টাক, বয়স কত তার কেউ বলতে পারে না, নোংরা বানরের মত তার চেহারা, মদ খেয়ে সব সময়ই তার দিল খুশি, ক্রেতাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সে-ই ঐ মঞ্চে দাঁড়িয়ে রোজ সন্ধ্যায় বেহালা বাজায়। কাল-চক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার আস্তিনওয়ালা পরিবেশকদের দল পালটে গেছে, খাদ্য পানীয় সরবরাহ-কারীর দল পালটে গেছে, এমন কি শুঁড়িখানার মালিকরাও সব পালটে গেছে, কিন্তু সাশ্কা কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা ছটার সময় এখনও ঠিক ঐ মঞ্চে এসে বসে, হাতে নেয় বেহালা, একটা সাদা কুকুর থাকে তার জানু আঁকড়ে, রাত্রি একটা বাজলে তখন সে মদে চুর হয়ে তার কুকুর 'স্নো-ড্রপ'কে সঙ্গে নিয়ে গ্যাম্ব্রিনাস ছেড়ে বাড়ি যায়।

আর একজন লোকও এখনও রয়ে গেছে এখানে, সে হচ্ছে মাদাম্ ইভানোভা, মদ বিক্রয়ের উঁচু টেবিল থেকে নির্দেশ দেয় সে পরিবেশক ভৃত্যদের। ইভানোভা বুড়ী হয়ে গেছে, গায়ে তার একেবারে রক্ত নেই, সারাদিন মাটির তলার এই স্যাঁতসেতে ঘরে থেকে থেকে দেখতে হয়েছে সে গভীর সমুদ্রের কোন গুহায় থাকা অলস মাছের মত সাদা। নাবিক যেমন তার মঞ্চে দাঁড়িয়ে হুকুম দেয়, ইভানোভা তেমনি তার উঁচু টেবিল থেকে পরিবেশক ভৃত্যদের নীরবে নির্দেশ দিতে থাকে, মুখে তার সিগারেট লেগেই আছে, সিগারেটটা মুখের ডান কোণে

ধরে ধোঁয়া লাগার ভয়ে ডান চোখটা বুজিয়ে রাখে সে। ইভানোভা কথা এক রকম বলে না বললেই হয়, কেউ মাথা নুয়ে তাকে নমস্কার জানালে সে শুধু ম্লান হাসি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দেয়।

২

পৃথিবীতে যত নামকরা বড় বন্দর আছে, তাদেরই একটি হচ্ছে এ বন্দর: সব সময় জাহাজে জাহাজে ঠাসা। মরচে-পড়া কালো বিরাটকায় দুর্ভেদ্য রণতরী এখানে এসে ভেড়ে। সুদূর প্রাচ্যগামী দোব্রেগভলনী লাইনের পুরু চোঙয়ালা স্টীমারগুলি এখান থেকে গাড়ি ভর্তি ভর্তি মাল আর হাজার হাজার দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামী নিয়ে যায়। বসন্ত আর শরৎকালে পৃথিবীর সর্বদেশের শত শত পতাকা ফরফর করে উড়তে থাকে এখানে, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কত রকম ভাষায়ই যে হুকুম আর হলপ চলে তার লেখাজোখা নেই। ডক শ্রমিকেরা অসংখ্য গুদাম ঘর থেকে মাল নিয়ে পাশাপাশি সাজানো কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে জাহাজে যায় আর আসে, তাদের পদভরে দুলতে থাকে সে পাটাতন। শ্রমিকদের ভিতরে অনেক দেশের অনেক ধরনের লোক আছে,—আছে ছিন্নবাস নগ্নপ্রায় রুশীয় ভবঘুরের দল, অনবরত ভদকা খেয়ে খেয়ে মুখগুলি তাদের ফুলো ফুলো; আছে নোংরা পাগড়ী-পরা কালো কালো সব তুর্কী, তাদের পরনের পাজামাগুলি উপরে ঢিলে, নিচে আঁটসাট, আছে পেশীবহুল, মোটা-সোটা পারসিক, চুল নখ তাদের হেনা দিয়ে গাজরের মত রঙ করা। মাঝে মাঝে দুই বা তিন মাস্তুলওয়ালা ইতালীয় অনেক জাহাজও আসে এখানে, তরুণী বক্ষের মত বর্তুল অমল ধবল পাল খাটিয়ে যখন তারা আসে, দূর থেকে দেখতে তা বড় সুন্দর লাগে। লাইট হাউসের আশেপাশে যখন তারা এসে যায়, বিশেষ করে সে সময়টা যদি বসন্তের কোন নির্মল প্রভাত হয়, তা হলে তখন তাদের দেখে মনে হয় ওগুলি যেন কতকগুলি মধুর স্বপ্ন, ভাসছে জলে নয়,—চক্রবাল রেখার উপরকার আকাশে। কখনও কখনও উচ্চশীর্ষ আনাতোলীয় 'কাচির মাস' আর তিন স্তরে ত্রিভুজের মত পাল তোলা নক্সা-করা, কিম্ভুতকিমাকার গহনা-পরা "ফেলুক্কা" এসে রাজ্যের যত আবর্জনা, ডিমের খোলা, তরমুজের খোসা, আর সাদা 'সী-গালে' ভর্তি এই বন্দরের নোংরা সবুজ জলে মাসের পর মাস দোল খায়। মধ্যে মধ্যে ভাড়া করা কালো পাল খাটিয়ে অদ্ভুত সরু জাহাজ ছুটে আসে এখানে, মাথায় এর নোংরা এক ফালি কাপড় নিশানের মত করে বাঁধা থাকে;

জেটির গা ছুঁয়ে কাত হতে হতে দ্রুতবেগে এগুলি বন্দরের ভেতর ঢুকে যায়, আশেপাশের আর সবাই গালাগালি দেয়, ভয় দেখায়, সে সব গ্রাহ্য না করেই এরা জেটির মত একটা জায়গায় এসে ভেড়ে, সম্পূর্ণ অনাবৃত-দেহ ছোট ছোট ব্রোঞ্জমূর্তির মত চেহারার নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে কি সব তড়বড় করে বলতে বলতে অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জাহাজের পাল গুটিয়ে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে এই নোংরা অদ্ভুত জাহাজটা এমন শান্ত হয়ে যায় যে, তখন দেখে মনে হয় যেন মৃত কিছু একটা। আবার কোন দিন রাত্রির অন্ধকারে আলো না জ্বালিয়েই এমনি অকস্মাৎ সে বন্দর থেকে পালিয়ে যায়। রাত্রে এখানে চোরাইকারবারীদের হালকা নৌকার ভিড় লেগে যায়। জেলেরা আনে দূর থেকে বা কাছ থেকে ধরা মাছ ঃ বসন্তে তারা আনে ক্ষুদে ক্ষুদে সব এ্যানকোভি, এ মাছ বহু লক্ষ হলে তবে নৌকা ভরে, গ্রীষ্মে আনে কদাকার প্লাইস্, শরতে আনে ম্যাকরেল, মোটা-সোটা ধূসর মুলেট আর ঝিনুক, আর শীতে আনে স্টার্জন, এক একটা স্টার্জনের ওজন প্রায় তিন থেকে ছয় হন্দরের মত, তীর থেকে বহু দূরে গিয়ে জীবন বিপন্ন করে এদের ধরতে হয়।

বিভিন্ন দেশের এই সব নাবিক, জেলে, আগুনে কয়লা দেবার লোক, জাহাজের বাচ্চা চাকর, বন্দরের চোর, ইঞ্জিনীয়ার, মজুর, ডকমজুর, মাঝি, ডুবুরি, চোরাই কারবারী এরা সবাই জোয়ান, সমুদ্রের জল আর মাছের স্বাদ জানে এরা, কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করতে ভয় পায় না, বরং জীবন বিপন্ন করে কাজ করতেই এরা ভালবাসে, আনন্দ পায়, এদের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে শক্তি, ক্ষমতা, আর কড়া কথার কামড়; ডাঙায় থাকবার সময় পরমানন্দে এরা বর্বরের মত হৈ-হল্লা করে, মদ খায় আর মারামারি করে। সন্ধ্যার পর বন্দর থেকে শুরু করে উঁচু পাহাড় অবধি সমস্ত শহরটায় যেমন আলোগুলি জ্বলে ওঠে তখন সেগুলি ঐন্দ্রজালিকের উজ্জ্বল চক্ষুর মত যেন তাদের আকর্ষণ করতে থাকে, যেন বলতে থাকে এস, আমার কাছে এস, জীবনের অনাস্বাদিত অভিনব আনন্দ-রস পান করাব তোমাদের। কিন্তু দেয় না কিছুই, প্রতিবারেই তাদের প্রতারিত করে।

বন্দর আর শহর—দুয়ের মাঝখানে পড়ে কতকগুলি সরু খাড়া বদ্‌খদ্‌ রাস্তা, শহরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের লোকজন রাত্রে এ রাস্তায় চলতে ভয় পান। এর প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে নোংরা জাফরির জানলাওয়ালা ঘর, ভিতরে একটিমাত্র আলো টিম টিম করে জ্বলে, যারা অল্প পয়সায় রাত্রের শোবার জায়গা খোঁজে তারা এখানে রাত্রি কাটায়। যে সব দোকানে ব্যবহৃত জামা-কাপড়, এমন কি নাবিকের একমাত্র পোশাক পর্যন্ত বিক্রি করা যায় এবং সমুদ্রে ব্যবহারযোগ্য পোশাক কিনতে পাওয়া যায় সে রকম দোকানের সংখ্যা এখানে অনেক বেশি। শুঁড়িখানা, সরাই, হোটেল ইত্যাদিও অনেক আছে, বাইরে নানা ভাষায় তাদের পরিচয় লেখা: এ ছাড়া পতিতালয় আছে, সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং বে-আইনী দুই-ই;

এবং সংখ্যাও তাদের নিতান্ত কম নয়; এখানে ঘর থেকে মেয়েরা মুখে আচ্ছা করে রঙ মেখে চাপাগলায় নাবিকদের ডাকতে থাকে। গ্রীক কফিখানায় খরিদ্দারেরা গিয়ে ডমিনো বা তাস খেলে, তুর্কী কফিখানায় পাঁচ কোপেক খরচ করলে লোকে শোবার জায়গা পায়, তা ছাড়া নারঘাইলের ধূমপানও করতে পারে। ছোট ছোট কয়েকটা প্রাচ্য সরাইখানাও এখানে আছে, সেখানে বিভিন্ন রকমের শামুক, কুচো চিংড়ি, ঝিনুক, বড় বড় আঁচিল বেরুনো ফাটল মাছ, এবং অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ খেতে পাওয়া যায়। এই রাস্তাতেই ভাল করে খড়খড়ি আঁটা কোন চিলেকোঠা বা মাটির নিচের ঘরে জুয়ার আড্ডা বসে, 'ফারো' বা 'ব্যাকারো' খেলার উপসংহার হয় প্রায়ই কারো মাথা ফাটিয়ে বা ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে। এরই কোন কোণে বা আনাচে-কানাচে হীরের কঙ্কন থেকে শুরু করে রুপোর ক্রুশ পর্যন্ত এবং লিওনিজ ভেলভেটের গাঁট থেকে নাবিকের গ্রেটকোট পর্যন্ত যে-কোন চোরাই মালই লুকিয়ে রাখা যায়।

কয়লাগুঁড়োয় কালো হয়ে যাওয়া সরু খাড়া এই রাস্তাগুলি রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে আঠা আঠা হয়ে ওঠে, আর তীব্র দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে এগুলি থেকে। এগুলি যেন মস্ত বড় আন্তর্জাতিক শহরের নালী বা ময়লা টানা নর্দমা; এর ভেতর দিয়ে অধিবাসীদের সুস্থ সবল দেহ এবং সরল মনের পক্ষে ক্ষতিকর যাবতীয় নোংরা, পচা আবর্জনা আর পাপ যেন সাগরের জলে চালান হয়ে যায়।

এই এলাকায় যারা হৈ-হুল্লোড় করে তারা আসল শহরে বড় যায় না, সেখানে সবই ছিমছাম, কাঁচের জানলা আঁটা সব দোকান, বড় বড় সব মনুমেণ্ট, বৈদ্যুতিক আলো, পাথর-বাঁধানো ফুটপাথ, রাস্তার ধারে ধারে সারিবাঁধা সব সাদা বাবলার গাছ, জমকালো পুলিশ, আরাম আর পরিচ্ছন্নতার যেন মূর্ত প্রতীক সব। কিন্তু তারা তাদের কষ্টার্জিত, নোংরা ছেঁড়া রুবল নোটগুলি নিঃশেষ করবার আগে গ্যাম্‌ব্রিনাসে একবার ঢুঁ মেরে যাবেই। রাত্রির অন্ধকারে এখানে একবার ঢুঁ-মারা ওদের সমাজে বহুকালের রেওয়াজ আর একদিক দিয়ে এটাই যেন শহরের প্রাণ-কেন্দ্র।

এখানে যারা আসে তাদের অনেকে কিন্তু বিয়ারের রাজা গ্যাম্ব্রিনাসের কঠিন নামটা উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারে না, তাই বন্দর ছেড়ে যাবার আগে তাদের কেউ হয়ত অপরকে বলে, এবার সাশ্‌কার ওখানে যাওয়া যাক, কি বলো?

উত্তর আসে, হাঁ, হাঁ, যাবই ত, যাবই ত, যেতে হবে বৈকি?

তখন সবাই সমবেত কণ্ঠে সুর করে বলে ওঠে, এবার নোঙর তোলার সময় হল—ও—ও।

বন্দরে আর সমুদ্রে যারা চলাফেরা করে, তারা সাশ্‌কাকে স্থানীয় গভর্নর এবং বিশপের চেয়েও বেশি সম্মান করে, মর্যাদা দেয়। এ কথা সত্যি যে, তার নামটা না হলেও তার তেজস্বী বানরের মত মুখ আর বেহালাখানার কথা কখনও কখনও সিডনী কি প্লাইমাউথ, নিউইয়র্ক, ব্লডিভস্টক কনস্টান্টিনোপল্‌

কি সিংহলের এক শ্রেণীর লোকের মনে পড়বেই, কৃষ্ণসাগরের আশেপাশের লোকের ত কথাই নেই, ওখানকার সাহসী জেলেদের অনেকেই সাশকার অনুরাগী ভক্ত।

৩

সাশকা সাধারণত সবার আগেই গ্যাম্‌ব্রিনাসে আসে, অবশ্য হঠাৎ দু-একটা খরিদ্দার কোন কারণে ওর আগেও এসে যেতে পারে। হল-ঘর দুটো তখন আগের দিনের বিয়ারের বাসি গন্ধে ভরা থাকে, তা ছাড়া কেমন আঁধার আঁধার, কারণ দিনের বেলায় গ্যাস জ্বালা হয় বড় কম। জুলাইয়ের গুমোট দিনে শহরের পাথরে-তৈরি ঘরবাড়ি-রাস্তায় লোকজন যখন গরমে ছটফট করে, হড়হড় ঘড়ঘড় চেঁচামেচিতে যখন তাদের কানে তালা লেগে যায়, তখন এখানটা বেশ ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ, বড় শান্তির।

সাশকা এখানে এসেই প্রথমে মদ বিক্রির বড় টেবিলটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মাদাম ইভানোভাকে নমস্কার করে এক মগ বিয়ার খেয়ে নেয়। ইভানোভা মধ্যে মধ্যে তাকে বলে, সাশকা, একটু কিছু বাজিয়ে শোনাও না আমায়!

সাশকা অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, কি শুনতে চাও তুমি, মাদাম ইভানোভা? মাদামের সঙ্গে ব্যবহারে সে সব সময়ই অতিমাত্রায় বিনীত, ভদ্র।

তোমার নিজের মনে যা আসে, তাই বাজাও।

সাশকা তখন পিয়ানোর বাঁয়ে তার নিজের জায়গাটায় গিয়ে বসে অদ্ভুত করুণ সব সুর বাজায়। পাতাল কক্ষে এক অলস নিস্তব্ধতা নেমে আসে, উপর থেকে ক্বচিৎ কখনও শহরের চাপা ঘড় ঘড় শব্দ আর পার্টিশানের ওধারের রান্না-ঘরের প্লেট গ্লাসের ঝনঝন ছাড়া আর কোন শব্দ এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। সাশকার বেহালা যেন কাঁদাতে থাকে, তা থেকে ঝরে পড়তে থাকে ইহুদীদের বেদনা, মানুষের আদিমতম বেদনা, সে বেদনার সুরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কণ্ঠ মিলিয়ে আছে যেন জাতীয় সংগীতের করুণ মধুর সুর। ঊষার অস্পষ্ট আলোকে মাথা নিচু করে চিবুক টান করে চিন্তাভারাক্রান্ত ভ্রূর নিচে থেকে শান্ত গম্ভীর চোখ দুটিকে ঊর্ধ্বে ন্যস্ত করে যে সাশকা বাজিয়ে যায় সে যেন গ্যাম্‌ব্রিনাসের খদ্দেরের দেখা সাশকা নয়, তারা যে সাশকাকে দেখে সে নেচে নেচে দাঁত বের করে মিটমিটি হাসে।

এই বাজনা বাজাবার সময় 'স্নো-ড্রপ' কুকুরটি সাশকার কোলের উপর

-বসে থাকে, সংগীতের সময় যে ঘেউ ঘেউ করতে হয় না তা সে বহুদিন হল শিখে নিয়েছে, তবু অভিশাপের সুরে বেহালার এই যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, এই যে গভীর বেদনার মূর্ছনা এতে বিচলিত না হয়ে পারে না সে ঃ বড় বড় হাই তুলে ছোট্ট গোলাপী জিভটা সে বার বার বাঁকা করে উল্টে দেয়, ছোট্ট কোমল দেহ আর কৃষ্ণচক্ষু মুখখানি তার বার বার কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মদ খাওয়া চরমে উঠলে পানকারীদের মুখ হয়ে ওঠে লাল, গা যায় ঘামে ভিজে, গলা দিয়ে কর্কশ স্বর বেরুতে থাকে। তামাকের ধোঁয়া চোখে এসে বিঁধতে থাকে। চারিদিকের হৈচৈ-য়ের মাঝে কেউ কিছু বলতে চাইলে তাকে টেবিলের উপর নুয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে হবে। কিন্তু সাশকা তার মঞ্চের উপর বসে ঐ যে বেহালা বাজায় তার সুর সব কিছু ছাড়িয়ে ওঠে, ঐ যে প্রাণান্তকর গরম, তামাক, গ্যাস আর বিয়ারের ঐ ভাপ, উচ্ছৃঙ্খল জনতার ঐ যে কলরব—সব কিছু ডুবিয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয় সাশকার বেহালার সুর।

মদ, স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য আর উত্তাপ—এই তিনে মাতাল হয়ে ক্রেতারা প্রত্যেকেই এক একটি নিজের প্রিয় সুর শুনতে চায় সাশকার কাছ থেকে। দুই তিনটি লোক বিষণ্ণ চোখে টলতে টলতে সাশকা-কে জড়িয়ে ধরে, তার গতিরোধ করে, তার জামার আস্তিন টানতে টানতে বলে, সাশকা, ভাই, লক্ষ্মী, একটা খুব করুণ কিছু বাজাও, (হিক্‌কা) এই অনুগ্রহটা তোমার করতেই হবে।

এক সেকেণ্ড সবুর, সাশকা বার বার মাথা নেড়ে বলে, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারেরা যেমন করে তাদের ফি নেন তেমনি করে একটা রৌপ্যমুদ্রা পকেটে পোরেঃ এক সেকেণ্ড।

আচ্ছা সাশকা, তুমি এমন ছোটলোক, টাকা দিলাম তোমায় আমি, আর এইবার নিয়ে অন্তত বিশবার বলছি, 'ওডেস্‌সার যাত্রী ছিলাম' বাজাও, অথচ—

এক সেকেণ্ড সবুর।

আমাদের একটু 'নাইটিংগেলটা' বাজিয়ে শুনাও না, সাশকা?

আমি একটু 'মারুস্যা' শুনতে চাই, সাশকা।

'সেট্‌জ সেট্‌জ,' আমাদের একটু 'সেট্‌জ সেট্‌জ' শুনাবে।

একটু সবুর।

ঘোড়ার গলার আওয়াজের মত শব্দ করে কে একজন হলের অপর প্রান্ত থেকে বলে উঠল, 'মেষপালক'টা বাজাও।

গৃহপালিত মোরগের মত সাশকা কোঁ-কোঁ করে বলে উঠল, এক সেকেণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হাসির তুফান ছুটল।

গ্যাম্‌ব্রিনাসে লোক আসতে শুরু করছে। সাশকার সঙ্গে যে সঙ্গত করে সে এল পরে, দর্জি বা ঘড়ির দোকানে তার দিনের কাজকর্ম সেরে। গরম জলের ভিতর মাংসের কাবাব, পনীরের স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি অনেক আগেই কাউণ্টারে

সাজানো হয়ে গিয়েছে, গ্যাস আলোর সবগুলিই জ্বালা হয়ে গেছে। সাশকা আর এক মগ বিয়ার খেয়ে তার সহকারীকে বললে, 'মে প্যারেড, এক, দুই, তিন!' সঙ্গে সঙ্গে সে এক প্রচণ্ড 'মার্চ' বাজাতে শুরু করে দিলে। এর পর সাশকার সে এক কম হয়রানি নয় ঃ এক একজন খরিদ্দার আসে আর সাশকা মাথা নুয়ে তাকে নমস্কার জানায়, এই রকম একজন দুজন নয়,—অসংখ্য; প্রত্যেকেই মনে করে সে-ই সাশকার বিশিষ্ট বন্ধু, তাই সাশকা যখন তাকে নমস্কার করে তখন সে গর্বিত দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে ওরা দেখল কিনা সাশকার নমস্কার। বাজাবার সময় সাশকা এক এক করে দুই চোখেই পর পর টেরা নজরে চাইতে থাকে, মাথার টাকের চামড়া কোঁচকাতে থাকে, এবং ভাঁড়ের মত ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কেবলি হাসতে থাকে।

বেলা দশ এগারোটার সময় গ্যাম্‌ব্রিনাস একেবারে ভর্তি হয়ে গেল, এখানে একসঙ্গে দুশোরও বেশি লোক ধরে। প্রায় অর্ধেক খদ্দের এসেছে মাথায় রুমাল আঁটা স্ত্রীলোক সঙ্গে করে, ভিড়কে কেউ তোয়াক্কা করে না এখানে, কেউ পা মাড়িয়ে দিলে, টুপি কুঁচকে দিলে, কিংবা বিয়ার খাবার সময় ফেললে খানিকটা পেণ্টুলনের উপরে—এ সব কিছুতেই কেউ কিছু মনে করে না, কেউ যদি করে তবে বুঝতে হবে সে মাতাল হয়ে একটু ঝগড়া করতে চাইছে। তৈলচিত্র শোভিত পাতাল কক্ষের দেয়াল থেকে বাষ্পবিন্দু আরও বেশি করে চুঁয়ে পড়তে লাগল, জনতার নিঃশ্বাস বাষ্পাকারে উপরে উঠে আরও ঘন হয়ে ছাদের গা থেকে গরম বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার মত পড়তে লাগল। এদিকে বেশ ঘটা করে বিয়ার খাওয়া চলতে লাগল গ্যাম্‌ব্রিনাসে। এখানকার সবচেয়ে কৃতিত্বের কাজ হল, দুতিনজন এক টেবিলে বসে মদ খেতে খেতে টেবিলটা খালি বোতলে এমনি করে ভর্তি করবে যে সেই সবুজ বোতলের অরণ্যের বাধায় কেউ কাউকে দেখতে পাবে না।

একটুও না থেমে বিভিন্ন লোকে যতগুলি বাজনা শুনতে চেয়েছে, একে একে সাশকা তার সবগুলি বাজিয়ে গেল। সব গানগুলির সুর তার মুখস্থ। চারদিক থেকে রৌপ্যমুদ্রা এসে পড়তে লাগল তার পকেটে, প্রত্যেক টেবিল থেকে মগ ভর্তি বিয়ার আসতে লাগল। যতবার সে তার মঞ্চ থেকে নেমে মদ বিক্রির কাউণ্টারে যাবার চেষ্টা করলে, ততবার তাকে একেবারে ছিঁড়ে খাবার যোগাড়।

সাশকা, বন্ধু, একটি মগ খেয়ে যাও।

এই যে সাশকা, তোমার জন্যে মগ ধরে বসে আছি, ডাকলে তোমায় পাওয়া যায় না কেন, আচ্ছা লোক তুমি!

অশ্বকণ্ঠ লোকটি তূর্যধ্বনি করে উঠল, সাশকা এখানে এসে এক মগ খেয়ে যাও।

যারা রঙ্গমঞ্চে গান বাজনা করে তাদের গায়ে পড়ে একটু আদিখ্যে করে

আদর দেখানোই মেয়েদের স্বভাব, তাই এখানকার মেয়েরাও একটু মনকাড়া হাসি হেসে কণ্ঠে মধু ঢেলে তাকে বলতে লাগল, সাশকা, লক্ষ্মীটি, আমার কাছ থেকে এক মগ তোমার খেতেই হবে, না, না বলতে পাবে না তুমি, আর, 'কোকিল, তুমি হেঁটে চলো' এই গানটা একটু বাজিয়ে শোনাতে হবে যে!

সাশকা হেসে মুখ ভেংচালে, তারপর ডাইনে বাঁয়ে মাথা নুয়ে নমস্কার জানিয়ে, হাতটা বুকে চেপে মেয়েদের দিকে চুমু ছুঁড়ে, প্রত্যেক টেবিলে গিয়ে বিয়ার খেয়ে পিয়ানোর কাছে ফিরে এল। সেখানে পিয়ানোর উপরও কে তার জন্যে টাটকা এক মগ বিয়ার রেখে গেছে। যাই হোক, ওখানে এসে 'বিদায়' বা ঐ ধরনের কি একটা গানের সুর বাজাতে শুরু করল। লোকে যাতে মজা পায় এ জন্যে মাঝে মাঝে সে গানের আসল সুরের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগমত বেহালা থেকে কখনও কুকুরের বাচ্চার কখনও শূকরের বাচ্চার ডাকের মত ধ্বনি তোলে, কখনও খাদে নেমে মৌমাছির গুণগুণানি শোনায়. শ্রোতারা শুনে হাসে আর হাততালি দেয়।

বেশ গরম হয়ে উঠল হল। সিলিং থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল; খরিদ্দারদের ভিতরে অনেকেই এরই মধ্যে কাঁদতে আর বুক চাপড়াতে শুরু করেছে, অনেকে মেয়েমানুষ নিয়ে বা আগেকার কোন ব্যাপার নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা করতে শুরু করেছে, মারামারি এই বাধে বাধে; অল্প একটু আধটু টানায় যাদের মাথা একটু ঠাণ্ডা আছে তারা এদের থামাতে চেষ্টা করছে। পরিবেশক ভৃত্যেরা বিয়ার ভর্তি মগ হাতে উঁচু করে ধরে এরই মধ্যে কি করে যে বড় পিপে, ছোট পিপে, লোকের পা আর দেহের ভিতর দিয়ে চলাফেরা করছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মাদাম ইভানোভা আরও বেশি রক্তশূন্য মৌনী সমাহিত হয়ে—সমুদ্রে ঝড় উঠলে পোতাধ্যক্ষ যেমন করে হুকুম দেন, ঠিক তেমন করে পরিবেশক ভৃত্যদের নির্দেশ দিচ্ছে।

প্রত্যেকেই গান গাইতে চাইছে। সাশকা একে লোক ভাল, তাতে এতক্ষণ বাজিয়ে সবার আনন্দ দিতে পেরেছে বলে তৃপ্তি আছে মনে, তারপর আবার বিয়ার টেনেছে, তাই সহজেই রাজি হয়ে গেল সে। একদল অমনি পরস্পরের মুখের দিকে অর্থহীন আগ্রহে চেয়ে কর্কশ রাসভ কণ্ঠে একই সুরে বেহালা বাজনার সঙ্গে গাইতে লাগলঃ

চিরবিদায় কেন হবে মোদের
কেন মোরা থাকব দূরে দূরে;
দু হাত যদি এক হয়ে যায় এবার
হবে নাকো থাকতে দূরে সরে।

আর এক দল তখনই হয়ত এদের জব্দ করবার জন্যেই আরও উঁচু গলায় তাদের নিজের খুশি মত অন্য গান ধরে এদের গান ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

মাঝে মাঝে এশিয়া মাইনর থেকে গ্রীকেরা আসে গ্যাম্‌ব্রিনাসে, এরা সব রুশিয়ার বন্দরে মাছ ধরতে আসে। তারা এসে সাশকাকে তাদের প্রাচ্যের কোন একটা সুর বাজাতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে বেহালায় এক অতি করুণ বিষাদময় একঘেয়ে কান্না শুরু হয়ে যায়, আর ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ ভার করে ছলছল চোখে তার সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে থাকে। শুধু এই নয়, সাশকা ইতালীয় পল্লীগীতি. উক্রেইনের দুমকা. ইহুদীদের বিয়ের নাচ এবং আরও অনেক কিছু বাজাতে পারে। একবার এখানে একদল নিগ্রো নাবিক এসে হাজির হল, আর সবাই গান গাইছে দেখে তাদেরও গান গাইবার ঝোঁক চাপল। সাশকা ওদের দেশের লাফিয়ে চলা সুরটা শিগগিরই শিখে নিলে, পিয়ানোয় কি করে এর সঙ্গত করতে হবে তা-ও ঠিক করে নিলে, তারপর আফ্রিকার অদ্ভুত কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গে সাশকার বেহালার বাজনায় গ্যাম্‌ব্রিনাস একেবারে গমগম করতে লাগল, শ্রোতারা আনন্দে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠল।

সাশকার পরিচিত স্থানীয় সংবাদপত্রের এক রিপোর্টার এক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপককে এই বিখ্যাত বেহালাবাদকের বাজনা শুনবার জন্য গ্যাম্‌ব্রিনাসে আসতে বলেন। সাশকা ব্যাপার বুঝতে পেরে সেদিন তার বেহালা থেকে আরও বেশি করে মিউ,—ব্যা, এবং গাধার ডাকের মত শব্দ বের করতে লাগল। শুনে শ্রোতাদের হো হো করে সে কি হাসি! কিন্তু অধ্যাপক তা শুনে নাক সিঁটকে বললেন. বেহালাবাদক ত নয়, একটা ভাঁড়!

বিয়ারটুকু পুরোপুরি না শেষ করেই তিনি গ্যাম্‌ব্রিনাস ছেড়ে চলে গেলেন।

৪

প্রাচীরগাত্রের ঐ সব মার্কুয়িস, জার্মান শিকারী, নাদুস নুদুস কিউপিড আর ব্যাঙের সামনে প্রায়ই যে লাম্পট্য আর অমিতাচার চলত, একমাত্র গ্যাম্‌ব্রিনাস ছাড়া অন্য কোথাও তেমনটি আর বড় দেখা যায় না।

যেমন ধর, চোরের দল: মস্ত বড় এক দাঁও মারবার পর তারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এক রকম গড়াতে গড়াতে এখানে এসে হাজির হয়, প্রত্যেকের সঙ্গেই একটা করে মেয়েমানুষ, প্রত্যেকের মাথায়ই কোণওলা টুপি আর পায়ে পেটেণ্ট লেদারের উঁচু বুট, সরাইখানার আদব কায়দায় তারা একেবারে দুরস্ত, আর চোখে মুখে একটা 'কুছ পরোয়া নেই' ভাব। সাশকা তাদের জন্য বাজায় যত সব চোরেদের গান ঃ 'প্রেম ফাঁদে পড়েছি আমি,' 'মারুস্যা, তুমি কেঁদ না,'

'বসন্ত হল শেষ' ইত্যাদি। নাচ তাদের সম্মানে বাধে, কিন্তু তাদের সুন্দরী তরুণী সঙ্গিনীরা 'মেষপালক' বাজনার তালে তালে মেঝেয় গোড়ালির ঠোক্কর মেরে উল্লাসে চিৎকার করতে করতে খুব নাচে, বয়স তাদের অনেকেরই বিশের কম। মেয়ে পুরুষ সবাই বেদম মদ গেলে কিন্তু মুস্কিল হয় এই যে, এ সব চোরেরা আগেকার সামান্য টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া মারামারি শুরু করে দেয়, অথবা সরাইখানার বিল না মিটিয়েই সটকে পড়ে।

অনেক মাছ ধরার পর দল বেঁধে জেলেরা আসে, এদের কোন কোন দলে ত্রিশজনের মত লোক থাকে। শরতের শেষ কয়েক সপ্তাহ অনেক সময় এদের খুব ভাল যায়, এই সময় প্রায় চল্লিশ হাজারের মত ম্যাকারেল বা ধূসর মুলেট এরা ডাঙায় তোলে। এই সময় মাছের ব্যবসার সবচেয়ে কম অংশীদারও দুশো রুবলের বেশি পায়। শীতকালে ভালমত এক খেপ বেলুগা ধরতে পারলে অবশ্য এর চেয়েও বেশি লাভ, কিন্তু সে বড় কঠিন ব্যাপার। এই মাছ ধরতে হলে রাত্রে তীর থেকে প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল দূর-সমুদ্রে যেতে হয়, অনেক সময় ঝড় বাদলের মধ্যেই যেতে হয়, ঢেউ এসে নৌকার উপর পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে কাপড় জামা আর দাঁড়ের উপর জল জমে বরফ হয়ে যায়, তুফানের জন্যে অনেক সময় তাদের মাঝ সমুদ্রেই থেকে যেতে হয়, তারপর ঐ তুফানই হয়ত তাদের ঠেলে তীরে তুললো—আনাপায় বা ত্রেবিজোন্দে। প্রত্যেক শীতকালেই ডজনখানেকের মত নৌকা মারা যায় সমুদ্রে, বিদেশের কোন তীরে দুঃসাহসী জেলেদের মৃতদেহ গিয়ে ভেসে ওঠে, সে-ও বসন্তের আগে নয়।

ভাল এক ক্ষেপ মাছ ধরার পর সমুদ্র থেকে ফিরে এসেই ওরা একটু ফুর্তি করবার জন্য একেবারে পাগল হয়ে যায়। অতি জঘন্য রকমের লাম্পট্যে আর অমিতাচারে দু দিনের মধ্যে ওরা তখন কয়েক হাজার রুবল উড়িয়ে দেয়। ওরা তখন কোন শুঁড়িখানা বা কোন ফুর্তির জায়গায় গিয়ে আর সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা দিয়ে খড়খড়ি বন্ধ করে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে মদ খায়, মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রেম করে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গায়, আয়না ভাঙে, ডিস ভাঙে, মেয়েমানুষকে ধরে মারে, অনেক সময় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, অবশেষে ক্লান্ত হয়ে থুথু, খাওয়া সিগারেটের টুকরো, ভাঙা কাঁচের টুকরো, ঢালা মদ এবং রক্তের দাগের মধ্যে টেবিল, মেঝে বা খাটের উপর আড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এমনি করে কয়েকদিন কাটায় তারা। এক জায়গা ভাল না লাগলে অন্য ফুর্তির জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। তারপর শেষ কপর্দক পর্যন্ত মদে আর ফুর্তিতে উড়িয়ে অনুতাপ করতে করতে তারা নিজের নিজের নৌকায় ফিরে যায়। কারো মাথা ফাটা, কারো মুখে মারামারির দাগ, হৈ-চৈ আর মারামারির পর শরীর সবারই দুর্বল, তাই নিয়েই তারা তাদের ঐ অভিশপ্ত অথচ প্রিয়, কঠিন অথচ মনমাতানো সামুদ্রিক জীবন আবার শুরু করে।

গ্যাম্‌ব্রিনাসে আসা তাদের একবারও বাদ যায় না। প্রতি বৎসর শীতকালে এই কর্কশকণ্ঠ দৈত্যের মত লোকগুলি হুড়মুড় করে গ্যাম্‌ব্রিনাসে ঢুকে পড়ে, শীতের উত্তর-পূর্ব বাতাসে তাদের মুখ হয়ে থাকে তখন লাল, গায়ে থাকে ওয়াটারপ্রুফ, জ্যাকেট আর চামড়ার পেণ্টুলন, আর পায়ে থাকে বৃষচর্মে তৈরি জানু পর্যন্ত উঁচু বুট, এই বুট পরেই তাদের সাথীরা এক ঝড়ের দিনে সোজা পাতালপুরী গিয়ে হাজির হয়েছে।

একমাত্র সাশকার খাতিরেই তারা এখানে এসে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করে না,—তা না হলে তারা যা খুশি তাই করত ঃ ভারি ভারি মগগুলি সব মেঝের উপর আছড়ে ভাঙত। সাশকা তাদের নিজেদের গান ঃ সুদূর পবনে আন্দোলিত ভয়ঙ্কর অথচ সহজ সুন্দর সমুদ্রের গান বাজিয়ে শোনায়, আর তাদের সবাই একসঙ্গে জোরালো গলায় সেই গান গাইতে থাকে। অর্ফিয়ুস যেমন তার সঙ্গীত দিয়ে সমুদ্রের ঝড় থামাতে পারতেন, সাশকাও যেন তেমনি এদের থামায়। মাঝে মাঝে দাড়িওয়ালা দৈত্যের মত চেহারার কোন মাছধরা বোটের মালিক, বয়স হয়ে গেছে তার চল্লিশের মত, সমুদ্রের কঠিন জীবন হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা তার হরণ করে নিয়েছে, সে-ও যখন সাশকার বেহালার করুণ সুরে গলা মিলিয়ে গায়—

কেন আমি জেলে হলাম গো,
ভাগ্যহত দীনহীন এ জেলে—

তখন তারও দু চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে ওরা নাচে, কঠিন পাথরের মত মুখগুলি নিশ্চল রেখে মেঝের একই জায়গা কঠিন বুটের আঘাতে কাঁপিয়ে ওরা নাচে, ওদের গা আর জামা-কাপড় থেকে মাছের গন্ধ বেরিয়ে তখন সারা ঘর ভরে যায়। সাশকার জন্য টাকা খরচ করতে তারা কিছুমাত্র কার্পণ্য করে না ঃ নিজের নিজের টেবিলের কাছে তারা ওকে বহুক্ষণ ধরে আটকে রাখে। এই জেলেরা কি কঠিন জীবন যাপন করে সাশকাও তা জানে, তাই এদের জন্য কোন কিছু বাজিয়ে শোনাবার সময় এদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণায় তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে।

সাশকার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে বৃটিশ বাণিজ্যপোতের নাবিকদের জন্য বাজাতে। চমৎকার দেখতে এরা ঃ সবাই তরুণ, চওড়া বুকের ছাতি, বৃষস্কন্ধ, সাদা ধবধবে দাঁত, মুখে গোলাপী আভা, নীল চোখে নির্ভীক প্রসন্ন দৃষ্টি; এরা পরস্পর বাহুবদ্ধ হয়ে দল বেঁধে আসে এখানে। এদের পেশীগুলি এমন যে, মনে হয় পেশীর চাপে বুঝি জামা ফেটে যাবে, জামার নিচু কলারের উপর ওদের বলিষ্ঠ গ্রীবাও বড় সুন্দর দেখায়। এদের অনেকেই আগে এখানে এসেছে, তাই অনেকেই সাশকাকে চেনে, সাশকার সঙ্গে দেখা হলেই এরা শ্বেত দশনপংক্তি বিকশিত করে মধুর হেসে তাকে রুশীয় ভাষায় নমস্কার জানিয়ে বলে, 'Zdryste'.

সাশকা আর তাদের বলার অপেক্ষা রাখে না, তখনই বাজাতে শুরু করে, 'রুল ব্রিটেনিয়া'। নাবিকেরা তখন ক্রীতদাস প্রথায় পীড়িত যে দেশ সেই দেশে এসে পড়েছে, তাই ব্রিটিশ স্বাধীনতার স্তোত্রটি বিশেষ গর্ব ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে গায়। মাথার টুপি খুলে তারা গানের উপসংহারে গায়ঃ

বৃটিশ কদাপি হবে না, হবে না
হবে নাক ক্রীতদাস!

ওরা যখন টুপি খোলে, তখন আশেপাশে আর যত লোক বসে থাকে তারা সবাই টুপি খোলে, অন্য সময় তারা যতই দুর্দান্ত, বেয়াড়া হোক।

এর পরই হয়ত কোন গেঁয়ো জেলে, কানে তার মাকড়ী, মুখের দাড়ি তার ঝালরের মত একেবারে গলা থেকে শুরু হয়েছে, দুই মগ বিয়ার হাতে করে সাশকার কাছে গিয়ে দাঁত বের করে হেসে তার পিঠে একটা আদরের চাপড় দিয়ে 'হর্ণপাইপ' নাচের সুরটা বাজাতে বলবে। ফুর্তিবাজ নাবিকদের এই নাচের সুর বাজাতে বেহালায় ছড়ের ঘা পড়তেই ইংরেজ যুবকগুলি এক লাফে তাদের আসন থেকে উঠে পিপেগুলি সরিয়ে নাচের জায়গা করে দেবে, আর সবাইকেও তারা হেসে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলবে। যারা উঠতে দেরি করবে তাদের আর ভদ্রতা দেখান হবে না, এক লাথি মেরে তাদের পায়ের নিচের পিপেগুলি সরিয়ে দেবে তারা। এ রকম করবার অবশ্য প্রায়ই দরকার হয় না, কারণ গ্যাম্‌ব্রিনাসে যারা আসে তারা সবাই নাচ ভালবাসে, বিশেষ করে 'হর্ণ-পাইপ' নাচ হলে ত কথাই নেই। সাশকা পর্যন্ত নাচটা ভাল করে দেখবে বলে বাজাতে বাজাতে চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ায়।

নাবিকেরা প্রথমে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে নাচের সুরের তালে তালে হাততালি দেয়, দুজন নাবিক বৃত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। নাচটা হচ্ছে—নাবিকেরা সমুদ্রে যে জীবন যাপন করে তারই প্রতিচ্ছবি। জাহাজ ছাড়তে যাচ্ছে, দিনটা বড় চমৎকার, সব ফিটফাট। নাবিকেরা তাদের হাত দুটো বুকের উপর আড়া-আড়ি করে রেখেছে, মাথা হেলিয়ে দিয়েছে পিছনের দিকে, দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনড়, কিন্তু পা দিয়ে তালে তালে ঘা দিচ্ছে মেঝেতে। এইবার একটু বাতাস উঠল সমুদ্রে, জাহাজ একটু দুলতে শুরু করল, নাবিকদের ফুর্তি এতে আরও বেড়ে গেল এবং নাচের ভঙ্গিও তাই একটু জটিল হয়ে উঠল। এর পর বাতাস একটু জোরে বইতে শুরু করল, ডেকের উপর আর স্থির হয়ে দাঁড়ান যায় না, তাই নাবিকরাও তখন একটু হেলতে দুলতে শুরু করল। এইবার শেষে সত্যিকার ঝড় শুরু হল, জাহাজের ভীষণ দোলানিতে নাবিকেরা যেন এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে চায়, সবাই সন্ত্রস্ত। 'সবাই হাত তোল, পাল নামাও।' নাচিয়েদের হাত পায়ের ভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে ওরা পালের দড়িদড়া বেয়ে উপরে উঠছে, পাল খুলে গুছিয়ে নিচে নেমে আসছে। এদিক সমুদ্রের ঝড়ে জাহাজ আরও বেশি দুলতে শুরু করেছে, ভীষণ দুলছে। 'থামো, কে যেন জলে

পড়েছে।' এবার 'লাইফবোট' নামানো হচ্ছে। নাবিকেরা সবাই মাথা নোয়ালে, কাঁধের মাংসপেশীতে টান পড়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল. পিঠগুলি বাঁকা করে সোজা করে তারা অতি দ্রুত দড়ি টেনে চলেছে। কিন্তু ঝড় এবার কমে যাচ্ছে, জাহাজের দোলানিও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, ঝড় থামার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও শান্ত হয়ে গেল। নাবিকরা আবার দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনড় রেখে শুধু মেঝের উপর 'হর্ণ-পাইপ' নাচের তালে তালে পা ফেলছে।

ক্বচিৎ কখনও সাশকাকে জর্জিয়ার সুরা প্রস্তুতকারকদের জন্য লেজিঙ্কা বাজনাও বাজাতে হয়, শহরের নিকটেই ওদের বাস। সাশকা জানে না এমন বাজনা নেই। কখনও নৃত্যোচ্ছ্ব দলের কেউ হয়ত ভেড়ার চামড়ার টুপি আর সারকেশিয়ান কোট পরে পিপের ভিতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে আর পিছনে তালে তালে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে, আর তার সঙ্গীরা হাততালি দিয়ে তাকে সামনে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে. সাশকা অমনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে উঠছে, খাস! খাস! খাস! মাঝে মাঝে সে 'মোল্‌দাভিয়া'র 'ঝোক,' ইতালীর তারান্তেলা এবং জার্মান নাবিকদের জন্য 'ওয়লজ্‌'ও বাজায়।

মাঝে মাঝে গ্যাম্‌ব্রিনাসে মারামারি বেধে যায়. এদের দু একটি আবার ভীষণ মারাত্মক রকমের। এখানকার পুরানো খরিদ্দারেরা প্রায়ই একবার করে এই রকম এক ভয়ঙ্কর মারামারির গল্প করে। সে মারামারিটা বেধেছিল 'রিজার্ভে' বদলি করা হয়েছে এমন রুশীয় নৌসেনা আর বৃটিশ নাবিকদের মধ্যে। দুই দলের মধ্যে চলেছিল ঘুষি, পিপের লোহার পাতের ঘা. বিয়ার-মগ ছোঁড়া-ছুঁড়ি, এমন কি মদের পিপে পর্যন্ত ছোঁড়া-ছুঁড়ি হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি মারামারি বাধায় প্রথমে রুশীয়রাই, ছুরিও চালায় তারাই প্রথমে. সংখ্যায় তারা বৃটিশদের তিন গুণ বটে. কিন্তু আধ ঘণ্টা লেগেছিল ওদের শুঁড়িখানা থেকে তাড়িয়ে দিতে।

অনেক তুমুল ঝগড়া খুনোখুনিতে পরিণত হবার আগেই সাশকা দু দলের মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিয়েছে। বিবাদরত দু দলের মাঝে গিয়ে সে এমন সব তামাসার কথা বলে হাসে আর মুখভংগি করে যে. ওরা ঝগড়া থামিয়ে চারিদিক থেকে তার হাতে বিয়ারের মগ এগিয়ে দেয়ঃ

ও সাশকা, ধরো এই মগ, আমার সঙ্গে খাও. ধুত্তোরি, খাও না!

এ সব সাদাসিধে লোকদের ঝগড়া মারামারি যে সাশকা এত সহজে থামিয়ে দিতে পারত, এর কারণ হয়ত তার নিরীহ স্বভাব, সকৌতুক আচরণ আর দরদী মন, তার ঢালু, মাথার নিচের ঐ চোখদুটি থেকে যেন মনুষ্যপ্রীতি ঝরে ঝরে পড়ত। অথবা এও হতে পারে ও যে গুণী সুরসাধক, তাই ওর গুণের প্রতি সম্মান দেখাতে তারা চুপ করে যেত, এও একরকম কৃতজ্ঞতা জানানো আর কি! আবার এও হতে পারে—গ্যাম্‌ব্রিনাসে যারা আসে তারা প্রায় সবাই ওর কাছে ঋণী। সমুদ্র এবং বন্দরের চলতি ভাষায় সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থাকে বলা হয় "দেকোখটো'। এই চরম দেকোখটোর দিনে লোকে নিঃসঙ্কোচে গিয়ে সাশকার

কাছে টাকা ধার চাইত, আবার সরাইখানায় গিয়ে মদ খাবার জন্য সামান্য কিছু ধার চাইলেও সে কখনও 'না' করত না।

সাশকা অবশ্য এ ধার দেওয়া টাকা কোনদিনই আর ফেরত পেত না, দেনাদারেরা যে কুঅভিসন্ধি করে তার টাকা ফেরত দিত না, তা নয়, দিতে তাদের মনেই থাকত না, আবার ঐ সব দেনাদারেরাই হয়ত ফুর্তির সময় তার বাজনা শুনে খুশি হয়ে তাদের দেনার দশগুণ তার পকেটে তুলে দিত।

মাদাম ইভানোভা অনেক সময় বিরক্ত হয়ে তাকে তিরস্কার করে বলত,—কি কান্ড, টাকাগুলি কি এমনি করে উড়িয়ে দিতে হয়!

উত্তরে সে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলত, কিন্তু, মাদাম ইভানোভা, টাকাগুলি ত আমি আমার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না। যা আছে আমার তাতেই 'স্নো-ড্রপ' আর আমার দিব্যি চলে যাবে। আয় 'স্নো-ড্রপ' সোনা কুকুর আমার কাছে আয়।

৫

দেশকালের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাম্‌ব্রিনাসকেও তার বাজনা পাল্টাতে হয়েছে। বোয়ার যুদ্ধের সময় রেওয়াজ ছিল 'বোয়ার মার্চ' শোনা (খুব সম্ভব এই সময় রুশীয় আর ইংরেজ নাবিকদের মধ্যে সেই বড় রকমের মারামারিটা হয়)। প্রতি সন্ধ্যায় সাশকাকে অন্তত বিশবার এই মার্চের বাজনাটা বাজিয়ে শোনাতে হত, এবং প্রতিবার বাজনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই টুপি নেড়ে নেড়ে হর্ষধ্বনি করে উঠত, যারা উদাসীন থাকত তাদের দিকে লোকে তীব্র কটাক্ষে চাইত। গ্যাম্‌ব্রিনাসে এটা বড় শুভ লক্ষণ নয়।

এর পর ফ্রান্স আর রুশিয়ার মধ্যে সন্ধি হওয়াতে কিছুদিন ধরে দেশে বেশ উৎসব চলল। গভর্ণরের তেমন ইচ্ছা না থাকলেও অনুমতি দিলেন 'মার্সেই' বাজাতে। বোয়ার মার্চের মত এত জনপ্রিয় না হলেও এটা বাজানোর জন্যও রোজই ফরমাশ হতে লাগল; হর্ষধ্বনি হতে লাগল কম, টুপি একেবারে কেউ নাড়লেই না। এর একটা কারণ হচ্ছে দেশের লোকের এতে হৃদয়ের আবেদন ছিল না, আর এক কারণ গ্যাম্‌ব্রিনাসের খরিদ্দারেরা এই সন্ধির রাজনৈতিক গুরুত্বও তেমন বুঝত না, মার্সেই বাজছে বলে যারা চেঁচামেচি করত হর্ষধ্বনি জানাতও আবার তারাই।

কিছুদিন ফ্যাশান হল 'কেকওয়াক' বাজনা শোনা, একবার এক মাতাল

বণিক তার ওভারকোট, গ্যালোশ এবং নেকড়ের চামড়ার টুপি না খুলেই পিপের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে এই নাচটা নেচে গেলেন, কিন্তু এই নিগ্রো নাচের গান আর বেশি দিন চলল না।

এর পর জাপান-যুদ্ধ গ্যাম্‌ব্রিনাসের খরিদ্দারদের হৃদয়স্পন্দন যেন দ্রুততর করে তুলল। পিপের উপর খবরের কাগজ আসতে শুরু করল এবং প্রতি সন্ধ্যায় এই যুদ্ধ সম্বন্ধেই আলোচনা চলতে লাগল গ্যাম্‌ব্রিনাসে। অশিক্ষিত শান্তিপ্রিয় লোকেরাও রাতারাতি রাজনীতিবিদ্‌, যুদ্ধবিদ্‌ হয়ে উঠল। কিন্তু এ সময় সবারই মনে ভয়, ভয় যেমন নিজের জন্যে, তেমনি ভাইয়ের জন্যে, এমন কি বন্ধুর জন্যেঃ বহুদিন ধরে যারা একসঙ্গে কাজ করেছে, বিপদ ঝঞ্ঝা সয়েছে, প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে, তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য নিবিড় হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত হয়ে গেছে।

প্রথমে কারো মনেই সন্দেহ ছিল না যে, রুশিয়া জয়লাভ করবে। সাশকা 'কুরোপ্যাতকিন' মার্চটা কি করে কার কাছ থেকে শুনে নিয়ে প্রায় বিশ দিন সন্ধ্যায় ওটা বাজালে, বেশ কিছুটা সাফল্যের সঙ্গেই বাজালে। কিন্তু একদিন রাত্রে বালাক্লাভার জেলেরা একটা নতুন গানের সুর নিয়ে এল গ্যাম্‌ব্রিনাসে, গানটার নাম 'সল্টী গ্রীকস্‌' বা পিণ্ডোসেস্‌, এ গানটা আসার পর 'কুরোপ্যাতকিন' মার্চটা একেবারে অচল হয়ে গেল। সল্টী গ্রীক্‌সের কথাগুলি এই রকম—

ও মা, তোমার কোল থেকে কেড়ে
(ওরা) পাঠালে, মা, অনেক দূরে;
কাল ছিল যে কোলের ছেলে
আজকে সে যে যুদ্ধ করে।

সেদিন থেকে গ্যাম্‌ব্রিনাসে অন্য সব গান অচল। প্রতি সন্ধ্যায়ই লোকে বার বার সাশকাকে অনুরোধ করে, ভাই সাশকা সেই গানটা একবার বাজাও না! সেই করুণ গানটা, বালাক্লাভার গান, মানে সৈন্যদের সেই গান, বুঝছ ত!

সাশকা বাজনা আরম্ভ করলে তারা গানটা গাইত আর কাঁদত, ডবল করে মদ খেত; সারা রুশিয়াতেই এই রকম চলত তখন। প্রতি সন্ধ্যাতেই কেউ না কেউ বিদায় নিতে আসত, পোষা মোরগের মত সদর্প পদক্ষেপে সরাইখানায় প্রবেশ করে, টুপিটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিত মেঝের উপর, দম্ভ করে বলত জাপানীগুলিকে সে একাই শেষ করবে, তারপর যাবার সময় এই বুকফাটানো গান শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে যেত।

একদিন সাশকা অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি সকাল সকাল গ্যাম্‌ব্রিনাসে এসে হাজির হল। সে আসতেই তার হাতে প্রথম মদের মগটা দিয়ে ইভানোভা অন্য দিনের মতই বললে, সাশকা, তোমার নিজের কোন সুর একটু বাজিয়ে শোনাও না!

শুনে হঠাৎ সাশকার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, হাতের মগও নড়ে উঠল।

সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে সে বললে, জানো, মাদাম ইভানোভা, ওরা আমায় যুদ্ধে যেতে তলব করছে।

ইভানোভা নিজের হাত দুটো মুচড়ে বললে, না, না, তামাসা করছ তুমি।

সাশকা নিতান্ত নিরীহ লোকের মত মাথা নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, না, তামাসা নয়, সত্যি বলছি আমি।

কিন্তু তোমার যুদ্ধে যাবার বয়স পার হয়ে যায়নি, সাশকা? কত বয়স হয়েছে তোমার?

এ পর্যন্ত অবশ্য সাশকাকে এ প্রশ্ন কেউ কোনদিন করেনি, সবাই ভেবে এসেছে ঐ সরাইখানার দেয়াল, দেয়ালের ঐ মার্কুইস, উক্রেইনবাসী, ব্যাঙ, আর প্রবেশদ্বারে গড়া চিত্রিত গ্যাম্‌ব্রিনাসের মূর্তির বয়সও যত, সাশকারও বয়স তত।

সাশকা একটু ভেবে বললে, ছেচল্লিশ, কিংবা উনপঞ্চাশও হতে পারে। ঠিক বলতে পারি না, শৈশবেই মা-বাপ হারিয়েছি আমি—বলতে গিয়ে গলা ভারী হয়ে এল তার।

কর্তৃপক্ষকে বল না গিয়ে সে কথা?

বলেছি আমি, মাদাম ইভানোভা।

ওঁরা কি বললেন?

ওঁরা বললেন চুপ কর নোংরা ইহুদী, ফের কথা বললে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাব তোকে. ওঁরা পাঠিয়েছিলেনও একবার।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই গ্যাম্‌ব্রিনাসের সবাই জেনে ফেললে সাশকার ব্যাপারটা। তার দুঃখে সহানুভূতি দেখাতে সবাই তাকে বিয়ার খাওয়াতে লাগলে, বিয়ার খেয়ে খেয়ে শেষে পাঁড় মাতাল হয়ে উঠল সাশকা। মুখ ভেংচে, টেরা চোখে চেয়ে, নানা রকম ফুর্তির ভাব দেখিয়ে সে দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করলে অনেক, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তার চিরকালের কৌতুক-ভরা চোখ থেকে ভয় আর বেদনার ছোপ গেল না। হঠাৎ এক জোয়ান বয়লার-মিস্ত্রী নিজে থেকে এগিয়ে এসে বললে, সাশকার বদলে সে যুদ্ধে যাবে। সবাই অবশ্য বুঝলে এ কথার কোন মানে হয় না, সাশকার কিন্তু ওর কথা শুনে চোখে জল এসে গেল, সাশকা তাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে তখনই তাকে তার বেহালাটা উপহার দিয়ে দিল। 'স্নো ড্রপ'কে সে ইভানোভার হাতে দিয়ে গেল :

মাদাম ইভানোভা, তুমি দয়া করে আমার কুকুরটাকে একটু যত্নআর্তি করো। কে জানে, হয়ত আমি আর ফিরে না-ও আসতে পারি, তখন কুকুরটাকে দেখেই আমার কথা মনে পড়বে তোমার। স্নো-ড্রপ, লক্ষ্মী কুকুর আমার! দেখ, কি করে নিজের মুখ চাটছে ও।...আরে আমার বেচারা রে!...হাঁ, আর একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি আমি তোমার কাছে। এই সরাইখানার মালিকের কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে আমার। তুমি সেই টাকাটা নিয়ে আমি যে ঠিকানা দেব, সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। গোমেলে আমার দূরসম্পর্কের এক ভাই

আছে, তার স্ত্রী ছেলেপেলে আছে, আর আমেরিকায় আমার ভাইপোর বিধবা স্ত্রী থাকে, এদের আমি প্রতি মাসেই টাকা পাঠাতাম। আমাদের ইহুদী-সমাজে এ জিনিসটা খুব চল : আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসি। ছেলেবেলা থেকেই ত আমারও কেউ নেই, আচ্ছা, বিদায় মাদাম ইভানোভা।

বিদায়, সাশকা। এস আমরা পরস্পর চুমু দিয়ে বিদায় নেই। এতদিন আমরা একসঙ্গে কাটালাম।...আর, আর কিছু মনে করো না, সাশকা, তোমার মঙ্গল কামনা করে একবার তোমার বুকের উপর ক্রুশের মত করে হাত রাখব আমি।

সাশকার চোখ দুটি তখন গভীর বেদনায় ছাওয়া, তবু যাবার আগে এ ব্যাপার নিয়ে ভাঁড়ের মত একবার কৌতুক না করে সে থাকতে পারলে না। বললে, মাদাম ইভানোভা, তুমি কি মনে কর, রুশদেশের ক্রুশ আমায় মেরে ফেলতে পারবে?

৬

এর পর গ্যাম্‌ব্রিনাস একেবারে খাঁ খাঁ করতে লাগল, সাশকা আর তার বেহালা না থাকায় সরাইখানা যেন একেবারে অনাথ হয়ে গেল। মালিক খরিদ্দারদের আকৃষ্ট করবার জন্য চারজন ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে নিয়ে এলেন, এরা ঘুরে ঘুরে বাজাবে। এদের একজন মিউজিক হলের বিদূষকের মত লাল দাড়ি আর কৃত্রিম নাক লাগিয়ে, ডোরাকাটা পাজামা পরে জামার কলার কান অবধি টেনে অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসির গান গাইতে লাগল। কিন্তু এই বাজিয়ের দলে কাজ চললো না; খরিদ্দারেরা এদের গান-বাজনা শুনে বু-বু শব্দ করে বিদ্রূপ করতে লাগল, গাইয়ে বাজিয়েদের গায়ে খাবারের টুকরো ছুঁড়তে লাগল, একবার বিদূষকটি সাশকার নামে অসম্মানকর মন্তব্য করেছিল বলে তেনদ্রোভোর জেলেরা তাকে ধরে আটকে রেখেছিল এক ঘরে।

কিন্তু যাই হোক না কেন বন্দর বা সমুদ্রের যে সব তরুণদের যুদ্ধে ডাক পড়েনি তারা তাদের পুরানো অভ্যাস মত গ্যাম্‌ব্রিনাসে না এসে পারত না। প্রথম প্রথম প্রতিদিন রাত্রেই তারা সাশকার নাম করত।

সাশকা থাকলে বেশ হত। সে না থাকায় জায়গাটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

হাঁ, তাই। বেচারা সাশকা এখন যে কোথায় কে জানে!

হাল-ফ্যাশানের গানের সুরে আর একজন কেউ বলে উঠত, 'বহু বহু দূরে—

মাঞ্চুরিয়ার রণক্ষেত্রে' তার পরেই লজ্জা পেয়ে থেমে যেত; আর একজন তখন হঠাৎ বলে উঠত, তিন রকমের ঘা আছে ঃ ফুটো হওয়ার ঘা, চেরার ঘা আর কাটার ঘা, এ ছাড়া ছেঁড়া ফাটার ঘা-ও আছে।

ঘরে ফিরি আমি বিজয়গর্বে
তুমি এলে বাহুহীন—

তোমার ঐ ঘ্যানঘ্যানানি থামাও...মাদাম ইভানোভা, সাশকার কোন খবর আছে? কোন চিঠি কি পোস্টকার্ড?

মাদাম ইভানোভা ইদানীং খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস করেছে, কাগজটা এক হাত দূরে রেখে, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে কাগজ পড়ে সে, পড়বার সময় ঠোঁট দুটি তার নড়তে থাকে, 'স্লো-ড্রপ' তার কোলের উপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। আগের সেই যে মঞ্চে দাঁড়ানো নাবিকের মত হুকুম দিত ভৃত্যদের, সে ভাব আর নেই তার, সে হাসিখুশি ভাব-ও নেই, এখন তার আজ্ঞাবাহক ভৃত্যেরা উদ্দেশ্যহীন অসতর্কপদে ঝিমুতে ঝিমুতে ঘুরে বেড়ায় কেবল ঘরের মধ্যে।

সাশকা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হলে সে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, কিছুই জানি না আমি। চিঠিপত্রও পাই না, কাগজেও কিছু লেখে না।

তারপর ধীরে ধীরে তার চশমাটা খুলে সুখোপবিষ্ট স্লো-ড্রপের পাশে খবরের কাগজের উপর রেখে মুখ ফিরিয়ে নীরবে কাঁদতে থাকে।

কখনও কখনও ছোট্ট কুকুরটার কাছে মুখ নিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে, হাঁরে, স্লো-ড্রপ, খবর-টবর কিছু রাখিস? আমাদের সাশকা এখন কোথায় আছে, জানিস? তোর প্রভু কোথায়?

স্লো-ড্রপ তার তুলতুলে ছোট্ট নাকটা উঁচু করে ভিজে কালো চোখ পিট পিট করতে করতে নরম নাকি সুরে যেন কাঁদতে থাকে।

সময়ে সব কিছুই গা-সহা হয়ে যায়। ম্যান্ডোলিন বাজিয়েদের পরে এল ব্যালালাইকা বাজিয়ের দল, তারপর এল রুশ উক্রেইনের পুরুষ আর মেয়েদের কোরাস, সর্বশেষে 'এ্যাকর্ডিয়ন' বাজিয়ে ল্যাশকা এসে আসন পাতলে গ্যাম্-ব্রিনাসে। সবার চেয়ে সে-ই বেশি দিন থাকতে পেরেছে গ্যাম্‌ব্রিনাসে। লোকটা আগে ছিল চোর, তারপর বিয়ে করবার পর সে শুধরে গেল। আগে সব সরাইখানাতেই তার যাতায়াত ছিল, সবাই তাকে চেনে, তাই তাকে নিয়ে গ্যাম্‌ব্রিনাসে কোন গোলমাল হল না, আর গোলমাল করবারও কিছু ছিল না, ব্যবসার বাজার তখন বড় মন্দা।

একমাস দুমাস করে বছর কেটে গেল, এখন আর সাশকার কথা কারো মনে পড়ে না, অবশ্য একমাত্র ইভানোভা ছাড়া, সে-ও আগেকার মত সাশকার নাম শোনামাত্রই আর কাঁদে না। দেখতে দেখতে আর একটা বৎসরও কেটে গেল। সাশকার ছোট্ট সাদা কুকুরটাও বুঝি এখন তার কথা ভুলে গেছে।

সাশকা যে ভয় নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল, সে সব কিছু আর ঘটেনি : রুশীয় ক্রুশ তাকে আর মেরে ফেলতে পারেনি, একটি আঘাত পর্যন্ত লাগেনি তার গায়ে। অথচ তিন তিনটি বড় রকমের লড়াইয়ে সে যোগদান করেছে, একটি সৈন্যদলের আগে আগেই যেতে হয়েছে তাকে, এই দলের ব্যাণ্ডে বাঁশী বাজাত সে। ওয়াফাঙকু-তে এসে সে বন্দী হয়। এর পর যুদ্ধ থেমে গেলে একটা জার্মান জাহাজ তাকে বন্দরে তার বন্ধুদের কাছে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, বন্ধুরা তখন কাজ করছিল, ওকে দেখতে পেয়ে তাদের সে কি ফুর্তি!

সাশকার আসার সংবাদ সমস্ত বন্দর জেটি, জাহাজ তৈরির কারখানায় আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। সে রাত্রে গ্যাম্‌ব্রিনাসে এত ভিড় হল, যে অনেকে বসবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল; বিয়ারের মগ চালান দিতে হল মানুষের মাথার উপর দিয়ে হাতে হাতে; অনেকে বিয়ার খেয়ে পয়সা না দিয়েই চলে গেল, কিন্তু তাতেও ক্ষতি হল না মালিকের, সেদিন বিক্রিও হয়েছে খুব। এত বিক্রি আর কোনদিন হয়নি। বয়লার-মিস্ত্রী সাশকার বেহালাটা তার স্ত্রীর শালে জড়িয়ে বেশ যত্ন করে নিয়ে এসেছিল, কয়েক মগ বিয়ার খেতে পেয়ে তখনই সে সেটা দিয়ে দিলে। সাশকার সঙ্গে যে লোকটা সঙ্গত করত তাকেও লোকে কোত্থেকে যেন খুঁজেপেতে ধরে নিয়ে এল। ল্যশকার বেশ একটু দুঃখ লাগল মনে, তার আত্মাভিমানেও ঘা লাগল, নিজের আসন না ছাড়বার জন্য সে বার বার জিদ করে বলতে লাগল, অমনি বললেই হল, প্রতিদিনকার চুক্তি হয়েছে না আমার সঙ্গে? কিন্তু কে কার কথা শোনে, তাকে সবাই হঠিয়ে দিলে সেখান থেকে, তা ছাড়া মার খেয়েই মরত—যদি সাশকা এসে না বাধা দিত।

সাশকা সেদিন যে সম্বর্ধনা পেল, রুশ-জাপান যুদ্ধের কোন বীরের ভাগ্যেই তা ঘটেনি। তাকে শক্ত মজবুত হাতে ধরে মেঝে থেকে তুলে মাথার উপরে নিয়ে এত জোরে ছুঁড়তে লাগল সব যে, সিলিং-এ লেগে তার মাথা ফাটবার যোগাড়। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এত জোর চিৎকার যে, গ্যাসের আলোগুলি নিভে নিভে যেতে লাগল। চিৎকার শুনে কয়েকবার উপর থেকে পুলিশ ছুটে এসে বলে গেল, একটু আস্তে, বাইরের লোকের বিঘ্ন হচ্ছে।

সে রাত্রে সাশকা গ্যাম্‌ব্রিনাসের লোকেরা যে সব গান আর নাচের সুর ভালবাসে সবই বাজিয়ে শোনাল। বন্দী থাকবার সময় সে কতকগুলি জাপানী গানের সুর শিখে নিয়েছিল, তা-ও বাজিয়ে শোনালে সে, কিন্তু শ্রোতারা সে সুর তেমন পছন্দ করলে না। মাদাম ইভানোভা যেন আবার নতুন জীবন ফিরে পেল, ব্রিজের উপর জাহাজের ক্যাপ্টেন যে ভঙ্গিতে দাঁড়ায় আবার সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মনে সে ভৃত্যদের হুকুম দিতে লাগল, 'স্নো-ড্রপ' আবার আগের মত সাশকার কোলের উপর বসে আনন্দে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল। একবার বাজনা থামলে সাদাসিধে সরলমনা কোন জেলে হঠাৎ সাশকার প্রত্যা-গমনের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিস্ময়ানন্দে বলে উঠল, আরে আমাদের সাশকা

ফিরে এসেছে যে! সঙ্গে সঙ্গে আবার তুমুল হাস্যধ্বনি আর ফুর্তির কটুবাক্য শুরু হল, আবার সাশকাকে নিয়ে সেইরকম সিলিং-এর কাছে ছোঁড়াছুঁড়ি চেঁচামেচি, মদ খাওয়া খাওয়ি, মগ ঠোকাঠুকি, আর পরস্পরের গায়ে বিয়ার ঢালাঢালি চলল।

এতদিন পরে সাশকা ফিরে এল, কিন্তু দেখলে মনে হয় একটুও পরিবর্তন হয়নি তার, একটুও বয়স বাড়েনি। সরাইখানার পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক গ্যাম্‌-ব্রিনাসের মূর্তির মত তার চেহারারও বিশেষ কিছু পাল্টায়নি, দুর্ভাগ্য আর মহাকাল দুই-ই যেন হার মেনেছে এর কাছে। কিন্তু মাদাম ইভানোভার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে সাশকার আসল রূপ। ইভানোভা লক্ষ্য করেছে, যুদ্ধে যাবার আগে তার চোখে মুখে যে ভয় আর উদ্বেগের ছায়া ছিল তা এখনও কাটেনি, বরং সে ছায়া যেন আরও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। সাশকা এখনও সেই আগের মত টেরা চোখে চাইছে, কপালে খাঁজ তুলছে, কিন্তু ইভানোভা বুঝছে এই সব কিছুই তার অভিনয়।

৭

গ্যাম্‌ব্রিনাসে আবার যেন সেই সাবেক দিন ফিরে এল, মনে হতে লাগল যুদ্ধটুদ্ধ কিছু হয়নি। নাগাসাকিতে সাশকাও বন্দীটন্দী কিছু হয়নি। বেলুগা বা ধূসর মুলেটে এক ক্ষেপ ভাল মাছ ধরার পর মস্ত উঁচুমাথা বুট পরে জেলেরা আবার তেমনি ফুর্তি করতে আসতে লাগল, চোরেদের মেয়ে বন্ধুরা এসে আবার তেমনি নাচতে লাগল, এবং সাশকাও আগের মত পৃথিবীর সব জায়গাকার নাবিকদের গান বাজাতে লাগল।

কিন্তু সব কিছু ওলোটপালট করে দেবার মত কিসের যেন আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যায় শহরের সকল রাস্তা একেবারে লোকজন ভরে গেল, কেবল কালো মাথা, গুঞ্জন আর তাড়াহুড়া ঃ যেন বিপদসূচক কোন ঘণ্টা শুনেছে ওরা। হাতে হাতে সব প্রচারপত্র চালান দিচ্ছে, আর মুখে মুখে সব বলাবলি করছে অতি বিস্ময়কর একটি কথা ঃ 'স্বাধীনতা,' সবাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে বিশ্বাস করছে, আর বার বার উচ্চারণ করছে 'স্বাধীনতা।'

আনন্দের বন্যা এসে গেল যেন দেশে, সে আনন্দের ঢেউ গ্যাম্‌ব্রিনাসের পাতালপুরীতে গিয়েও পৌঁছল। এখন যারা গ্যাম্‌ব্রিনাসে আসতে লাগল তার মধ্যে দেখা গেল অনেক ছাত্র আছে, মজুর আছে, আর আছে সুন্দরী তরুণী

সব মেয়ে। মদের পিপেগুলি কত কি-ই না দেখল তাদের জীবনে, এখন তাদের উপর দাঁড়িয়ে উদ্দীপ্ত চোখে চেয়ে লোকে বক্তৃতা দিতে লাগল। তারা যা বলছে শ্রোতারা যে তার সব কিছুই বুঝতে পারলে তা নয়, তবু যে আন্তরিকতা নিয়ে তারা সব আশা আর প্রীতির বাণী শোনাচ্ছে—সে আন্তরিকতা সবার হৃদয়ই স্পর্শ করল।

সাশকা, 'মারসেই' বাজাও, জোরসে বাজাও 'মারসেই'।

ফরাসী-রুশ সন্ধি উৎসবে গভর্ণর যে 'মারসেই' বাজনার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে বাজনার সঙ্গে এ 'মারসেই'এর অনেক তফাৎ। রাস্তার উপর দিয়ে গান গাইতে গাইতে লাল নিশান হাতে শোভাযাত্রার পর শোভাযাত্রা চলেছে, মেয়েরা লাল ফিতা পরেছে, হাতে তাদের লাল ফুল। সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে দেখা হলেও লোকে মিষ্টি হাসি হেসে তার করমর্দন করছে।

কিন্তু হঠাৎ সমস্ত আনন্দ যেন এক নিমেষে মিলিয়ে গেল, সমুদ্রতীরে শিশুপদ চিহ্নের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একদিন বেঁটে মোটা এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার হাঁসফাঁস করতে করতে গ্যাম্‌ব্রিনাসে এসে হাজির হলেন, চোখ দুটি তাঁর যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, মুখখানা পাকা মজা টমাটোর মত লাল।

কি? মালিক কে এখানকার? রূঢ় কণ্ঠে যেন ধমকে উঠলেন তিনি, মালিককে চাই আমি এখনই।

সাশকা তার বেহালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল ওর উপর ঃ

তুমি মালিক এখানকার? চুপ! কি? তুমিই-ই বুঝি এখানে জাতীয় সঙ্গীত বাজাও, আর কোন জাতীয় সঙ্গীত হবে না এখানে, বুঝলে?

সাশকা শান্ত কণ্ঠে বললে, না হুজুর, আর জাতীয় সঙ্গীত হবে না।

এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার রেগে মুখ লাল করে তর্জনী নাড়তে নাড়তে সাশকার নাকের ডগায় নিয়ে গিয়ে বললেন, কোন রকমের জাতীয় সঙ্গীত নয়।

আজ্ঞে, হুজুর, কোন রকমের নয়।

দাঁড়াও, বিপ্লব শুরু করা দেখাচ্ছি আমি তোমাদের! বলেই হঠ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি, গ্যাম্‌ব্রিনাসের লোকগুলি কিছুক্ষণ ভয়ে বিস্ময়ে যেন কাঠ হয়ে রইল।

শহরে একটা স্থায়ী নিরানন্দের ভাব দেখা দিল। চারিদিকে যা অস্পষ্ট গুজব, তা শুনলে গা শিউরে ওঠে, মাথা ঘুরে যায়। লোকে অতি সাবধানে কথা বলে ঃ তাদের ভয় সামান্য একটা চাউনির ভিতর দিয়েই যদি মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে; নিজেদের ছায়া দেখেই নিজেরা চমকে ওঠে, নিজেদের ভাবনাকে বুঝি তারা ভয় করে চলে। শহর পায়ের নীচেকার সমুদ্র তটের যে নোংরা জলায় এতদিন তার দেহের বিষাক্ত মল ত্যাগ করে এসেছে এই প্রথম

তা থেকে সে ভয় পেতে শুরু করলে। সুন্দর জমকালো দোকানগুলির কাঁচের জানলার উপর বোর্ড এ'টে দেওয়া হল, উ'চু উ'চু মনুমেণ্টগুলির পাশে পাহারাওয়ালা মোতায়েন করা হল, বড় বড় বাড়ির সামনে কামান বসানো হল, কি জানি বলা ত যায় না। আর এদিকে শহরের বাইরের দিকে নোংরা দুর্গন্ধময় কু'ড়েঘরে বা জলপড়া চিলেঘরে ঈশ্বরের প্রিয় অথচ বাইবেলের ক্রুদ্ধ ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত জনগণ ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, তাদের বিশ্বাস জীবনপাত্র নিঃশেষ করে দুঃখের গরল পান করা তাদের এখনও শেষ হয়নি।

নীচে সমুদ্রের ধারে আঠার মত লেগে থাকা আঁধারের মধ্যে নর্দমার মত রাস্তাগুলিতে কি সব গোপন ষড়যন্ত্র চলেছে। সারা রাত সরাইখানা, চায়ের দোকান আর ভাড়া দেওয়া রাতকাটানোর ঘরগুলির দরজা খোলা।

পরদিন সকালে ইহুদী-নিধন অভিযান শুরু হল। দুদিন আগে যারা ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃত্বের আনন্দে বিভোর হয়ে স্বাধীনতার প্রতীক নিয়ে পথে বেরিয়েছিল, আজ তারাই বেরিয়েছে হত্যা করতে। এই হত্যা করতে তাদের কেউ যে হুকুম দিয়েছে তা নয়, ইহুদীদের যে তারা ঘৃণা করে তা-ও নয়, এদের সঙ্গে বরং তাদের বেশ বন্ধুত্বের ভাবই আছে, কোন লাভের আশায় তারা যে এ কাজ করতে যাচ্ছে, তা-ও নয়, কারণ সেটা অনিশ্চিত; প্রত্যেক মানুষের মনে যে নোংরা পাজি শয়তান বাস করে সে-ই এদের কানে চুপি চুপি বলছে, যাও, নিষিদ্ধ হত্যার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে, নারীধর্ষণ বিলাসে বা অপরের জীবনের উপর ক্ষমতালাভে আর তোমাদের বাধা নেই।

এই নিধনযজ্ঞের সময় সাশকা তার মুখে ইহুদীজনোচিত অদ্ভুত মজাদার ভাব রেখেই শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে, একটা আঁচড় পর্যন্ত তার গায়ে পড়েনি। অটল নির্ভীকতায় ভরা তার মন, ভয়কে সে ভয় বলে মনে করে না, পৃথিবীতে যত কামান আছে সবগুলির একত্রিত শক্তির চেয়েও মনের এ শক্তি আত্মরক্ষায় অধিকতর কার্যকরী। কিন্তু একদিন মারমুখী জনতা যখন হিমবাহের মত ছুটে আসছিল রাস্তা দিয়ে, সাশকা তখন তাদের গতিপথ থেকে সরে একটা বাড়ির দেয়ালের গা ঘে'ষে দাঁড়িয়েছিল। সাশকাকে দেখে লাল শার্ট আর সাদা এ্যাপ্রন-পরা এক পাথরকাটা মিস্ত্রী হঠাৎ তার বাটালি উ'চু করে গর্জে উঠল, এই যে, একটা ইহুদী, সাবাড় কর ওকে, ওর রক্তের রঙ দেখি।

কিন্তু তখনই কে যেন তার হাত ধরে ফেলে বললে, থাম্, হতভাগা, দেখছিস না এ সাশকা? মাথায় একেবারে গোবর পোরা তোর!

মিস্ত্রী থামল। সেই মদিরাবিহ্বল বিকৃত উন্মত্ত অবস্থার সময় সে যেকোন লোককে খুন করতে পারত, হোক না সে তার বাপ, ভাই বা পুরোহিত, এমন কি হন না কেন সেই গোঁড়া ভগবান নিজে; আবার কেউ যদি এই সময় হুকুমের সুরে তাকে কিছু বলত, তা-ও সে একটা অনুগত শিশুর মত পালন করত।

সে বোকার মত ফিক্‌ফিক্ করে একটু হাসল, একবার থুথু ফেলল, তারপর

জামার আস্তিন দিয়ে নাকটা একটু মুছে নিল। কিন্তু তখনই তার নজরে পড়ল, ছোট্ট একটি সাদা কুকুর সাশকার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। তখনই নিচু হয়ে সে কুকুরটার পেছনের পা ধরে উপরে তুলে তার মাথাটা ফুটপাতের পাথরে আছাড় দিয়ে দৌড়তে শুরু করলে। সাশকা নীরবে একদৃষ্টে চেয়ে রইল লোকটির দিকে ঃ লোকটি তখনও দৌড়ে চলেছে, মাথাটা তার সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে, মুখটা হাঁ-করা, চোখ দুটি গোল গোল আর উন্মত্ততায় সাদা বাহু দুটি প্রসারিত, মাথার টুপি কোথায় উড়ে গেছে। 'স্নো-ড্রপের' ফাটা মাথার হাড় রক্ত ঘিলু এসে সাশকার বুটে লেগেছে, একটা রুমাল দিয়ে সে তা মুছে ফেললে।

৮

এর পর এমন একটা অদ্ভুত অবস্থা এল যাকে কেবল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ঘুমের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সন্ধ্যার পর শহরের কোন ঘরের জানলায়ই আর আলো দেখা যায় না, কিন্তু কাফেগুলির সাইনবোর্ড এবং সরাইখানার জানলায় আলো জ্বল জ্বল করতে থাকে; বিজেতারা এখনও সরকারের কাছ থেকে পূর্ণমাত্রায় যথেচ্ছাচার করবার অধিকার পায়নি, তাই তারা নিজেদের কতটা ক্ষমতা আছে তাই একবার পরখ করে দেখছিল। মাথায় মাঞ্চুরিয়ার ফার ক্যাপ পরে আর জ্যাকেটের বোতামের ঘরে সেণ্ট-জর্জ রিবন এঁটে উচ্ছৃংখল দুর্দান্ত সব লোক প্রত্যেক রেঁস্তরায় ঢুকে নিতান্ত বর্বরের মত 'জনগণের জাতীয় সঙ্গীত' বাজাতে জবরদস্তি করছিল, শুধু তাই নয় এই সুর বাজাবার সময় সকলে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতেও বাধ্য করছিল। লোকের বাড়িতে জোর করে ঢুকে তারা তাদের খাট বিছানা ড্রয়ার হাতড়ে কি সব খুঁজছিল, টাকা, ভদকা আর 'জনগণের জাতীয় সঙ্গীত' গাইবার জন্য জুলুম করছিল। তা ছাড়া বেশি মদ খেয়ে এসেছিল বলে বমি করে ঘরদোর সব নোংরা দুর্গন্ধময় করে তুলছিল।

একদিন দশজন এই ধরনের লোক এসে গ্যাম্‌ব্রিনাসে ঢুকল, দুটো টেবিল অধিকার করে বসল তারা। কাউকে যেন তারা গ্রাহ্যই করে না, পরিবেশক ভৃত্যদের সঙ্গে যে সুরে কথা বলতে লাগল, তা অতিমাত্রায় উদ্ধত; কোন রকম জানাশোনা নেই এমন লোকের কাঁধের উপর দিয়ে থুথু ফেলতে লাগল তারা, অপরের বসবার জায়গায় পা-ই তুলে দিল; বিয়ার দিয়ে গেলে তা মেঝেতে ঢেলে ফেলে দিয়ে বলে পচা। সবাই ভাবে এরা পুলিশের চরই হবে! তা ছাড়া জল্লাদদের দেখলে যে এক রকম ভয় আর গা-ছম্‌ছমে কৌতূহল জাগে, ঠিক

সেই রকম ভাব জাগতে থাকে সবার মনে। ওদের একজনকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে-ই হচ্ছে দলের নেতা। এর নাম নস্যিখোর মোতকা। মোতকার নাকটা ভাঙা, মাথার চুল লাল, নাকী সুরে কথা বলে সে, আগে ইহুদী ছিল, পরে খৃস্টান হয়েছে। গায়ে নাকি এর অসুরের মত বল, আগে চোর ছিল, তারপর পতিতালয়ে বিঘ্নকারীদের তাড়ানোর কাজ নিল, তারপর পর পর হল কোট্‌না আর পুলিশের গুপ্তচর।

সাশকা ব্লিজার্ড বাজাচ্ছিল এমন সময় নস্যিখোর মোতকা তার কাছে এগিয়ে তার ডান হাতটা জোরে চেপে ধরে হলের দিকে ফিরে বললে, আমরা জাতীয় সঙ্গীত শুনতে চাই, জনগণের জাতীয় সঙ্গীত। আমাদের মহামান্য সম্রাটের সম্মানার্থে—জাতীয় সঙ্গীত।

ফার-ক্যাপ-পরা গুণ্ডাগুলিও সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, হাঁ জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত।

আর একজন কে যেন একেবারে দূরের কোণ থেকে কি করবে বুঝতে না পেরে লজ্জানম্র কণ্ঠে বলে উঠল, জাতীয় সঙ্গীত!

সাশকা তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, কোন জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে না এখানে।

নস্যিখোর অমনি গর্জে উঠে বললে, কি? আমার আদেশ অমান্য করবার সাহস রাখ তুমি? নোংরা জংলী ইহুদী ভূত!

সাশকা নস্যিখোরের কাছাকাছি মুখটা নিয়ে চোখ মুখ কুঁচকে বেহালার আঙুল চালানোর জায়গাটা ধরে বলে উঠল, তুমি কি বটে হে?

কেন, আমার সম্বন্ধে কি বলতে চাও তুমি?

আমি যদি নোংরা জংলী ইহুদী হই ত, তুমি কি?

আমি ত একজন গোঁড়া খৃস্টান।

খৃস্টান? কত পেয়েছ বল ত এর জন্যে?

—শুনে গ্যাম্‌ব্রিনাসের লোক সব হো হো করে হেসে উঠল আর নস্যিখোর মোতকা রাগে গরগর করতে করতে তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর কম্পিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোথায় কার কাছ থেকে শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করে বললে, ভাই সব, আর কতদিন আমরা আমাদের সম্রাট এবং পবিত্র ভজনালয়ের প্রতি ইহুদীদের এই অত্যাচার সহ্য করব?

সাশকা কিন্তু মঞ্চের উপর উঠে সেই নস্যিখোরকে আবার তার দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করলে, গ্যাম্‌ব্রিনাসের লোকেরা কেউই কোনদিন ভাবতে পারেনি যে, যে সাশকা চিরকাল মজা করে মুখ ভেংচে এসেছে সে-ও এমন উদ্ধতভাবে শক্ত কথা শোনাবার ক্ষমতা রাখে।

আরে, এই কুকুরের বাচ্চা, মুখ ফেরা দেখি আমার দিকে, খুনেটা, একবার চেয়ে দেখ! বেশ দেখ তবে—!

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ব্যাপারটা ঘটে গেল। সাশকার বেহালা যেন হঠাৎ একটা দোল খেয়ে উপরে উঠে একটা ঝিলিক মেরে খুব জোরে ঝনঝন করে বেজে উঠল, আঘাতটা 'ফার-ক্যাপ' পরা দীর্ঘকায় লোকটির কপালের এক-পাশে লাগায় সে ঘুরে পড়ল। বেহালাটা তখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ওর হ্যাণ্ডেলটা শুধু সাশকার হাতে রয়ে গেছে। বিজয়গর্বে সেইটাই সে এখন জনতার মাথার উপরে তুলে ধরলে।

নস্যিখোর চিৎকার করে তার সঙ্গীদের ডাকলে : ভাই সব, ছুটে এস, সাহায্য কর আমায়।

কিন্তু তখন আর ছুটে এসে কোন লাভ নেই : সাশকার চারিদিকে তখন মানুষের বলিষ্ঠ বেষ্টনী। যারা সাশকাকে আটকে রাখলে তারাই ফার-ক্যাপ পরা লোকগুলিকেও দূরে হটিয়ে দিলে।

এক ঘণ্টা পরে দিনের কাজ শেষ করে সাশকা যখন বিয়ারের দোকান থেকে বেরিয়ে এল, অনেক লোক একসঙ্গে তখন তাকে আক্রমণ করলে, একজন তার চোখে এক ঘুষি লাগিয়ে হুইসিল বাজালে, তারপর পুলিশ ছুটে আসতেই তাদের বললে, একে 'বুলভার স্টেশনে' নিয়ে যাও। অপরাধ রাজনৈতিক।... এই আমার ব্যাজ।

৯

সবাই ভাবলে, সাশকাকে আবার হারালাম আমরা, এবার আর ফিরে আসবে না সে। বিয়ারের দোকানের পাশেই ফুটপাথের উপর যে কাণ্ডটা হল, একজন নিজের চোখে তা দেখছিল, সে এসে আর সবার কাছে সব কিছুই বললে। গ্যাম্‌ব্রিনাসে যারা রোজ আসে তারা সবাই পাকা ঘাগী, এই 'বুলভার স্টেশন' যে কি বস্তু, আর পুলিশের গুপ্তচরদের প্রতিহিংসা যে কি ভয়ঙ্কর তা তারা বেশ ভালভাবেই জানে।

এবার কিন্তু সাশকার ভাগ্য নিয়ে তারা আর প্রথমবারের মত উদ্বেগ বোধ করলে না, তার কথা ভুলেও গেল শিগগির। দু মাস পরেই তার জায়গায় এক নতুন বেহালাবাজিয়েকে নেওয়া হল। সে অবশ্য সাশকারই শিষ্য।

প্রায় মাস তিনেক পরে বসন্তের এক শান্ত প্রদোষে গ্যাম্‌ব্রিনাসে যখন 'প্রত্যাশা' ওয়ালজটার বাজনা চলেছে, তখন কে একজন ভীত কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল, আরে, দেখ দেখ সাশকা এসেছে!

সবাই ঘুরে উঠে দাঁড়াল পিপে থেকে। হাঁ, সাশকাই ত বটে! মৃতের রাজ্য

থেকে এই দ্বিতীয়বার উঠে এল সে, কিন্তু এ কি জংলী চেহারা হয়েছে তার, সারা মুখ ভর্তি দাড়ি! সবাই ছুটে গিয়ে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল, জড়িয়ে ধরলে, বিয়ারের মগ ঠেলে দিতে লাগল তার হাতে। কিন্তু যে লোকটা তাকে প্রথম দেখেছে সেই আবার হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, দেখ, দেখ ওর হাতের দিকে একবার চেয়ে দেখ!

তখনই আনন্দের উত্তেজনা থেমে গেল। দেখা গেল সাশকার বাঁ হাতের কনুইটা দুমড়ানো, খুব সম্ভব থেঁতলা করে দিয়েছে কেউ, ওটা চেপে রেখেছে সে নিজের গায়ের সঙ্গে। দেখে মনে হচ্ছে ও হাতটা ওঠাতে নামাতে পারে না সে, হাতের আঙুলগুলি থুতনির কাছে অনড় হয়ে রয়েছে।

সারা গায়ে লোমওয়ালা এক রুশীয় গেঁয়ো মাঝি সাশকার এ অবস্থা দেখে বলে উঠল, এ কি ব্যাপার হল, ভাই?

সাশকা উত্তর দিলে, ও কিছু নয়, বয়স হলে গিঁটটিট একটু আধটু বিগড়ে যায়, ঐরকম কিছু একটা হবে।

তাই নাকি?

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর দরদী মাঝিটা হঠাৎ বলে উঠল, তা হলে 'মেষপালক' বেরুল আবার? মেষপালক? নামটা শোনবামাত্র সাশকার চোখ দুটি আনন্দে চক্‌চক্‌ করে উঠল। সে তখনই তার সঙ্গতকারকে চিরদিনের অভ্যাসমত বলে উঠল, আরে এই, আরম্ভ কর 'মেষপালক', এক, দুই, তিন!

পিয়ানোবাদক এই ফুর্তির নাচের সুর তুলতে তখন-ই পিয়ানোয় ঠোক্কর মারতে শুরু করলে বটে কিন্তু পেছন ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালও একবার সাশকার দিকে। সাশকা তার যে হাতটা ভাল সেই ডান হাত দিয়ে তার পকেটের ভেতর থেকে হাতের তালুর মত বড় চারকোণা আয়ত এক যন্ত্র টেনে বের করলে, ওর আবার যে একটা শাখা-অংশ ছিল সেটা সে মুখে পুরে নিল, তারপর তার ভাঙা হাতের জন্যে সবটা না পারলেও যতটা পারলে বাঁ দিকে বেঁকে 'ওকারিনা'য় 'মেষপালক' নাচের মনমাতানো পাগল-করা সুর বাজাতে শুরু করল।

শ্রোতারা অমনি চারিদিক থেকে হা-হা-হা করে হেসে ফেটে পড়ল।

গেঁয়ো মাঝিটা অমনি বলে উঠল, ও ঠিক একটা শয়তান এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে প্রচণ্ড নৃত্য শুরু করল। মেয়ে পুরুষ যত খরিদ্দার ছিল সেখানে সবাই তার সঙ্গে যোগ দিলে। পরিবেশক ভৃত্যেরা মৃদু হেসে মুখের ভাব যথাসম্ভব সংযত রেখে পায়ে তাল দিতে লাগল। এমন কি মাদাম ইভানোভা পর্যন্ত তার কর্তব্য ভুলে এই মনমাতানো নাচের তালে তালে মাথা দোলাতে লাগল, আর আঙুল মটকাতে লাগল। এমন কি মনে হতে লাগল এতদিনের পুরানো, জীর্ণ, ছিদ্রযুক্ত গ্যাম্‌ব্রিনাসও বুঝি ভ্রূ কুঁচকে কৌতুকদৃষ্টিতে

পথের দিকে চাইছে। মনে হতে লাগল হাতভাঙা পঙ্গু সাশকার হাতের ঐ বাজে সরল হুইসিলটা পর্যন্ত যেন গান গেয়ে চলেছে—যে গানের ভাষা গ্যাম্‌-ব্রিনাসের বন্ধুগোষ্ঠীর এমন কি সাশকারও অবোধ্য।

ঠিকই ত! মানুষকে পঙ্গু করা যায়, কিন্তু শিল্পকে কেউ কোনদিন নষ্ট করতেও পারে না, দাবিয়ে রাখতেও পারে না।

১৯০৭

পান্না

বিচিত্রদেহ অনুপম কদমগতি-অশ্ব খলস্টোমারের স্মরণে—

।।১।।

রজতধূসর দীর্ঘকায় মার্কিন ধাঁচের রেসের এঁড়ে ঘোড়া পান্নার বয়স সবে চার, মাঝ রাত্রে অন্যাদিনের মত জেগে উঠল সে তার আস্তাবলে। তার ডাইনে বাঁয়ে এবং যাতায়াতের পথটার এধারে ওধারে আর আর সব ঘোড়ারা খড় চিবুচ্ছে, বেশ লোভীর মতই কচমচ করে খাচ্ছে, আর খড়ের ভিতরকার ধুলোবালিতে যখনই নাকে সুড়সুড়ি লাগছে, তখনই ঘোঁৎ করে শব্দ করে উঠছে। সহিসটা ঘরের এক কোণে খড়ের গাদার উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। দিন বদল দেখে আর নাকডাকানি শুনেই বুঝতে পেরেছে পান্না যে এ হচ্ছে তরুণ সহিস ভ্যাসিলি। ভ্যাসিলিকে ঘোড়াগুলি একেবারে পছন্দ করে না ঃ ও আস্তাবলে সিগারেট খেয়ে কড়া তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে, প্রায়ই মাতাল হয়ে এসে ওদের পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারে, চোখে ঘুষি মারে, দড়ি ধরে জোরে হেঁচকা টান দেয়, তাছাড়া অস্বাভাবিক নাকী সুরে ওদের ভয় দেখিয়ে ধমকায়।

পান্না তার কামরার দরজার দিকে একটু এগিয়ে গেল। তার কামরার সামনেই উল্টো দিকের কামরায় দাঁড়িয়ে কালো তরুণ মাদী ঘোড়া স্মার্ট,—এখনও তার দেহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি। পান্না অন্ধকারে তার দেহটা দেখতে পায় না, কিন্তু যখনই স্মার্ট তার খাবার থেকে মুখ তুলে দাঁড়ায় তখনই দেখা যায় তার বড় বড় চোখ থেকে কেমন সুন্দর এক বেগুনে আলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ঝিলিক মেরে যায়। পান্না বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাইরের বাতাসটা টেনে নিল নাক দিয়ে, এতে পুরোপুরি না হলেও অল্প একটু স্মার্টের গায়ের গন্ধের আমেজ পাওয়া যায়, নিঃশ্বাসটা টানবার পরই সে একবার অল্প একটু হ্রেষারব করে উঠল। স্মার্টও তৎক্ষণাৎ তার দিকে ফিরে প্রীতিকম্পিত চঞ্চল মৃদু আনন্দ রবে তার প্রত্যুত্তর দিলে।

তখনই পান্নার কানে এল পাশের আর একটি ঘোড়া ঈর্ষায় জ্বলে ক্রুদ্ধ শ্বাস ফেললে। এ হচ্ছে বয়স্ক তেজী পালের ঘোড়া ওনেগিন। ওনেগিন এখনও শহরের রেসে মধ্যে মধ্যে দৌড়ায়। এই দুটো পুরুষ ঘোড়ার মধ্যে পাতলা

কাঠের এক পার্টিশান, কেউ কাউকে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু পান্না তার নাকটা পার্টিশানের একেবারে কিনারে নিয়ে যাওয়ায় ওর্নেগিনের নিঃশ্বাসের দ্রুত সঞ্চারিত বাতাসে তার চিবানো খড়ের গন্ধ বেশ নাকে আসতে লাগল তার। দুই ঘোড়ারই রাগ ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল, দুই ঘোড়াই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টেনে টেনে পরস্পরের গাত্রগন্ধ শুঁকতে লাগল, ঘাড় বেঁকিয়ে কান দুটো খাড়া করে তুললে তারা। তারপরে হঠাৎ দুটিতেই উচ্চকণ্ঠে হ্রেষারব করে মেঝের উপর পা ঠুকতে লাগল।

সহিস তার পূর্বাভ্যাস মত তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলে, আরে মলো যা, থাম না।

দুটি ঘোড়াই তখন ভয় পেয়ে দরজা থেকে পেছিয়ে গিয়ে কান দুটি খাড়া করে রইল। এই দুটি ঘোড়ার মধ্যে শত্রুতা অনেক দিনের, কিন্তু তিনদিন আগে ঐ কালো মাদী ঘোড়াটা তাদের সঙ্গে একই আস্তাবলে রাখার পর থেকে এমন দিন নেই যে, তারা বড় রকমের ঝগড়া মারামারি করে না, মাদী ঘোড়াকে অবশ্য সাধারণত তাদের আস্তাবলে রাখা হয় না, রেস্ শুরু হবার আগে যখন নানা গণ্ডগোল চলে, ঘোড়া রাখবার জায়গার টানাটানি পড়ে যায় তখনই বাধ্য হয়ে এমনি করতে হয়। পান্না আর ওর্নেগিন ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর পুকুরে যেমন ঝগড়া মারামারি করে তেমনি আস্তাবলেও করে। পান্না ঐ আত্মপ্রত্যয়শীল বিপুলকায় পালের ঘোড়া ওর্নেগিনকে মনে মনে একটু ভয় করেই চলে, ওর গায়েই যেন কেমন বদ্‌ঘোড়ার গন্ধ, তাছাড়া দেখতে কি ভয়ঙ্কর : উটের মত মস্ত বড় গলা, দৃঢ়নিবদ্ধ গম্ভীর দুটি চোখ, সর্বোপরি ওর মজবুত গঠন : বছরের পর বছর রেসে দৌড়ে আর অন্য ঘোড়ার সঙ্গে লড়াই করে করে ওর দেহটা যেন শক্ত ইস্পাত হয়ে গেছে।

না, ওকে সে একটুও ভয় করে না, মনে মনে এইরকম ভাবতে চেষ্টা করে পান্না খড়ের গামলায় মুখ ঢুকিয়ে দিলে, তারপর তার নরম নমনীয় ঠোঁট দিয়ে খড় নাড়াচাড়া করতে লাগল। প্রথমে সে শুধু খড়ের ডগাগুলি কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল, কিন্তু প্রায় তখনই তার জাবর কাটার স্বাদের কথা মনে পড়ায় সে পরমোৎসাহে জাবর কাটতে শুরু করে দিল। এই সময় ধীরে ধীরে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত সব চিন্তা তার মনে ভেসে আসতে লাগল—কত মূর্তি, গন্ধ, শব্দ, এগুলি কোন আঁধার রাজ্য থেকে মনে ভেসে আসে, কিছুক্ষণ থেকে আবার কোন আঁধার রাজ্যে মিলিয়ে যায়।

খড়। প্রথমে খড়ের কথা মনে হল তার, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সহিস নাজারের কথা মনে পড়ে গেল তার। আগের রাত্রে সে তার খড় দিয়ে গেছে।

নাজার বুড়ো বটে কিন্তু বড় খাঁটি লোক, সে কাছে এলেই কেমন কালো রুটি আর মদের গন্ধ পাওয়া যায় তার গা থেকে; বেশ আস্তে আস্তে নরম পায়ে চলে সে। তার তত্ত্বাবধানে থাকবার সময় ওট, খড় সবকিছুই যেন মিষ্টি লাগে, আর

তার কথাগুলিও কি মিষ্টি ঃ দলন মলন করবার সময় মৃদু মিষ্ট তিরস্কারের সুরে সে কত কি বলে। কিন্তু ঘোড়ার সবচেয়ে যা বেশি দরকার তাই সে দিতে পারে না, তা তার নেই; পান্নাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবার সময়ই পান্না তা বুঝতে পারে ঃ নাজারের আত্মপ্রত্যয় নেই, ঠিক মত চালাতে জানে না সে।

ভ্যাসিলিরও এ গুণ নেই, সে চিৎকার করে ঘোড়াদের ধমকায় আর মারে বটে, কিন্তু তারা সবাই জানে সে একটা কাপুরুষ, তারা তাকে ভয়ই করে না। ভ্যাসিলি ঠিক মত চড়তেও জানে না, ওদের পিঠে উঠে কেবল ঝাঁকি দেয় আর বড্ড বেশি নড়চড় করে। তৃতীয়, ঐ কানা সহিসটা ওদের দুজনের চেয়ে ভাল, কিন্তু সে ঘোড়াদের ভালবাসে না ঃ নিষ্ঠুর সে, অধীর; হাত দুটি তার যেন কাঠের মত শক্ত। চতুর্থ, এ্যান্দ্রিয়াশ্‌কা একটা বাচ্চা;—ঘোড়ার যে ছোট বাচ্চা এখনও দুধ খায়, তারই মত সে ঘোড়াদের সঙ্গে খেলা করতে চায়, কেউ কাছে না থাকলে ও চুপি চুপি গিয়ে ওদের উপরের ঠোঁট আর নাকের মধ্যিখানটায় চুমু দেয়, ঘোড়াগুলি এ সব পছন্দ করে না, তা ছাড়া এ কি পাগলামি!

কিন্তু ঐ যে দাড়িগোঁফ কামানো সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা রোগা একটু কুঁজো সহিসটা, সে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা। সে নিজেই যেন একটা চমৎকার ঘোড়া, যেমনি তার বুদ্ধি তেমনি তার বল, তেমনি সে নির্ভীক। কখনও রাগ করে না, চাবুক মারে না, এমন কি চাবুক দেখিয়ে শাসায় না পর্যন্ত; কোন রাগী ঘোড়াকেও যখন সে চালায়, তখন তার জোরাল নিপুণ আঙুলের টানে চলতে সেই রাগী ঘোড়ারও যেন রোমাঞ্চ লাগে, বুকটা ভরে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে এক ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়। তার আঙুলগুলি যেন যাদু জানে। এই লোকটিই কেবল দ্রুত ছুটিয়ে পান্নার দেহের সকল পেশীকে সমানভাবে সঞ্চালিত করে একটা সুখকর অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে, পান্না তখন যেন আনন্দে উড়ে চলে।

পান্নার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রেস-কোর্সে যাবার সেই ছোট্ট পথটা, পথের ধারের প্রত্যেকটি বাড়ি, বাড়ির পাশের প্রত্যেকটি পাথর, দৌড়ের জন্য তৈরি বালু ছড়ানো পথ, থামবার যায়গা, ছুটন্ত সব ঘোড়া, সবুজ ঘাস আর হলদে ফিতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার তিন বৎসর বয়সের সেই ঘন পাটল ঘোড়াটার কথা,—সেদিন তাকে ব্যায়াম করাবার সময় তার পায়ের গাঁটটা মচকে গেছে, সেই অবধি সে খোঁড়া হয়ে রয়েছে। পান্না তার কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে নিজেই একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে নিল।

পান্নার মুখের মধ্যে হঠাৎ এক গোছা খড় এসে গেল, তার চমৎকার গন্ধ। পান্না বেশ করে সেটা চিবুলে,—তারপর যখন সেটা গিলে ফেললে তখন তার মুখের মধ্যে যেন শুকনো ফুল আর তীব্রগন্ধি কোন ঘাসের সুবাস পেতে লাগল সে। মনের মধ্যে অমনি অনেক দূরের কি যেন এক অস্পষ্ট স্মৃতি ভেসে আসতে লাগল। ধূম্রপায়ী লোক অনেক সময় এ রকমটি অনুভব করে ঃ রাস্তায় যেতে যেতে সিগারেটে একটা টান দিতেই হয়ত মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে যায়

সেকেলে ওয়ালপেপারে ছাওয়া একটা দরদালানের কথা, কাবার্ডের উপর রাখা একটা বাতিতে তার আঁধার সম্পূর্ণ দূর করতে পারছে না. অথবা মনে পড়ে তালে তালে ঘুঙুরের বাজনা শুনতে শুনতে সে রাত্রিতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে চলেছে, মধ্যে মধ্যে একটু ঝিমিয়ে পড়ছে, অথবা যেতে যেতে একটু পরে একটু সবুজ বনের ভেতর এসে গেছে সে, তারপর কেবল চক্‌চকে বরফ, যুদ্ধের হৈ-চৈ, আর যুদ্ধের প্রবল আগ্রহে তার হাঁটুর কাঁপুনি। অতীতের এই সব বিস্মৃত ঘটনা একদিন কতই না উন্মাদনা এনেছে, এখন মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠে, মনের কোণে কিছুটা আনন্দ কিছুটা বেদনার স্পর্শ বুলিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

জাবনা খাওয়ার গামলার উপরে যে ছোট্ট কালো রঙের জানলা আছে, সেটা তখনও দেখা না গেলেও সেখানটার রঙটা যেন একটু ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে, অন্ধকারের মধ্যেই তার অস্তিত্বটা যেন তখন প্রকাশ পাচ্ছে। ঘোড়াদের জাবর-কাটার গতি একটু মন্থর হয়ে এসেছে, ওরা একটার পর আর একটা কেমন কোমল গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। বাইরে তীক্ষ্ম শিঙা-নাদের মত সুউচ্চ কণ্ঠে সানন্দে একটা মোরগ ডেকে উঠল, বেশ কিছুক্ষণ পরে দূরে নিকটে আরও অনেক মোরগ ডাকতে লাগল।

২

পান্নার দেহ আর পায়ের গঠন একেবারে নিখুঁত, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমায় সে, মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে একটু হেলে দোলে। মধ্যে মধ্যে সে একটু চমকে ওঠে, গভীর নিদ্রা তখন তার তন্দ্রাতে পরিণত হয়; কিন্তু একটু আগে ঐ যে সে সামান্য একটুক্ষণ গাঢ় ঘুম ঘুমিয়ে নেয় ওতেই তার দেহের প্রত্যেক পেশী, স্নায়ু এবং চামড়ার অবসাদ দূর করে তাজা করে দেয়।

ভোরের একটু আগে স্বপ্ন দেখলে পান্নাঃ বসন্তের একটি প্রভাত,—ঊষার অরুণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিধারে,—মাঠের কি সুন্দর গন্ধ! ওখানকার ঘাস যেমন ঘন তেমনি পুষ্ট, সরস,—আবার সবুজও তেমনি,—প্রভাতের অরুণ আলো তাতে যেন একটু গোলাপীর আমেজ এনে দিয়েছে! মানুষই হোক আর পশুই হোক—শুধু তরুণ বয়সেই তাদের এ চোখে পড়ে। এর উপর আবার ওতে শিশির ঝলমল করছে। মৃদু বাতাস বইছে, তার সঙ্গে ওতে সব রকমের গন্ধ এক সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে,—সে এক অপূর্ব সুবাস। প্রভাতের শীতল আবহাওয়ায় গ্রামের কোন্ চিমনি থেকে ওঠা স্বচ্ছ নীল ধোঁয়া চক্রাকারে এসে

নাকে লাগছে; মাঠের প্রত্যেক ফুলের এক একটি বিশেষ রকমের গন্ধ,—বেড়ার ওধারে গাড়ির চাকার দাগকাটা। ভিজে রাস্তা থেকে এক মিশ্র গন্ধ বেরুচ্ছে: মানুষের গন্ধের সঙ্গে আলকাতরা, ঘোড়ার নাদ, ধুলো, পথ চলতি গরুর টাটকা দুধ, বেড়ার ধারের খুঁটো থেকে বেরুনো রজন সব কিছুর গন্ধ মিশে এক হয়ে গেছে।

সাতমাসের বাচ্চা পান্না—সেই মাঠের মাঝে মাথা নিচু করে পিছনের পা দুটো লাথি মারার মত করে ছুঁড়তে ছুঁড়তে শুধু শুধু ছুটছে। দেহটা যেন তার বায়ু দিয়ে তৈরি, ভার-টার যেন এর কিছু নেই। সাদা সুগন্ধি ক্যামোমিল ফুলগুলি তার পায়ের নিচে থেকে, তার পিছন থেকে দৌড়ে চলেছে। পান্না সূর্যের দিকে মুখ করে কদমে ছুটেছে।

ভিজে ঘাসের ছাট লেগে জানু আর পায়ের নিচেটা তার ঠাণ্ডা আর কালো হয়ে যাচ্ছে। উপরে তার নীল আকাশ, নিচে সবুজ ঘাস,—তা ছাড়া রয়েছে সোনালি সূর্য, চমৎকার বাতাস, যৌবনের উদ্দাম আনন্দ, শক্তি আর দ্রুতগতি।

হঠাৎ একটা সংক্ষিপ্ত স্নিগ্ধ আকুল হ্রেষারব কানে এল, তার,—এ রবটা তার এত পরিচিত যে হাজার হাজার অন্য রবের সঙ্গে শুনলেও দূর থেকেই সে বুঝতে পারত। রবটা শুনেই সে দৌড় থামিয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে মাথাটা উঁচু করল, তারপর সুন্দর কান দুটো একটু নেড়ে লেজটা দিয়ে ঝাঁটার মত ঝাপটা মেরে নিচু করল,—শেষে নিজের শীর্ণ পদ শীর্ণ দেহ কাঁপিয়ে বিলম্বিত ললিত সুরে সে-আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে মায়ের কাছে তীরের মত ছুটে গেল।

হাড়বেরুনো বয়স্ক গম্ভীর মাদী ঘোড়াটা ঘাস থেকে তার ভিজে নাকটা তুলে তার বাচ্চার গা-টা একবার তাড়াতাড়ি আচ্ছা করে শুঁকে নিয়ে আবার তখনই ঘাসে মুখ দিল,—ভাবটা যেন একটা জরুরি কাজে সে এখন ভীষণ ব্যস্ত। বাচ্চা তার গলাটা মায়ের পেটের নিচে বাড়িয়ে তার পিছনের দু পায়ের মাঝে মুখ দিয়ে পূর্বাভ্যাস মত অতি মধুর টকটক দুধে ভরা ঈষদুষ্ণ স্প্রিংয়ের মত বাঁটে টান দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ঈষদুষ্ণ দুধের শীর্ণধারা ফিনকি দিয়ে তার মুখে এসে পড়তে লাগল। বাচ্চা কেবলই খেয়ে চলেছে, কিছুতে থামতে চায় না,—শেষে মা তার বাঁট টেনে নিয়ে বাচ্চার কুঁচকিতে মারলে এক গুঁতো...।

আস্তাবলে দিব্বি আলো এসে গেছে এখন। লম্বা দাড়িওয়ালা গায়ে গন্ধ বেরুনো একটা পুরুষ ছাগল ঘোড়াদের সঙ্গে এক আস্তাবলেই থাকে; সে এবার এগিয়ে এল দরজার কাছে,—কিন্তু দরজাটা একটা হুড়কো দিয়ে বন্ধ করা থাকায় সে আর বেরিয়ে আসতে পারলে না,—পিছন ফিরে সহিসের মুখের দিকে চেয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকতে লাগল। ভ্যাসিলি খালি পায়ে তার এলোমেলো চুলের মাঝে আঙুল দিয়ে মাথাটা চুলকাতে চুলকাতে এসে দরজা খুলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে আস্তাবলের উষ্ণ বাষ্পের ঢেউয়ে দরজার আয়তক্ষেত্রের মত মুখটা একেবারে ভরে গেল। এদিকে শুভ্র তুষার আর শুকনো পাতার মৃদু গন্ধও আসতে লাগল আস্তাবলে।

এবার ওট দেওয়া হবে বুঝতে পেরে ঘোড়ারা সব নিজের নিজের খোপের দরজায় অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে লাগল। লোভী একগুঁয়ে ওনেগিন কাঠের মেঝের উপর পা ঠুকতে ঠুকতে গামলার কিনারের লৌহবেষ্টনীর ওখানটায় মুখ লাগিয়ে রইল, মধ্যে মধ্যে হাঁ করে ঢেঁকুর তুলতেও লাগল সে। পান্না লোহার শিকের গায়ে মুখ ঘষতে লাগল।

ভ্যাসিলি ছাড়া আরও যে চারটে সহিস আছে তারাও এসে গেল এবার, এসে খাবার টিন থেকে ওট দিতে লাগল। পান্নার গামলায় ওট দিচ্ছিল নাজার, খস্‌খস্‌ শব্দে ওট গামলায় পড়বার সময়ই পান্না বুড়ো সহিসের মাথার উপর দিয়ে বগলের নিচু দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তা খাবার চেষ্টা করছিল, খাবার আগ্রহে তার ঈষদুষ্ণ নাসারন্ধ্র থর থর করে কাঁপছিল। শান্ত পান্নার এই খাবার আগ্রহ নাজার বেশ উপভোগ করে তাই এই আগ্রহ জাগিয়ে রাখবার জন্যে সে ইচ্ছা করেই ওট দিতে দেরি করছিল, গামলাটা আটকে রাখছিল নিজের কনুই দিয়ে।

খোশ মেজাজে সে পান্নাকে আদরের ধমক দিয়ে বলছিল, তবে রে পেটুক, আর তর সইছে না,– না? পাজিটা, আবার তুই নাক ঢোকা গামলায়! নাক ঢোকানো তোর বের করে দেব আমি।

গামলার উপরকার ছোট্ট জানলা দিয়ে সূর্যকিরণ বেঁকে এসে পড়ছে ঘরে ঃ যেন মস্তবড় একটা আলোর থাম হেলানো অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোটি কোটি স্বর্ণরেণু সে আলোর থামের মধ্যে ঘুর পাক খাচ্ছে, সার্শির লম্বা লম্বা ছায়া কেবল ওগুলিকে পৃথক করে দেখাচ্ছে।

৩

পান্নার ওট খাওয়া হয়ে গেলেই তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। ঠাণ্ডাটা একটু কমেছে, মাটি একটু নরম, দেয়ালের সব কিন্তু তখনও বরফে সাদা হয়ে রয়েছে। আস্তাবল থেকে ঘোড়ার নাদ সব বেলচা দিয়ে ঠেলে বাইরে আনা হয়েছে, তা থেকে ঘন ধোঁয়ার মত বাষ্প বেরুচ্ছে। চড়ুই পাখিরা আবার তার উপর এলোমেলো লাফালাফি আর কিচিরমিচির করছে, মনে হয় ঝগড়া করছে। দরজার কিনারে পা দিয়েই পান্না মাথাটা নিচু করে বাইরের সুগন্ধি বাতাস খানিকটা সানন্দে টেনে নিয়ে মাথা নেড়ে নাক দিয়ে জোরে শব্দ করে উঠল। নাজার অমনি তখনি বলে উঠল, ষাট্‌, ষাট্‌, ভগবান মঙ্গল করুন তোমার। পান্না স্থির থাকতে পারছিল না ঃ ভীষণ ছুটতে ইচ্ছা করছিল তার, বাইরের

বাতাস এসে তার নাকে চোখে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছিল, সে চাইছিল বুকটা তার বাতাসে হাপরের মত ফুলে ফুলে উঠে জোরে জোরে ধুক ধুক করতে থাকে। এই অবস্থায় লাইনের খুঁটিতে বাঁধা থাকায় আপত্তি জানাতে সে পেছনের পা দুটো ছুঁড়তে ছুঁড়তে হ্রেষা রব করে উঠল, তারপর ঘাড়টা বাঁকিয়ে মাথার উপর লাল শিরা বেরুনো গোল চোখে পেছনে একবার আড়চোখে চেয়ে নিল ঃ ওখানে বাঁধা ছিল সেই কালো মাদী ঘোড়াটা।

নাজার হাঁপাতে হাঁপাতে এক কেঁড়ে জল মাথার উপরে তুলে পান্নার গলা থেকে লেজ অবধি সমস্ত পিঠটার উপর ঢেলে দিল। এতে অভ্যস্ত আছে পান্না, জিনিসটা স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্তু জলটা না বলে কয়ে হঠাৎ গায়ে এসে পড়ে বলে ভীতিপ্রদও বটে। নাজার আরও জল নিয়ে এসে পান্নার পিঠের দুই পাশ, বুক, পা, লেজের নিচেটা সব ভিজিয়ে দিলে। প্রত্যেকবার ভিজাবার পরই সে তার শক্ত হাত দিয়ে ঘোড়ার গা থেকে জল সব চেপে চেপে বের করে দিতে লাগল। পান্না একবার পেছন ফিরে তার উঁচু ঈষৎ নোয়ানো নিতম্বটা দেখে নিল, জল লেগে ওখানটা একটু কালো দেখাচ্ছে, আর সূর্যকিরণে চিক্‌চিক্‌ করছে।

এটা ঘোড়দৌড়ের দিন। সহিসরা যেভাবে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোড়ার আশে-পাশে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে তাই দেখে পান্নাও বুঝতে পেরেছে সে কথা। ওরা কোন ঘোড়ার পায়ের একটু উপরে চামড়ার স্টকিং পরিয়ে দিচ্ছে, কারো পায়ের নিচের গাঁট থেকে জানু পর্যন্ত লিনেনের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে, কারো সামনের পায়ের খোড়লের ওখানটায় 'ফার'-ওয়ালা প্যাড লাগিয়ে দিচ্ছে। উঁচু আসনওয়ালা দু চাকার হালকা 'সালকী' গাড়িগুলি চালা থেকে বের করা হচ্ছে—ওদের চাকার ধাতুনির্মিত পাখিগুলি সূর্যকিরণে ঝকমক করছে,—সদ্য বার্নিশ করা লাল বেড় ও বমগুলিও চক্‌চক্‌ করছে।

এইবার প্রধান জকী বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে। সেই ইংরেজটা। পান্নার গা শুকিয়ে ব্রাশ করে দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া মেজেও দেওয়া হয়েছে পশমী কাপড় দিয়ে। শীর্ণকায় দীর্ঘবাহু ঈষৎ কুঁজো এই ইংরেজটাকে ভয় এবং সম্মান করে চলে যেমনি ঘোড়াগুলি তেমনি সব লোকে। পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো রোদে ঝলসানো দৃঢ় তার মুখ, পাতলা ঠোঁট দুটি যেন ঈষৎ ব্যঙ্গ-কুটিল। সোনার ফ্রেমের চশমা পরা নীলাভ চোখ দুটির দৃষ্টি তার যেমনি দৃঢ়, শান্ত তেমনি তীক্ষ্ণ। উঁচু বুটপরা লম্বা পা দুটো ফাঁক করে, পেণ্টুলনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে ঘোড়াদের পরিষ্কার ফিটফাট করা দেখছিল, মুখে একটা সিগার লেগেই আছে, সিগারটা একবার মুখের এ দিকে আর একবার ওদিকে সরাচ্ছে সে। গায়ে তার 'ফার-কলার'-ওয়ালা ধূসর রঙের জ্যাকেট, মাথায় লম্বা আয়ত-ক্ষেত্রের মত চূড়া লাগানো একটা কালো টুপি। মধ্যে মধ্যে কি এক রকম ঝাঁকুনি দিয়ে সামান্য দুই এক কথায় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করছে সে, সঙ্গে সঙ্গে সহিস

আর মজুরেরা সব তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে, ঘোড়ারাও সেই দিকে মন দিতে কান খাড়া করছে।

পান্নাকে ঠিকমত সাজানো হল কিনা সেই দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি। পান্নার মাথার সামনের চুল থেকে তার ক্ষুর অবধি সে ভাল করে পরখ করে দেখলে, সেই নিরীক্ষণ পরীক্ষার সময় পান্না গর্বভরে তার মাথাটা উঁচু করলে, নমনীয় গ্রীবাটা একটু বাঁকালে, এবং ঘষা কাঁচের মত ঈষৎ স্বচ্ছ পাতলা কান দুটো খাড়া করে রইল। জকী নিজেই তার জিনের পেটিটার নিচে আঙুল দিয়ে দেখে নিলে ঠিকমত আঁট হয়েছে কি না! এর পর সহিসরা ঘোড়াদের লাল বর্ডার দেওয়া ধূসর রঙের লিনেন পরাতে লাগল, ঐ কাপড়ের নিচে ঘোড়ার পেছনের পায়ের দিকে আবার লাল বৃত্ত আর মনোগ্রাম আঁকা। এর পর নাজার আর সেই কানা সহিস এই দুজনে পান্নার লাগাম ধরে সেই পরিচিত পথে সারি সারি পাথরের বাড়ির মধ্যে দিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়ে চলল। এই রাস্তাটা সিকি মাইলের একটু কম হবে।

মাঠে তখন আরও অনেক ঘোড়া এসে গেছে, সহিসরা তাদের বৃত্তাকার রঙ্গক্ষেত্রে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, হাঁটাচ্ছে—দৌড়ের সময় ঘোড়ারা যেমন করে চলে ঠিক তেমনি করে অর্থাৎ ঘড়ি যে মুখো হয়ে চলে তার উল্টো দিকে মুখ করিয়ে। মাঠের মধ্যবৃত্তে তারা লেজকাটা মজবুত পা-ওয়ালা ছোট ঘোড়াদের পায়চারি করাচ্ছে। ওদের মধ্যে একটা ছোট এঁড়ে ঘোড়াকে দেখেই পান্না চিনলে, ও পান্নার পাশে পাশে দৌড়ায়। ওরা পরস্পরকে দেখে মৃদু হ্রেষা রবে বন্ধুত্বের সম্ভাষণ জানাল।

৪

দৌড়ের মাঠে ঘণ্টা বেজে উঠল। সহিসরা এসে পান্নার গায়ের ঢাকনা খুলে নিল। চশমার নিচে দিয়ে সূর্যের দিকে মিটমিট করে চাইতে চাইতে, ঘোড়ার দাঁতের মত হলদে লম্বা দাঁতগুলি বের করে বগলের নিচে চাবুক নিয়ে দস্তানা বাঁধতে বাঁধতে ইংরেজটা এগিয়ে এল। পান্নার লেজের ঘন লম্বা চুলগুলি তার গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে পড়ে, একটা সহিস এসে সেগুলি সাল্‌কী-গাড়ির সিটের উপর তুলে দিলে, ওর ফিকে প্রান্তটুকু শুধু ঝুলে রইল। আরোহীর ভারে গাড়ির বম দুটি দুলে উঠল। পান্না তার কাঁধটা বাঁকিয়ে আড়চোখে দেখে নিলে—জকী তার নিতম্বের ঠিক পেছনে পা দুটি ফাঁক করে বম বরাবর বসে পড়েছে। জকী

ধীরে সুস্থে লাগামটা হাতে নিয়ে কি যেন একটা বললে, সঙ্গে সঙ্গে সহিসরা বলগা ছেড়ে দিলে। এখনই রেসে দৌড়তে পারবে এই আনন্দে পান্না যেই দ্রুত ছুটতে গেল অমনি লাগামে জোরাল হাতের টান পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু নাড়লে, তারপর মাঠ থেকে রেস-কোর্সে ঢুকবার যে গেটটা আছে তার ভিতর অনতিদ্রুত পুরো কদমে সেই দিকে দিকে ছুটল।

রেসের জন্য চিহ্নিত পথটা ঠিক যেন একটা ডিম্বাকার উপবৃত্ত, লম্বায় এক মাইল, পাশে পাশে চলেছে তার একটা কাঠের বেড়া। পথটা বেশ চওড়া, তার উপরে হলদে বালি ছড়ানো, বালি আবার একটু ভিজে ভিজে তাই জমাট, তার উপর দিয়ে চলতে গেলে যেন স্প্রিংয়ের মত ধাক্কা দেয়। ওর উপর দিয়ে সাল্‌কী-গাড়ি চালাতে গেলে গাড়ির গাটাপার্চা-টায়ারের সোজা রেখার মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ পড়ে দেখায় যেন একটা নক্সা পাড়।

প্রধান বিরতি স্থানের ওখানে রয়েছে একটা কাঠের গ্যালারি, একশোটা ঘোড়া লম্বালম্বি দাঁড়ালে যতটা জায়গা জোড়ে, ততটা জায়গা নিয়ে সেটা তৈরি। গ্যালারির তক্তাগুলি বসানো হয়েছে সব সরু সরু থামের উপর। মাটি থেকে সেই গ্যালারির ছাদ অবধি একেবারে মানুষে মানুষে ঠাসা, দেখা যাচ্ছে শুধু তাদের কালো মাথা। এখানে এসে লাগামের ঈষৎ একটু টানেই পান্না বুঝলে গতি পাল্টাতে পারে সে এবার, বুঝে আনন্দে সে একবার ঘোঁৎ করে উঠলে।

এইবার পান্না জোর কদমে ছুটতে আরম্ভ করল, পিঠটা তার একেবারে নড়ছে না বললেই হয়, গলা সামনের দিকে বাড়ানো, বাঁ বমের দিকে একটু বাঁকানো, মুখটা উপরে তোলা। খুব লম্বা লম্বা পা ফেলছে বলে দূর থেকে তাকে দেখে মনে হবে, সে মোটেই জোরে দৌড়াচ্ছে না, একজোড়া কম্পাসের মত তার সামনের দুটো পা দিয়ে সে শুধু দৌড়ের চিহ্নিত পথটার দূরত্ব মেপে চলেছে, ক্ষুর দিয়ে তার মাটিটা শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। মার্কিন পদ্ধতি এটা, এভাবে চললে ঘোড়ার নিঃশ্বাস নেওয়া সহজ হয়, বাতাসের বাধা যতদূর সম্ভব কম থাকে, তা ছাড়া বলহানিকর অনাবশ্যক সব গতিবেগের বালাই থাকে না এতে; বাইরের ঠাট তেমন দেখানো না গেলেও এতে মেলে স্বস্তি, অযথা শক্তিক্ষয় থেকে রেহাই, দম, আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সুযোগ। এমনি করে ঘোড়াকে একটা নিখুঁত যন্ত্রে পরিণত করা হয়।

দুটো রেসের মাঝের ইণ্টারভাল এটা; ঘোড়াদের চাঙ্গা করে করে নেওয়া হচ্ছিল, ওদের দমটা ঠিক করে নেওয়ার জন্য প্রত্যেক রেসের আগেই এ করা হয়। কতকগুলি ঘোড়া বহির্বৃত্তে দৌড়াচ্ছিল, আর কতকগুলি দৌড়াচ্ছিল অন্তর্বৃত্তে; বহির্বৃত্তের ঘোড়াগুলি পান্না যেদিকে ছুটছে—সেই দিকেই ছুটছিল আর ভিতর-বৃত্তের ঘোড়া ছুটছিল তার উল্টো দিকে। আসল ওরেল-জাতের ছিটছিট ছাই রঙের দীর্ঘকায় একটা ঘোড়া পান্নাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, তার বাঁকানো ঘাড়

আর ধূমকেতুর মত লেজ দেখে মনে হয় সে যেন একটা নাগরদোলার ঘোড়া। চওড়া মোটা বুকটা তখন তার ঘামে ভিজে কালো হয়ে গেছে, সামনের পা দুটো জানুর দিকে এগিয়ে দিয়ে চলবার সময় মোটা কুঁচকীর ওখানটা নড়ছে, আর প্রত্যেক পদক্ষেপে পিলে খট্‌খট্‌ করছে।

এর পর একটা দো-আঁসলা একহারা লম্বা মাদী ঘোড়া পেছন থেকে এসে পান্নার পাশাপাশি চলতে লাগল, এর কেশরগুলি কালো আর পাতলা। একেও পান্নার মত মার্কিন পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সহিসের সুপরিচর্যার ফলে এর পিঠটা চক্‌চক্‌ করছে, আর দৌড়বার সময় নিচের পেশিগুলি সঞ্চালিত হওয়ায় গায়ের চামড়া যেন মৃদু তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। এদের দুজন জকী নিজেদের ভিতর কি যেন বলাবলি করতে লাগল, আর এরা দুটি পাশাপাশি ছুটে চলল, যেতে যেতে পান্না একবার ওর গায়ের গন্ধ শুঁকে ওর সঙ্গে একটু খেলা করবার উদ্যোগ করলে, কিন্তু তার ইংরেজ জকী তাকে তা করতে দিলে না, পান্নাও অনুগতের মত তার নির্দেশ মেনে চলল।

মস্ত বড় একটা কালো পুরুষ ঘোড়া জোর কদমে ওদের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, ওদের উল্টো দিকে ছুটছিল সে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে পটি জড়ানো, জানুতে জানুত্রাণ, পায়ের খোড়লে গদি। তার গাড়ির বাঁয়ের বমটা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, কারণ সেটা ডাইনের বম থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি বড়; ঘোড়াটার মাথার উপরে একটা সরু চাকা আঁটা, সেই চাকায় আবার লোহার এক পেটি টান টান করে বাঁধা, উচ্ছৃঙ্খল অসংযতভাবে চলতে গেলে এটা নাকে লাগলে সে বশে এসে যায়। পান্না এবং মাদী ঘোড়াটা একসঙ্গেই ওর দিকে তাকিয়ে দেখলে এবং দুজনেই বুঝলে ঐ ঘোড়াটার বল, গতিবেগ এবং সহ্য-শক্তি যেমন অসাধারণ তেমনি ও একগুঁয়ে, অবাধ্য এবং বদরাগী। কালো পুরুষ ঘোড়াটার পিছু পিছু ছুটে এল একটা ছোট চটপটে ছাই রঙের পুরুষ ঘোড়া। পাশ থেকে দেখলে মনে হবে সে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটছে ঃ কারণ অতি দ্রুত সে পা ফেলছে, পা তুলে নিচ্ছে প্রায় হাঁটুর কাছে, আর সুন্দর সুগঠিত মাথা আর বাঁকা গলার ওখানটায় রয়েছে এক মহা ব্যস্ততা আর কঠোর উদ্যমের ভাব। পান্না একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দিকে আড়চোখে চেয়ে, যেতে যেতেই একটা কান একটু নেড়ে নিল।

সংক্ষিপ্ত হ্রেষা রবের মত উচ্চহাসি হেসে অপর ঘোড়ার জকীটা তার বক্তব্য শেষ করে নিল, তারপর মাদী ঘোড়াটার লাগাম দিলে ছেড়ে, মাদী ঘোড়াটা এমন শান্তভাবে পান্নাকে ছাড়িয়ে চলে গেল যে, দেখে মনে হবে ওকে ছাড়িয়ে যেতে তার একটুও কষ্ট করতে হয়নি, এর পর সে দ্রুত কদমে স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটে চলল, পেছন থেকে তার চক্‌চকে পিঠটা দেখা যেতে লাগল, সে পিঠ এত সমান যে, শিরদাঁড়ার রেখা দেখা যায়-কি-না-যায় বোঝা যায় না।

কিন্তু তখনই বৃহৎ তাকরাচিহ্নিত আগুনে-লাল রঙের একটি ঘোড়া পান্না

ধীরে সুস্থে লাগামটা হাতে নিয়ে কি যেন একটা বললে, সঙ্গে সঙ্গে সাহিসরা বলগা ছেড়ে দিলে। এখনই রেসে দৌড়তে পারবে এই আনন্দে পান্না যেই দ্রুত ছুটতে গেল অমনি লাগামে জোরাল হাতের টান পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু নাড়লে, তারপর মাঠ থেকে রেস-কোর্সে ঢুকবার যে গেটটা আছে তার ভিতর অনতিদ্রুত পুরো কদমে সেই দিকে দিকে ছুটল।

রেসের জন্য চিহ্নিত পথটা ঠিক যেন একটা ডিম্বাকার উপবৃত্ত, লম্বায় এক মাইল, পাশে পাশে চলেছে তার একটা কাঠের বেড়া। পথটা বেশ চওড়া, তার উপরে হলদে বালি ছড়ানো, বালি আবার একটু ভিজে ভিজে তাই জমাট, তার উপর দিয়ে চলতে গেলে যেন স্প্রিংয়ের মত ধাক্কা দেয়। ওর উপর দিয়ে সাল্‌কী-গাড়ি চালাতে গেলে গাড়ির গাটাপার্চা-টায়ারের সোজা রেখার মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ পড়ে দেখায় যেন একটা নক্সা পাড়।

প্রধান বিরতি স্থানের ওখানে রয়েছে একটা কাঠের গ্যালারি, একশোটা ঘোড়া লম্বালম্বি দাঁড়ালে যতটা জায়গা জোড়ে, ততটা জায়গা নিয়ে সেটা তৈরি। গ্যালারির তক্তাগুলি বসানো হয়েছে সব সরু সরু থামের উপর। মাটি থেকে সেই গ্যালারির ছাদ অবধি একেবারে মানুষে মানুষে ঠাসা, দেখা যাচ্ছে শুধু তাদের কালো মাথা। এখানে এসে লাগামের ঈষৎ একটু টানেই পান্না বুঝলে গতি পাল্টাতে পারে সে এবার, বুঝে আনন্দে সে একবার ঘোঁৎ করে উঠলে।

এইবার পান্না জোর কদমে ছুটতে আরম্ভ করল, পিঠটা তার একেবারে নড়ছে না বললেই হয়, গলা সামনের দিকে বাড়ানো, বাঁ বমের দিকে একটু বাঁকানো, মুখটা উপরে তোলা। খুব লম্বা লম্বা পা ফেলছে বলে দূর থেকে তাকে দেখে মনে হবে, সে মোটেই জোরে দৌড়াচ্ছে না, একজোড়া কম্পাসের মত তার সামনের দুটো পা দিয়ে সে শুধু দৌড়ের চিহ্নিত পথটার দূরত্ব মেপে চলেছে, ক্ষুর দিয়ে তার মাটিটা শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। মার্কিন পদ্ধতি এটা, এভাবে চললে ঘোড়ার নিঃশ্বাস নেওয়া সহজ হয়, বাতাসের বাধা যতদূর সম্ভব কম থাকে, তা ছাড়া বলহানিকর অনাবশ্যক সব গতিবেগের বালাই থাকে না এতে; বাইরের ঠাট তেমন দেখানো না গেলেও এতে মেলে স্বস্তি, অযথা শক্তিক্ষয় থেকে রেহাই, দম, আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সুযোগ। এমনি করে ঘোড়াকে একটা নিখুঁত যন্ত্রে পরিণত করা হয়।

দুটো রেসের মাঝের ইণ্টারভাল এটা; ঘোড়াদের চাঙ্গা করে করে নেওয়া হচ্ছিল, ওদের দমটা ঠিক করে নেওয়ার জন্য প্রত্যেক রেসের আগেই এ করা হয়। কতকগুলি ঘোড়া বহির্বৃত্তে দৌড়াচ্ছিল, আর কতকগুলি দৌড়াচ্ছিল অন্তর্বৃত্তে; বহির্বৃত্তের ঘোড়াগুলি পান্না যেদিকে ছুটছে—সেই দিকেই ছুটছিল আর ভিতর-বৃত্তের ঘোড়া ছুটছিল তার উল্টো দিকে। আসল ওরেল-জাতের ছিটছিট ছাই রঙের দীর্ঘকায় একটা ঘোড়া পান্নাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, তার বাঁকানো ঘাড়

আর ধ্মকেতুর মত লেজ দেখে মনে হয় সে যেন একটা নাগরদোলার ঘোড়া। চওড়া মোটা বুকটা তখন তার ঘামে ভিজে কালো হয়ে গেছে, সামনের পা দুটো জানুর দিকে এগিয়ে দিয়ে চলবার সময় মোটা কুঁচকীর ওখানটা নড়ছে, আর প্রত্যেক পদক্ষেপে পিলে খট্‌খট্‌ করছে।

এর পর একটা দো-আঁসলা একহারা লম্বা মাদী ঘোড়া পেছন থেকে এসে পান্নার পাশাপাশি চলতে লাগল. এর কেশরগুলি কালো আর পাতলা। একেও পান্নার মত মার্কিন পদ্ধতিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সহিসের সুপরিচর্যার ফলে এর পিঠটা চক্‌চক্‌ করছে, আর দৌড়বার সময় নিচের পেশিগুলি সঞ্চালিত হওয়ায় গায়ের চামড়া যেন মৃদু তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। এদের দুজন জকী নিজেদের ভিতর কি যেন বলাবলি করতে লাগল, আর এরা দুটি পাশাপাশি ছুটে চলল. যেতে যেতে পান্না একবার ওর গায়ের গন্ধ শুঁকে ওর সঙ্গে একটু খেলা করবার উদ্যোগ করলে, কিন্তু তার ইংরেজ জকী তাকে তা করতে দিলে না, পান্নাও অনুগতের মত তার নির্দেশ মেনে চলল।

মস্ত বড় একটা কালো পুরুষ ঘোড়া জোর কদমে ওদের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, ওদের উল্টো দিকে ছুটছিল সে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে পটি জড়ানো. জানুতে জানুত্রাণ, পায়ের খোড়লে গদি। তার গাড়ির বাঁয়ের বমটা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, কারণ সেটা ডাইনের বম থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি বড়; ঘোড়াটার মাথার উপরে একটা সরু চাকা আঁটা, সেই চাকায় আবার লোহার এক পেটি টান টান করে বাঁধা, উচ্ছৃঙ্খল অসংযতভাবে চলতে গেলে এটা নাকে লাগলে সে বশে এসে যায়। পান্না এবং মাদী ঘোড়াটা একসঙ্গেই ওর দিকে তাকিয়ে দেখলে এবং দুজনেই বুঝলে ঐ ঘোড়াটার বল, গতিবেগ এবং সহ্য-শক্তি যেমন অসাধারণ তেমনি ও একগুঁয়ে, অবাধ্য এবং বদরাগী। কালো পুরুষ ঘোড়াটার পিছু পিছু ছুটে এল একটা ছোট চটপটে ছাই রঙের পুরুষ ঘোড়া। পাশ থেকে দেখলে মনে হবে সে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটছে ঃ কারণ অতি দ্রুত সে পা ফেলছে, পা তুলে নিচ্ছে প্রায় হাঁটুর কাছে, আর সুন্দর সুগঠিত মাথা আর বাঁকা গলার ওখানটায় রয়েছে এক মহা ব্যস্ততা আর কঠোর উদ্যমের ভাব। পান্না একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দিকে আড়চোখে চেয়ে. যেতে যেতেই একটা কান একটু নেড়ে নিল।

সংক্ষিপ্ত হ্রেষা রবের মত উচ্চহাসি হেসে অপর ঘোড়ার জকীটা তার বক্তব্য শেষ করে নিল, তারপর মাদী ঘোড়াটার লাগাম দিলে ছেড়ে, মাদী ঘোড়াটা এমন শান্তভাবে পান্নাকে ছাড়িয়ে চলে গেল যে. দেখে মনে হবে ওকে ছাড়িয়ে যেতে তার একটুও কষ্ট করতে হয়নি, এর পর সে দ্রুত কদমে স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটে চলল. পেছন থেকে তার চক্‌চকে পিঠটা দেখা যেতে লাগল, সে পিঠ এত সমান যে, শিরদাঁড়ার রেখা দেখা যায়-কি-না-যায় বোঝা যায় না।

কিন্তু তখনই বৃহৎ তাকরাচিহ্নিত আগুনে-লাল রঙের একটি ঘোড়া পান্নার

এবং মেয়ে ঘোড়াটাকে প্লুতগতিতে চলে ছাড়িয়ে গেল। ঘন ঘন বড় বড় লাফ দিয়ে ছুটছিল সে, লাফ দেবার সময় দেহটা প্রসারিত করে মাটিকে যেন আলিঙ্গন করছিল সে, পরক্ষণেই তার সামনের এবং পেছনের পা উপরে এসে যেন মিলে মিলে যাচ্ছিল। ওর জকী ওর পেছনের দিকে না বসে যেন ওর ওপর শুয়ে পড়েছিল, তার দেহের সমস্ত ভার পড়ছিল যেন লাগামের উপর। পান্না চঞ্চল হয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে গেল কিন্তু ওর ইংরেজ জকী তখনই লাগামের টানে ওকে ভিতরে নিয়ে এল ঃ অন্য সময় যে হাত ঘোড়ার স্বচ্ছন্দগতিতে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল এবং নমনীয় সে হাত যেন অকস্মাৎ একেবারে লোহার মত কঠিন হয়ে উঠল। প্রধান বিরতি স্থানের ওখানে আগুনে লাল ঘোড়াটা আর একটা চক্কোর দিয়ে পান্নাকে আবার ছাড়িয়ে গেল। সে তখনও প্লুতগতিতে ছুটছিল বটে. কিন্তু গা তার তখন ঘামে ভিজে গেছে. চোখ দুটি রাঙা হয়ে উঠেছে, নাক দিয়ে কেমন ঘড় ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে। জকী তার পিঠের উপর নুয়ে পড়ে কেবলই তাকে চাবুক লাগাচ্ছে। শেষে গেটের কাছে সহিসরা ঘোড়াটাকে আটকে তার লাগাম বলগা ধরে ফেললে। সহিসরা তাকে যখন সেখান থেকে নিয়ে গেল তখন তার গা দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে, গা কাঁপছে তার. কয়েক মিনিটের মধ্যে তার দেহের ভার অনেকটা কমে গেছে।

পান্না আর আধ চক্কোরের মত পুরো কদমে চলে পাশের একটা রাস্তা দিয়ে দৌড়ের চিহ্নিত পথটা আড়াআড়ি পার হয়ে গতিবেগ কমিয়ে পাশের মাঠে বেরিয়ে এল।

৫

ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘন ঘন কয়েকবার ঘণ্টা বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়-পাল্লার ঘোড়াগুলি বিদ্যুৎগতিতে গেটের ভিতর দিয়ে ছুটে এল। গ্যালারির লোকেরা অমনি ঘন ঘন করতালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। লিনেনে ঢাকা কান নাড়তে নাড়তে মাথাটা একটু নুয়ে পান্না বেশ ফুর্তির ভাব নিয়ে নাজারের পাশে অন্য ঘোড়াদের সঙ্গে এক লাইনে এসে দাঁড়াল। এতক্ষণ ব্যায়ামের ফলে দেহের উষ্ণ রক্তের ধারা যেন তার ধমনী তোলপাড় করছে, নিঃশ্বাস হয়েছে গভীর ও সরল, জড়তা ক্লান্তি কেটে গিয়ে দেহে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, এখন দেহের প্রতি পেশী যেন তার আর একটা দৌড়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। আবার ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার জকী হাতে

দস্তানা না পরেই সাল্‌কীতে চড়ল। ওর চওড়া ফরসা হাত দুটি যেন যাদু জানে, ঐ হাত পান্নার মনে একই সঙ্গে ভয় বিস্ময় আর প্রীতির উদ্রেক করে। ইংরেজ জকী ধীরে সুস্থে দৌড়ের জন্য চিহ্নিত পথে প্রবেশ করল, আর আর ঘোড়ারা তখন তাদের ব্যায়াম শেষ করে সেখান থেকে পাশের মাঠে সরে যাচ্ছে। ওখানে রইল শুধু পান্না আর দৌড় পরখ করে দেখবার সময় যে কালো পুরুষ ঘোড়াটার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেই। গ্যালারিগুলির নিচে থেকে উপর পর্যন্ত একেবারে লোকে ঠাসা, অসংখ্য কালো মাথার স্তূপের মধ্যে উঁকি মারছে কতকগুলি ফরসা চঞ্চল মুখ আর হাত, মেয়েদের ছাতা আর টুপি, ফরফর করছে প্রোগ্রামের সাদা কাগজ। প্রধান বিরতি স্থানটা ছাড়াবামাত্রই পান্না বুঝলে হাজার হাজার লোক তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, আরও বুঝলে ওরা চায় সে খুব জোরে ছুটুক, পুরো দমে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটুক, এতে তার মনে ওদের চিত্ত জয় করবার আগ্রহ জাগিয়ে দেহের পেশীগুলিকে করে তুলল অতি-মাত্রায় দৃঢ় ও চঞ্চল। ডাইনে তার পাশাপাশিই একটা বাচ্চা জকী পিঠে নিয়ে বিচ্ছিন্ন প্লুতগতিতে ছুটে চলেছে সেই সাদা পুরুষ ঘোড়াটা।

স্থির কদমে চলতে চলতে পান্নার দেহটা একটু বাঁয়ে বেঁকে গেল। একটা দস্তুর মত বাঁকা জায়গা পার করতে হল তার। লাল বৃত্ত-আঁটা খুঁটিটার কাছে আসতেই মাঠে অল্পক্ষণের জন্য একটা ঘণ্টাধ্বনি হল। ইংরেজ জকী তার আসনটায় একটু নড়ে বসলে, হঠাৎ তার হাত দুটি কঠোর হয়ে উঠল। তার হাতের টান যেন বলে উঠল, হাঁ, এবার ছোটো, কিন্তু দম বাঁচিয়ে, পুরো ছুটবার সময় এখনও হয়নি। পান্না যে তার ইঙ্গিত বুঝেছে তা জানাবার জন্য তার পাতলা স্পর্শকাতর কান দুটি মুহূর্তের জন্য পেছনে এনে আবার তখনই তা খাড়া করলে। সাদা পুরুষ ঘোড়াটা প্লুতগতিতে তার পাশাপাশি সামান্য একটু পেছনে ছুটেছে, তার নিঃশ্বাস তালে তালে পান্নার কাঁধে এসে লাগতে লাগল।

লাল পোস্ট ছাড়িয়ে গেল পান্না, এবার আর একটা কঠিন বাঁক, তারপরেই চিহ্নিত পথটা বেশ সোজা হয়ে গিয়েছে, ওখানেই দ্বিতীয় গ্যালারি, তাতে কালো মাথার ভিড় আর সাদা মুখের গুঞ্জরণ, প্রতি পদক্ষেপেই গ্যালারিটা বড় হয়ে উঠছে চোখে। লাগামের টানেই পান্না বুঝলে, জকী বলছে জোরে, আর একটু জোরে। প্রাণপণ শক্তিতে ছুটবার আগ্রহ জাগল পান্নার মনে, কিন্তু তখনই আবার মনে হল, এখনই ঠিক হবে কি? জকীর ঐন্দ্রজালিকের হাত যেন স্নিগ্ধ স্বরে তার উত্তর দিয়ে বললে, না, এখন নয়, এখনও সময় হয়নি, উত্তেজিত হয়ো না, আর একটু পরে।

দুটো ঘোড়াই ঠিক একই সেকেণ্ডে প্রাইজ পোস্টটা ছাড়িয়ে গেল, অবশ্য দুটি দুই প্রান্ত দিয়ে। পান্নার একটু বাধা সৃষ্টি করছিল শক্ত দড়িটা, বেশ ব্যথা লাগছিল তার দেহে, মুহূর্তের জন্য তাই সে কান দুটো খাড়া করল, কিন্তু

পরক্ষণেই সে ব্যথা ভুলে জকীর হাতের নির্দেশ শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। হাঁ, আর একটু জোরে। কিন্তু উত্তেজিত হয়ো না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিক মত ছুটবে, লাগামের টানে হুকুম পাঠালে জকী। গ্যালারীর কালো মাথাগুলি যেন দুলছে, পিছনে পড়ে রইল গ্যালারী। কয়েক কুড়ি গজ যাবার পর পান্না, ছোট্ট সাদা ঘোড়াটা, ইংরেজ জকী এবং রেকাবের উপর দাঁড়ানো ঘোড়ার গায়ে লেপটে পড়া সেই বাঘা জকীটা—এই চারটি মিলে যেন একটা অখণ্ড বস্তু হয়ে ছুটতে লাগলঃ সম ইচ্ছা, সম ক্ষিপ্রবেগ, সঙ্গীতের সমতালের মত সম ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপ। পান্নার ক্ষুর থেকে তালে তালে শব্দ হচ্ছে—টা, টা, টা, টা, আর বাচ্চা জকীর ঘোড়ার পা থেকে সমতালে শব্দ বেরুচ্ছে, ট্রা, টা, ট্রা, টা। আরও জোরে ছুটব কি? পান্না জানতে চাইলে, ইংরেজ জকীর হাত উত্তর দিলে, হাঁ, ছোটো কিন্তু মাথা ঠিক থাকে যেন!

গ্যালারি পেছনে পড়ে রইল, ওখান থেকে দর্শকেরা সব চিৎকার করছে, সেই চিৎকার শুনে পান্নার মাথা গরম হয়ে গেল, লাগামের টান ভুলে মুহূর্তের জন্য যে সাধারণ ছন্দোবদ্ধ কদমে সে চলেছিল—তার কথা ভুলে চারটা লম্বা লাফ দিলে। সঙ্গে সঙ্গে লাগামের কঠিন টানে মুখটা তার যেন ছিঁড়ে গেল, ঘাড়টা যেন মোচড় খেল, মুখটা গেল ডাইনে বেঁকে। যে প্লুতগতিতে সে চলতে চেয়েছিল, সে চলা তার কঠিন হয়ে উঠল। পান্না রেগে গেল, প্লুতগতি সে ছাড়বে না, কিন্তু জকী তার সেই মুহূর্তের মেজাজ বুঝতে পেরেই শান্ত কঠিন টানে আবার তাকে কদমে ফিরিয়ে আনলে। গ্যালারি আবার পিছনে পড়ে গেছে, আবার সেই আগের মত কদমে চলতে লাগল, জকীর হাতের লাগামের টানও তাই আবার বন্ধুর হাতের টানের মত নরম হয়ে এল। নিজের অপরাধের কথা বুঝতে পেরে পান্না দ্বিগুণ বেগে কদমে ছুটতে চাইলে। জকী খোশ মেজাজেই লাগামের টানে জানিয়ে দিলে, না, এখনও নয়, শুধরাবার সময় পাওয়া যাবে। সব ঠিক আছে।

এর পর আর ভুলভ্রান্তি না করে ওরা আরও দেড় চক্কোর ঘুরে এল। কিন্তু সেই কালো পুরুষ ঘোড়াটাও সেদিন বেশ ভাল দৌড়াচ্ছিল। পান্না যখন ভুল করে বসলে সে তখন ওকে ছয় ধাপ ছাড়িয়ে গিয়েছে, এখন পান্না তাকে ক্রমেই ধরে ফেলছিল, শেষ পোস্টটার আগের পোস্টে ওরা যখন পৌঁছল তখন পান্না ওর চেয়ে সোয়া তিন সেকেণ্ডের পথ আগে আগে চলেছে। জকীর হাত তখন লাগামের টানে হুকুম দিলে, হাঁ, এখন তুমি ছুটতে পার, যত জোরে পার। পান্না কান খাড়া করে বিদ্যুৎগতিতে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে নিলে। ইংরেজ জকীর মুখ তখন দৃঢ়সংকল্পে জ্বলজ্বল করছে, দৃঢ়নিবদ্ধ পীত দশন-শ্রেণী উন্মোচিত করে ক্ষৌরমসৃণ ওষ্ঠাধর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 'জোরে, আরও জোরে!' সাইরেনের শব্দ যেমন ক্রমেই চড়া পর্দায় উঠতে থাকে তেমনি ক্রমোচ্চ কম্পিতকণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল, ও-ই-ই-এ।

দৌড়ের তালে তালে বাচ্চা জকীও চিৎকার করে উঠল,, হাঁ, হাঁ, হাঁ, হাঁ!

প্রতিযোগিতা এবার চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছল, এক চুলের ফারাক চলেছে যেন, যে কোন মুহূর্তে একে অন্যকে হারিয়ে দিতে পারে। পান্নার পা মাটির উপর সমতালে শব্দ করে চলেছে—ট্রা-টা-টা-টা! আর তার সামনে দ্রুতগতি সাদা ঘোড়াটা শব্দ করে চলেছে,—ট্রারা,-ট্রারা-ট্রারা। পান্না ক্রমেই তার কাছে এগিয়ে আসছে। সাল্‌কী গাড়ির নমনীয় বোম দৌড়ের তালে তালে দুলছে আর এদিকে বাচ্চা জকী তার ঘোড়ার উপর শুয়ে পড়লেও তার দ্রুতগতির বেগে দুলে দুলে উঠছে।

জোর বাতাস তার কানের ভিতর যেন বাঁশি বাজাচ্ছে, নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, নাকের ভিতর দিয়ে ভলকে ভলকে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নেওয়া ক্রমেই কষ্ট হয়ে উঠছে তার। গায়ের চামড়া গরম। পান্না শেষ বাঁকটা ঘুরে এল, সমস্ত দেহটা তার এখন ভেতরের দিকে নোয়ানো। সামনের গ্যালারিটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সহস্র কণ্ঠের উৎসাহধ্বনি তাকে এবার ভীত, উত্তেজিত, গর্বিত করে তুলছে, আর সে কদমে ছুটতে পারে না, এবার দ্রুতগতি শুরু করতে চললে সে, কিন্তু পেছনের ঐন্দ্রজালিক হাতটা অমনি তাকে অনুনয় করে, হুকুম দিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠল, লক্ষ্মীটি, এ করতে নেই, দোহাই তোমার, এ করো না,...হাঁ, এই ত, এই ত, ঠিক হয়েছে, এই ত চাই।...ক্ষিপ্র-গতিতে বিজয় নির্ধারক স্থানের দড়ি কেটে বেরিয়ে গেল সে, দড়িটা দেখতেই পায়নি সে চোখে। প্রধান বিরতি স্থান থেকে বজ্রনাদী জলপ্রবাহের ন্যায় উচ্চ হর্ষধ্বনি, হাস্যরব আর অভিনন্দন বর্ষিত হতে লাগল। চঞ্চল মুখ আর হাতের উপর এসে পড়তে লাগল মেয়েদের ছাতা, টুপি, লাঠি, প্রোগ্রামের সব সাদা কাগজ। ইংরেজ জকী হাতের লাগাম ছেড়ে দিলে, তার ভঙ্গি দেখে পান্নার মনে হল সে যেন বলছে, পান্না শেষ হল এবার, সাবাস বেটা! পান্না তার গতিভঙ্গি পালটে এবার হাঁটতে আরম্ভ করলে। কালো ঘোড়াটা ওর সাত সেকেণ্ড পরে পাল্লা শেষ করবার জায়গায় এসে পৌঁছল।

অতি কষ্টে অবশ পা দুটা তুলে ইংরেজ জকী তার সাল্‌কী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লে, ভেলভেট-মোড়া আসনটা সে হাতে করে ওজন দিতে দাঁড়িপাল্লার কাছে নিয়ে গেল। সহিসরা ছুটে এসে পান্নার ঘর্মসিক্ত পিঠের উপর একটা কাপড় দিয়ে দিলে, তারপর তাকে বাইরের মাঠে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। বিচারক ঘণ্টা বাজিয়ে উচ্চ বিলম্বিত কণ্ঠে তার বিজয় ঘোষণা করলেন, সমবেত জন-মণ্ডলী হর্ষধ্বনি করে উঠল। এদিকে পান্নার মুখ থেকে তখন ফিকে হলদে রঙের ফেনা ঝরে পড়ছে মাটিতে আর সহিসদের হাতে।

কয়েক মিনিট পর পান্নার সাজ খুলে আবার তাকে বড় গ্যালারির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। লম্বা ওভারকোট আর চক্‌চকে নতুন টুপি পরা দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোককে পান্না প্রায়ই আস্তাবলে আসতে দেখত, তিনি এসে এবার

পান্নার গলা চাপড়ে আদর করে নিজের হাতে মস্ত বড় এক চাংড়া চিনি তার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন। ঐ ইংরেজ জকীটাও ওখানে ঐ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে তার লম্বা দাঁত বের করে হাসছিল, আর চোখ মুখ কোঁচকাচ্ছিল। পান্নার গা থেকে কাপড়টা তুলে নিয়ে তাকে একটা কালো কাপড়ে ঢাকা তেপায়া বাক্সের সামনে আনা হল, ছাই রঙের পোশাক পরা একটা লোক ঐ বাক্সের নিচে মাথা ঢুকিয়ে কি যেন করতে লাগল।

এর পর গ্যালারি থেকে ঝেঁটিয়ে সব লোকে নেমে আসতে লাগল, কেবল কালো মাথা আর কালো মাথা; এসে তারা ঘোড়ার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করল। ক্রোধে উত্তেজনায় মুখ তাদের রাঙা হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, সেই অবস্থায় পরস্পরের দিকে চেয়ে তারা চেঁচামেচি করতে লাগল। কি একটা ব্যাপারে তাদের ভীষণ রাগ হয়ে গেছে ঃ পান্নার পা, মাথা এবং দুই পাশে তারা আঙুল চালিয়ে দিতে লাগল, পাছার বাঁ দিকের যেখানটা ওর তপ্ত লোহা দিয়ে চিহ্নিত করা, সেইখানটা কুঁচকে কুঁচকে দেখতে লাগল তারা। এর পর সবাই আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, এ জাল ঘোড়া, মেকি, যত সব জোচ্চুরি কারবার। আমাদের টাকা ফিরিয়ে দাও! পান্না এ সবই শুনলে, কিন্তু বুঝলে না কিছুই, অস্থির হয়ে ঘন ঘন সে শুধু কান নাড়তে লাগল। সে বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল ঃ কি বলে এরা সব? ভাল দৌড়াইনি আমি? সেই মুহূর্তে তার চোখ পড়ল ইংরেজ জকীর মুখের দিকে। তার কঠিন ঈষৎ ব্যঙ্গে ভরা স্বভাবশান্ত মুখখানা যেন রাগে জ্বলছে, হঠাৎ ঈষৎ ধরা গলায় সে কি যেন বলে হাতটা উঁচুতে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের কলরব ছাপিয়ে একটা মোক্ষম চড়ের শব্দ শোনা গেল।

৬

এর পর পান্নাকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হল; সেখানে তিন ঘণ্টা পরে তাকে ওট খেতে দেওয়া হল, তারপর সহিসেরা যখন তাকে কুয়োর ধারে জল খাওয়াচ্ছিল তখন সে দেখলে বেড়ার ওধার থেকে মস্ত বড় এক হলদে চাঁদ উঠছে, দেখে কেমন যেন তার ভয় ভয় করতে লাগল।

এর পরই দুঃখের দিন শুরু হল।

ব্যায়াম করাবার জন্যে অথবা রেসে দৌড়াবার জন্যে আর তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না। প্রতিদিনই নতুন নতুন সব লোক আসে, সবাই তার

অচেনা; তারা এসে ওকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ওর সারা গা পরীক্ষা করে : মুখে আঙুল ঠেলে দেয়, পিউমিস দিয়ে ওর গা ঘষে আর জোর গলায় কি সব বলাবলি করে।

তারপর ওর মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যার পর ওকে আস্তাবল থেকে বের করে অসংখ্য জনশূন্য রাস্তা দিয়ে কারা ওকে নিয়ে চলল, তারপর মনে পড়ে কতকগুলি বাড়ির কথা, সেগুলির জানলার ভিতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল, তারপর মনে পড়ে রেলওয়ে স্টেশন, আঁধার ঘুপসী জিরজিরে একটা ওয়াগন, মনে পড়ে দেহের ক্লান্তির কথা, এতদূর চলে পাগুলি তার কাঁপছিল, বেশ মনে পড়ে রেলগাড়ির শিটি, রেলের উপর দিয়ে গাড়ি চলবার ঝনঝনানি, শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া, আর দোদুল্যমান লণ্ঠনের বিষণ্ণ আলো। তারপর ঐ লোকগুলি তাকে ওয়াগন থেকে বের করে অচেনা রাস্তা দিয়ে শরতের রিক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে নিয়ে চলল, কত গ্রাম পার হয়ে তারা শেষে তাকে একটা অচেনা আস্তাবলে এনে বন্দী করল, এখানে আর অন্য কোন ঘোড়া রইল না।

প্রথম প্রথম সে আগেকার সেই রেসের দৌড়, ইংরেজ জকী, ভাসিলি, নাজার এবং ওনেগিনের কথা ভাবত, মধ্যে মধ্যে এদের স্বপ্নও দেখত, তারপর ধীরে ধীরে এদের সবার কথাই ভুলে গেল। সে বেশ বুঝতে পারত তাকে যেন কার কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে, তার সুঠাম সুন্দর দেহ ক্রমে মিইয়ে পড়তে লাগল, শুকিয়ে যেতে লাগল, একেবারে নড়চড় না করতে পারায় স্বাস্থ্য তার একেবারে ভেঙে গেল। প্রায়ই নতুন নতুন লোক তার চারিদিকে ভিড় করে ঠেলাঠেলি করে তাকে পরীক্ষা করত, আর নিজেদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা করত।

মধ্যে মধ্যে সে তার ঘরের দরজা দিয়ে দেখত আর আর ঘোড়ারা খোলা মাঠে হাঁটছে বা দৌড়াচ্ছে, নিজের মনের রাগ দুঃখ জানিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যেই একবার ডেকে উঠবে মনে করত সে, অমনি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত, আবার সেই একঘেয়ে কাল গোণা।

যে লোকটা ওর আস্তাবলটা দেখাশুনা করত, মাথাটা তার মস্ত বড়, চোখ দুটি যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু, গোলগাল মোটা মোটা মুখে সরু কালো একটা জোড়া গোঁফ, আর ছোট কালো দুটি চোখ। পান্নার কোন খোঁজখবরই সে একরকম নিত না, তবু কেন না জানি পান্না তাকে বড় ভয় ›

একদিন খুব ভোরে আর আর সহিসরা যখন ঘুমুচ্ছে তখন এই লোকটা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে পান্নার আস্তাবলে এসে তার গামলায় কিছু ওট রেখে আবার তক্ষুনি চলে গেল। পান্না এতে একটু আশ্চর্য হলেও ঐ ওট খেতে আরম্ভ করল। ওটগুলি খেতে মিষ্টি হলেও কেমন যেন একটু তেতো তেতো, কেমন যেন বিস্বাদ লাগল মুখে। পান্না খেতে খেতেই ভাবলে, আশ্চর্য, এমন ওট ত আমি কোনদিন খাইনি!

এর পরই হঠাৎ তার পেটটা যেন ভীষণ ব্যথা করে উঠল। একটু পরেই থামল ব্যথা, কিন্তু তখনই আবার শুরু হল। প্রতি মিনিটে ব্যথাটা বেড়ে বেড়েই উঠতে লাগল। শেষে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। পান্না ধীরে ধীরে কাতরাতে লাগল, চোখের সামনে সে আগুনের চাকা দেখতে লাগল, হঠাৎ দৌর্বল্যে তার সারা গা ঘেমে উঠল, পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, তার পরই দড়াম করে পড়ে গেল সে মাটিতে। উঠতে সে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু চেষ্টা করেও কিছু সে করতে পারল না. সামনের পা দুটা একটু উঁচু করেই আবার সে কাৎ হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মাথার ভিতর তার যেন এক ঘূর্ণী বয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে ঘোড়ার মত লম্বা দাঁত বের করা ইংরেজ জকীর মূর্তিটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, এর পর দেখলে সে মস্ত বড় টুঁটি বেরুনো ওনেগিনকে, ওনেগিন উচ্চ একটা হ্রেষা রব করেই কোথায় মিলিয়ে গেল। কোন এক অদৃশ্য শক্তি নিষ্ঠুর নির্মম আকর্ষণে তাকে যেন এক হিমশীতল অন্ধকার গুহায় টেনে টেনে নিয়ে চলেছে। আর নড়তে পারলে না সে।

হঠাৎ তার পা আর গলায় খিল ধরে গেল, পিঠটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে এল। সারা গা থর থর কাঁপতে লাগল, গা থেকে উগ্রগন্ধি ঘাম বেরুতে লাগল।

এক মুহূর্তের জন্য লণ্ঠনের দোদুল্যমান আলো যেন তার চোখে বিঁধতে লাগল, তারপর দৃষ্টিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তা-ও শেষ হয়ে গেল। একটা কর্কশ চিৎকার তার কানে এল. এর পর তার গায়ে যে গোড়ালির ঘা পড়ল, তা আর সে টের পেলে না। তখন চিরকালের মত সব শেষ হয়ে গেছে।

১৯০৭

রত্নবলয়

লুডভিগ ভ্যান বিঠোফেন
২ সন, (অপ, ২, নং ২)
লারগো আপাশিয়োনাতো

আগস্টের মাঝামাঝি, শুক্লপক্ষের আগে আবহাওয়াটা বড় খারাপ হয়ে উঠলঃ কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলের বৈশিষ্ট্য এটা। প্রথমে স্থলভাগ আর সমুদ্রের উপর ঘন কুয়াশা বিরাজ করতে লাগল, বিরাটকায় লাইট হাউস থেকে দিনরাত ষাঁড়ের মত চিৎকার আর সাইরেন বাজতে লাগল, তারপর শুরু হল এক সকাল থেকে আর এক সকাল পর্যন্ত জলকণার মত গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। রাস্তা আর ফুটপাথ ঘন কাদায় ভরে গেল, রাস্তার কাদায় মানুষ-টানা জিনিস-টানা গাড়িগুলি বহুক্ষণ আটকে আটকে যেতে লাগল। এর পর শুরু হল ভীষণ ঝড়, ঝড়ো হাওয়াটা আসতে লাগল উত্তর-পশ্চিম কোণের স্তেপভূমির ওদিক থেকে, গাছের মাথাগুলি ভীষণভাবে দুলতে লাগল, ঝটিকা ক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের মত ওঠা নামা করতে লাগল, রাত্রে বাড়ির টিনের ছাদগুলি ঝন ঝন করতে লাগল, মনে হতে লাগল কে যেন ওগুলির উপর ভারি বুট জুতো পরে দৌড়াচ্ছে, জানলাগুলি কাঁপতে লাগল, দরজার উপর দুম দুম শব্দ হতে থাকল, আর চিমনির ভিতরে বন্য জন্তুর গর্জনের মত একটা আওয়াজ হতে লাগল। বহু জেলে-নৌকা সমুদ্রে দিক ভুল করে বসলো, দুটো নৌকা ফিরে আসতেই পারলে না, এক হপ্তা পরে ঐ দুই নৌকার জেলেদের মৃতদেহ সমুদ্র তীরে ভেসে এসে লাগল।

সমুদ্রোপকণ্ঠের বাড়িগুলি থেকে লোকজন সব শহরে চলে যেতে লাগল। এদের অধিকাংশই সব গ্রীক আর ইহুদী। দক্ষিণদেশবাসী আর সকলের মতই এরা জীবনকে বড় ভালবাসে, আর বড্ড বেশি ভীতু। কর্দমাক্ত রাজপথ দিয়ে গদি, সোফা সিন্দুক, চেয়ার, ওয়াশস্ট্যাণ্ড, সামোভার বোঝাই অগুণতি ড্রে-গাড়ি চলেছিল। মসলিনের মত সূক্ষ্ম জলকণার মাঝ দিয়ে ঝাপসা চোখে এই শহরে যাওয়ার দৃশ্য দেখলে সত্যি মায়া লাগেঃ তল্পিতল্পাগুলি ভিজে বিশ্রী মেটে রঙের হয়ে গেছে, দেখলে মনে হয় যেন কোন ভিক্ষুকের জিনিস; গাড়িতে

জিনিসপত্র ঢাকা ভিজে তারপলিনের উপর ইস্ত্রি, হাতল-ঢাকনিওয়ালা পাত্র আর চুপড়ি ধরে বসে আছে সব বাড়ির ঝি আর রাঁধুনী, ঘোড়াগুলি সব ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে আর মধ্যে মধ্যে থেমে যাচ্ছে, হাঁটুগুলি তাদের থর থর করে কাঁপছে, পিঠের দুপাশ থেকে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে, গাড়োয়ানেরা মাদুরে গা ঢেকে বসে তাদের গালাগালি দিচ্ছে। পরিত্যক্ত বাড়িগুলির দশা দেখলে মনে আরও বেশি কষ্ট হয় ঃ জনশূন্য খালি বাড়িগুলি যেন খাঁ খাঁ করছে, ফুলের কেয়ারিগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, কুকুরগুলি পড়ে রয়েছে বাড়িতে, এখানে ওখানে ছড়ান ভাঙা শার্সির টুকরো, খাওয়া সিগারেটের টুকরো, কাগজের টুকরো, ভাঙা মাটির পাত্র, পিসবোর্ডের বাক্স, ওষুধের বোতল আর আবর্জনা।

কিন্তু আগস্টের শেষাশেষি আবহাওয়াটা হঠাৎ পাল্টে গেল। দিনগুলি এমন শান্ত মধুর নির্মেঘ রৌদ্রস্নাত হয়ে উঠল যে, জুলাইতেও তেমনি দেখা যায়নি। শূন্যে ভাসমান মাকড়সার জালগুলি শুকনো মাঠে ফসলের করকরে মুথার উপর আভা পড়লে যেমন দেখায় তেমনি চিক্‌চিক্‌ করতে লাগল। শান্ত গাছের ডাল থেকে ধীরে ধীরে পাতা খসে পড়তে লাগল।

শহরের বাড়ির মেরামতের কাজ শেষ হয়নি বলে মার্শাল অব্‌ নোবিলিটির স্ত্রী প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনা আর তার পল্লী-আবাস ছেড়ে যেতে পারেনি। এখন সে এই মধুর দিনগুলি দেখে বড় খুশি হল ঃ পরিষ্কার বাতাস, চারিদিকে কেমন নীরব নিস্তব্ধ, সোয়ালো পাখিরা দল বেঁধে দক্ষিণে উড়ে যাবার আগে টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে কেমন কিচিরমিচির শব্দ করছে, সমুদ্রের লোনা হাওয়া গায়ের উপর কেমন আদরের স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে।

২

তা ছাড়া সতেরই সেপ্টেম্বর তার জন্মদিন। এই দিনটা তার বড় ভাল লাগে ঃ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সুদূর শৈশবের সহস্র মধুর স্মৃতি, আর এই দিনে সুখের আনন্দের কোন কিছু ঘটবে বলে সে প্রতিবারই আশা করে। সকালে জরুরি কাজে শহরে বেরিয়ে যাবার আগে তার স্বামী তার রাত্রির টেবিলের উপর একটা ছোট্ট বাক্সে চমৎকার একজোড়া মুক্তার দুল রেখে গেছেন, মুক্তা দুটি দেখতে যেন ছোট্ট দুটি পীয়ার-ফল। এই উপহারটা পেয়ে তার মনের ফূর্তির ভাবটা যেন আরও বেড়ে গেছে।

বাড়িতে সে এখন একাই। তার অবিবাহিত ভাই. এ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক

প্রসিকিউটার, নিকোলাই সাধারণত তাদের বাড়িতেই থাকে বটে, কিন্তু সে-ও সেদিন কোর্টে কি একটা শুনানির জন্যে শহরে বেরিয়ে গেছে। স্বামী বলে গেছেন নিতান্ত কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কাউকে তিনি ডিনারে ডাকবেন না। আর জন্মদিনটা তার এখন গরমের সময় পড়ায় ভালই হয়েছে, কারণ শহরে হলে এ জিনিসটা ঘটা করে করতে বহু টাকা ব্যয় হয়ে যেত, হয়ত একটা বল-নাচের ব্যবস্থাও করতে হত, আর এখানে পল্লী-আবাসে খরচ অতি সামান্যই পড়বে। সমাজে প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও, অথবা এ-ও বলা যেতে পারে সমাজে এই প্রতিষ্ঠা আছে বলেই প্রিন্স শেয়িন কোন রকমে সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আগেকার যে বিপুল সম্পত্তি ছিল তাঁদের পূর্বপুরুষেরাই তা প্রায় নিঃশেষ করে গিয়েছেন, অথচ যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত তার ঠাট বজায় রাখতে আয়ের বেশি তাঁকে ব্যয় করতে হয় ঃ লোকেদের আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করা আছে, দানধ্যান আছে, ভাল জামাকাপড় পরা আছে, তাছাড়া ঘোড়া রাখা, আরও কত কি। প্রিন্সেস ভেরার আগেকার সেই উদ্দাম স্বামীপ্রেম অনেকদিন আগেই প্রকৃত স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে, স্বামী যাতে সর্বস্বান্ত না হন, সে জন্যে চেষ্টার তার অন্ত নেই। স্বামীকে বুঝতে না দিয়েই অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসও সে নিজের জীবন থেকে বাদ দিয়েছে, সংসার চালায় অতি হিসাব করে।

সে এখন বাগানে ঘুরে ঘুরে কাঁচি দিয়ে ডিনার-টেবিলের জন্য ফুল কাটছিল। ফুলের কেয়ারিগুলিতে ফুল একরকম নেই বললেই হয়, বড় অনাদৃত তারা। নানা রঙের ডবল কারনেশান ছিল বাগানে, ওদের ভালোর সময় চলে গেছে, স্টকেরও ঐ অবস্থা, অর্ধেক ফুটেছে বাকি অর্ধেক সবুজ হয়ে গেছে, তা থেকে বাঁধাকপির গন্ধ বেরুচ্ছে; গোলাপের ঝোপগুলিতে এবার গ্রীষ্মে এই তৃতীয়বার ফুল ফুটছে, ওতে অবশ্য কতকগুলি ফোটা ফুল আর কুঁড়ি আছে, কিন্তু বড় ছোট ছোট। কিন্তু এদের এ দশা হলেও ডালিয়া আছে, পিওনি আছে, এ্যাস্টর আছে, তাদের ত এখনই রূপ দেখানর সময়, নিস্তব্ধ মৃদু বাতাসে দুলে দুলে তারা চারিদিক শরতের বিষণ্ণ তৃণগন্ধে ভরে দিচ্ছে। আর আর যেসব ফুলদের প্রেমবিলাস আর সফল মাতৃত্বলাভের সময় শেষ হয়ে গেছে তারা ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অসংখ্য বীজ ছড়াচ্ছে।

বড় রাস্তায় একটা মোটরের তিন সুর মিশান হর্ন শোনা গেল ঃ প্রিন্সেস ভেরা বুঝলে তার বোন এ্যানা নিকোলায়েভনা আসছে। সেদিন সকালেই সে টেলিফোনে জানিয়েছে, সে এসে বাড়ির সব দেখাশুনা এবং অভ্যাগতদের সম্বর্ধনায় সাহায্য করবে।

ভেরা যা ভেবেছিল, তাই, বোনই আসছে, এগিয়ে আনতে গেল সে বোনকে। একটু পরেই চমৎকার একখানা সীডান গাড়ি গেটের কাছে এসে থামল, শোফার আস্তে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

দুই বোন পরমানন্দে পরস্পরকে চুমু দিলে। ছেলেবেলা থেকেই ওদের

দ্বটিতে বড় ভাব। চেহারার দিক দিয়ে কিন্তু দ্বজনের একটুও মিল নেই। বড় বোন ভেরা হয়েছে ঠিক তার মায়ের মত। মা ছিলেন ইংরেজ, খ্বব স্বন্দরী। মায়েরই মত দীর্ঘাঙ্গী হয়েছে ভেরা, দেহটা তারই মত নমনীয়, ম্বখখানা কোমল অথচ যেন একটু উদাসীন আর গর্বিত, হাত দ্বটি একটু বড় বড় হলেও বেশ স্বগঠিত, কাঁধ দ্বটি ধীরে ধীরে নিচু হয়ে গেছে, বড় স্বন্দর দেখতে, ছোট ছোট অনেক প্রস্তরম্বর্তির এ ধরনের কাঁধ প্রায়ই দেখা যায়। আর ছোট বোন এ্যানা হয়েছে ঠিক তার বাপের মত, বাপেরই মত মঙ্গোল ধরনের ম্বখ তার। বাপ ছিলেন অভিজাত তাতার, তাঁর পিতামহ ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে খৃস্ট-ধর্মে দীক্ষিত হন, তিনি সাক্ষাৎ তাইম্বরলঙের বংশধর। ভেরার বাবা আবার গর্বভরে এই বিখ্যাত নরহত্যাকারীর নাম রেখেছিলেন তাইম্বরলেঙ্ক। এ্যানা লম্বায় তার দিদির চেয়ে প্রায় আধ-মাথা ছোট, কাঁধটা তার বেশ চওড়া। বেশ হাসিখ্বশি ফুর্তিবাজ মেয়ে সে, লোককে ক্ষেপাতে বড় ভালবাসে। ম্বখখানা তার খাঁটি মঙ্গোল ধাঁচের ঃ চোয়ালের হাড় একটু বের্বন, চোখ দ্বটি ছোট ছোট, চোখে একটু কম দেখে বলে মধ্যে মধ্যে চোখের পাতা দ্বটি টান করে চায়। ওর ছোট্ট ঠোঁট দ্বটির ওখানটায় কি যেন আছে, ঠিক ধরা যায় না ঃ নিচের প্বর্ণ পরিপ্বষ্ট ঠোঁটটা একটু বাড়ান, প্বর্বষের মনে বাসনার উদ্রেক করবার মত, আবার একটু যেন উদ্ধত, আবার তাতেই লেগে থাকে সর্বদা রমণীস্বলভ রহস্যময় একটুখানি হাসি; হয়ত এই দিয়েই লোকের চিত্ত জয় করে নেয় সে, অথবা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে তার তীব্র বিদ্রূপাত্মক মনকাড়া অঙ্গভঙ্গি দিয়ে। ভেরার শান্ত দৃপ্ত র্বপের চেয়ে র্বপহীনা এ্যানার এই অপর্বপ ঠাটই প্বর্বষ-চিত্তকে বেশি করে আকর্ষণ করত।

বেশ বিত্তশালী এক ম্বর্খের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এ্যানার, স্বামী কাজকর্ম একরকম কিছ্বই করতেন না, একটা দানখয়রাত প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে অবশ্য তিনি ছিলেন, 'ক্যামারজাঙ্কার' খেতাবও অবশ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু ও সব কেবল নামেই। এ্যানা তার স্বামীকে ঘৃণা করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার দ্বটি সন্তানের—একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের জননী, আর ছেলেপেলে যাতে না হয় সেজন্য সে এখন বদ্ধপরিকর। আর এ দিকে ভেরা ছেলেপেলে চায়, যতগ্বলি হয় তার হোক, কিন্তু বিশেষ কারণে একটিও তার এখনও হয়নি, তাই ছোট বোনের ছেলেমেয়েকে সে বড্ড বেশি ভালবাসে,—ছেলেমেয়ে দ্বটি দেখতে স্বন্দর, কিন্তু একটু যেন রক্তহীন, দ্বটিই বেশ সভ্য শান্ত অন্বগত। গায়ের রঙ ওদের ময়দার মত ফ্যাকাশে, মাথার চুল যেন কুঞ্চিত শন, ঠিক প্বতুলের চুলের মত।

এ্যানা রীতিমত ফুর্তিবাজ এবং উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু বড় মিষ্টি তার ব্যবহার আর কথাবার্তা; আবার মধ্যে মধ্যে ঠিক এর উল্টো হয়ে যায় অর্থাৎ খেয়ালী সে। ইউরোপের যত দেশ—তার সব রাজধানী আর স্বাস্থ্যনিবাসগ্বলিতে গিয়ে সে বেপরোয়া হয়ে প্বর্বষদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, অথচ যে স্বামীকে সে

যা তা বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তার কাছেও অবিশ্বাসিনী হয়নি সে কোন দিন। টাকা পয়সা সে দু হাতে ওড়ায়, জুয়া আর নাচ ত লেগেই আছে, নতুন কিছু, বা মনে উত্তেজনা আনে এমন কিছু দেখলেই তার দিকে ছুটবে, তা ছাড়া বিদেশ ভ্রমণকালে এমন সব কাফেতে যাতায়াত করে যার সুনাম সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। মনটা কিন্তু তার দয়াদাক্ষিণ্যে ভরা, আর ধর্মভাব এত গভীর আর অকপট যে, গোপনে সে ক্যাথলিকই হয়ে গেছে। তার পিঠ, বক্ষদেশ আর দুটি কাঁধ অপরূপ সুন্দর। বড়রকমের কোন বল-নাচে যাবার সময় সে দেহের এই অংশগুলিকে সভ্য-সমাজের রীতি এবং নীতিবিরুদ্ধভাবে অনাবৃত করে যায়, কিন্তু শোনা যায় তার এই খাটো জামাকাপড়ের নিচে সে নাকি 'হেয়ার-শার্ট' পরে।

আর এদিকে ভেরার চলনচালন রীতিমত সাদাসিধে, শান্ত অমায়িক ব্যবহার তার সকলের সঙ্গেই অথচ ঢলাঢলি গলাগলি করতে যায় না কারো সঙ্গে, গুরুগম্ভীর রাণীর মতই তার স্বভাব।

৩

আঃ কি সুন্দর! সত্যি কি সুন্দর এখানটা দেখতে! এ্যানা তার বোনের সঙ্গে দ্রুত চলতে চলতে বলে উঠল ঃ এস না, খাড়া তীরের উপরকার এই বেঞ্চটায় একটু বসি, কি? আপত্তি নেই ত তোমার?...কতকাল সমুদ্র দেখিনি! কি চমৎকার বাতাস এখানে, নিঃশ্বাস নিতেই আনন্দে বুক ভরে যায়। গেল বার গ্রীষ্মকালে ক্রিমিয়ার মিসখোরে একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করেছি আমি। সমুদ্রের ফেনাওয়ালা জলের কি গন্ধ জান? ঠিক মিগনোনেটের মত গন্ধ এর।

ভেরা সস্নেহে একটু হাসলে ঃ সব সময় কিছু না কিছু কল্পনা করাই তোমার স্বভাব।

না, না, সত্যি তাই। আমার বেশ মনে আছে, একবার আমি যখন বলেছিলাম চাঁদের রঙে একটু গোলাপী আমেজ আছে, তখন সবাই আমার কথা শুনে হেসেছিল। কিন্তু এই কয়েকদিন আগে বোরিতস্কী বলে যে আর্টিস্ট আমার ছবি করছেন তিনি সব কিছু শুনে বললেন, আমার কথাই ঠিক ঃ আর্টিস্টরা বহুদিন থেকেই এ কথা জানেন।

সম্প্রতি এই আর্টিস্ট নিয়েই মেতে উঠেছিস বুঝি তুই?

এ্যানা হেসে বলে উঠল, কি যে সব বল তুমি! তারপরই তীরটা যেখানে

খাড়া দেয়ালের মত সোজা নেমে গেছে সমুদ্রে, সেখানটা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিচে একবার তাকাল, তখনই চমকে পেছিয়ে এসে ভীতিবিবর্ণ মুখে চিৎকার করে উঠল।

একটু পরেই মৃদুকম্পিত কণ্ঠে বললে, বাপ রে কি উঁচু! এত উঁচু থেকে যখন আমি নিচে তাকাই, তখন শরীরটার মধ্যে কেমনই যেন করে ওঠে আমার, সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যায়, আবার ভালও লাগে, পায়ের আঙুলগুলি আমার ব্যথা করতে থাকে। তবুও আবার দেখতে ইচ্ছা করে আমার।

এ্যানা আবার দেখবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার দিদি তাকে আটকে ফেললে ঃ

এ্যানা, লক্ষ্মীটি, এ করে না। তোকে এ সব করতে দেখলে আমারই মাথাটা কেমন করতে থাকে। বোস্, লক্ষ্মীটি, বোস্।

ঠিক আছে, বসছি আমি। কিন্তু দেখ, দিদি, সত্যি এ কত সুন্দর, মনটাকে যেন একেবারে তাজা করে দেয়, চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছা করে না। ভগবান আমাদের জন্যে এই যে সব আশ্চর্য সুন্দর জিনিস তৈরি করে রেখেছেন, এর জন্যে তাঁকে যে কি ধন্যবাদ আমি জানাই দিদি, তোমায় কি বলব।

দুজনেই কিছুক্ষণ মনে কি যেন ভাবতে লাগল। নিচে—অনেক নিচে রইল সমুদ্র। বেঞ্চ থেকে সমুদ্রের তীর দেখা যাচ্ছিল না, সমুদ্রের বিরাটত্ব বিশালত্বের অনুভূতিটা যেন তাতে বাড়িয়েই দিচ্ছিল। সমুদ্রের জল বন্ধুর মত ধীর স্থির, বর্ণ তার অতি সুন্দর নীল, নীল রঙটা ফিকে ফিকে দেখাচ্ছিল শুধু তরঙ্গের বাঁকা রেখার খাঁজে খাঁজে, আর অতি গভীর দেখাচ্ছিল চক্রবাল রেখার ওখানে।

তীরের অনতিদূরে ভাল করে দেখা যায় না এমন সব জেলে-নৌকাগুলি শান্ত জলে গতিহীন হয়ে যেন ঝিমুচ্ছে। বেশ কিছুটা দূরে তিন মাস্তুলওয়ালা একখানা জাহাজ আগাগোড়া তার সাদা পাল খাটিয়েছে, পালগুলি বাতাসে ফুলে ফুলে ওঠায় দেখাচ্ছে জাহাজখানা যেন শূন্যে ঝুলে রয়েছে, এগুচ্ছে না মোটেই।

বড় বোন চিন্তান্বিত মুখেই ছোটবোনের কথার উত্তরে বললে, তুমি যা বলতে চাইছ, বুঝলাম। কিন্তু আমার ঠিক তোমার মত লাগে না সমুদ্র দেখে। অনেক দিন পরে যখন আমি সমুদ্র দেখি, তখন প্রথম দৃষ্টিতে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাই, মনে হয় যেন একটা বিরাট বিপুল দিব্য বিস্ময় আমার সামনে, এমনটি আর কোনদিন দেখিনি, কিন্তু দেখতে দেখতে দেখবার মত কিছুই আর দেখি না এর মাঝে, এর একঘেয়ে শূন্যতা শেষে আমার মনকে পীড়িত করে তোলে। এর দিকে তাকালেই বিরক্তি লাগে, চেষ্টা করি যাতে চোখ না পড়ে এর দিকে।

এ্যানা একটু হাসলে।

কি হাসলি যে? জিজ্ঞাসা করলে তার দিদি।

এ্যানা অল্প একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললে, গেল বার গ্রীষ্মকালে আমরা ইয়াল্টা থেকে দল বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে উচ্-কশ গিয়েছিলাম। জায়গাটা ফরেস্টারদের আস্তানা ছাড়িয়ে প্রপাতের উপরে। যাবার পথে প্রথমে আমরা কুয়াশার মধ্যে পড়লাম, চারিদিকে কেমন ভিজে ভিজে, চোখেও ভাল দেখা যায় না। পাইন-গাছের ভিতর দিয়ে আমরা ক্রমেই উঁচুতে উঠতে লাগলাম, শেষে একটা প্রায় খাড়া রাস্তা বেয়ে উপরে উঠবার পরই বন শেষ হল, কুয়াশাও কেটে গেল। তখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে জান? পাহাড়ের চূড়ায় সংকীর্ণ একটু জায়গা, পাহাড়টা খাড়া নিচে নেমে গেছে সেখানে। সেখান থেকে গ্রামগুলি দেখাচ্ছে কতকগুলি দিয়াশলাই বাক্সের মত, বন-বাগান যেন ঘাস। নিচের সব কিছু মিলিয়ে দেখাচ্ছে যেন একটা মানচিত্রের মত, আরও নিচে দূরে পঞ্চাশ ষাট মাইল জুড়ে সমুদ্র। মনে হতে লাগল আমি যেন শূন্যে ঝুলছি, এখনই উড়তে যাচ্ছি। এত সুন্দর লাগছিল আমার, তোমায় কি বলব! আর তা ছাড়া শরীরটাও আমার খুব হালকা বোধ হচ্ছিল। মনের আনন্দে গাইডকেই বলে বসলাম, সৈয়দ ওঘলু, বড় সুন্দর, না? ওঘলু তাঁর উত্তরে জিভ দিয়ে কেমন একটা শব্দ করে বললে, এ সব দেখে হামার কেমন বিচ্ছিরি লাগে, আপনি বুঝতে পারবে না, হামি রোজ এ সব দেখছে কি না!

ভেরা একটু হেসে বলে উঠল, তোমার এ উপমার কাহিনীটা বড় ভাল লাগল আমার। আসল কথা কি জান, আমরা উত্তরাঞ্চলের লোকেরা সমুদ্রের সৌন্দর্য তেমন বুঝি না, আমরা ভালবাসি বন। ইয়েগোরোভস্কোয়ের পেছনকার বনের কথা মনে পড়ে তোমার? দেখে কি কোনদিনও বিরক্তি লাগে মনে? সেই সব পাইন? শেওলা? তারপর ঐ ডেথকাপ্-গুলি? দেখলে মনে হয় যেন লাল সাটিন দিয়ে তৈরি ওগুলি, তার উপর সাদা মোতির কারুকার্য। তা ছাড়া কি শান্ত আমাদের ওদিককার বন, কি ঠাণ্ডা!

এ্যানা বললে, বন সমুদ্রে কিছু তফাত নেই আমার কাছে, আমি সব ভালবাসি। আর সবচেয়ে বেশি ভালবাসি আমার বোনটিকে, আমার লক্ষ্মী দিদি ভেরাকে। জান, আমরা এই দুটি ছাড়া আর আমাদের বোন নেই!

—বলেই এ্যানা তার দিদির গলা জড়িয়ে তার গালে গাল রাখল। তারপর হঠাৎ সে চমকে উঠে ভেরার গলা ছেড়ে দিয়ে বলে উঠল ঃ

কি বোকা আমি! আমরা দুজনে নভেলের দুটি চরিত্রের মত প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে চলেছি, অথচ আমি যে উপহারটা এনেছি তার কথা ভুলেই গেছি। দেখাচ্ছি তোমায় আমার উপহারটা, কিন্তু ভয় করছে তুমি যদি পছন্দ না কর!

এই বলেই এ্যানা তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ছোট্ট একখানা 'নোটবুক' বের করলে, বাঁধাইটা এর অপরূপ সুন্দর যে নীল ভেলভেট দিয়ে সেটা বাঁধানো সেটা অতি পুরনো জীর্ণ, রঙ তার জ্বলে গেছে, কিন্তু চারিদিকে তার পুঁতি

বসান সোনার তারের কি অপূর্ব কারুকার্য! দেখলেই বুঝা যায় কোন নিপুণ শিল্পীর বহুদিনের পরিশ্রমের ফল এটা। বইটাতে সুতার মত সরু একটা সোনার চেন লাগান, ভেতরে কাগজের বদলে রয়েছে হাতীর দাঁতের সরু পাত।

ভেরা জিনিসটাকে তারিফ করে বলে উঠল, কি সুন্দর, কি চমৎকার! তারপর সে তার বোনকে চুমু দিয়ে বললে, এটি কোত্থেকে যোগাড় করলে তুমি?

দুষ্প্রাপ্য জিনিসের দোকান থেকে। তুমি ত জানই পুরনো জিনিস খুঁজে বেড়ান আমার এক বাতিক, ঐ সব খুঁজতে গিয়েই পেয়ে গেলাম এই 'প্রেয়ার-বুক'টা। দেখ, এখানকার কারুকার্যের মধ্যে কেমন একটু ক্রুশ গড়ে উঠেছে। বইটার এই বাঁধাইটা দেখেই আমার পছন্দ হয়ে গেল, ঐটায় রেখেছি আমি, বাকী সব, মানে ভিতরকার পাতা, পেনসিল, বন্ধনী এই সব আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে। মলিনেৎকে আমি যতই বোঝাতে চেষ্টা করি, ও কিছুতেই বুঝে ওঠেনা, কি রকমটি আমি চাই। এখন এর পুরো কারুকার্যটা যে ধাঁচের বন্ধনীটাও ঠিক সেই ধাঁচের হওয়া উচিত অর্থাৎ বেশি চটকদার হবে না, সোনা হওয়া চাই পুরনো, তা ছাড়া কারুকার্যটাও পুরোটার সঙ্গে মানানসই, এই ত বলেছিলাম আমি, ভগবান জানেন ও কি করেছে। চেনটা কিন্তু যোগাড় করেছে ও খুবই পুরনো, খাঁটি ভিনিসিয়ান কাজ করা।

ভেরা প্রশংসমান দৃষ্টি নিয়ে বইটা নাড়াচাড়া করতে লাগল ঃ

কোন আদ্যিকালের জিনিস! ধরতেই পারছি না আমি কতদিনের পুরনো এটা!

আমার অনুমান সতের শতকের শেষাশেষি কি আঠারো শতকের মাঝামাঝি এটা তৈরি হয়েছে।

ভেরা একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, যে জিনিসটা আমি এখন হাতে ধরে রয়েছি সেটা হয়ত একদিন মার্কুইস্ ডিপম্পাদোর বা মেরী এ্যান্তুইনেতের হাতের স্পর্শ পেয়েছে। ও এ্যানা, একটা প্রেয়ার বুককে লেডিজ কারনেট করে তোলা, এ কেবল তুমিই পার। যাক, এখন চল, বাড়ির ভিতরে দেখি সেখানে কি হচ্ছে।

অনেকখানি সমতল জায়গা টালি দিয়ে বাঁধান, চারিদিকে তার চাঁচের বেড়ায় উঠেছে ইসাবেলা আঙুরের লতা, তারই মধ্য দিয়ে দুই বোন বাড়ির ভিতরে চলল। ঘন সবুজ লতার গায়ে ঝুলে রয়েছে থোপা থোপা কালো আঙুর, রোদ লেগে কোন কোনটার গা হয়েছে একটু সোনালি, গন্ধ এদের অনেকটা স্ট্র-বেরীর মত। জায়গাটার আলোতে যেন একটু সবুজের আমেজ আছে, সেই আবছা সবুজের আভা ফিকে হয়ে পড়েছে আবার এই দুবোনের মুখে।

এ্যানা যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলে, ডিনারটা কি এইখানে পরিবেশন করা হবে?

প্রথমে ভেবেছিলাম তাই করবো। কিন্তু সন্ধ্যাকালে আজকাল বেশ ঠাণ্ডা

পড়তে শুরু করছে, তাই মত পালটেছি : ডাইনিং-রুমে পরিবেশন করাই ভাল হবে বলে মনে করি। পুরুষরা এখানে ধূমপান করতে আসতে পারবেন।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নাম করা কেউ আসছেন?

ঠিক জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে দাদু আসছেন।

শুনেই দিদির হাতটা আবেগভরে চেপে ধরে আনন্দে একরকম চিৎকার করে উঠল এ্যানা : দাদু আসছেন, কি মজা, কতকাল তাঁকে দেখি না।

ভাস্যার বোনও আসছে, আর প্রফেসার স্পেশনিকোভও বোধহয় আসছেন। কাল শুনে ত আমরা একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তুই ত জানিসই দাদু আর প্রফেসার দুজনেরই ভাল খাবারের দিকে কেমন টান, অথচ অর্থ বা প্রীতি কোন কিছু দিয়েই কোন কিছু পাবার উপায় নেই এখানে, শহরেও নয়।

লুকা এক শিকারীর কাছ থেকে কয়েকটি কোয়েল পাখি যোগাড় করেছে, তাই বেশ মন দিয়ে রাঁধছে সে এখন। এখানকার বীফটাও মন্দ নয়, অবশ্য অন্য জিনিসের সঙ্গে তুলনা করেই বলছি মন্দ নয়; আর বীফ ছাড়া আমার গত্যন্তরও নেই। তবে হাঁ, আমরা বড় চমৎকার গলদা চিংড়ীর যোগাড় করেছি।

মোটের উপর তোমার মেনুটা শুনে ত বিশেষ মন্দ লাগছে না আমার। ঘাবড়িও না, দিদি। আর বলতে দোষ কি, কেউ যখন নেই এখানে. তাই বলছি ভাল খাবার খেতে ত তুমি নিজেও ভালবাস!

হাঁ, আর একটা চমৎকার নতুন জিনিস পাওয়া গেছে। আজই সকালে এক জেলে একটা গার্নার্ড এনে দিয়েছে আমাদের। মাছটা দেখেছি আমি। বিরাট মাছ। দেখতেই ভয় করে।

এ্যানার কৌতূহলটা বড্ড বেশি, সবকিছুতেই, তা ব্যাপারটা তার নিজেরই হোক বা পরেরই হোক। দিদির কথা শুনে মাছটা সে তখনই দেখতে চাইল।

ক্ষৌরমসৃণ পীতগণ্ড দীর্ঘকায় লুকা অতিকষ্টে একটা আয়তাকার পাত্রে করে মাছটা নিয়ে এল, আনবার সময় আবার মেঝেতে জল না পড়ে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল তার।

পাচকসুলভ গর্ব দেখিয়ে সে বললে, হুজুর, এর ওজন হচ্ছে সাড়ে বারো পাউন্ড। একটু আগে আমরা ওজন করে দেখলাম।

মাছের অনুপাতে পাত্রটা ছোট, তাই মাছের লেজটা বাঁকা হয়ে ছিল। আঁশগুলি তার সোনালি, ডানাগুলি লাল টকটকে, মস্ত বড় মাথার ওখান থেকে কুলোর মত লম্বা যে দুটি পাখা বেরিয়েছে তার রঙ ফিকে নীল। মাছটা তখনও তাজা ছিল, কানকো নাড়ছিল।

ছোট বোন তার ছোট্ট আঙুল দিয়ে মাছের মাথাটায় একটু আস্তে হাত দিলে, মাছটা অমনি লেজের ঝাপটা মারলে, এ্যানা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চিৎকার করে হাতটা সরিয়ে নিলে।

ভেরার মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখে লুকা বলে উঠল, হুজুর বিশ্বাস করুন

সব জিনিসই ভাল হবে আপনার। এইমাত্র একজন বুলগেরিয়ার লোক দুটো আনারস-তরমুজ দিয়ে গেল, অনেকটা ক্যাণ্টালুপের মত, তবে গন্ধটা এর আরও ভাল। আচ্ছা, হুজুর গার্নার্ড রাঁধবার সময় কি মশলা দেব, টার্টার, না পলোনাইস, না সোজাসুজি মাখন আর বিস্কুটের গুঁড়ো?

তোমার যা খুশি দিও, এখন তুমি যেতে পার, ভেরা উত্তরে বললে।

৪

বিকেল পাঁচটার সময় নিমন্ত্রিত লোকেরা সব একে এক আসতে শুরু করলেন। বিধবা বোন লুদমিলা লোভনা দুরাসোভাকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্স ভাসিলি লোভিচ্ এসে হাজির হলেন, বোনটি তার বেশ মোটাসোটা, কথা কম বলেন, লোকও ভাল। এর পর এলেন ভাস্যুচক্, বেশ পয়সাওয়ালা লোক, বয়সও অল্প, কিন্তু তিনি একটি অপদার্থ লম্পট, শহরের লোকেরা তাঁকে এই নামেই ভাল চেনে, তবু লোকে তাঁকে পছন্দ করে, কারণ তিনি মূক-নাট্য, নাটক, 'চ্যারিটি'র যে কোন কিছু বেশ ভাল ভাবে গুছিয়ে গাছিয়ে দিতে পারেন। এর পর এলেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক জেনী রীটার, স্মোলনি ইনস্টিটিউটে ভেরার সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব হয়, রীটারের সঙ্গে এলেন তাঁর শ্যালক নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্। এর পর এ্যানার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মোটরে এলেন বিপুল-দেহ কদাকার প্রফেসার স্পেশনিকভ আর ভাইস্-গভর্ণর ভন সেক্। সবার শেষে একটা ভাড়া করা ল্যাণ্ডোয় এলেন জেনারেল এ্যানোসভ্ সঙ্গে তাঁর দুজন অফিসার ঃ এদের একজন হচ্ছেন স্টাফ কর্ণেল পোনামারিয়ভ, বয়স অনুপাতে তাঁকে একটু বেশি বুড়ো দেখায়, দিনরাত কেরানির কাজ করে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গেছে, দেখতে শীর্ণ, মেজাজ তিরিক্ষে; আর একজন হচ্ছেন অশ্বারূঢ় সৈন্যদলের গার্ডস্‌লেফটেন্যাণ্ট বাখতিনস্কী, পিতার্সবার্গ শহরে শ্রেষ্ঠ নর্তক এবং করিৎকর্মা লোক বলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে।

জেনারেল এ্যানোসভ দেখতে বেশ দীর্ঘকায়, ভুঁড়ি আছে, তা ছাড়া মাথার চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে, এক হাতে বাক্সের রেলিং এবং আর এক হাতে ল্যাণ্ডোর পেছনের দিকটা ধরে তিনি গাড়ির ফুটবোর্ড থেকে থপ করে নেমে পড়লেন। তিনি সব সময়ই বাঁ হাতে একটা 'ইয়ার-ট্রামপেট' নিয়ে বেড়ান আর ডান হাতে থাকে মাথায় রবার-জড়ানো এক বেত। মুখখানা তাঁর বেশ বড় সাদা-মাঠ আর লাল, নাকটা মোটা; ছোট ছোট চোখ দুটিতে তাঁর আত্মমর্যাদা জ্ঞানের

সঙ্গে মৃদু অবজ্ঞা এবং খোশমেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়, যে সব সাধারণ সাহসী লোকের অনেকবার বিপদ ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাদের প্রায় সবার চোখেই এটা দেখতে পাওয়া যায়।

দূর থেকে দেখেই দু বোন তাঁকে চিনতে পারলে, তারা অমনি ল্যাণ্ডোর কাছে যথাসময়ে ছুটে গিয়ে হাসতে হাসতে তাঁর দু বগলের নিচে হাত দিয়ে নামালে। জেনারেল খোশমেজাজেই ভাঙা গলায় ধমকে উঠলেন, তোরা আমায় বিশপ ঠাওরেছিস্ নাকি?

ভেরা একটু তিরস্কারের সুরে বললে, ও দাদু, তুমি কেমন লোক বল দেখি, এতদিন আমরা তোমার পথ চেয়ে বসে আছি, আর তুমি আমাদের একবার চোখের দেখাটাও দাও না।

এ্যানা হাসতে হাসতে বললে, দাদু আমাদের এই দক্ষিণ দেশে এসে তার লজ্জাসরম সব বিসর্জন দিয়েছে, তার ধর্মকন্যার কথাও মনে থাকে না তার।... তুমি এই বুড়ো বয়সে নির্লজ্জের মত বড় বিলাসী হয়ে উঠেছ, দাদু, আমাদের সবার কথাই ভুলে গেছ তুমি।

জেনারেলের মাথায় টুপি ছিল না, তিনি এবার দু বোনের হাতে চুমু দিয়ে, দুজনারই গালে চুমু দিলেন, তারপর আবার দিলেন হাতে।

পুরোন হাঁপানির জন্য তিনি থেমে থেমে বলতে লাগলেন, দাঁড়া, শোন, তোরা আমায় বকিস না...এই হতচ্ছাড়া ডাক্তারগুলি সারা গ্রীষ্মকাল ধরে আমার বাতের চিকিৎসা করছে...কি একটা জঘন্য মালিশ দেয় তারা, বিশ্রী তার গন্ধ, ওরা আমায় কোথাও বেরুতেই দিতে চায় না, এই প্রথম বেরুলাম আমি, তোদের এখানে প্রথম এলাম, তোদের দেখতে পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে—তারপর তোরা আছিস কেমন বল। —ভেরা, তুই এখন দেখছি একেবারে পুরোপুরি লেডী, তোর চেহারা এখন ঠিক তোর মায়ের মত হয়েছে, সে যাক, এর পর 'ক্রীস্নিং'-এ ডাকছিস আমায় কবে, বল?

সে ডাকা বোধহয় কোনদিনই হবে না, দাদু।

না, না, মন খারাপ করিস নে, বোন, হবে হবে, ছেলেপেলে হবে, ভগবানকে ডাক।...আর এ্যানা, তুই একটুও পালটাসনি বোন, ষাট বছর বয়সেও তুই এমনি ছটফটে মেয়ের মতই থাকবি। আচ্ছা দাঁড়া, এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোদের।

অশ্বারূঢ় দলের অফিসারটি তখন বলে উঠলেন, সে সৌভাগ্য আমার পিতার্সবার্গেই হয়ে গেছে।

বেশ, তবে আয় এ্যানা, লেফটেন্যাণ্ট বাখতিনস্কীর সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দি। ইনি বেশ ভাল নাচতে পারেন, খুব চেঁচামেচি করতে পারেন, তা ছাড়া খুব ভাল ঘোড়া চালাতে পারেন। বাখতিনস্কী, গাড়ি থেকে ঐ জিনিসটা নিয়ে এস না, ভাই!...হাঁ, তোরা শোন দেখি, এদিকে। কি খাওয়াচ্ছিস

আমাদের আজ, তাই বল। ডাক্তাররা একরকম না খাইয়েই রেখেছে আমাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে ছেলেমেয়েদের যেমন খিদে পায় তেমনি খিদে আছে আমার।

জেনারেল এ্যানোসোভ স্বর্গত প্রিন্স বুলাৎতুগানোভস্কীর যুদ্ধ-সহচর ছিলেন। প্রিন্সের মৃত্যুর পর তাঁর সকল স্নেহ ভালবাসা গিয়ে পড়ে তাঁর এই দুটি মেয়ের উপর। খুব ছেলেবেলা থেকেই তিনি এদের দেখে এসেছেন, শুধু তাই নয়, এ্যানার তিনি ধর্মবাপ। তখন থেকে এখন পর্যন্ত তিনি 'কে' শহরের পরিত্যক্ত-প্রায় বড় দুর্গের গভর্ণর; ওখান থেকে প্রায় রোজই তিনি তুগানো-ভস্কীদের বাড়িতে আসতেন। মেয়ে দুটি তাঁকে খুবই ভালবাসত কারণ তিনি তাদের আদর করতেন, আস্কারা দিতেন, উপহার দিতেন, বক্সে বসিয়ে থিয়েটার সার্কাস দেখিয়ে আনতেন, তা ছাড়া তাদের সঙ্গে খেলা করতেও তাঁর মত আর কেউ পারত না। সবচেয়ে ভাল লাগত তাদের তাঁর মুখে যুদ্ধের গল্প শুনতেঃ যুদ্ধের অভিযান, যুদ্ধ, খোলা জায়গায় সৈন্যদের রাত্রিযাপন, বিজয়, পিছুহটা, মৃত্যু, আঘাত, ভয়ঙ্কর তুষারপাত ইত্যাদির গল্প, সে গল্প শোনার কথা তারা এখনও ভুলতে পারেনি। গল্প বলতেন তিনি সন্ধ্যার চায়ের পরে—রাত্রে শোবার সময়ের আগ পর্যন্ত, গল্প বলার ভঙ্গিও ছিল তাঁর অপূর্ব ঃ মহাকাব্যের মত অনাড়ম্বর ধীর স্বচ্ছন্দগতি।

পুরনো দিনের অজস্র গুণ আর স্মৃতি যেন রূপ পেয়েছে তাঁর আশ্চর্য সুন্দর বলিষ্ঠ চরিত্রে। মনে গভীর দাগ কাটবার মত যে সব গুণ তাঁর সময়ের অফিসারদের চেয়ে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেই বেশি দেখা যেত, রুশীয় মুঝিক-সুলভ যে সব গুণের একত্র সমাবেশ ঘটলে সৈনিক শুধু অপরাজেয় হয় না, লোকচক্ষে শহীদ, এমন কি ঋষিতুল্য হয়ে ওঠে, সেই সব গুণের একত্র সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিলেন তিনি নিজের চরিত্রে। নিষ্কলুষ চরিত্র, সরল বিশ্বাস, প্রসন্ন উদার স্বচ্ছ দৃষ্টি, সাধারণ সাহস, মৃত্যুর সম্মুখেও বিনয়, পরাজিতের প্রতি অনুকম্পা, অসীম ধৈর্য এবং বিপুল শারীরিক ও নৈতিক বলের অধিকারী ছিলেন তিনি।

পোলীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি গিয়েছেন, একমাত্র জাপানী যুদ্ধ ছাড়া। জাপানী যুদ্ধেও তিনি যেতেন, কিন্তু এতে ডাকা হয়নি তাঁকে, তাই যাননি। ঐ যে লোকে বলে, 'খামাকা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে যেও না,' এই মহান নীতিবাক্যটা তিনি মেনে চলতেন। তাঁর সময়ে তাঁর অধীনস্থ কোন লোককে চাবুক মারা ত দূরের কথা তিনি একটি চড়চাপড় পর্যন্ত দেননি কোন দিন। পোলীয় বিদ্রোহের সময় একদল বন্দীকে গুলি করে মারতে হুকুম দেওয়া হয় তাঁকে, এ হুকুম দেন পল্টনের অধিনায়ক নিজে, কিন্তু এ হুকুম তিনি মানেননি, তিনি বলেছিলেন, যদি গুপ্তচর হত, তাহলে আপনার হুকুম পেলে আমি গুলি কেন নিজের হাতে তাকে গলা টিপে মারতাম। কিন্তু এরা

হচ্ছে বন্দী, এদের এ কাজ আমি করতে পারব না। কথাগুলি বলেছিলেন তিনি অতি সহজভাবে, স্বচ্ছ অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাঁর উপরওয়ালার চোখের দিকে চেয়ে, সে দৃষ্টিতে স্পর্ধা বা বাহাদুরি দেখাবার বিন্দুমাত্র আভাষ ছিল না, তাই, আদেশ অমান্য করবার জন্য তাঁকে আর গুলি করা হয়নি, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

১৮৭৭-১৮৭৯-র যুদ্ধে তিনি খুব তাড়াতাড়ি কর্ণেল হয়ে গেলেন; যথা-রীতি সামরিক শিক্ষা অবশ্য তিনি পাননি, নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলতেন, আমার যে শিক্ষা তাকে বলা যেতে পারে ভালুকের শিক্ষা। কিন্তু অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে যোগ দিয়েছেন তিনি ঃ দানিয়ুব নদী পার হয়েছেন তিনি, বলকান পাহাড় পার হয়েছেন, শীতকালে শিপকাতে শিবির সন্নিবেশ করেছেন, শেষবার যখন প্লেভনা আক্রমণ করা হয়, সে দলে তখন তিনিও ছিলেন; পাঁচবার আহত হন তিনি, একবারের আঘাত ত রীতিমত গুরুতর ঃ বোমার টুকরা লেগে তাঁর মাথাটা ভীষণভাবে জখম হয়। জেনারেল র‍্যাদেতস্কী আর স্কোবেলেভ তাঁকে বেশ ভালভাবে জানতেন, শ্রদ্ধা করতেন। স্কোবেলেভ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, এমন একজন অফিসার আছেন, যিনি আমার চেয়েও সাহসী, তাঁর নাম হচ্ছে মেজর এ্যানোসোভ।

বোমার টুকরোর আঘাতে তিনি প্রায় বধির হয়ে ফিরে এলেন যুদ্ধ থেকে, বল্কান অভিযানে তুষার লাগায় একটি পায়ের তিনটি আঙুল তাঁর কেটে ফেলতে হয়, শিপকায় শিবির সন্নিবেশ কালে ভীষণ বাতব্যাধি ধরে তাঁর। যুদ্ধ-নিবৃত্তিকালে দু বৎসর চাকরি করবার পর কর্তৃপক্ষ জানান এইবার তাঁর অবসর গ্রহণ করবার সময় হয়েছে,—এ কথা শুনে তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন।

শহরের সবাই তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ হাবভাব রকম-সকম দেখে হাসি তামাসা গভর্ণর তা নিজের চোখে দেখেছেন. তাই তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থন করে কর্তৃপক্ষকে চাপ দিলেন। পিতার্সবার্গ থেকে কর্তৃপক্ষও এই বীর কর্ণেলের মনে যাতে কোন রকমে আঘাত না লাগে এই জন্যে তাঁকে 'কে'—শহরের গভর্ণর করে দিলেন, দেশের প্রতিরক্ষার জন্য এই পদটার যে খুব বেশি প্রয়োজন ছিল, তা নয়,—এ পদটা সৃষ্টি করা হল তাঁকে শুধু সম্মান দেখানর জন্যে।

শহরের সবাই তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ হাবভাব রকম-সকম দেখে হাসি তামাসা করত। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরুতেন না তিনি কখনও, গায়ে পুরানো ধরনের একটা লম্বা কোট মাথায় উঁচুমাথা একটা টুপি, মুখে মস্ত বড় একটা ঢাকনা, ডান হাতে একটা বেত আর বাঁ হাতে ইয়ার ট্রামপেট,—এই ছিল তাঁর সাজ, সঙ্গে থাকত তাঁর খাঁদা নাকের মোটাসোটা দুটি ছোট্ট কুকুর, প্রভুর দু পাশে জিভ নাচাতে নাচাতে তারা চলত। সকালে বেড়াবার সময় একটু দূরে কোন পরিচিত লোক দেখলে তিনি ভীষণ চিৎকার করে তাকে ডাকতে শুরু করতেন, সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দুটিও চিৎকার করতে শুরু করত।

যারা কানে কম শোনে তাদের অনেকেই অপেরা দেখতে বড় ভালবাসে,

এ্যানোসোভও বাসতেন। দ্বৈত সঙ্গীতের সময় মাঝে মাঝে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠতেন, বাঃ বাঃ, চমৎকার, কি দরাজ গলা, যেন একটা বাদাম ফাটাচ্ছে। শুনে আশেপাশের লোকেরা সব চাপাহাসি হাসতে থাকত, জেনারেল কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারতেন না, সন্দেহ করতেন না কিছুই, তাঁর ধারণা তাঁর পাশের লোককে শোনাবার জন্যে আস্তে একটু মন্তব্য করেছেন শুধু।

রক্ষী-আবাসের খোঁজখবর নেওয়া তাঁর উপর ন্যস্ত কাজেরই একটি অঙ্গ, তাই মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছোট্ট কুকুর দুটিকে সঙ্গে করে সেখানে আসতেন। বন্দী অফিসারেরা এখানে চা খেতে খেতে অথবা তাস খেলতে খেলতে নানা গল্প করতেন, সামরিক জীবনের কঠোরতা থেকে কিছুটা মুক্তি। জেনারেল তাঁদের প্রশ্ন করতেন, আপনার নাম?—আপনাকে কে বন্দী করেছেন? কতদিনের জন্যে? কেন? কখনও কখনও কোন অফিসার বে-আইনী সাহসের কাজ করে এখানে এসেছেন শুনে তিনি হঠাৎ তারিফ করে বসতেন, আবার কাউকে এমন জোর গলায় তিরস্কার করতেন যে, বাইরে থেকে তা শোনা যেত। কিন্তু তিরস্কার শেষ হতে না হতেই তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন—তাঁর খাবার আসে কোত্থেকে এবং কত খরচ পড়ে তাতে। কোন লেফটেন্যাণ্ট হয়ত তাঁর সামান্য ত্রুটির জন্য কোন সুদূর অঞ্চল থেকে এখানে দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করতে এসেছেন, তাঁদের নিজেদের কোন রক্ষী-আবাস নেই, তিনি তখন খুলেই বলতেন সে কথা, জানাতেন টাকা-পয়সার টানাটানিতে সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গেই খেতে হয় আমার। এ্যানোসোভ তখন হুকুম দিয়ে দিতেন, তাঁর নিজের বাড়ি থেকে যেন এ'র খাবার এনে দেওয়া হয়, বাড়িটা অবশ্য তাঁর রক্ষী-আবাস থেকে একশো গজের বেশি নয়।

এই 'কে' শহরেই তুগানোভস্কী পরিবারের সঙ্গে তাঁর মাখামাখি শুরু হয়, বিশেষ করে বাড়ির দুটি মেয়ের সঙ্গে, শেষে তা এত বেড়ে ওঠে যে, প্রতি সন্ধ্যায় তিনি একবার ওদের বাড়ি না গিয়ে থাকতে পারতেন না। কোনদিন যদি কোন কারণে মেয়ে দুটিকে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে হত, অথবা অফিসের কাজে তিনি নিজেই বাড়িতে আটকে যেতেন, তখন গভর্ণরের ঐ বিরাট বাড়ির মধ্যে একা একা তাঁর বড় বিশ্রী লাগত। প্রত্যেকবার গ্রীষ্মের সময় তিনি এক মাসের ছুটি নিয়ে, 'কে' শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে য়িগোরোভেস্কোইতে তুগানোভস্কীদের যে জমিদারী আছে, সেখানে কাটিয়ে আসতেন।

বহুদিনের রুদ্ধ স্নেহ-প্রীতি বাঁধ ভেঙে গিয়ে পড়ছিল এবার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর, বিশেষ করে মেয়েদের উপর। বিয়েও তাঁর একদিন হয়েছিল, কিন্তু সে এতদিন আগের কথা যে, সে সব তিনি একরকম ভুলেই গেছেন! যুদ্ধ বাধবার আগেই তাঁর স্ত্রী এক ভ্রাম্যমান অভিনেতার সঙ্গে পালিয়ে যান, লোকটি তার ভেলভেট জ্যাকেট আর জরির আস্তিন দিয়ে ভুলিয়েছিল তাঁকে। স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁকে মাসোহারা পাঠাতেন, কিন্তু

অনেক অনুতাপ আর কান্নাকাটি করে চিঠি লিখলেও কোনদিন তাঁর কাছে ফিরে আসবার অনুমতি দেননি তিনি। তাঁদের কোন ছেলেপেলে ছিল না।

সেদিনকার সন্ধ্যাটা যে এমন শান্ত আর সুখোষ্ণ হবে সে কথা আর কেউ ভাবেনি। দ্রাক্ষাকুঞ্জের সমান জায়গা এবং ডাইনিং-রুমের বাতিগুলির শিখা যেন নির্বাত, নিষ্কম্প। ডিনার টেবিলে প্রিন্স ভাসিলি লোভিচ্ সবাইকে বড় আনন্দ দিচ্ছিলেন। গল্প বলতে তিনি একেবারে ওস্তাদ। কোন এক দল লোকের, বা সবার পরিচিত কোন এক ব্যক্তির জীবনের সামান্য একটা ঘটনায় তিনি এমনি করে রঙ চড়াতেন বা এমনি সব কথা জুড়ে দিতেন যে, তা শুনে হাসতে হাসতে লোকের পেটে খিল ধরে যেত। এক সুন্দরী ধনবতী নারীর পাণিপ্রার্থনা করতে গিয়ে নিকোলাই নিকোলয়েভিচের কি দশা হয়েছিল এ দিন সন্ধ্যায় তিনি সেই করুণ কাহিনীটি বলছিলেন। এর মাঝে শুধু এইটুকু সবার জানা যে, এই মহিলার স্বামী তাঁকে বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের অনুমতি দেননি। কিন্তু হলে হবে কি, প্রিন্স এই সামান্য ঘটনায় কল্পনার রঙ চড়িয়ে কাহিনীটা যা দাঁড় করালেন, তা হচ্ছে এই ঃ আত্মাভিমানী গম্ভীর নিকোলাই তাঁর জুতো বগলে নিয়ে শুধু স্টকিং পরে গভীর রাত্রে রাস্তা দিয়ে চলেছেন, এমন সময় সামনে পড়ে গেল এক পুলিশ, পুলিশ তাকে কিছুতেই ছাড়বে না, অনেক চেঁচামেচি আর তর্কাতর্কির পর শেষে তিনি পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারলেন যে, তিনি একজন সহকারী সরকারী উকিল, চোর নন। বিয়ে প্রায় হয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যারা তাঁর হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে এসেছিল তারা হঠাৎ বেঁকে বসল, তারা আরও বেশি টাকা না হলে সাক্ষ্য দেবে না। কিন্তু নিকোলাই একে কৃপণ, তাতে যে কোন রকমের ধর্মঘটের তিনি বিরোধী তাই তিনিও কিছুতেই আর টাকা বাড়াবেন না, সে কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন তাদের, তা ছাড়া চুক্তিপত্রের আইন দেখালেন, এ সব ব্যাপারে হাইকোর্টে আপীল করলে সেখান থেকে কি রায় বেরয় তা শোনালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আদালত থেকে গতানুগতিক প্রশ্ন করা হল ঃ এই দুজনের আইনানুমোদিত বিবাহে বাধা দেবার মত উপস্থিত কেউ কিছু জানেন? মিথ্যা সাক্ষীর দল রেগেই ছিল, তারা সমস্বরে বলে উঠল, হাঁ জানি। আমরা এর আগে হলপ করে যে সব কথা বলেছি, সব মিথ্যা, ঐ সরকারী উকিল মশায় আমাদের ভয় দেখিয়ে জোর করে

ঐ সব কথা বলতে বাধ্য করেছেন। আর এই মহিলার স্বামীর সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই বলতে পারি যে, তিনি অতি মান্যগণ্য লোক, যোসেফের মত সৎ এবং দেবদূতের মত দয়ালু।

বিয়ের গল্প বলতে শুরু করে প্রিন্স ভাসিলি এ্যানার স্বামী গুস্তভ ইভানোভিচ্ ফ্রিয়েসিকে পর্যন্ত বাদ দিলেন না। তিনি বললেন, গুস্তভ বিয়ের পরদিনই পুলিশ ডেকে বলেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাঁর আইনানুমোদিত স্বামীর ঘরে আনা হোক, কারণ তাঁর স্ত্রীর নিজস্ব কোন পাসপোর্ট নেই। এই গল্পের মধ্যে সত্য কথা যেটুকু ছিল, সে হচ্ছে এই যে, ওদের বিয়ের ঠিক পরেই এ্যানার মায়ের বড় অসুখ যাচ্ছিল এবং ভেরা তখন দক্ষিণ অঞ্চলে চলে গেছে বলে এ্যানাকে কিছুদিন তার মায়ের কাছে থাকতে হয়েছিল, আর তাতেই গুস্তভ পড়েছিলেন ফাঁপরে।

গল্প শুনে সবাই হেসে উঠল, এ্যানা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, গুস্তভ ইভানোভিচ্ আনন্দে একেবারে অট্টহাস্য করে উঠলেন, টানটান চক্‌চকে চামড়া, সযত্নে নিচে টানা ঘষামাজা পাতলা সরু চুল আর দৃঢ়নিবদ্ধ চোখ সমেত তাঁর শীর্ণ মুখখানা দেখে তখন মনে হতে লাগল একটা খুলি যেন খুশির চোটে তার বিশ্রী দাঁত বের করে ফেলেছে। বিয়ের প্রথম দিনে তিনি এ্যানাকে যেমন ভালবেসেছিলেন, এখনও ঠিক তেমনিই বাসেন, অপরের অলক্ষ্যে তাকে স্পর্শ করেন এবং তাকে সেবা করবার জন্য সব সময়েই এমন পাগল যে, দেখলে মায়া লাগে, লোকে বিব্রত বোধ করে।

টেবিল থেকে উঠবার আগে ভেরা নিকোলায়েভনা হঠাৎ নিমন্ত্রিত লোকদের সংখ্যা গণনা করে বসল। তেরো। ভেরার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন কেমন যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল ঃ কি বিপদ, আগে গুণে দেখিনি কেন আমি? ভাস্যারও দোষ আছে, টেলিফোনে সে বলেওনি আমায় কিছু।

শেয়িন বা ফ্রিয়েসি বাড়িতে যখন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসতেন, তখন ডিনারের পর সাধারণত 'পোকার' খেলা হত, কারণ ভেরা এ্যানা দু বোনই জুয়া খেলবার জন্য একেবারে পাগল। দুই বাড়িতেই অবশ্য নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে, সব খেলোয়াড়কে সমান সংখ্যক সমমূল্যের হাতীর দাঁতের তৈরি টোকেন দেওয়া হবে আর সব টোকেনগুলি একজনের হাতে এসে গেলেই সে রাত্রির মত খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, যে যতই পীড়াপীড়ি করুক না কেন, আর খেলা চলবে না। ক্যাশবাক্স থেকে নতুন টোকেন নেওয়াও আর চলবে না। বার বার দেখে দেখে বোঝা গেছে যে, এই রকম কঠোর নিয়ম না করলে চলবে না, কারণ ভেরা আর এ্যানা দুজনেই খেলতে খেলতে এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে, তাদের রুখবার আর কোন পথ থাকে না। এই নিয়ম মেনে চললে সবচেয়ে বেশি হার হলেও সে হার দুশো রুবলের বেশি হবে না।

এদিনেও অন্যান্য বারের মত সবাই পোকার খেলতে বসলেন। ভেরা

খেলছিল না, বাইরে দ্রাক্ষাকুঞ্জে চায়ের জন্য টেবিল পাতা হচ্ছিল সে সেইখানে তা দেখতে যাবার উপক্রম করছিল, এমন সময় বাড়ির ঝি কেমন যেন এক অদ্ভুত-ভাবে চেয়ে ড্রয়িং-রুম থেকে তাকে ডাকলে।

শোবার ঘরের পরেই ভেরার পড়বার ঘর, সেই ঘরে যেতে যেতে বিরক্ত হয়েই ভেরা জিজ্ঞাসা করলে, কি দাশা, কি বলছ?...অমন বোকার মত চেয়ে আছ কেন আমার দিকে? তোমার হাতেই বা ও কি?

দাশা সাদা কাগজে মোড়া গোলাপী ফিতেয় বাঁধা চারকোণা ছোট্ট একটা জিনিস টেবিলে রাখল। একটু অপমানিত বোধ করেছে সে তাই মুখ রাঙা করে স্খলিত কণ্ঠে সে বললে, আমার কিছু দোষ নেই, হুজুর, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমার দোষ নেই, ও এসে আমায় বললে—

ও! কে সে?

একটি ছেলে, হুজুর, এইটে দিতে এসেছিল।

তারপর?

সে রান্নাঘরে এসে এইটে টেবিলের উপর রেখে বললে, এইটা তোমার মনিব ঠাকরুণকে দিও, শুধু এইটুকু দেখ যে, তিনি যেন এটা পান, তুমি নিজে হাতে তাঁকে দিও। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে পাঠিয়েছেন এটা? ও বললে, লেখা আছে এতে। এই বলেই সে দৌড় দিলে।

যাও ধরে নিয়ে এস তাকে।

তা ত, হুজুর, পারা যাবে না। আপনাদের ডিনার খাওয়া যখন অর্ধেক হয়েছে তখন এসেছিল সে। আপনাদের বিঘ্ন করতে সাহস পাইনি আমি। প্রায় আধ ঘণ্টা হল বটে।

বেশ, যেতে পার তুমি।

ভেরা তখন একটা কাঁচি দিয়ে ফিতেটা কেটে যে কাগজটায় তার ঠিকানা লেখা ছিল সেটা সমেত ওটা ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেললে। যে কাগজটায় মোড়া ছিল সেটা খুলে ফেললে বেরুল লাল পশমী ভেলভেটের একটা মণিকারের দোকানের বাক্‌সো, দেখেই বোঝা যায় ওটা সদ্য কেনা। বাক্‌সের ডালাটা খুললে দেখা গেল ভিতরে হালকা নীল সিল্কের লাইনিং, নিচে কালো ভেলভেটের গায়ে আঁটা ডিম্বাকৃতি একটা সোনার ব্রেসলেট, তার ভিতরে একখানা চিঠি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে অষ্টভুজে ভাঁজ করা। তখনই চিঠিটা খুলে ফেললে সে। হাতের লেখাটা চেনা বলে মনে হল তার, কিন্তু সে নারী, তাই চিঠিটা সরিয়ে রেখে প্রথমে অলঙ্কারটার দিকেই মন দিলে সে।

জিনিসটার সোনা তেমন ভাল নয়, বেশ পুরু কিন্তু ভেতরে ফাঁপা, বাইরে চারিদিকে ছোট ছোট গারনেট বসানো ও গারনেটগুলি পুরানো, তা ছাড়া ওগুলির পালিশও তেমন ভাল নয়। কিন্তু ব্রেসলেটটার মাঝখানে সবুজ রঙের ছোট অদ্ভুত একটি পাথরের চারিদিকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পাঁচখানা অপূর্ব

সুন্দর ক্যাবোচন গারনেট, ওদের আকার এক একটা মটরের মত। ভেরা ব্রেসলেটটা বৈদ্যুতিক আলোর নিচে একটা ঠিকমত জায়গায় আনবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পাখাগুলির মসৃণ ডিম্বাকৃতি তলদেশ থেকে গভীর লাল আলো ঠিকরে বেরুতে লাগল।

ভেরা আলোর রঙ দেখে ভয় পেয়ে গেল ঃ এ যে ঠিক রক্তের মত রঙ!

এর পর চিঠিটার দিকে নজর দিলে সে। চমৎকার হাতের লেখা। চিঠিতে ছিল,—

'মহামান্যা প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনা,—

আপনার আনন্দোচ্ছ্বল শুভ জন্মদিনে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে এই অতি সামান্য উপহারটি পাঠাবার দুঃসাহস করছি আমি।'

ভেরা বিরক্ত হয়ে নিজের মনে মনেই বলে উঠল ঃ এ তবে সেই লোকটারই কাজ! চিঠিটা কিন্তু সে শেষ পর্যন্তই পড়লে। চিঠিতে লেখা ছিল—

'আপনাকে স্বনির্বাচিত কোন উপহার পাঠাবার দুঃসাহস আমি করতাম না, কারণ সে অধিকার আমার নেই, নির্বাচনযোগ্য রুচিবোধ নেই, আর সত্যি কথা বলতে কি তেমন অর্থসামর্থ্যও আমার নেই, তা ছাড়া আমার বিশ্বাস আপনাকে অলঙ্কৃত করতে পারে এমন রত্নও বুঝি পৃথিবীতে নেই।

এই ব্রেসলেটটা ছিল আমার প্রপিতামহীর, সর্বশেষ পরেছেন এটা আমার মা। মধ্যিখানকার বড় বড় পাথরগুলির মধ্যে একটা সবুজ পাথর দেখতে পাবেন আপনি, এটাও গার্নেট, সবুজ গার্নেট, বড় দুষ্প্রাপ্য। আমাদের বংশের সবাই বিশ্বাস করে এসেছেন এই পাথর ধারণ করলে মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ জানতে পারেন, দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পান, তা ছাড়া কোনরকম প্রচণ্ড আঘাতে তাদের মৃত্যু হয় না।

পাথরগুলি একটা রুপোর ব্রেসলেট থেকে খসিয়ে এই সোনারটায় লাগান হয়েছে, আপনি এটা স্থির জানবেন, আপনার আগে অন্য আর কেউ এটা অঙ্গে ধারণ করেননি।

ইচ্ছা করলে আমার দেওয়া এই অতি সামান্য অলঙ্কারটি আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন, কাউকে দিয়ে দিতে পারেন, মুহূর্তের জন্যও এ আপনার করস্পর্শ লাভ করেছে এটা জানতে পারলেই আমি সুখী হব।

আমার মিনতি, আপনি রাগ করবেন না আমার উপর। সাত বৎসর আগে আমি আঁপনার কাছে প্রথম চিঠি লিখতে শুরু করি, আপনি তখন আরও তরুণ, পাগলের মত বোকার মত কত কি আবোল-তাবোল লিখেছি, চিঠির উত্তর পাব এ আশাও করেছি, আমার সেই ঔদ্ধত্যের কথা ভেবে এখন আমি লজ্জায় মরে যাই। আজ আমার আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা আর পরম নিষ্ঠাবান গুণমুগ্ধ দাসোচিত নিত্যশুদ্ধ ভক্তি ছাড়া আর কিছু দেবার নেই, আপনার চিরসুখ কামনা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। আপনি সুখী আছেন জানলেই আমার

আনন্দ। যে আসনে আপনি বসেন, যে মেঝের উপর দিয়ে আপনি চলেন, পাশ দিয়ে যাবার সময় যে সব গাছে আপনার স্পর্শ লাগে, যে সব ঝি-চাকরের সঙ্গে আপনি কথা বলেন, এ সব কিছুকে, সবাইকে আমি প্রণতি জানাই। ঈর্ষা করি না এদের কাউকে।

দীর্ঘ অনাবশ্যক চিঠি লিখে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা চাইছি।

জীবনে মরণে আপনার দীন সেবক,

জি, এস্, জেড্।'

চিঠি পড়া শেষ করে ভেরা ভাবতে লাগলঃ চিঠিখানা আমি ভাস্যাকে দেখাব, কি না? যদি দেখাই ত কখন? এখন, না নিমন্ত্রিতেরা সব চলে গেলে? না পরে দেখানই ভাল, এখন দেখাতে গেলে এই লোকটার মতই বোকামি করা হবে আমার।

এই সব ভাববার সময় প্রিন্সেস ভেরার চোখ দুটি কিন্তু পড়ে ছিল পাঁচটি গার্নেটের ভিতর রক্তের মত লাল যে পাঁচটি আলো জ্বলছিল তার দিকে।

৬

কর্ণেল পোনামারিয়ভকে অনেক কষ্টে পোকার খেলতে রাজি করান গেল। প্রথমে তিনি বললেন, এ খেলার কিছুই তিনি জানেন না, মজা করবার জন্যও কোনদিন জুয়া খেলেননি তিনি, জানবার মধ্যে জানেন তিনি একমাত্র 'ভিণ্ট' খেলা, এইটা খেলতে তার যা একটু ভাল লাগে। যাই হোক, শেষে রাজি হতে হল তাঁকে পোকার খেলতে।

প্রথমে ওরা সব তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেন। খেলার নিয়মকানুন শিখাতে তাঁর দেরি হল না মোটেই এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল সব টোকেনগুলি তিনি জিতে সামনে জড়ো করেছেন।

এ্যানা কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে তাঁকে বললে, এ ত বড় ভাল কথা নয়, আনন্দের উত্তেজনার আমাদেরও কিছু ভাগ দেওয়া উচিত ছিল আপনার।

আর এদিকে ভেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে কর্ণেল স্পেশনিকোভ আর ভাইস-গভর্ণর ঐ সম্ভ্রান্ত অথচ বোকা বোকা জার্মাণ ভদ্রলোকটিকে নিয়ে, এঁদের কি করে আতিথ্য দেখান যায়। এঁদের জন্য ভিণ্ট খেলার ব্যবস্থা করলে সে, এবং চতুর্থ ব্যক্তি হবার জন্য গুস্তভ ইভানোভিচ্‌কে আমন্ত্রণ জানালে। এ্যানা তখনই চোখের পাতা দুটি নত করে তাকে ধন্যবাদ জানালে, ভেরাও বুঝলে

বোনের মনের কথা। সবাই জানেন গুস্তভকে কোন রকম তাস খেলায় আমন্ত্রণ করে আটকে না রাখলে তিনি সারা সন্ধ্যা তাঁর খুলির মত মুখ থেকে বিশ্রী দাঁতগুলি বের করে তাঁর স্ত্রীর পাশেই ঘুরে বেড়াবেন।

এবার সবকিছুই সহজ আনন্দে সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল। ভাস্যুচক জেনী রিটারের বাজনার সঙ্গে নিচু গলায় গান ধরলেন গাইতে লাগলেন তিনি ইতালীয় পল্লীগীতি 'ক্যান্‌জোনেৎ' আর রুবিনস্তিনের প্রাচ্যগীতি। ভাস্যুচকের গলাটা তেমন ভারি না হলেও বড় মধুর, দরদী আর প্রাণস্পর্শী। জেনী রিটারের বাজনাটাও একেবারে ত্রুটিশূন্য, ভাস্যুচকের গলার সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছিল। লোকে বলে ভাস্যুচক নাকি ওর প্রণয়প্রার্থী।

এদিকে এ্যানা অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এক কৌচে বসে খুব জোর প্রেমের অভিনয় করছে। ভেরা এগিয়ে এসে ওদের কথা শুনে একটু হাসলে।

এ্যানা তার দুষ্টামিভরা তাতার চোখ দুটি বোজা বোজা করে অফিসারটির দিকে চেয়ে বললে, হাসবেন না। আপনার কাছে হয়ত অশ্বারূঢ় সৈন্যদল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া মস্ত বড় একটা কাজ হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাজের কথাও একবার ভেবে দেখুন। আমরা এই মাত্র একটা স্ফূর্তি খেলা শেষ করে এলাম। সে কি সোজা কথা মনে করেন আপনি? ছি! কি লোকজনের ভিড় সেখানে, আর তামাকের গন্ধ, কুলি, গাড়োয়ান আর কত রকমের সব লোক— নালিশে নালিশে আমার একেবারে প্রাণান্ত করে ছেড়েছে। সারাদিন এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে পাইনি আমি। আর এই কি শেষ হল ভাবছেন? তা নয়, এর পর এক কনসার্ট আছে না? অভাবগ্রস্তা মেয়েদের সাহায্যের জন্য কনসার্ট, তারপর আছে এক 'চ্যারিটি বল'—।

বাখতিনস্কী অমনি একটু সামনে নুয়ে হাতওয়ালা চেয়ারের নিচে দুই জুতোর গোড়ালিতে ঠোক্কর লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন, এতে আমি আপনার সঙ্গে একটু ম্যাজুর্কা নাচতে চাইলে আশা করি আপনি 'না' করবেন না।

ধন্যবাদ। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে আমাদের এই শিশু আশ্রম নিয়ে, কি বলতে চাইছি আমি, বুঝছেন? শিশু আশ্রম মানে বহু দোষে দুষ্ট, অবাধ্য অ-বশ্য শিশুদের জন্য আশ্রম।

বুঝলাম। চমৎকার মজার ব্যাপার ত এটা।

উঁহু, এ সব জিনিস নিয়ে বিদ্রূপ করতে লজ্জা পাওয়া উচিত আপনার।... কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কি জানেন?

যে সব হতভাগ্য শিশুদের আত্মা বংশানুক্রমিক দোষ আর কুদৃষ্টান্তে কলুষিত হয়ে গেছে, তাদেরই আশ্রয় দিতে চাই আমরা, এখানে এনে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে চাই—।

হুঁ।

—তাদের নৈতিক জীবনের উন্নতি করাতে চাই, কর্তব্যবোধ জাগাতে চাই

তাদের মনে। বুঝতে পারছেন আমার কথাটা? প্রতিদিন শতশত হাজার হাজার শিশু আনা হচ্ছে আমাদের কাছে কিন্তু তাদের মাঝে অবশ্য মন্দ ছেলে একটিও নেই। যদি তাদের বাপমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের ছেলে কি মন্দ, মেয়ে কি মন্দ, তারা প্রশ্ন শুনেই অসন্তুষ্ট হয়—বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? সুতরাং আশ্রম গড়ে শিশুদের কল্যাণে উৎসর্গ করে দ্বার খুলে আমরা বসে আছি অথচ একটি জনপ্রাণী নেই সে আশ্রমে। আমরা ত এখন এক একটা মন্দ ছেলে আনবার জন্য এক একটা পুরস্কার ঘোষণা করব বলে ভাবছি।

অশ্বারোহী সৈন্যদলের নেতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করে তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, এ্যানা নিকোলয়েভনা, এ পুরস্কার ঘোষণা করবার দরকার কি? আমাকে অমনি নিয়ে নেন না কেন সেখানে? সত্যি বলছি আমার চেয়ে দুষ্ট ছেলে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আসুন! আপনার সঙ্গে কোন গুরুতর বিষয় আলোচনা করা এক দায় দেখছি। বলেই এ্যানা হেসে গড়িয়ে পড়ল কৌচের পিছন দিকে. কৌতুকে চোখ দুটি জ্বল জ্বল করতে লাগল তার।

এদিকে মস্তবড় একটা গোলটেবিলে বসে প্রিন্স ভ্যাসিলি তাঁর বোন এ্যানোসভ এবং তাঁর ভগিনীপতিকে নিজের আঁকা কতকগুলি কার্টুন ছবির এ্যালবাম দেখাচ্ছিলেন, ছবিগুলি সবই নিজের বাড়ির লোকের। ওঁরা চারজনই ছবি দেখছিলেন আর বসেছিলেন, ক্রমে যাঁরা তাস খেলছিলেন না তাঁরাও এসে জড়সড় হল ওখানে।

এ্যালবামে ছবিগুলি অনেকটা প্রিন্স ভ্যাসিলির ব্যঙ্গাত্মক গল্পের পরিপূরকের মত। অচঞ্চল গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি প্রথমে দেখালেন বীর সেনাপতি এ্যানোসভের তুরস্ক, বুলগেরিয়া এবং অন্যান্য স্থানে প্রেমাভিসার। তারপর ফুলবাবু প্রিন্স নিকোল বুলেত-তুগনোফ্স্কীর মণ্টী কার্লো অভিযান। এমনি চলতে থাকল। থাকল।

প্রিন্স ভ্যাসিলি এবার তাঁর বোনের দিকে দ্রুত একবার দুষ্টামি ভরা চোখে চেয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, ভদ্রমহিলাবৃন্দ, ভদ্রমহোদয়গণ এবার আমি আপনাদের আমার প্রিয় ভগিনী লুদমিলা লোভনার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে ওয়াকি-বহাল করছি। প্রথম ভাগ। শৈশব। শিশু বোন আমার বড় হচ্ছে। নাম তার লিমা।

এ্যালবামের পাতায় আঁকা রয়েছে ছোট্ট একটি মেয়ের ছবি, ইচ্ছে করেই ছেলেমি করে আঁকা হয়েছে ছবিটা, মুখখানার পাশের দিক দেখানো হয়েছে বটে কিন্তু তাতে দুটো চোখই দেখা যাচ্ছে: স্কার্টের নিচে থেকে দুটো বাঁকা লাইন বেরিয়ে এসেছে এ দুটো হচ্ছে তার পা--দু হাতের আঙুলগুলিই ছড়ানো।

লুদমিলা লোভনা অমনি হেসে উঠে বললে. আমাকে কেউই কোনদিন লিমা বলে ডাকেনি।

দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম প্রেম। অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশার্থী এক ছাত্র কুমারী লিমার সামনে নতজানু হয়ে তার স্বরচিত একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে, সেই কবিতার মাঝে এই অপূর্ব সুন্দর লাইন দুটিও ছিল ঃ

জাঁকাল তোমার পা দেখে মোর এই কথা মনে লয়,
ইহা যে দিব্য প্রেমের বস্তু, ইহা ছাড়া কিছু নয়।

আঃ—এই দেখুন পায়ের আসল চেহারা।

তারপর এই দেখুন সেই সামরিক ছাত্রটি লিমাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে প্ররোচিত করছে। এইটায় দেখুন, ওরা দুটিতে পালিয়ে যাচ্ছে। তারপরের অবস্থা বড় সঙ্কটের—ক্রুদ্ধ বাপ পলাতকদের ধরে ফেলেছেন। ভীরু ছেলেটা লিমাকে বিপদে ফেলে পালিয়ে গেল।

নাকে তোমার পাউডার দিলে এমনি ঢিলে করে,
চিহ্ন দেখে, আসছে যারা, ফেলবে এখন ধরে।
চেষ্টা করে এখন ওদের হটিয়ে রাখ দূরে,
দৌড়ে গিয়ে ঝোপের মাঝে আমি পড়ি সরে।

কুমারী লিমার কাহিনীর পরেই এল 'প্রিন্সেস ভেরা ও জ্ঞানহারা টেলিগ্রাফ কর্মচারী।'

ভ্যাসিলি লোভিচ্ অতি গম্ভীরভাবে বললেন, এই চলমান কাব্যকাহিনীর ছবি আঁকাই শুধু হয়েছে, বাক্যাংশ শেষ হয়নি, রচিত হচ্ছে।

এ্যানোসোভ বললেন এত বেশ অভিনব জিনিস, আগে কোনদিন দেখিনি।

শেষ সংখ্যা এ,—প্রথম প্রকাশন।

ভেরা আস্তে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, লক্ষ্মীটি থামো।

কিন্তু ভ্যাসিলি লোভিচ্ হয়ত শুনতে পেলেন না, অথবা শুনেও সে কথা রাখবার মত মনে করলেন না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। মে মাসের এক সুন্দর দিনে ভেরা নামে একটি কুমারী মেয়ে একখানা চিঠি পেল, চিঠির প্রথম পৃষ্ঠায় চুম্বনরত বন্য পারাবতের ছবি। এই সেই চিঠি আর এই সেই পাখি।

চিঠিখানায় বানানের সর্বনিয়ম তুচ্ছ করে প্রেম নিবেদন করা হয়েছে। চিঠিখানার প্রারম্ভে বলা হয়েছে, 'হে সুবর্ণকেশী সুন্দরী, আপনার রূপ আমার হৃদয়ে যেন একটি অগ্নিশিখার সমুদ্র সৃষ্টি করেছে, আপনার দৃষ্টি বিষধর ভূজঙ্গের মত আমার বেদনার্ত চিত্তে সর্বদা লগ্ন হয়ে আছে।' চিঠির উপসংহারে বহু বিনয় করে বলা হয়েছে, 'আমি সামান্য একজন টেলিগ্রাফ কর্মী কিন্তু হৃদয়াবেগে আমি মিলর্ড জর্জের সমতুল। আমার পুরো নামটা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করছি আমি, নামটা বড় অশ্লীল। তাই নামের আদ্যক্ষর শুধু সই করছি আমি ঃ পি, পি, জেড্। দয়া করে 'পোস্ট রেস্তান্ত' পোস্টাফিসের ঠিকানায় উত্তর দিলে সুখী হবো।' হে ভদ্রমহিলা ভদ্রমহোদয়গণ, এই দেখুন

সেই টেলিগ্রাফ কর্মচারীর ছবি নিপুণ হাতে 'ক্রেয়ন' দিয়ে আঁকা হয়েছে এটা—।

চিঠি পেয়ে ভেরার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়ে গেল (এই হচ্ছে তার হৃদয়ের ছবি, আর এই হচ্ছে গিয়ে তীর)। কিন্তু ভেরা বড় লক্ষ্মী মেয়ে বলে চিঠিখানা সে তার পূজনীয় মা বাপ এবং তার বাল্যবন্ধু এবং বাগদত্ত স্বামী সুদর্শন তরুণ ভাস্যা শেয়িনকে দেখালে। এই যে এর ছবি দেখুন আপনারা। যথা সময়ে কবিতায় এই ছবিগুলির ব্যাখ্যা লিখে দেওয়া হবে।

ভাস্যা শেয়িন তাঁর বাগ্‌দান-অঙ্গুরী ভেরাকে ফেরত দিয়ে বললে, আমি তোমার সুখের পথে বাধা হতে চাই না, কিন্তু দোহাই তোমার, বেশি তাড়াহুড়ো করে কিছু করে বস না, পাকাপাকি কিছু করবার আগে তার মনটা আগে বুঝে নাও, তোমার নিজের মনটাও বোঝ। বয়স তোমার অল্প, জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান তোমার একরকম নেই বললেই হয়, জ্বলন্ত পাবক শিখার দিকে পতঙ্গের মত ছুটে চলেছ তুমি। জেনে রেখ—এই সব টেলিগ্রাফ কর্মীরা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক। ওরা ওদের চোখ ধাঁধানো রূপ আর অনুরাগের ভড়ং দেখিয়ে নিরীহ মেয়েদের প্রতারণা করে অসীম আনন্দ পায়, পরে নিষ্ঠুরের মত তাদের ছেড়ে যায়।

ছ মাস কেটে গেল। জীবনের 'ওয়ালজ'-নাচের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ভেরা তার অনুরাগী ভক্তকে ভুলে গিয়ে সুদর্শন তরুণ ভাস্যাকে বিয়ে করলে, কিন্তু টেলিগ্রাফ কর্মী তাকে ভুললে না। একদিন সে ধূমনালী মার্জকের বেশে কালি-ঝুলি মেখে ভেরার সাজঘরে গিয়ে ঢুকলে, আপনারা দেখুন সে কেমন কম্বল, বালিশ, ওয়ালপেপার এমন কি মেঝেতে তার পাঁচ আঙুল আর দুই ঠোঁটের দাগ রেখে গেছে।

এর পর সে একটি গ্রাম্য মেয়ে সেজে ভেরাদের রান্নাঘরে বাসন ধোয়ার কাজ নিলে কিন্তু লুকা তার দিকে বড় বেশি নজর দিতে থাকায় সে শেষে পালিয়ে গেল।

এরপর দেখা গেল সে এক উন্মাদ আশ্রমে গেছে। সে একবার সন্ন্যাসীও হল। এই যে সেই সময়কার ছবি দেখুন আপনারা। সে যেখানেই যখন যাক না —প্রতিদিন ভেরাকে এক একখানি করে আবেগভরা চিঠি লিখত, চিঠির যেখানে সেখানে তার চোখের জল পড়ত সেই সেই জায়গার কালি সব চুপসে যেত।

যাক শেষে সে মারা গেল কিন্তু মরবার আগে উইল করে ভেরাকে টেলিগ্রাফ আফিসের দুটি বোতাম এবং তার চোখের জল ভরতি সুগন্ধি দ্রব্যের একটা বোতল দিয়ে গেল।

ভেরা নিকোলয়েভনা হঠাৎ বলে উঠল ভদ্রমহিলা-ভদ্রমহোদয়গণ; এবার একটু চা হলে কেমন হয়?

শরতের বিলম্বিত সূর্যাস্তের আভা মিলিয়ে যাচ্ছিল। চক্রবাল রেখার কিনারে নীলাভ মেঘ আর পৃথিবীর মাঝখানে যে সরু একখানি গভীর লাল রঙ দেখা যাচ্ছিল তা-ও ক্রমে ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। পৃথিবী, আকাশ, গাছপালা কিছুই দেখা গেল না আর। উপরে বড় বড় তারাগুলি আঁখিপক্ষ্ম নেড়ে ঝিক্‌মিক্‌ করতে লাগল, লাইট হাউসের নীল আলো একটা সরু থামের মত উপরে উঠে আকাশে লেগে যেন গোলাকার তরল আবছা আলো হয়ে চারিদিকে ছিটকে যেতে লাগল। মোমবাতির ঢাকনার গায়ে পতঙ্গ পাখা নাড়তে লাগল। সামনের বাগানে তামাক গাছের তারার মত ফুলগুলি থেকে রাত্রির স্নিগ্ধ অন্ধকারে কড়া গন্ধ বেরিয়ে আসতে লাগল।

ভাইস গভর্নর স্পেশনিকোভ আর কর্নেল পোনামারিখভ অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন, যাবার আগে বলে গেছেন জেনারেলকে নিয়ে যাবার জন্য ট্রামের ডিপোর ওখান থেকে তাঁরা ঘোড়া ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা এখনও যাননি তাঁরা সব দ্রাক্ষাকুঞ্জের ওখানটার সমান জায়গায় বসে ছিলেন। বার বার 'না'-'না' করলেও জেনারেল এ্যানোসোভকে তাঁর ওভার কোট পাঠিয়ে দেওয়া হল, গরম একটা কম্বল দিয়ে তাঁর পা দুটি ঢেকে দেওয়া হল। দুই বোনের মধ্যে তাঁর প্রিয় মদ পোমার্দ ক্ল্যারেতের একটি বোতল সামনে নিয়ে তিনি বসে ছিলেন। দুই বোন বেশ যত্ন করে তাঁর পরিবেশন পরিচর্যা করছিল, পাতলা কাঁচের পাত্রটি বার বার ঘন ভারি মদে ভরে দিচ্ছিল, দিয়াশলাই এগিয়ে দিচ্ছিল, পনীর কেটে দিচ্ছিল, আরো কত কি! বৃদ্ধ জেনারেল আনন্দে একেবারে বিড়ালের মত গরগর করছিলেন।

হ্যাঁ, শরৎকাল এসে গেল, বৃদ্ধ মোমবাতির আলোর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, শরৎ এল, এবার আমার তল্পি-তলপা বাঁধবার পালা। কি দুঃখের কথা! এখন এই সমুদ্রতীরের শান্ত মধুর পরিবেশে থাকতে পারলে কি আনন্দই না হত, এখানকার আবহাওটাও কি সুন্দর এখন।

ভেরা বললে থেকে যান না, দাদু?

তা কি পারি রে, পারি না। কর্তব্যের আহ্বান। ছুটি ফুরিয়ে গেল আমার। থাকতে পারলে ত খুব ভালই হত। গোলাপগুলি থেকে কি সুন্দর

গন্ধ বেরুচ্ছে, এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি আমি। গ্রীষ্মকালে ফুলগুলির একরকম গন্ধ থাকে না বললেই হয়, অবশ্য একমাত্র শ্বেতবাবলার ফুল ছাড়া, ওর গন্ধ যেন কেমন মিঠাইয়ের মত।

ভেরা একটা জগ থেকে একটা গোলাপী আর একটা গাঢ় লাল গোলাপ নিয়ে জেনারেলের ওভার কোটের বোতামের ঘরে পরিয়ে দিলে।

ভেরা, লক্ষ্মী সোনা, ধন্যবাদ তোমায়।

জেনারেল মাথাটা নুইয়ে গোলাপের গন্ধ শুঁকে প্রাণ খোলা দরদী বৃদ্ধেরা যেমনি করে হাসেন তেমনি করে হাসতে লাগলেন।

বুখারেস্তে যখন আমরা আস্তানা নিই তখনকার কথা মনে পড়ছে আমার। একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় গোলাপের কড়া গন্ধ নাকে এল। দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। দেখলাম দুইজন সৈনিক তাদের দুজনার মাঝে একটা সুন্দর খাঁজকাটা বোতলে আতর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর মাঝেই তারা ওর থেকে কিছুটা নিয়ে তাদের জুতো আর বন্দুকের টিপ কলে লাগিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কি তোমাদের?—ওরা বললে এটা, স্যার, এক রকমের তেল, আমাদের তরল খাবারে ঢেলে দিয়েছিলাম কিছুটা, কেমন যেন বিস্বাদ লাগল, কিন্তু গন্ধটা বড় সুন্দর। আমি একটি মাত্র রুবল দিলাম ওদের, ওরা সানন্দে আমায় সে বোতলটা দিয়ে দিল। বোতলে অর্ধেকের বেশি মাল নেই, তখন কিন্তু এ জিনিসের যা দাম তাতে ভাবলাম অন্তত দুশো রুবল আসবে আমার—এতে। সৈনিক দুটি ঐ এক রুবল পেয়েই কত খুশি। তারা বললে, আর একটা জিনিস আছে, স্যার, দেখুন। এক রকমের মটর। সেদ্ধ করতে কত চেষ্টা করলাম আমরা, কিন্তু এ ছাইয়ের জিনিস কিছুতেই নরম হল না। আমি দেখে বললাম এ হচ্ছে কফির বীজ, এ কেবল তুর্কীদেরই ভাল লাগে, সৈনিকদের এ দিয়ে কোন কাজ হবে না। ভাগ্যি ভাল—আফিম তারা খায়নি। কোন কোন জায়গায় দেখেছি আফিমের ডেলা সব পা দিয়ে মাড়িয়ে কাদায় পুঁতে দিচ্ছে।

এ্যানা বললে আচ্ছা দাদু, সত্যি করে বল ত যুদ্ধে ভয় পেয়েছ তুমি কোনদিন? ভয় ভয় লেগেছে?

কি যে বলিস তুই, এ্যানা!—ভয় লেগেছে বই কি। যারা বলে যুদ্ধে গিয়ে ভয় পায়নি, গুলির শব্দ যেন মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি, বিশ্বাস করিসনে তাদের কথা। যাদের মাথা খারাপ বা যারা হামবড়া তারাই শুধু ঐ সব কথা বলে। যুদ্ধে ভয় পায় সবাই, কারো পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে আবার কেউ বা জোর করে নিজেকে শক্ত রাখে, তফাত মাত্র এইটুকু। মনের ভয় বরাবরই একরকম থেকে যায়, কিন্তু বিপদে মাথা ঠিক রাখবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে বেড়ে যায়, এই যার যত বাড়ে সেই তত সাহসী বীর। ব্যাপার হচ্ছে এই। একবার ত আমি ভয়ে একেবারে মরে যাবার যোগাড় হয়েছিলাম।

দুই বোনই একসঙ্গে আবদার করে বলে উঠল বল না, দাদু ঘটনাটা!

ওরা ছেলেবেলায় এ্যানোসোভের কাছে যেমনি করে গল্প শুনত, এখনও ঠিক তেমনি করে শোনে। এ্যানা টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে দাদু হাতের তালুর উপর থুতনি রাখল। এ্যানোসোভ গল্প বলেনও বড় সহজ ভঙ্গিতে, বেশ ধীরে ধীরে। যুদ্ধের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে যে দুই একটি বইয়ের কথা আর উপমা দেন, সেইগুলিই শুধু কেমন অদ্ভুত, বিশ্রী লাগে। শুনে মনে হয় কোন প্রাচীন গল্পকথকের অনুকরণ করতে চেষ্টা করছেন তিনি।

যাইহোক, দু বোনের অনুরোধ রাখতে তিনি বলতে শুরু করলেনঃ

গল্পটা অবশ্য খুবই ছোট। ব্যাপারটা ঘটেছিল শিপকায়, শীতকালে; কামানের গোলায় আহত হয়েছিলাম আমি। তারপর, এক পরিখার মধ্যে ছিলাম আমরা চারজন। এই সময় এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেল আমার। একদিন সকালে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মনে হল আমি এ্যাকোভ নই, নিকোলাই। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই আমি এ ভুল ভাঙতে পারছিলাম না। মাথাটা বিগড়ে যাচ্ছে বুঝেই চিৎকার করে খানিকটা জল চেয়ে নিলাম, তারপর সেই জল দিয়ে বেশ করে মাথা ধোওয়ার পর তবে আমি আমার ঠিক বোধ ফিরে পাই।

পিয়ানোবাদিকা জেনী রিটার বলে উঠল, যুদ্ধে গিয়ে অনেক নারীর চিত্তও জয় করেছেন আপনি নিশ্চয়। যৌবনে নিশ্চয়ই আপনি খুব সুপুরুষ ছিলেন!

এ্যানা অমনি বলে উঠল,—কেন, দাদু ত আমাদের এখনও সুদর্শন।

এ্যানোসোভ শান্ত মধুর হাসি হেসে বললেন, সুপুরুষ আমি ছিলাম না, কিন্তু আমায় দেখে মুখ ফিরিয়েও নিত না কেউ। বুখারেস্তে একবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল। আমরা যখন মার্চ করে শহরে ঢুকলাম, ওখানকার লোকেরা বড় 'স্কোয়ারে' গুলি ছুঁড়ে আমাদের সম্বর্ধনা করলে, বহু জানলা ভেঙে গেল, কিন্তু যে সব জানলার ধারে গেলাসে জল ছিল, সেগুলি অনাহতই রয়ে গেল। কি করে জানলাম তা বলছি। আমার থাকবার জন্য যে বাড়িটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে এসে দেখি একটা জানলার তাকে একটা ছোট্ট খাঁচা, খাঁচার উপরে একটা মুখখোলা কাঁচের পাত্র, পাত্রের মধ্যে টলটলে জলে অনেক-গুলি সোনালি মাছ সাঁতরাচ্ছে, আর তার মধ্যে একটা ক্যানারি পাখি বসে। জলের মধ্যে ক্যানারি! দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু ভাল করে নজর দিয়ে দেখি কাঁচের পাত্রটার নিচুর দিক খুব চওড়া আর তার মধ্যিখানটা রীতিমত ফাঁপা, সুতরাং ক্যানারিটা অনায়াসে খাঁচা থেকে উড়ে ওখানে এসে বসতে পারে।

এর পর বাড়ির ভিতরে ঢুকেই দেখি বুলগেরিয়ার একটি অতি সুন্দরী মেয়ে। আমি তাকে আমার প্রবেশপত্র দেখাবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, এ হল কি করে ঃ এত বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে গেল অথচ এ বাড়ির জানলার কাঁচ ভাঙল না? ও বললে, জল থাকার জন্যেই এমনটি হতে পেরেছে।

মেয়েটি ক্যানারির কথাও বললে আমাকে। সত্যি আমি কি বোকা! আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল আমাদের, দুজনের চোখের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছিল, তখনই মনে হতে লাগল মেয়েটির সঙ্গে ভয়ঙ্কর প্রেমে পড়ে গেছি আমি, এ থেকে আর কিছুতেই নিস্তার নেই।

বৃদ্ধ জেনারেল এইখানে একটু থেমে ধীরে ধীরে কালো মদের গেলাসে একটু চুমুক দিলেন।

পিয়ানোবাদিকা বললে, আপনি তাকে আপনার প্রেমের কথা জানিয়েছিলেন নিশ্চয়, জানাননি?

হাঁ, জানিয়েছিলাম বই কি! কিন্তু কোন কথা বলে নয়। সেটা আবার কি করে হল, তা বলছি—

এ্যানা দুষ্টু হাসি হেসে বললে, শুনে আমাদের লজ্জায় মুখ রাঙা করতে হবে না ত, দাদু?

মোটেই না, ব্যাপারটা রীতিমত ভদ্রভাবেই হয়েছিল। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝছ, সব শহরেই আমরা এক রকম সম্বর্ধনা পাইনি, বুখারেস্তের লোকগুলি কিন্তু অতি সহজেই আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আরম্ভ করলে। একদিন আমি বেহালা বাজাচ্ছিলাম অমনি ওখানকার মেয়েরা তাদের রবিবারের ভাল জামা-কাপড় পরে এসে নাচতে শুরু করে দিলে, শুধু ঐ একদিন নয়, এরপর থেকে তারা রোজই ঐ করতে লাগল।

একদিন যখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, তখন আমি যেখানটা দিয়ে বুলগেরিয়ার ঐ মেয়েটিকে চলে যেতে দেখেছিলাম, সেখানটায় গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখেই সে ভান করে গোলাপের পাপড়ি কুড়াতে মন দিলে। এ পাপড়ি অবশ্য ওখানে বস্তায় বস্তায় কুড়ানো হয়। আমি গিয়ে তাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে এনে অনেকগুলি চুমু দিলাম।

সেই থেকে রোজই আকাশে চাঁদ তারা উঠলে আমি আমার ঐ প্রিয়ার কাছে ছুটে যেতাম, তার কাছে থাকবার সময় আমার দিনের দুঃখ কষ্ট উদ্বেগের কথা সব ভুলে থাকতাম। তারপর আমাদের দলের যখন ওখান থেকে চলে যাবার সময় হল তখন আমরা পরস্পরের কাছে শাশ্বত প্রেমের অঙ্গীকার করে চিরকালের মত বিদায় নিলাম।

ল্যুদমিলা লোভনা নিরাশ হয়ে বলে উঠল, এই হয়ে গেল?

জেনারেল বললেন, আর কি চাও তুমি?

আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন, এ্যাকোভ মিখাইলোভিচ্, কিন্তু আমি বলছি.. এ প্রেম নয়, এ শুধু এক সামরিক অফিসারের শিবিরবাসকালীন এক রোমাঞ্চকর ঘটনা।

জানি না, এ প্রেম কি অন্য কিছু। সত্যি বুঝি না।

আমি বলতে চাই, সত্যিকার প্রেম যে কি বস্তু তা কি বুঝবার সুযোগ

হয়েছে আপনার জীবনে? সত্যিকার প্রেম, মানে যে প্রেম দিব্য, পবিত্র, শাশ্বত এবং অপার্থিব। এ রকম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার কোনদিন?

বৃদ্ধ হাতলওয়ালা চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, ঠিক বলতে পারলাম না আমি। হয়ত নয়। প্রথমে যৌবনকালে সময় পাইনি আমি, কখনও তাসে, কখনও হাসি খেলা ফুর্তি করতে, কখনও যুদ্ধে সময় আমার কেটে গেছে। মনে হয়েছে সুস্থ দেহ আর যৌবন চিরকালই থাকবে। তারপর একদিন যখন ফিরে তাকালাম নিজের দিকে, দেখি আমি একেবারে জরাগ্রস্ত বুড়ো হয়ে গেছি।...ভেরা, লক্ষ্মীটি, আর আমায় আটকে রেখ না। তোমাদের সকলের কাছ থেকেই এখন বিদায় নিচ্ছি আমি। অশ্বারোহী সৈন্য-দলের নেতা বাখতিনস্কীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, আজ রাত্রে তেমন ঠাণ্ডা নেই, চল আমরা হেঁটেই আমাদের গাড়ি ধরি গিয়ে।

ভেরা বললে, দাদু, আমি তোমার সঙ্গে আসছি।

এ্যানা অমনি বলে উঠল, আমিও যাব।

রওয়ানা হবার আগে ভেরা তার স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, আমার ড্রয়ারের ভিতর একটা ছোট্ট লাল বাক্স আছে, ওর মধ্যে একখানা চিঠি দেখতে পাবে, পড়ো।

৮

এ্যানাকে সঙ্গে নিয়ে বাখতিনস্কী আগে আগে যাচ্ছিলেন, প্রায় বিশ পা পেছনে ভেরার সঙ্গে বাহুবদ্ধ হয়ে চলেছিলেন জেনারেল। এত অন্ধকার যে প্রথম কয়েক মিনিট পা এদিকে ওদিকে বাড়িয়ে তাঁদের পথ নির্ণয় করে নিতে হচ্ছিল, তারপর অবশ্য অন্ধকার গা-সওয়া হয়ে গেল। এ্যানোসোভ এখনও খুব ভাল দেখতে পান বলে গর্ব করতেন, তাই তিনিই তাঁর সঙ্গিনীকে পথ চলতে সাহায্য করছিলেন। ভেরার হাতটা ছিল এ্যানোসোভের জামার আস্তিনের খাঁজের ওখানটায়, বৃদ্ধ মাঝে মাঝে তাঁর ভারি ঠাণ্ডা হাত দিয়ে ওর হাতে আদরের চাপড় দিচ্ছিলেন।

তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, বড় মজার লোক তোমাদের ঐ লুদমিলা লোভনা। শুনে মনে হল, মনে মনে যা তিনি ভাবছিলেন তারই শেষাংশ যেন বেরিয়ে গেল হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে : জীবনে আমি এ বহুবার দেখলাম, মেয়েদের বয়স পঞ্চাশ পেরুলেই, বিশেষ করে তাঁরা যদি বিধবা বা কুমারী হন—অপরের প্রেমের ব্যাপার

নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দেন। অপরের প্রেম করা তাঁরা লুকিয়ে দেখেন তাকিয়ে দেখেন, তাই নিয়ে গল্পগাছা করেন, ঐ ব্যাপারে কাউকে সুখী হতে সাহায্য করেন অথবা দিব্য প্রেম সম্বন্ধে সব বড় বড় কথা বলতে শুরু করে দেন। আমার মনে হয় আজকালকার লোক কেউ ভালবাসতেই জানে না। সত্যিকার ভালবাসা জগতে নেই। অন্তত আমি ত কিছু দেখিনি আমার জীবনে।

ভেরা তাঁর বাহুতে একটু চাপ দিয়ে বললে, সে কি, দাদু? কি লজ্জার কথা! তুমি ত নিজে বিয়ে করেছিলে, ভালবাসা কি জিনিস তা ত তোমার না জানবার কথা নয়!

বিয়ে করা না করাতে কিছু এসে যায় না, ভেরা।...আমার কি করে বিয়ে হল শুনবে? যার সঙ্গে আমার বিয়ে হল তরুণ বয়সে চেহারা ছিল তার বড় সুন্দর, একটা পাকা পীচ ফলের মত। আমার পাশে যখন সে বসত ব্লাউজের নিচে বুকটা তখন তার দুলে দুলে উঠত, দীর্ঘপক্ষ্মাশ্রিত চোখ দুটি নত করে সে হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত। কি নরম তার গালের চামড়া! নিষ্কলুষ শুভ্র তার গ্রীবা, আর হাতদুটি তার সুখোষ্ণ, কোমল। ভগবান! তার বাপ-মা চুপি চুপি সব সময় আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন, দরজায় আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনতেন। বিদায় নেবার আগে প্রতিদিন সে আমায় অতি দ্রুত পাখির ঠোকর মারার মত করে কয়েকটি চুমু দিয়ে দিত। চায়ের সময় তার পাটা হঠাৎ লেগে যাবার মত করে প্রায়ই আমার পায়ে লেগে যেত। নিজের মনটা ভাল করে বুঝতেও সুযোগ দিলে না ওরা আমায়। একদিন নিকিতা এ্যান্তোনোভিচের কাছে গিয়ে আমি বললাম, দেখুন, আজ আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছি আপনার কাছে, বিশ্বাস করুন, এই দেবদূতের মত মেয়েটি—। আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে এল, তিনি আমাকে চুমু দিতে শুরু করে দিলেন, বললেন, তুমি যে এই প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসবে এ কথা আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম, বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! কিন্তু, দেখো বাবা, আমাদের এ রত্নটির যেন কোন অযত্ন না হয়। তিনমাস পরেই এই দেবদূত রত্নটি ময়লা ছেঁড়া ড্রেসিংগাউন পরে খালি পায়ে চটি ফট্‌ফট্‌ করতে করতে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল, মাথার পাতলা চুলগুলিও আঁচড়াবার বাঁধবার বালাই নেই, তাতে ঝুলে থাকত আবার চুল কোঁকড়ানর কাগজের টুকরা। বাড়ির আর্দালিদের সঙ্গে জেলেনীর মত ঝগড়া, আর তরুণ অফিসারদের সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা, খিলখিলিয়ে হাসা আর ঢলাঢলি। বিশেষ কোন কারণ বশত সবার সামনেই তিনি একটু নাকী সুরে টেনেটেনে আমায় জ্যাকিস্‌ বলে ডাকতে লাগলেন। একসঙ্গে জ্যাকিস্‌ না বলে বলতেন তিনি, ও জ্যা-য়্যা-য়্যাকিস্‌। এ ছাড়া যেমনি নোংরা, তেমনি ভন্ড লোভী আর অপব্যয়ী। চোখ দুটির মধ্যে তার সারল্যের লেশমাত্র ছিল না। যাক, সব শেষ হয়ে গেছে, বাঁচা গেছে। সেই

হতভাগা অভিনেতাটার কাছে আমি এখন কৃতজ্ঞ। ভাগ্য ভাল যে, আমাদের কোন ছেলেপিলে ছিল না।

আচ্ছা, দাদু, ওদের আপনি ক্ষমা করতে পেরেছেন?

ক্ষমা বললে কিছু বলা হয় না, ভেরা। প্রথমে আমি একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন তাদের দেখতে পেলে নিশ্চয়ই খুন করে ফেলতাম। তারপর ধীরে ধীরে সব জ্বালা কমে গেল, মনে রইল শুধু এক নিদারুণ ঘৃণা। ভালই হল। বৃথা রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন ভগবান। অধিকাংশ স্বামীদের ভাগ্যে যা ঘটে তা থেকেও রেহাই পেলাম। ঐ বিশ্রী ব্যাপারটা না ঘটে গেলে আমার অবস্থাটা কি হত একবার ভেবে দেখ ত! দুষ্কৃতি-কারিণীকে সাহায্য করতে, আশ্রয় দিতে গিয়ে অতি ঘৃণ্য পর্যায় নেমে যেতে হত আমায় ঃ আমি হতাম ওর বোঝা বইবার উট, দুধ দেওয়ার গাই, আড়াল করবার পর্দা বা তৈজসপত্রের মত। না, ভেরা, ভালই হয়েছে এ।

না, দাদু, এ তুমি ঠিক কথা বলছ না। যদি কিছু না মনে কর ত বলব, ব্যথাটা তুমি এখনও ভুলতে পারনি। আর তোমার দুঃখের ব্যাপারটা তুমি সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাও। এই ভাস্যা আর আমার কথাই ধর না কেন। আমাদের বিয়েটা সুখের হয়নি বলতে পার না তুমি, পার কি?

এ্যানোসোভ কিছুক্ষণ কথা না বলে চুপ করে রইলেন। তারপর একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেই বললেন, ঠিক আছে, ধরে নেওয়া যাক তোমাদের ব্যাপারটা একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু সাধারণ লোকে বিয়ে করে কেন? প্রথমে মেয়েদের কথাই ধরা যাক। তারা বিয়ে করে কারণ একা থাকতে তাদের লজ্জাবোধ হয়, বিশেষ করে যখন তাদের আর আর বন্ধুদের বিয়ে হয়ে যায়। বাড়ির লোকের কাছে একটা ভারস্বরূপ হয়ে থাকা তাদের অসহ্য হয়ে ওঠে। কোন বাড়ির কর্ত্রী হয়ে গিন্নী হয়ে স্বাধীনতা ভোগ করতে চায় তারা। এ ছাড়া আরও আছে, তা হচ্ছে দেহের তাগিদ, মা হওয়ার তাগিদ, নিজের একটা নীড় রচনা করবার তাগিদ।

পুরুষের কথা আলাদা। প্রথমত, একক জীবনে ঘৃণা ধরে যায় তাদের ঃ এলোমেলো ঘর, রেস্তরায় খাওয়া, নোংরা আবর্জনা, পোড়া সিগারেটের টুকরা, ছেঁড়া বা খাপ না খাওয়া জমা-কাপড়, হরদম বন্ধুবান্ধবের দৌরাত্ম্য এ সব সহ্য করতে পারে না তারা বেশি দিন। দ্বিতীয়ত, ঘর বেঁধে থাকা, কি স্বাস্থ্য কি পয়সাকড়ি দুই দিক দিয়েই তারা সুবিধা বলে মনে করে। তৃতীয়ত, তারা মনে করে বিয়ে করলে তাদের মৃত্যুর পরও তাদের কিছুটা অংশ তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বেঁচে থাকবে, এক রকম অমর হবার মোহ আর কি! এর পর আছে পবিত্রতার মোহ, যেমন আমার বেলায়। কেউ কেউ আবার ভালরকম যৌতুক পাবার লোভেও বিয়ে করে। কিন্তু এর মধ্যে প্রেম কোথায়? নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গকারী প্রেম, যে প্রেম কোন প্রতিদানের আশা রাখে না? প্রেমের শক্তি না কি মৃত্যুর চেয়েও বেশি! যে প্রেমের জন্যে যে কোন দুঃসাহসিক কাজ করা,

এমন কি জীবন বলি দিয়ে শহীদ হওয়াও কষ্টকর নয় বরং আনন্দের, সেই প্রেমের কথাই বলছি আমি এখানে। এর পর তুমি কি তোমার ভাস্যার কথা তুলতে চাও, ভেরা? বিশ্বাস কর আমি তাকে খুবই পছন্দ করি, সব দিক দিয়েই সে ঠিক আছে। কে জানে হয়ত ভবিষ্যতে তার প্রেম একদিন পরম সুন্দর হয়েই দেখা দেবে। কিন্তু আমি যে প্রেমের কথা বলছি সেটা একবার বুঝে দেখবার চেষ্টা কর। প্রেমের মানেই হচ্ছে বেদনা। জগতের গূঢ়তম রহস্য এ বেদনা। কোন রকম আরাম, হিসাব বা আপোষের ধার ধারে না এ।

ভেরা নরম সুরে জিজ্ঞাসা করলে, এ রকম প্রেম তুমি কোথাও দেখেছ, দাদু?

বৃদ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, না। তবে এর কাছাকাছি যায় এমন দুটি ব্যাপার আমার জানা আছে। এর একটিকে পাগলামি বলা যেতে পারে, আর একটা একেবারে যাচ্ছে-তাই নিছক আহম্মকি। শুনতে চাও ত দুটির কথাই বলতে পারি আমি। বেশিক্ষণ লাগবে না।

বল না দাদু!

আচ্ছা বলছি। আমাদেরই ডিভিশানের, কিন্তু আমাদের পল্টনের নয়, অন্য এক পল্টনের নায়কের স্ত্রী। বলব কি—ভীষণ বিদঘুটে চেহারা তার ঃ হাড় জিরজিরে, রোগা, মস্ত বড় তার হাঁ, মাথায় লাল চুল, লম্বা ঠ্যাং। মুখে এত পুরু করে প্রসাধনদ্রব্য লাগাত সে যে মস্কোর পুরনো বাড়ির চুণবালির মত তা ঝরে ঝরে পড়ত। কিন্তু হলে হবে কি, ও পল্টনের সে যেন এক মেসালিনা, যেমনি তার তেজ, তেমনি তার ঔদ্ধত্য, তেমনি করত সে সবাইকে ঘৃণা, জীবনে বৈচিত্র্য না হলে তার চলত না, তা ছাড়া আবার আফিম খাওয়ার অভ্যাস ছিল।

শরৎকালে একদিন এক তরুণ সাব-লেফটেন্যাণ্ট হয়ে এল আমাদের পল্টনে, একেবারে নতুন, সবে পাশ করে বেরিয়েছে মিলিটারী স্কুল থেকে। এক মাস পরেই ঐ ঘাগী মাগীটা ঐ ছেলেটিকে একেবারে নিজের মুঠোর মধ্যে এনে ফেললে। ছেলেটি যেন ওর চাকর, গোলাম; নাচের বেলায়ও ওর নিত্যসঙ্গী। সে ওর পাখা, রুমাল ইত্যাদি বয়ে নিয়ে বেড়াত, বরফ কুয়াশার মধ্যে সামান্য একটা জামা পরে ওর ঘোড়া আনতে ছুটত। কোন নিষ্পাপ সরল তরুণ যখন কোন পুরনো ঘাগী কুলটার পায়ে তার প্রথম প্রেম নিবেদন করে তখন ব্যাপারটা হয় বড় সাংঘাতিক। কোন রকমে ওর খর্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও বিশেষ লাভ নেই। সারা জীবনের মত তার মনে দাগ কেটে যায়।

বড়দিনের আগেই স্ত্রীলোকটির নেশা কেটে গেল, ঝোঁক পড়ল তার আবার পুরনো দিনের এক ঝানু নাগরের উপর; ছেলেটির দিকে একবার ফিরেও তাকায় না সে। ছেলেটি কিন্তু তখনও তার পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছেলেটি রোগা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, দেহের ওজন কমে গেল। কাব্য করে বলতে গেলে বলতে হয়, চোখে মুখে তার মৃত্যুর ছায়া পড়ল। প্রণয়ের

ব্যাপারে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলে ভীষণ সন্দেহ জাগল তার মনে। লোকে বলত সারা রাত ছেলেটি স্ত্রীলোকটির জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত।

বসন্তকালে একদিন পল্টনের বনভোজনের ব্যবস্থা হল। আমি ওদের দুজনকেই চিনতাম, কিন্তু ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। এই সব বনভোজন উপলক্ষ্যে যেমনটি হয়, তেমনি মদ খেয়েছিল সবাই প্রচুর। রাত্রে রেলপথের ধার দিয়ে সব বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখা গেল একটা মালগাড়ি আসছে। নিচু থেকে বেশ একটু খাড়া মত পথ দিয়ে উঁচুতে উঠে আসছিল গাড়িটা। হুইসিল শুনলে তারা। এঞ্জিনের হেড্‌লাইটটা চোখে পড়লেই স্ত্রীলোকটি ঐ ছেলেটির কানে কানে বললে, তুমি ত কেবলি বল, আমায় ভালবাস। কিন্তু আমি যদি বলি তুমি ঐ গাড়ির নিচে গিয়ে পড়, তা তুমি পারবে না নিশ্চয়ই। ছেলেটি মুখে কিছু না বলে দ্রুত গাড়ির নিচে গিয়ে পড়লে। সবাই বললে, ছেলেটির মতলব ছিল সামনের চাকা আর পেছনের চাকার মাধ্যখানে পড়া, তা হলে অবশ্য দেহটা তার দুখান হয়েই যেত, কিন্তু এক আহাম্মক ওকে তখন টেনে ধরে বাইরে সরিয়ে দিতে গিয়েছিল। লোকটার গায়ে তেমন জোর ছিল না, তাই পুরোপুরি সরাতে পারলে না, ছেলেটি দু হাতে রেললাইন আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল, ফলে হাত দুটো কাটা গেল।

ভেরা আঁৎকে বলে উঠল, কি ভয়ংকর!

সামরিক বিভাগের কাজ ছেড়ে দিতে হল তার। বন্ধুরা তার বাড়ি ফিরবার খরচের জন্য কিছু টাকা তুলে দিলে। কোন শহরে থাকবার তার কোন উপায় রইল না ঃ ঐ স্ত্রীলোকটি আর পল্টন- -দুয়েরই কলঙ্ক রটবে। বেচারার জীবনে আর কিছু রইল না, কিছুদিন ভিক্ষা করে জীবন কাটালে সে, তারপর শেষে পিতার্সবার্গের এক জেটিতে শীতে জমে মারা গেল।

দ্বিতীয় কাহিনী বেশ দস্তুর মত করুণ। স্ত্রীলোকটির প্রকৃতি, যার কথা এতক্ষণ বললাম, তারই মত, তফাতের মধ্যে এই যে, এটির বয়স অল্প, তরুণ। মেয়েটি একেবারে যাচ্ছেতাই। পরের ঘরের কথা অবশ্য সচরাচর আমরা তেমন গায়ে মাখি না, কিন্তু এর কথা শুনে আমরা একেবারে মর্মাহত হলাম। ওর স্বামী কিন্তু কিছুই মনে করত না এতে। সে সবই জানত, নিজের চোখে দেখত, কিন্তু থামাতে কিছুমাত্র চেষ্টা করত না। তার বন্ধুরাও আকার ইঙ্গিতে জানিয়েছে, কিন্তু তাদের কোন পাত্তাই দেয়নি সে, বলেছে, ভাগো, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই আমার। লেনা সুখী থাকলেই আমার হল। এমনি আহাম্মক ছিল লোকটা!

লেনা শেষে তার স্বামীর দলেরই এক তাঁবেদার সৈনিকের প্রেমে পড়ল। একেবারে দারুণ অবস্থা। লোকটির নাম লেফটেন্যাণ্ট ভিশন্যাকভ। ওরা তিন-জন দুই স্বামী এক স্ত্রীর মত বসবাস করতে লাগল, বিবাহের এইটাই যেন শ্রেষ্ঠ আইনানুগ ব্যবস্থা। এর পর আমাদের যুদ্ধে যাবার হুকুম এসে গেল।

মহিলারা সব বিদায় দিতে স্টেশনে এলেন, তাদের সঙ্গে লেনাও এল। কিন্তু জঘন্য ব্যাপার, ভাবতে গেলেও গা ঘিন ঘিন করে ঃ বাইরের ঠাট বজায় রাখবার জন্যও সে তার স্বামীর দিকে একবার চেয়ে দেখলে না, তার বদলে পুরনো দেয়ালে আইভী লতার মত তার প্রণয়ী লেফটেন্যাণ্টের গায়েই যেন সে লেপটে রইল। এক সেকেণ্ডের জন্যও সে তার সঙ্গ ছাড়লে না। আমরা সকলে ট্রেনে উঠবার পর ট্রেন যখন ছেড়ে দিলে তখন বিদায় দেবার সময় হলে ঐ বেহায়া মাগী তার স্বামীকে বেশ জোর গলায় বলে দিলে, ভোলোদ্যা সঙ্গে রইল, ওকে বেশ ভাল করে দেখাশুনা কর কিন্তু! ওর যদি কিছু হয় ত তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আমি, আর ফিরে আসব না। ছেলেপেলেও সব আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

তুমি হয়ত ভাবছ এই সেনাধ্যক্ষটি হাবাগোবা, ম্যানতামুখো, 'জেলিফিশ'! না, মোটেই না। বীর যোদ্ধা সে। জিলোনিয়ি গোরিতে এক তুর্কী উপদুর্গের বিরুদ্ধে ছবার আক্রমণ চালিয়েছে সে, তার দুশো সৈন্যের মধ্যে মাত্র চৌদ্দজন বেঁচেছে। দু দু বার আহত হয়েছে সে, কিন্তু মেডিক্যাল স্টেশনে যেতে রাজি হয়নি। এই ধরনের লোক সে। সৈন্যেরা তাকে পুজো করত।

কিন্তু তার লেনা তাকে বলে দিয়েছে, কি করতে হবে তাকে। তার লেনা। সুতরাং নার্সের মত, মায়ের মত সে ঐ কাপুরুষ কুঁড়ে অকর্মণ্য ভিশন্যাকোভের সেবা যত্ন করেছে। রাত্রে শিবিরে জলকাদায় সে ঐ অপদার্থ লোকটিকে নিজের ওভারকোটে ঢেকে রেখেছে। লোকটি পরিখায় আরামে শুয়ে কাটিয়েছে বা 'ফারো' খেলেছে আর সে তার হয়ে খাদকাটা মিস্ত্রিদের তদারক করে বেড়িয়েছে। রাত্রে ভিশন্যাকোভের হয়ে সে ফাঁড়ি পরিদর্শন করে বেড়িয়েছে। আর এ সময়টা কেমন জানো? এই সময় এ্যারোস্লাভল্-এর গ্রাম্য মেয়েরা যেমনি করে বাঁধাকপি কোটে ঠিক তেমনি করে তুর্কীরা আমাদের প্রহরীদের কেটেছে। বলতে নেই, কিন্তু সত্যি বলতে কি ভিশন্যাকোভ হাসপাতালে টাইফাসে যখন মারা গেল, তখন সে কথা শুনে সবাই খুশি।

আচ্ছা মেয়েরা কি রকম, দাদু? ভালবাসতে জানে এমন মেয়েদের দেখনি তুমি কোনদিন?

নিশ্চয়ই দেখেছি, ভেরা। আরও বলছি আমি ঃ আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে সব নারী ভালবেসেছে তাদের প্রত্যেকে মহান বীরত্বের কাজ করতে পারে। দেখনি যে মুহূর্তে তারা চুমু দেয়, আলিঙ্গন করে, নিজেকে বিলিয়ে দেয়, সেই মুহূর্তে তারা মা? তাদের কেউ যখন ভালবাসে, ভালবাসাই তখন তাদের জীবন, তাদের সমগ্র জগৎ। প্রেম যে এত নিচুতে নেমে গিয়ে অমার্জিতরুচি লোকের দৈনন্দিন সুখ সুবিধা আর চিত্তবিনোদনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এতে মেয়েদের দোষ দেওয়া যায় না। দোষ পুরুষের। বেশি বেশি খেয়ে বিশ বছরেই তারা অপদার্থ হয়ে যায়, বাচ্চা মুরগীর মত দেহ আর খরগোশের মত প্রাণ হয় তাদের: তা দিয়ে উদগ্র কামনা, বীরত্ব, স্নেহমমতা, প্রেমের পুজো কিছুই আর করা চলে

না। লোকে বলে সত্যিকার প্রেম নাকি জগতে ছিল। সত্যিই ত, তা না হলে দিব্যপ্রাণ কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, শিল্পী এরা সব কিসের স্বপ্ন দেখেছেন? সেদিন আমি 'মেনন লেসকট' আর 'ক্যাভেলিয়ার ডে গ্রু'-এর গল্প পড়েছিলাম। সত্যি বলছি, চোখে জল এসে গেল আমার। তুমি সত্যি করে বল ত প্রত্যেক নারী তার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে এই রকম একনিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, সর্বংসহ, নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ প্রেমের স্বপ্ন দেখে কিনা?

দেখেই ত, দাদু।

আর এ রকম প্রেম এখন নেই বলে মেয়েরা এখন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। এখন থেকে ত্রিশ বছর পরে—অবশ্য আমি বেঁচে থাকব না ততদিন, কিন্তু, ভেরা, তুমি থাকবে, তুমি দেখো এখন থেকে ত্রিশ বছর পরে মেয়েরা জগতে এমন কর্তৃত্ব করবে যা কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি। আমাদের পুরুষজাতিকে তারা নিচ ঘৃণ্য ক্রীতদাসের মত পায়ের তলায় রাখবে। তাদের স্বেচ্ছাচার আর বদখেয়ালে জীবন আমাদের দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আর এ সবই হবে এ যুগে প্রেমকে আমরা ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পারিনি বলে। এই হবে তাদের প্রতিশোধ। জানই ত, প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

জেনারেল একটুখানি থেমে আবার তখনই হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা ভেরা, যদি বলতে তেমন সঙ্কোচ বোধ না কর ত, বলো ত প্রিন্স ভাসিলি যে আজ রাত্রে ঐ এক টেলিগ্রাফকর্মীর কথা বলছিল, ও ব্যাপারটা কি? এর কতটুকু বা সত্যি আর কতটুকু বা তার মনগড়া?

তুমি সত্যিই শুনতে চাও, দাদু?

তুমি বললেই শুনব। অবশ্য বলতে তোমার যদি কোন বাধা থাকে, তাহলে না হয় না বললে।

না, বাধা আবার কি? বলছি আমি তোমায়।

ভেরা তখন সেই পাগলা লোকটার সকল কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললে জেনারেলকে। লোকটা ভেরার বিয়ের দুবছর আগে থেকে তার পিছু পিছু ঘুরছে।

ভেরা তাকে দেখেনি কোনদিন, তার নামও জানে না। লোকটা যে সব চিঠি লিখেছে ভেরার কাছে, তার নিচে শুধু সই থাকে জি, এস্. জেড্। তার একবারকার চিঠিতে সে শুধু জানিয়েছিল, সে এক অফিসের কেরানি, টেলিগ্রাফ অফিসের কথা কিছুই বলেনি। ভেরার গতিবিধি সে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করে বলে মনে হয়, কারণ তার প্রতি চিঠিতেই দেখা যায় ভেরা কোন সন্ধ্যা কোথায় কাটাল, তার সঙ্গে কে কে ছিল, কি রকম পোষাক সে পরেছে, সব কিছু লক্ষ্য করেছে সে। প্রথম প্রথম যে সব চিঠি লিখত সে তার মধ্যে অশোভন কিছু

না থাকলেও, সেগুলি যেন কেমন অমার্জিত রুচির পরিচায়ক. তা ছাড়া তার মধ্যে যে তীব্র আকুলতা প্রকাশ পেত তা যেন কেমন হাস্যকর। এর পর ভেরা লোকটাকে একখানা চিঠি লিখে জানায় সে যেন আর তার প্রেমের কথা লিখে তাকে বিরক্ত না করে। ভেরা জেনারেলকে এই কথাটা তাদের আপনজনের কাউকে না জানাতে বিশেষ করে অনুরোধ করলে। ভেরার এ চিঠি পাবার পর লোকটি প্রেমের কথা বলে আর কোন চিঠি লেখেনি, ইস্টার, নববর্ষের আগের সন্ধ্যায় এবং ভেরার জন্মদিনে সে শুধু শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছে। ঐ দিন যে পার্শেলটা পাঠিয়েছে সে, সে কথাও ভেরা জেনারেলকে জানালে, তা ছাড়া এই রহস্যময় অনুরাগীর অদ্ভুত চিঠিখানারও প্রায় প্রত্যেক কথাটা তাঁকে শোনালে।

জেনারেল সব শুনে শেষে একটু টেনে টেনে থেমে থেমে বললেন, লোকটা হয়ত একটু স্থূলবুদ্ধি, পাগলাটে কিংবা—কে জানে মেয়েরা যে ভালবাসার স্বপ্ন দেখে অথচ পুরুষেরা যা আর দিতে পারে না, সেই ভালবাসাই এসে গেছে তোমার জীবনে। সবুর। সামনে আলো পড়ছে. না? আমার গাড়ি এসে গেল নিশ্চয়!

ঠিক তখনই পেছনে একটা মোটরের উচ্চনাদ শোনা গেল, গাড়ির চাকার দাগে ভরা রাস্তাটা হঠাৎ এ্যাসোটিলিনের সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গাড়ি হাঁকিয়ে হাজির হলেন গুস্তভ ইভানোভিচ্।

তিনি এসেই বললেন, এ্যানা, তোমার জিনিসপত্র তুলে নিয়েছি আমি. উঠে পড়। তারপর জেনারেলের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাকে পেঁাছে দেব?

জেনারেল বললেন, না, ভাই, ধন্যবাদ। আমি এই কলের গাড়ি পছন্দ করিনে : কেবল ঝাঁকুনি আর দুর্গন্ধ, সুখ নেই ওতে। গুড্‌নাইট, ভেরা। ভেরার দুটি হাত আর কপালে চুমু দিয়ে তিনি বললেন, তোমার ওখানে প্রায়ই যাব আমি. দেখা হবে।

আর সবাইয়েরও পরস্পর বিদায় নেওয়ার পালা শেষ হল। ফ্রিয়েসীর গাড়ি ভেরাকে তার বাড়ির গেটের কাছে পেঁাছে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে বাতাস ছেড়ে গর্জন তুলে আঁধারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৯

ভেরা একটা অস্বস্তি ভাব নিয়ে দ্রাক্ষাকুঞ্জের পথে বাড়ি ঢুকল। দূর থেকেই সে তার দাদা নিকোলাইয়ের গলা শুনতে পেল. দেখলে দাদা তার শীর্ণ দেহটা

নিয়ে ঘরের এপাশ ওপাশ ছোটাছুটি করছেন। ভাসিলি লোভিচ তাসের টেবিলের পাশে বসে, খাটো করে ছাঁটা শক্ত চুলওয়ালা মস্ত বড় মাথাটা তাঁর একটু নুয়ে পড়েছে। একখানা চক্ দিয়ে টেবিলের সবুজ কাপড়ের উপর কি সব হিজিবিজি আঁকছেন তিনি।

ডান হাত দিয়ে যেন কোন অদৃশ্য ভারী বস্তু ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন এমনি অঙ্গভঙ্গি করে উত্তেজিত কণ্ঠে নিকোলাই বলছেন, অনেক আগেই আমার মনে হয়েছে, এই সব যা-তা চিঠি লেখা বন্ধ করে দেওয়া দরকার। ভেরাকে বিয়ে করবার আগেই তোমাকে বলেছি, ঐ সব চিঠির ভিতরকার হাস্যকর ব্যাপারগুলি নিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মত তোমাদের কৌতুকবোধ করা উচিত নয়। যাক, এই যে ভেরা এসে গেছে! শোন, ভেরা, ভাসিলি লোভিচ্ আর আমি তোমার ঐ পাগলের সম্বন্ধে কথা কইছিলাম। এই পত্র লেখালেখি ঔদ্ধত্য এবং অমার্জিত রুচির পরিচায়ক বলে আমি মনে করি।

শেয়িন শান্ত কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললে,—চিঠি লেখালেখি হয়নি, চিঠি শুধু এক তরফা সেই লোকটার কাছ থেকে এসেছে।

ভেরা তার স্বামীর কথায় সাহস পেয়ে বললে, আমি বুঝি না তুমি লোকটাকে বসলে।

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ নিজের বুক থেকে জোর করে সেই অদৃশ্য ভারী জিনিসটা যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, দুঃখিত আমি।

ভেরা তার স্বামীর কথায় সাহস পেয়ে বললে, আমি বুঝি না তুমি লোকটাকে আমার পাগল বল কেন। সে তোমার কাছে যেমন, আমার কাছে তেমন।

বেশ, আমি আবার মাপ চাইছি। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এ পাগলামি বন্ধ করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে, কৌতুকের সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। ভাসিলি লোভিচ্ বিশ্বাস কর—আমার উদ্বেগ শুধু তোমার ও ভেরার সুনাম নিয়ে। ভেরার সুনাম নিয়ে।

শেয়িন বললেন,—জিনিসটা তুমি বোধ হয় একটু বাড়িয়ে দেখছ, কোল্যা।

হতে পারে। তবে তোমার কিন্তু এ নিয়ে একটা উপহাসকর অবস্থার মাঝে পড়বার আশঙ্কা আছে।

প্রিন্স বললেন,—কি করে, বুঝছি না।

নিকোলাই টেবিলের উপর থেকে লাল বাক্সটা তুলে তখনই আবার বিরক্তির সঙ্গে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ধরো পাগলামির চূড়ান্ত নিদর্শন এই ব্রেসলেটটা, ধরো এই বিদখুটে জিনিসটা আমাদের বাড়িতেই রইল, ফেলে দিলাম, বা দাশাকে দিয়ে দিলাম, তাহলে প্রথমত ঐ পি, পি, জেড্ তার বন্ধুবান্ধবের কাছে বড়াই করে বলে বেড়াবে যে প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনা শেয়িনা তার উপহার গ্রহণ করেছেন, তারপর এটাই তার সাহস বাড়িয়ে দেবে। কাল হয়ত ভেরাকে সে একটা হীরের আংটি পাঠাবে। তার পর দিন একটা

মুক্তোর হার, তারপর কে জানে হয়ত সে তহবিল তছরূপ বা জোচ্চুরির দায়ে কাঠগড়ায় উঠবে আর প্রিন্স আর প্রিন্সেস শেয়িনকে দাঁড়াতে হবে গিয়ে তার সাক্ষী হয়ে। চমৎকার ভবিষ্যৎ এ্যাঁ?

ভ্যাসিলি লোভিচ্ বললেন, ব্রেসলেটা অবশ্যই তাকে ফেরত পাঠাতে হবে।

ভেরা তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললে, আমারও তাই মত এবং যত শীগগির পাঠানো যায়, সেই ভাল। কিন্তু কথা হচ্ছে কি করে পাঠানো হবে? আমরা তার নাম ঠিকানা কিছুই জানিনা যে!

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ কথাটায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। আমরা এই লোকটার নামের আদ্যক্ষর ত জানি। পি পি জেড্। তাই না ভেরা?

জি. এস. জেড্।

বেশ। তা ছাড়া, সে কোথাও না কোথাও কাজ করে তা-ও জানি। এতেই যথেষ্ট হবে। কাল আমরা শহরের 'ডাইরেক্টরী' খুলে ঐ আদ্যক্ষরের কোন সরকারী কর্মচারী বা কেরাণী আছে খুঁজব। যদি কোন কারণে না পাই তবে গোয়েন্দা নিযুক্ত করব। আমার হয়ে সে ওকে খুঁজে বের করে দেবে। বেশি অসুবিধা হলে ওর হাতের লেখা এই যে কাগজ রয়েছে তা তাকে দেব। মোট কথা কাল বেলা দুটোর মধ্যে ওর পুরো নাম ঠিকানা, এমন কি কখন কখন ও বাড়িতে থাকে, তা পর্যন্ত বের করব আমি। তারপর ওকে ওর এই জিনিসটা যে শুধু ফেরত দেব তাই নয়, ও ওর অস্তিত্বের কথা আমাদের আর কোনদিন যাতে মনে করিয়ে না দেয় তারও ব্যবস্থা করব আমি।

প্রিন্স ভ্যাসিলি জিজ্ঞাসা করলে, কি করে করবে তুমি?

কেন? আমি গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা করব।

দোহাই তোমার, গভর্ণরের কাছে যেও না, তাঁর সঙ্গে আমাদের কি রকম সম্বন্ধ, তা তোমার জানা আছে। তাঁর কাছে গেলে আমরা নিজেরাই নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলব।

বেশ, তাহলে আমি পুলিশের উপরওয়ালার কাছে যাব, তিনি আর আমি একই ক্লাবের সভ্য, বন্ধু। তিনি এই রোমিওটিকে ডেকে তার নাকের নিচে আঙুল নাড়বেন। কি করেন তিনি—জানো? নাকের কাছে আঙুল এনে, হাত না নেড়ে শুধু আঙুলটা নেড়ে নেড়ে তিনি ধমকাতে থাকেন : এ সব চলবে না, বুঝলে?

ভেরা মুখখানা বিকৃত করে বললে, ছি, এ নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া!

প্রিন্স ভেরার কথায় সায় দিয়ে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, ভেরা; কোন বাইরের লোককে এর মধ্যে টানা ঠিক হবে না। চারিদিকে কেবল গুজব ছড়াবে। আমাদের শহরটা যে কেমন তা তো আমরা জানি। এ শহরে থাকাও যা, একটা কাঁচের পাত্রে থাকাও তাই। আমি নিজেই বরং এই যুবকটির কাছে যাব, কে

জানে, সে হয়ত ষাট বছরের কোন বুড়োও হতে পারে। যাই হোক, তার কাছে গিয়ে, তার জিনিসটা ফেরত দিয়ে, কিছু কথা বলে আসব আমি।

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ অমনি বলে উঠলেন, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব। তোমার মত নরম মানুষের কর্ম নয় এ, যা বলতে হয় আমি বলব। এর পর তিনি তাঁর ঘড়িটা বের করে দেখে বললেন, এবার তোমাদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। পা টলছে আমার, অথচ দু-দুটো ফাইল বেশ ভাল করে দেখে রাখতে হবে আমার।

ভেরা একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, যাই বলো, বেচারার জন্য আমার কেমন দুঃখ হয়।

নিকোলাই দরজার গোড়ায়ই ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, দুঃখ করবার কিছু নেই। আমাদের সমপর্যায়ের কেউ যদি ঐ ব্রেসলেট আর ঐ রকম চিঠি পাঠাত, প্রিন্স ভাসিলি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত। ও না করলে আমি করতাম। আগেকার দিন হলে আমি তাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে চাবুক লাগাতাম।... ভাসিলি লোভিচ্, অফিসে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোর, আমি ফোন করব তোমায়।

১০

সিঁড়িটা যেমনি নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ : ইঁদুর, বেড়াল, প্যারাফিন তেল আর ঘর ধোয়ার গন্ধ। ছয় তলায় উঠবার আগে প্রিন্স ভাসিলি লোভিচ্ একটু থামলেন। শ্যালককে বললেন, একটু থামো, হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। এখানে আসা আমাদের উচিত হয়নি, কোলা।

আরও দুটি ধাপ উঠলেন তাঁরা। সিঁড়িতে এত অন্ধকার যে ফ্ল্যাটের নম্বরটা দেখতে নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্‌কে দুটো দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে হল।

ডাকবার ঘণ্টা বাজালে মোটাসোটা এক বুড়ি বেরিয়ে এল, মাথার চুলগুলি তার সব সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটি ধূসর, চোখে চশমা। বুড়ি সামান্য একটু কুঁজো, হয়ত কোন অসুখ আছে।

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ বললেন, মিঃ ঝেল্‌ত্‌কোভ বাড়ি আছেন?

বুড়ি ভয় পেয়ে গিয়ে একবার এর দিকে আর একবার ওর দিকে তাকাতে লাগল। এ'রা দুজনই বেশ সম্ভ্রান্ত লোক দেখে বুড়ি যেন একটু সাহস পেল।

দু-এক পা পেছিয়ে বুড়ি বললে, হাঁ, আছেন। আসুন আপনারা। বাঁ দিকের প্রথম দরজা।

বুলাত-তুগানোভস্কী বেশ জোরে জোরে তিনবার দরজায় ঘা মারলেন।

ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল, ভেতরে আসুন।

ঘরটার ছাদটা বেশ একটু নিচু বটে, কিন্তু ঘরটা বেশ প্রশস্ত, আকার অনেকটা সমচতুর্ভুজের মত। ঘরে দুটো গোল জানালা আছে, দেখতে অনেকটা জাহাজের পোর্ট হোলের মত, আলো বড় একটা আসে না। গোটা ঘরটাই যেন মাল-টানা জাহাজের খাবার ঘরের মত। একপাশের দেয়ালের কাছে একটা ছোট্ট শোবার খাট, অপর পাশের দেয়ালের গায়ে একটা চওড়া সোফা, তাতে পাতা রয়েছে একটা চমৎকার তেক্‌কী কম্বল। ঘরের মধ্যিখানটায় রঙিন উক্রেইন অঞ্চলের কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিল।

প্রথমে ওঁরা দুজন ঘরের বাসিন্দার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলেন না ঃ লোকটি হতভম্ব হয়ে আলোর দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে হাত রগড়াচ্ছিল। বেশ লম্বা আর রোগা চেহারা তার, মাথার চুল রেশমের মত আর লম্বা।

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ বেশ উদ্ধতভাবে বলে উঠলেন, আপনিই ত মিঃ ঝেল্‌ত্‌কোভ?

আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম ঝেল্‌ত্‌কোভ। আপনারা আসাতে বড় খুশি হলাম।—বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে তুগানোভস্কীর দিকে দু পা এগিয়ে এল। কিন্তু নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ এই স্বাগত সম্বর্ধনা যেন দেখতেই পাননি এমনভাবে শেয়িনের দিকে ফিরে তিনি বললেন, আমি তোমায় বলেছিলামই যে, আমরা ভুল করিনি।

ঝেল্‌ত্‌কোভের শীর্ণ কম্পিত আঙুলগুলি তার বাতাপি রঙের জ্যাকেটের উপর নিচে ওঠাতে নাবাতে লাগল, জামার বোতামগুলি সে একবার খোলে, একবার বন্ধ করে। শেষে বেশ একটু চেষ্টা করে সাহস সঞ্চয় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে সোফার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বললে, অনুগ্রহ করে বসুন আপনারা।

এইবার তার চেহারার সবটুকু দেখা গেল ঃ ফ্যাকাশে গায়ের রঙ, মুখখানা মেয়েদের মত কোমল, নীল চোখ, থুতনিটা একগুঁয়ে শিশুর থুতনির মত চেরা। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

প্রিন্স শেয়িন বললেন, ধন্যবাদ। বেশ আগ্রহ সহকারে দেখছিলেন তিনি লোকটিকে। নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ সংক্ষেপে বললেন, ঠিক আছে। দুজনের একজনও কিন্তু বসলেন না ঃ

অল্পক্ষণেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ইনি হচ্ছেন প্রিন্স ভ্যাসিলি লোভিচ্ শেয়িন,—এখানকার অভিজাত প্রধান সামরিক কর্মচারী। আমার নাম মির্জা বুলাত তুগানোভস্কী, সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটার আমি। আপনার সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করতে এসেছি আমরা তাতে এঁর এবং আমার সমান স্বার্থ আরও খুলে বলতে গেলে বলতে হয় ব্যাপারটা হচ্ছে এর স্ত্রী আমার বোনের সম্বন্ধে।

শুনে মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল ঝেল্‌ত্‌কেভের, সোফার উপর বসে পড়লে সে, তারপর বিবর্ণ ওষ্ঠ নেড়ে তোতলাতে তোতলাতে সে বললে, আপনারা বসুন দয়া করে। কিন্তু তখনই হয়ত মনে পড়ে গেল তার এ অনুরোধ আগেই সে একবার করেছে, তাই আর কি করতে হবে বুঝতে না পেরে সে আসন থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেল একবার জানলার কাছে, চুলগুলি উস্কোখুস্কো করে তখনই আবার ফিরে এল। কম্পিত হস্তে সে আর একবার জামার উপর থেকে নিচের সকল বোতাম ধরে টানতে লাগল, কখনও নিজের হালকা লালচে গোঁফ ধরে টানতে লাগল, কখনও মুখে হাত দিতে লাগল। তারপর সানুনয় দৃষ্টিতে ভ্যাসিলি লোভিচের দিকে চেয়ে বললে, হুজুর যা বলেন তাই করতে প্রস্তুত আমি।

শেয়িন কোন কথা বললে না। উত্তর দিলেন নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্‌, বললেন, প্রথমেই আপনার একটা জিনিস ফেরত দিতে চাই আমি। বলেই পকেট থেকে লাল বাক্সটা বের করে তিনি টেবিলের উপর রাখলেন ঃ আপনার রুচির অবশ্য প্রশংসা করতে হয়, কিন্তু আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, এরকম কোন জিনিস যেন ভবিষ্যতে আর না পাঠান আপনি।

শুনে মুখটা লাল হয়ে উঠল ঝেল্‌ত্‌কোভের, চোখ দুটি নত করে অনুচ্চ কণ্ঠে সে বললে, আমি বুঝতে পারছি অন্যায় করে ফেলেছি আমি,—আমি ক্ষমা চাইছি। এক এক গ্লাস চা চা দেব কি আপনাদের?

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্‌ ওর শেষের কথাটা যেন শুনতেই পাননি, এমন ভাব করে তিনি বলে চললেন, দেখুন মিঃ ঝেল্‌ত্‌কোভ, আপনি ভদ্রলোক, কোন কিছুর ইঙ্গিত করলেই বুঝতে পারেন দেখে খুশি হলাম। আমার বিশ্বাস আমাদের কাজকর্ম চটপটই সেরে ফেলতে পারব আমার। আমার ধারণা, গত সাত আট বৎসর ধরে আপনি প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনার পিছু লেগেছেন! কেমন সত্যি কি না?

ঝেলতকেভ কোমল কণ্ঠে বললে, হাঁ, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বিস্ময়ে তার চোখের পাতা দুটি নুয়ে পড়ল।

কিন্তু এ পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করিনি, অথচ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এ রকম কিছু আমরা করতে পারতাম এবং করা উচিতও ছিল। কেমন ঠিক কি না?

আজ্ঞে হাঁ।

হাঁ। কিন্তু আপনার এই শেষের কার্যটি, মানে আপনি এই যে রত্নবলয় পাঠিয়েছেন এর দ্বারা আপনি আমাদের একেবারে ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছেন। বুঝছেন? একেবারে ধৈর্যের সীমা। বলতে বাধা নেই, প্রথমে ভেবেছিলাম আমরা ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকেই জানাব, কিন্তু জানাইনি, এখন দেখছি জানাইনি ভালই করেছি, কারণ—আবার বলতে হচ্ছে কথাটা—কারণ দেখেই বুঝলাম আপনি ভদ্রলোক।

ঝেল্‌ত্‌কোভ হঠাৎ বলে উঠল, মাপ করবেন কি বললেন আপনি? বলেই হেসে উঠল ঃ ব্যাপারটা কতৃপক্ষের কানে তুলবেন ঠিক করেছিলেন, এই তো?

পকেটে হাত দিয়ে সে সোফার এক কোণে গিয়ে বেশ আরাম করে বসল, তারপর দিয়াশলাই আর সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ধরালঃ

আপনি বললেন আপনারা ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানাতে যাচ্ছিলেন?

শেয়িনের দিকে চেয়ে চেয়ে সে বললে, মাপ করবেন প্রিন্স, আমি না বসে পারলাম না। নিকোলাই নিকোলয়েভিচের দিকে তাকিয়ে সে বললে, আপনি বলতে থাকুন।

প্রিন্স টেবিলের কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এবার বসলেন, তারপর এই অদ্ভুত লোকটির মুখের দিকে পরম বিস্ময়ে, আগ্রহে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

নিকোলাই নিকালয়েভিচ্‌ বেশ একটু রূঢ়স্বরে বলতে লাগলেন, দেখুন, আমরা যখন খুশি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি। অপরিচিত লোকের পরিবারের মধ্যে এমন অনধিকার হস্তক্ষেপ—

অনুগ্রহ করে একটু শুনুন আমার কথা—

না, আপনি শুনুন আমার কথা, বলে এ্যাসিস্টাণ্ট প্রসিকিউটর এক রকম ধমকে উঠলেন।

বেশ, বলুন, শুনছি আমি। কিন্তু প্রিন্স ভাসিলি লোভিচকে আমি কিছু বলতে চাই।

বলেই তুগানোভস্কীর কথায় কিছুমাত্র কান না দিয়ে সে প্রিন্সের উদ্দেশ্যে বললে, আজ আমার জীবনের চরম সংকটের মুহূর্তে উপস্থিত, তাই লোকাচার বা ভদ্রতার ধার না ধেরে সামান্য কিছু বলতে চাই। আপনি শুনবেন কি?

শেয়িন উত্তর দিলেন, বলুন আমি শুনছি। এদিকে তুগানোভস্কী 'আচ্ছা!' বলে কেমন এক ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি করে উঠলেন দেখে তিনি বললেন, কোলা, তুমি একটু চুপ কর তো!

এদিকে ঝেল্‌ত্‌কোভের মুখ দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড একেবারে কথা বেরুচ্ছিল না, দমটা তার একেবারে বন্ধ হয়ে আসছিল, তারপর হঠাৎ একসঙ্গে সে একেবারে অনেক কথা বলে গেল। কথা বললে সে কেবল তার চোয়াল দিয়ে, ঠোঁট দুটি তখন তার মরা মানুষের মত অনড় আর সাদা। প্রিন্স ভাসিলির উদ্দেশ্যে সে বলতে লাগল—

কথাটা বলা কঠিন হলেও আমার বলতে হবে ঃ আপনার স্ত্রীকে আমি ভালবাসি। সাত বৎসরের নিরাশ নম্র ভালবাসা আমাকে এ কথা বলবার কিছুটা অধিকার দিয়েছে। প্রথমেই আমি স্বীকার করছি ভেরা নিকোলয়েভনার বিয়ের আগেই তাঁকে মূর্খের মত কতকগুলি চিঠি লিখেছি, শুধু তাই নয় সেগুলির উত্তর পর্যন্ত প্রত্যাশা করেছি। আমি জানি আমার এই শেষের কাজটি, মানে তাঁকে এই ব্রেসলেট পাঠানো আরও বোকামি হয়েছে। আপনার চোখের দিকে

চেয়ে বলছি আমি সব, আমি জানি আপনি বুঝবেন আমার কথা। আপনার স্ত্রীকে ভাল না বেসে থাকা আমার সাধ্যাতীত। আচ্ছা, প্রিন্স, আপনিই বলুন, ধরলাম আমার কান্ড দেখে ভীষণ রাগ হচ্ছে আপনার, কিন্তু আমার এ মনোভাবের বিলোপ সাধন করতে কি করতে চান আপনি? নিকোলাই নিকোলয়েভনা যেমন বললেন তেমনি এ শহর ছাড়িয়ে অন্য কোন শহরে আটক রাখতে চান আমায়? কিন্তু এখানে থেকে ভেরা নিকোলয়েভনাকে আমি যেমন ভালবাসছি, সেখান থেকেও আমি তেমনি বাসব। জেলে পুরতে চান আমায়? কিন্তু সেখানে থেকেও আমি তাকে আমার অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় উদ্ভাবন করতে পারব। সুতরাং নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় হচ্ছে মৃত্যু। আপনারা যদি তাই চান, যে কোন রকমের মৃত্যু বরণ করতেও আমি প্রস্তুত।

নিকোলাই নিকোলয়েভনা তাঁর টুপিটা পরে নিয়ে বললেন, কাজের কথা বলতে এসে থিয়েটার শুনছি আমরা! আমার স্পষ্ট কথা ঃ প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনাকে এমনি করে জ্বালাতন করা আপনার একেবারে বন্ধ করতে হবে, যদি না করেন তবে আমাদের মত লোকেরা আপনাকে যা করতে পারেন তাই আমরা করব।

ঝেল্‌ত্‌কোভ তাঁর এসব কথা শুনলেও তাঁর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না, প্রিন্স ভাসিলি লোভিচের দিকে চেয়ে সে বললে, কিছু মনে করবেন না, দশ মিনিটের জন্য ছুটি চাইছি আমি। বলেই যাচ্ছি, টেলিফোনে প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি আমি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি, যে কথাবার্তা হয় আমাদের, যতটা পারি জানাব আপনাকে।

শেয়িন বললেন, বেশ।

নিকোলাই নিকোলয়েভনা ভগিনীপতিকে একা পেয়ে তাঁকে নিয়ে একবার পারলে না তা যদি তার মনে জাগে, তা সে রুখবে কি করে? শেয়িন একটুখানি জিনিস তিনি যেন ফেলছেন এমন ভঙ্গি করে তিনি বলে উঠলেন, এ চলবে না,, এ সব কিছুতেই চলবে না, বুঝলে? আমি আগেই বলেছিলাম তোমায়, যা করবার হয় আমিই করব। তোমার যেমন মন গলে গেল, লোকটাও অমনি আদিখ্যে দেখাতে শুরু করল। আমি হলে দু কথায় সব চুকিয়ে দিতে পারতাম।

প্রিন্স ভ্যাসিলি লোভিচ্ বললেন, একটু সবুর কর, এক্ষুণি সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। আসল কথা লোকটার মুখ দেখে বোঝা যায় ও ইচ্ছে করে কোন মিছে কথা বলতে পারে না বা প্রতারণা করতে পারে না। সে প্রেমে পড়েছে--সে কি তার অপরাধ? এ পর্যন্ত কেউ যার কারণ নির্ণয় করতে পারলেনা তা যদি তার মনে জাগে তা সে রুখবে কি করে? শেয়িন একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, লোকটার জন্য দুঃখ হয় আমার। তা ছাড়া আমার কেবলি মনে হয় কি যেন এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, এ অবস্থায় একটা ভাঁড়ের মত যা তা করতে পারি না আমি।

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ বললেন, আমি বলব এ তোমার আত্মার অবনতি।

দশ মিনিট পরে ঝেল্‌ত্‌কোভ ফিরে এল। চোখ দুটি তার চক্‌চক্ করছে, কি এক গভীর বেদনার ছায়া তাতে, চোখের জল হয়ত চেপে রেখেছে সে, তাই এমন দেখাচ্ছে। ভদ্রতার ধার আর সে ধারছে না, সভ্য সমাজের নিয়মকানুন ভুলে গেছে, কার কোথায় বসা উচিত সে জ্ঞানও তার আর নেই। প্রিন্স শেয়িন এর কারণটা বুঝতে পেরে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

ঝেল্‌ত্‌কোভ হঠাৎ লে উঠল, আমি প্রস্তুত। কাল থেকে আপনারা আর আমার সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাবেন না। আপনাদের কাছে আমি মৃত। কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার, প্রিন্স ভাসিলি লোভিচ্, ব্যাপারটা আমি শুধু আপনার কাছেই বলছি, আমি তহবিল তছরূপ করেছি, সুতরাং এ শহর থেকে যেমন করে হোক আমার পালাতে হবে। যাবার আগে ভেরা নিকোলয়েভনার কাছে একখানা শেষ চিঠি লিখতে অনুমতি দেবেন আমায়?

নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ অমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, না, যা চুকে গেল তা চুকে গেল, আর চিঠিপত্র না।

শেয়িন বললেন, বেশ, লিখতে পারেন আপনি চিঠি।

ঝেল্‌ত্‌কোভ ক্রুর হাসি হেসে বললে ঠিক আছে, দেখা তো দূরের কথা আপনারা শুনতেও পাবেন না আমার সম্বন্ধে কোন কথা। প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনা প্রথমে আমার সঙ্গে কোন কথাই বলতে চাননি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি এই শহরে থাকতে পারি কি না, তা হলে মধ্যে মধ্যে তাঁকে দেখতে পারি, অবশ্য তাঁর কাছে অদৃশ্য থেকে; তিনি তার উত্তরে বললেন, আপনি জানেন না আপনার এই কাণ্ডকারখানা কি রকম ক্লান্ত করে তুলেছে আমায়। যত শীগগির পারেন অনুগ্রহ করে থামান এ সব আপনি। আমিও তাই থামিয়ে দিচ্ছি এ সব। আমার যা করবার ছিল তা আমি করেছি, নয় কি?

ভাসিলি লোভিচ্ সে রাত্রে বাড়ি এসে তার স্ত্রীর কাছে ঝেল্‌ত্‌কোভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সমস্ত বৃত্তান্তই খুলে বললেন। এ সব বলা তাঁর কর্তব্য বলেই মনে করলেন তিনি।

শুনে ভেরা উদ্বিগ্ন হল, কিন্তু বিস্মিত বা বিহ্বল হল না। পরে রাত্রে স্বামী যখন বিছানায় শুতে এলেন, তখন ভেরা হঠাৎ দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে বললে—আমাকে একটু একা থাকতে দাও, আমি বুঝতে পারছি ঐ লোকটা আজ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে।

প্রিন্সেস ভেরা নিকোলয়েভনা খবরের কাগজ পড়ত না কোনদিন, কারণ প্রথমত এতে তার হাত নোংরা হয়, দ্বিতীয়ত আজকাল যে ভাষায় লেখা হয়, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বের করতে পারে না সে।

সুতরাং ভাগ্যচক্রেই সে সেদিন কাগজটা খুলল, এবং যে স্তম্ভে তার প্রথমে চোখ পড়ল তাতে এই খবরটা লেখা ছিল ঃ

রহস্যময় মৃত্যু। জি, এস্, ঝেল্ত্কোভ নামে নিয়ন্ত্রণ সংস্থার এক কর্মচারী গত রাত্রি সাতটার সময় আত্মহত্যা করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই আত্মহত্যার কারণ তহবিল তছরূপ। অন্তত এই মর্মে তিনি এক চিরকুট রাখিয়া গিয়াছেন। সাক্ষী-প্রমাণে ইহা আত্মহত্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ইঁহার দেহের আর ময়না তদন্ত করা হইবে না।

ভেরা ভাবতে লাগল, আমার কেন না জানি আগে থেকেই মনে হচ্ছিল এই রকম কিছু একটা ঘটবে, এই রকম একটা শোকাবহ পরিণতি! এ কি? ভালবাসা না পাগলামি?

এর পর সারাদিন ভেরা ফুলের আর ফলের বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মিনিটে মিনিটে তার উদ্বেগ আর অস্থিরতা বেড়ে উঠতে লাগল। যে লোকটিকে সে কোনদিন দেখেনি, দেখতে চাইত না, সেই হাস্যাস্পদ পি, পি, জেঁড্ই এখন তার সমস্ত মনটা জুড়ে রইল।

এ্যানোসোভ যে বলেছিলেন,—কে জানে, হয়ত সত্যিকার নিঃস্বার্থ দিব্য প্রেমই এসে গেছে তোমার জীবনে! সেই কথা মনে পড়ল তার।

ছটার সময় পিয়ন এল। ভেরা নিকোলয়েভনা ঝেল্ত্কোভের হাতে লেখা দেখেই এবার চিনতে পারল,—ভেরা তার চিঠিখানা এবার এমন যত্ন করে সন্তর্পণে খুললে যে সে নিজেই নিজের মনোভাব দেখে অবাক হয়ে গেল।

ঝেল্ত্কোভ যে চিঠিখানা লিখেছিল তা এই ঃ

ভেরা নিকোলয়েভনা, আপনাকে ভালবেসে যে অপার আনন্দ পেয়েছি আমি তা ভগবানেরই দান, আমার কিছু দোষ নেই এতে। রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ভবিষ্যৎ সুখ—এর কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামাইনি আমি কোনদিন, আমার জীবনের সব কিছুই ছিল আপনাকে কেন্দ্র করে। এখন বুঝছি একটা অবাঞ্ছিত কীলকের মত আপনার জীবনে প্রবেশ করে আপনাকে শুধু কষ্ট দিয়েছি। যদি

সম্ভব হয় আমার এ অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন। আমি আজ বিদায় নিচ্ছি, আর ফিরে আসব না কোনদিন, আর কোন কিছুই আপনাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে না।

শুধু আপনার অস্তিত্বের জন্যই আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আত্মানুসন্ধানে আমি জেনেছি, আমার এ কোন ব্যাধি নয়, উন্মাদের ভ্রান্তবদ্ধ ধারণাও নয়। কি কারণে জানি না ভগবান আমাকে যে প্রেম দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন, এ তাই।

আপনার ভাই নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ এবং আপনি হয়ত আমার এ কাণ্ড-কারখানা দেখে অনেক হেসেছেন। কিন্তু তবুও যাবার আগে পরমানন্দে আমি বলে যাচ্ছি, 'ধন্য হোক আপনার নাম।'

আট বৎসর আগে আপনাকে দেখি আমি একটি সার্কাস বক্সে, দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসেছি আমি আপনাকে, কারণ আমার মনে হয়েছে পৃথিবীতে এমনটি আর কোথাও নেই, এর চেয়ে ভাল কোন কিছু নেই জগতে,—না জীবজন্তু, না গাছপালা, না আকাশের কোন তারা; এর চেয়ে কোমল মধুর সুন্দর মানুষও কেউ হতে পারে না। আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীর যা কিছু সৌন্দর্য সব যেন মূর্তি পেয়েছে আপনার মধ্যে।

এরপর কি-ই বা করতে পারতাম আমি? কোন শহরে পালিয়ে যাব? কিন্তু মন যে আমার পড়ে থাকত আপনারই আশে-পাশে, আপনারই চরণে ঃ আপনারই চিন্তায় আপনারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম আমি এক মধুর উন্মাদনা নিয়ে। আমি মূর্খের মত ব্রেসলেটটি পাঠিয়ে যে ভুল করেছি তাতে লজ্জায় মরে যাচ্ছি; হঠাৎ একটা ভুল হয়ে গেল আমার, কি করব বলুন! এতে আপনার বাড়ির অভ্যাগতেরা যা তা ভেবেছেন তাও বুঝতে পারিছি আমি।

দশ মিনিটের মধ্যে আমি এ জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছি। চিঠিখানায় একখানা ডাকটিকিট এ'টে এটা ডাক বাক্সে ফেলবার মত এখন সময় আছে আমার হাতে, কাজটা করবার জন্যও অপরের সাহায্য নিতে চাই না আমি। অনুগ্রহ করে আমার এই চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলবেন আপনি। এইমাত্র স্টোভ জেবলে আমি আমার পরম আদরের জিনিসগুলি সব পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করেছি ঃ আপনার একটা রুমাল চুরি করেছিলাম আমি, এক সম্ভ্রান্ত সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকার সময় আপনার হাত থেকে এটা পড়ে গিয়েছিল, সেটা পোড়াচ্ছি। আমাকে চিঠি লিখতে নিষেধ করে যে চিরকুটখানা পাঠিয়েছিলেন আপনি, সেটা পোড়াচ্ছি। ওঃ কত আদর করেই না সেই চিরকুটখানায় চুমু দিয়েছিলাম আমি! এ ছাড়া আরও আছে ঃ শিল্পমেলার একটা প্রোগ্রাম হাতে ধরে ছিলেন আপনি, সেটা ভুলে একখানা চেয়ারের উপরে ফেলে যান আপনি, সেটাও পোড়াচ্ছি। সব শেষ। সমস্ত সূত্র আমি ছিন্ন করে দিয়েছি, তবুও আমার বিশ্বাস, শুধু বিশ্বাস নয়, দৃঢ় বিশ্বাস কখনও কখনও আমার কথা মনে পড়বে আপনার। যদি পড়ে তা হলে—

জানি আপনি বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী, কারণ বীঠোফেন-কোয়ার্টেট-অনুষ্ঠানে সময়ই আমি বেশি দেখতে পেয়েছি আপনাকে, তাই বলছি যদি মনে পড়ে তা হলে অনুগ্রহ করে 'দি সোনাটা ইন্ ডি-ডুর্ নাম্বার টু, অপ্ টু' বাজাবেন, বা কাউকে বাজাতে বলবেন।

চিঠিখানা যে কি বলে শেষ করব ভেবে পাচ্ছিনা আমি। আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ, একমাত্র শান্তি এবং একমাত্র ধ্যান ছিলেন আপনি, হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে তাই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান আপনাকে সুখী করুন, ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ কোন কিছুতে যেন আপনার দিব্য আত্মার বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। আপনার কর-কমলে চুম্বন জানাই আমি। ইতি।

জি এস্ জেড্।

ভেরা কেঁদে চোখ লাল করে, ঠোঁট ফুলিয়ে তার স্বামীকে চিঠিখানা দেখিয়ে বললে, তোমার কাছে কোন কিছুই গোপন করতে চাই না আমি, আমার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কি যেন একটা এসে গেছে আমাদের জীবনে। নিকোলাই নিকোলয়েভিচ্ ও তুমি বোধহয় এ ব্যাপারটায় যেমন করা উচিত ছিল তেমনটি করে উঠতে পারনি।

প্রিন্স শেয়িন গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিঠিখানা পড়লেন, তারপর সযত্নে সেটা বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই লোকটার অকপটতায় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তা ছাড়া তোমার প্রতি এর অনুরাগ বিশ্লেষণ করবার অধিকারও আমার নেই।

ভেরা বললে, তোমার কি মনে হয়—সে মারা গেছে?

হাঁ, সে মারা গেছে। আমার মনে হয় সে তোমায় ভালই বাসত, পাগল ছিল না মোটেই। আমি সব সময় তার দিকে তাকিয়ে তার প্রতি অঙ্গক্ষেপ, মুখের প্রতি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। তুমি ছাড়া তার জীবনের আর কোন অর্থ ছিল না। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ভিতরে একটা নিদারুণ যন্ত্রণাবোধ করছে ও, এক একবার মনে হচ্ছিল একটা মরা মানুষের সঙ্গেই কথা বলছি আমি। ভেরা, আমি যে ওকে কি বলব, কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।

ভেরা তার কথায় বাধা দিয়ে বললে,—শোনো ভাস্যা, আমি যদি শহরে ওকে একবার দেখতে যাই, মনে কষ্ট লাগবে তোমার?

না, না, ভেরা, তুমি যাও। আমি নিজেও যেতাম, কিন্তু নিকোলাই সব কিছু গোলমাল করে রেখেছে। আমি গেলে অপ্রস্তুত বোধ করবে।

ভেরা নিকোলয়েভনা লুতারানস্কায়া স্ট্রীটের দুখানা বাড়ির পেছনে তার গাড়ি রেখে এল। ঝেল্‌ত্‌কোভের ফ্ল্যাটটা বের করতে বেগ পেতে হল না তার। রুপোর ফ্রেমের চশমা পরা, মোটাসোটা সেই ধূসরাক্ষী বুড়ীর সঙ্গেই প্রথম সাক্ষাৎ হল তার, বুড়ী সেই আগের দিনের মতই জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান আপনি?

প্রিন্সেস উত্তর দিলে, মিঃ ঝেল্‌ত্‌কোভ।

ভেরার পোষাক পরিচ্ছদ, টুপি এবং দাস্তানা দেখে এবং কিছুটা তার প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর শুনে বাড়িওয়ালীর মন গলে গেল। সে বললে, আসুন, আসুন, বাঁ দিকে ফিরে প্রথম দরজাই তার। ঐখানেই তিনি—। এত শীগগির —তিনি ছেড়ে গেলেন আমাদের!

আচ্ছা ধরুন ত বিল তছরুপই যদি তিনি করে থাকেন—তিনি ত তা আমায় বলতে পারতেন! জানেন, অবিবাহিত লোকদের ঘর ভাড়া দিয়ে তেমন কিছু লাভ হয় না আমাদের। তবুও ছয় সাত শো রুবলের ব্যাপার হলে আমি কোন রকমে তাঁর দেনা মিটিয়ে দিতে পারতাম আমি। ওঃ কি সুন্দর লোকই যে তিনি ছিলেন, তা আপনাকে কি বলব! আট বৎসর ধরে আমার বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন আমার ছেলের চেয়ে বেশি ছিলেন তিনি আমার কাছে।

সিঁড়ির পথে একটা চেয়ার ছিল তাতে বসে পড়ল ভেরা। বসে বেশ করে ভেবে চিন্তে গুছিয়ে সে বললে, আপনার এই মৃত ভাড়াটের বন্ধু আমি। তাঁর শেষ মুহূর্তে তিনি কি করছেন, কি বলেছেন—অনুগ্রহ করে বলুন আমায়।

দুইজন ভদ্রলোক এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে কি সব কথা বললেন তার সঙ্গে। আমাকে তিনি বললেন, ওঁরা ওঁকে একটা জমিদারীর গোমস্তার পদে দিতে চান। এরপরই মিঃ জর্জ টেলিফোন করতে ছুটলেন, টেলিফোন করে খোশমেজাজ নিয়েই ফিরে এলেন। ভদ্রলোক দুইজন চলে যাবার পরই তিনি চিঠি লিখতে বসলেন, তারপর চিঠিখানা পোস্ট করতে তিনি বাইরে গেলেন একবার। এরপর খেলনা পিস্তলের আওয়াজের মত একটা আওয়াজ শুনলাম আমরা। গ্রাহ্য করলাম না। সন্ধ্যা সাতটার সময় প্রতিদিন চা খেতেন তিনি। বাড়ির ঝি লুকেরা গিয়ে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলে কোন সাড়া দিলেন না তিনি, লুকেরা বার বার দরজা ধাক্কা দিলে, কোন সাড়া নেই। অবশেষে আমরা জোর করে দরজা খুলে দেখি তিনি মরে পড়ে রয়েছেন।

ভেরা দৃঢ়কণ্ঠে বললে. ব্রেসলেটটা সম্বন্ধে কিছু জানেন?

হাঁ, হাঁ, ব্রেসলেট, এই দেখুন ভুলেই গিয়েছিলাম আমি ব্রেসলেটটার কথা! আপনি ব্রেসলেটের কথা কি করে জানলেন? চিঠি লিখবার আগে তিনি আমার কাছে এসে বললেন, আপনি ত ক্যাথলিক? বললাম হাঁ। তিনি বললেন, দেখুন আপনাদের মধ্যে একটা সুন্দর রীতি আছে : যীশুমাতার মূর্তিতে আপনারা অঙ্গুরী, হার ইত্যাদি অলঙ্কার পরিয়ে দেন, এই ব্রেসলেটটা যদি তাতে পরিয়ে দেন ত বড় খুশি হই আমি। শুনে আমি রাজী হয়ে গেলাম তাঁর কথায়।

ভেরা বললে, একবার তাঁকে দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। এই যে তাঁর দরজা, বাঁ দিকের প্রথমটা। আজ তাঁকে ময়না—ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ওঁর এক ভাই আছেন, তিনি এসে ওঁর খৃষ্টীয় রীতিতে কবর দেবার অনুমতি চাইলেন। আসুন আপনি।

ভেরা মনটা শক্ত করে দরজা খুললে। ঘরটা ধূপধুনোর গন্ধে ভরা, তা ছাড়া তিনটে মোমবাতি জ্বলছে সেখানে। ঝেল্‌ত্‌কোভের দেহটা টেবিলের উপর আড়াআড়ি শুইয়ে রাখা হয়েছে। মৃতের মাথার নীচে বালিশ চাপা না থাকায় কিছু অবশ্য এসে যায় না, তবুও কে যেন একটা নরম কুশান গুঁজে দিয়েছে তাঁর মাথার নীচে। মুদ্রিত চোখ দুটি যেন বড় গম্ভীর, ঠোঁট দুটিতে যেন প্রসন্ন শুভ্র হাসি লেগে রয়েছে, দেখে মনে হয় মৃত্যুর পূর্বে সে এমন এক গভীর মধুর রহস্যময় কিছুর সন্ধান পেয়েছে যাতে তার জীবন প্রহেলিকার সকল প্রশ্নের উত্তর মিলে গেছে। ভেরার মনে হল এই প্রশান্তির ভাব দেখেছে সে দুজন শহীদের মুখে, তাঁদের একজন হচ্ছেন পুশ্‌কিন আর একজন নেপোলিয়ান।

বুড়ী একটু আন্তরিকতা দেখিয়ে ভেরাকে বললে, আপনাকে একলা রেখে কিছুক্ষণ আমি বাইরে থাকি কেমন?

হাঁ,—পরে আপনাকে আমি ডাকব, ভেরা বললে, এবং তখনই তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা লাল গোলাপ বের করে বাঁ হাতে মৃতের মাথাটা একটু উঁচু করে ডান হাতে ফুলটা তার গলার নীচে রাখলে। ভেরা তখনই বুঝলে প্রত্যেক নারী মনে মনে যে প্রেমের স্বপ্ন দেখে সে প্রেম তার জীবনে দেখা দিয়ে হারিয়ে গেল। জেনারেল এ্যানসোভ ভবিষ্যদ্বাণীর মত করে যে অপার্থিব শাশ্বত প্রেমের কথা বলেছিলেন, সেই কথা মনে পড়তে লাগল তার। মৃতের কপালের উপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে নিয়ে দুই হাতে দুই পাশ ধরে সেই ঠাণ্ডা ভিজে কপালে বিলম্বিত সস্নেহ চুম্বনে সে তার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করলে।

ভেরা ওখান থেকে চলে যাবার সময় বুড়ী তাকে একটু তোয়াজ করে বললে, মাদাম, আপনি দেখছি আর সবার মত নন, আর সবাই এসেছিল শুধু ব্যাপার কি তাই দেখতে। মৃত্যুর পূর্বে মিঃ ঝেল্‌ত্‌কোভ আমায় বলেছিলেন, আমি যদি মারা যাই, আর একজন মহিলা আমায় দেখতে যদি আসেন, তাঁকে বলবেন বিঠোফেনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হচ্ছে—। এই যে লিখে রেখে গেছেন তিনি, দেখুন।

দেখি! বলেই ভেরা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। বুড়ীকে সে বললে, মাপ করবেন, এই মৃত্যুটা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে, কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না আমি।

লেখাটা পড়লে ভেরা। সেই পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা—'এল্‌, ভন বীঠোফেন, সোনাটা নং ২, অপ, ২, লারগো এ্যাপাশিয়োনাতো।'

১৩

ভেরা নিকোলয়েভনা সেদিন সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ি এল; স্বামী বা ভাই কেউই বাড়ি ছিলেন না দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে সে।

জেনী রিটার কিন্তু তার বাড়িতে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঐ সব দেখে শুনে এসে ভেরার মন তখন ভারাক্রান্ত, সে ছুটে গেল জেনীর কাছে, জেনী তার সুন্দর হাত দুটিতে চুমু দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁদে ফেললে। জেনীকে সে বললে, জেনী, আমাকে কিছু একটা বাজিয়ে শোনাও না ভাই! এই অনুরোধ করবার পরই সে ঘর থেকে বেরিয়ে ফুলের বাগানে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল।

ভেরার কেন যেন মনে হচ্ছিল ঝেল্‌ত্‌কোভ* এই অদ্ভুত নামের মৃত লোকটা 'সোনাটা'র যে অংশটুকুর কথা বলে গেছে জেনী ঠিক সেইটাই আজ বাজাবে।

তাই হল। বাজনা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর সুরের অনুপম গভীরতা দেখে ভেরা বুঝলে, এই সেই সঙ্গীত। তার বুকটা যেন চিরে দুখান হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল যে প্রেম হাজার বছরে একবার দেখা যায়, সেই প্রেম তার জীবনে এসে দেখা দিয়ে হারিয়ে গেল। বীঠোফেনের এত সঙ্গীতের মধ্যে এইটাই বা ঝেল্‌ত্‌কোভ তাকে শুনতে বলে গেল কেন? ভাবতে গিয়ে জেনারেল এ্যানসোভের কথাগুলি মনে পড়তে লাগল তার। পর পর কথা এসে যেন কথার মালা গাঁথা হয়ে যেতে লাগল তার মনে। সঙ্গীতের ভাব আর ছন্দের সঙ্গে মিলে সেগুলি যেন স্তোত্রের এক একটি চরণ হয়ে যেতে লাগল। প্রত্যেক স্তবকের শেষে শুনতে লাগল ভেরা, 'ধন্য হক তোমার নাম।'

"সুমধুর স্বরলহরীর ভিতর দিয়ে আমি তোমার কাছে এখন এমন এক জীবনের কথা বলব, যে জীবন সানন্দে বিনম্রচিত্তে যন্ত্রণার কাছে আত্মবলি দিয়েছে। কোন অভিযোগ, তিরস্কার নেই আমার চিত্তে, আমার প্রেমকে ঘৃণা

*কথাটা এসেছে 'ঝেল্‌তক্‌' শব্দ থেকে।

করা হয়েছে বলে বেদনাও নেই। আমার চাওয়া শুধু 'ধন্য হক তোমার নাম'।

"হাঁ, জানতাম এতে যন্ত্রণা আসবে আমার, হবে রক্তপাত, হবে মৃত্যু। দেহত্যাগ করা আত্মার পক্ষে কষ্টকর তাও জানি, তবুও হে আমার সুন্দর, আমি তোমার গুণগান করি, গভীর আবেগে স্তুতি করি, শান্ত বিনম্রচিত্তে ভালবাসা জানাই, 'ধন্য হক তোমার নাম'।

"তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি হাসি, প্রতি দৃষ্টিপাত, প্রতিটি পদধ্বনি মনে পড়ছে আমার। আমার শেষ স্মৃতি মধুর বিষাদ, শান্ত সুন্দর বেদনায় ভরা। কিন্তু তোমায় কোন দুঃখ দেব না আমি। নীরবে একা চলে যাব আমি, কারণ ভগবানের এই অভিপ্রেত, অদৃষ্টের এই নির্দেশ। 'ধন্য হক তোমার নাম'।

"আমার এই দুঃখের মৃত্যু মুহূর্তে তোমার কাছেই আমার প্রার্থনা। আমার জীবনও সুন্দর হতে পারত। আফশোষও কিছু নেই আমার। মনে মনে মৃত্যুকেই আমি কামনা করছি, কিন্তু হৃদয়ে আমার ধ্বনিত হচ্ছে তোমারই গুণগান, 'ধন্য হক তোমার নাম'।

"তুমি যে কত সুন্দর, তুমি নিজে ত জান না, তোমার আশেপাশের কেউও তা জানে না। ঘড়ি বাজছে। এবার যাবার সময় হল আমার। প্রাণত্যাগের এই শোকাবহ মুহূর্তেও আমি বলছি, তোমার জয় হক।

"সর্বজয়ী মৃত্যু আমার এসে গেল এবার, এখনও আমি বলছি, তোমার জয় হক।"

দু হাতে একটা সরু বাবলা গাছ আঁকড়ে ধরে দেহটা তাতে চেপে ভেরা কাঁদতে লাগল, গাছটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলি মর্মরধ্বনি তুলে যেন ভেরার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে লাগল। তামাক গাছের গন্ধ হয়ে উঠল আরও তীব্র। এদিকে ভেরার বেদনায় সান্ত্বনা দিতে দিব্য অপূর্ব সঙ্গীত বলে চললঃ

"শান্ত হও, প্রিয়তমে, শান্ত হও। আমার কথা মনে পড়ে তোমার? পড়ে? তুমিই আমার জীবনের সর্বশেষ একমাত্র প্রেমপাত্রী। শান্ত হও, আমি তোমার কাছেই রয়েছি। আমাকে স্মরণ করলেই তুমি আমাকে পাবে, কারণ তুমি ও আমি পরস্পরকে এক মুহূর্তের জন্য ভালবাসলেও সে ভালবাসা চিরকালের। আমার কথা মনে পড়ে তোমার? পড়ে? তোমার চোখের জল দেখতে পাচ্ছি আমি। শান্ত হও। আঃ ঘুম, ঘুম কি মধুর আমার কাছে!"

জেনী রিটার বাজনা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে ভেরা বেঞ্চের উপর বসে অঝোরে কাঁদছে।

জেনী জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, ভেরা?

অস্থির, উত্তেজিত ভেরা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে জেনীর গণ্ড, ওষ্ঠ এবং চোখে চুমু দিয়ে বললে, সব ঠিক আছে, সে আমায় ক্ষমা করেছে, আর ক্ষোভ নেই।

১৯১১